মাঘ—১৩৩১

প্রথম সংখ্যা।

সৌরভ

সম্পাদক

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

বিষয় সূচী।

[illegible] টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দ্বাদশবর্ষ কাল নিজ জেলার কার্য্য করিয়া আজ আমরা বাহিরের সাহিত্য সেবীগণকেও আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা রাজধানীর শ্রেষ্ঠ পত্রিকাসমূহে প্রবন্ধ পাঠাইয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা সৌরভে প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। আমরা সাদরে তাঁহাদের প্রবন্ধ বিচার করিব এবং প্রকাশ যোগ্য হইলে বা চেষ্টা করিয়া তাহা প্রকাশের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলে যথা সাধ্য সেরূপ করিয়া নূতন লেখকের সাহিত্য চর্চ্চার পথ প্রদর্শনে সাহায্য করিব।

ভগবান আমাদের এই কার্য্যে সহায় হউন।

গ্রীক দর্শনে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব।

গ্রীক ও হিন্দু উভয় জাতিই মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। ইহাদের প্রতিভার প্রকৃতি বিভিন্ন, চিন্তার ধারা ও গতি স্বতন্ত্র। কাজেই হিন্দু ও গ্রীকদর্শনে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। হিন্দু দর্শন আধ্যাত্মিক শাস্ত্র (১) কিন্তু গ্রীক দর্শনে আধাত্মিক তত্ব যথেষ্ট থাকিলেও তাহা মূলতঃ আধ্যাত্মিক নহে। গ্রীক দার্শনিকেরা কনাদ-গোতম প্রভৃতির ন্যায় দর্শন শাস্ত্রে মুক্তি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই। বোধ হয় কেবল গ্রীসের আর্ফেয়ুসপন্থীদিগের সাহিত্যেই মোক্ষের আলোচনা আছে। পক্ষান্তরে মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি শ্রুতি। ইহারা শাস্ত্র-সাপেক্ষ—নিরঙ্কুশ নহে। কিন্তু প্লোটা আরিষ্টটল প্রভৃতির দর্শনশাস্ত্র শাস্ত্র-নিরপেক্ষ—নিরঙ্কুশ।

হিন্দু ও গ্রীকদর্শনে এইরূপ মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও কোন কোন বিশেষ তত্ত্বের জন্য একে অপরের নিকট ঋণী হওয়া অসম্ভব নহে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে সার উইলিয়ম জোনস্ সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পিথাগোরাসের দার্শনিক তত্ত্বের মূলভিত্তি হিন্দু দর্শন। (১) কোলব্রুক সাহেবেও সাংখ্য দর্শনের নিকট পিথাগোরাসের ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই (২) ইহার পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ স্ক্রোডার (Dr. Schroeder) এ সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ এক পুস্তক প্রকাশিত করেন। (৩) তাহার মতে পিথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ হিন্দু দর্শন হইতেই গৃহীত। অধ্যাপক গার্ব, হপকিন্স, ম্যাকডনেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই মতে সায় দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। অধ্যাপক বার্ণেট বলেন, "গ্রীক দর্শনই ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি। ... কেবল উপনিষদ ও বৌদ্ধদর্শন ভারতের নিজস্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি দর্শনশাস্ত্র নহে। (৪) অধ্যাপক বার্ণেট স্ক্রোডারের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পুস্তকে স্থান দেন নাই। অধ্যাপক বুসল্ট ও উইনডেলবেণ্ড প্রভৃতি ইহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা দর্শন বিষয়ে ভারতের নিকট গ্রীসের ঋণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

এত মতভেদের ভিতর পিথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দর্শন হইতে উদ্ভূত একথা সরাসরি সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহা বিচার সাপেক্ষ।

স্ক্রোডার বলেন পিথারগোরাস লাইকারগাসের ন্যায় ভারতে আসিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (৫)

অধ্যাপক গার্ব্ব; গঁপর্জ্জ ও ম্যাকডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে পিথাগোরাস যখন বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত পারস্যে ভারতীয় দার্শনিকগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। (১) তখন পিথাগোরাস তাঁহাদের নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবার পিথাগোরাস ও প্লোটা প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ যে শিক্ষালাভ করিবার জন্য মিশরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন—ইহাকে অনেকেই ঐতি-

---

(১) মহা মহোপাধ্যায় —৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের, "ফেলোসিপের লেক্‌চার, প্রথম বর্ষ, ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) Sir William Jone's "Works" III 236.

(২) Colebrooke's Miscellaneous Essays" 1, 436. (৩) "Pythegoras und die Inder."

(৪) Early Greek Philosophy," P. 18.

(৫) The Journal of the Royal Asiatic Society July 1909 P.572.

হাসিক সত্য বলিয়া মনে করেন। মিশরের অন্তর্গত আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কেন্দ্র। আলেকজান্দ্রিয়াতে দুর্লভ গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানলিপ্সু বহু লোক অধ্যয়ন করিবার জন্য আলেকজান্দ্রিয়া আসিতেন। কাজেই পিথাগোরাসের সহিত সেথানে ভারতীয় দার্শনিকগণের সাক্ষাৎ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। হিরোডটাস পিথাগোরাসের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি শতকণ্ঠে পিথাগোরাসের ও তাঁহার মতবাদের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু পিথাগোরাস ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন কি না—তাহার উল্লেখ করেন নাই। হিরোডটাসের মতে পিথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ মিশর হইতে গৃহীত। হিরোডটাস বলেন—জন্মান্তরবাদের আদি জন্মস্থান মিশর। কাজেই পিথাগোরাস মিশরিয় দার্শনিকগণের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়া গ্রীসে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিশরীয় তত্ত্বে সুপণ্ডিত ফ্রেন্সিস্ গ্রিফিথ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন "মিশরীয় সাহিত্যের কোথাও জন্মান্তর বাদের উল্লেখ নাই। হিরোডটাস হয়ত অন্য কোথাও বা অন্য কাহারও নিকট এসম্বন্ধে কোন কিছু শুনিয়া থাকিবেন ও পরে ভ্রম বশতঃ ইহা মিশরের ইতিহাস ভুক্ত করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, জন্মান্তর বাদের আদি জন্মস্থান মিশর।" হিরোডটাসের বহু অমার্জ্জনীয় ভ্রান্তি তাঁহার ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাও তন্মধ্যে অন্যতম।

ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদি সম্মত যে ভারতেই সর্ব্বাগ্রে জন্মান্তর বাদের উদ্ভব হইয়াছিল। ঋগবেদ ভারতীয় চিন্তা প্রসূত প্রাচীনতম গ্রন্থ। ভারতবর্ষ ইহার সূতিকা গৃহ। ঋক্‌বেদে জন্মান্তর বাদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। রোথ (Roth) গেল্‌ডনার (Geldner) বটলিঙ্গক (Boltlingk) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মতের সমর্থন করেন। এদিকে পিথাগোরাসের জন্মান্তরবাদও অনেকটা ভারতীয় জন্মান্তর বাদের অনুরূপ। ভারতের সহিত গ্রীসের ভাবের আদান প্রদানের ফলস্বরূপ হয়ত গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস ভারতীয় দার্শনিকগণের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিথাগোরাস ভারতে নাও আসিতে পারেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় বসিয়াও ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ জন্মান্তরবাদ শিক্ষা করা পিথাগোরাসের পক্ষে অসম্ভব নহে। পারস্যেও জন্মান্তরবাদের উদ্ভব হয় নাই। পারস্যে আগত ভারতীয় দার্শনিকদিগের নিকটও পিথাগোরাস ভারতের এই মতবাদ শিক্ষা করিতে পারেন। কারণ, তখন ভারতের বহু জ্ঞানী লোক পারস্যে যাতায়াত করিতেন। পারস্যের সহিত ভারতের ভাবের তখন যথেষ্ট আদান প্রদান হইত। কাজেই পিথাগোরাস জন্মান্তর বাদের জন্য ভারতের নিকট ঋণী বলিয়াই আমাদের অনুমান হয়।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

শীতে।

শান্ত শিশির সোণার শিশির
পাতায় পাতায় দোলে!
নদীর কূলে সরিষা ফুলে,
কার না হৃদয় ভুলে?
সোণার বরণ তরুণ তপন
মধুর হেসে চায়!
উষা রাণীর আনন খানি
নিত্য চুমো খায়!
দোলন দোলে উষার গলে
বিমল তরল হার!
রবির করে উজল করে
নাই তুলনা তার!
শিশির মাখা, তরুর শাখা,
কাঁপ্‌ছে বায়ু ভরে!
কিরণ ঢালা মুক্তা মালা
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে!
ঘোর জড়তা বিষাদ ব্যথা
একটু কোথা নাই!
আজ্‌কে শীতে হিমানীতে
আপ্‌না ভুলে যাই!
এমন উষায় প্রাণ কারে চায়?
কাহার ছবি জাগে?
কে আজ এসে পড়ছে হেসে,
ফুল বসন্তের আগে!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

হাতী-খেদা।

১

সুসঙ্গের সহিত গারো পাহাড়ের সম্বন্ধ বোধ হয় ময়মনসিংহবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। সুতরাং সম্পূর্ণ ইতিহাস এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বোধে ইহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। ইহা উল্লেখ করিলেই এস্থলে যথেষ্ট হইবে যে মদীয় পিতামহদেবের জীবন কালের মধ্যভাগ পর্য্যন্তও এই পাহাড়ে আমরা প্রতিবৎসর যথেচ্ছা হস্তী ধৃত করিতাম; এবং এমনও অনেক সময় হইত যে মদাক্রান্ত হস্তী পালিত স্ত্রী হস্তীর (কুম্‌কীর) সহিত একেবারে আমাদের গ্রামে আসিয়াও উপস্থিত হইত; পাহাড় আমাদের অধিকার চ্যুত হওয়ার বহুদিন পরও, এই সকল হস্তী যথেচ্ছা ধরিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল। কিছুকাল পর সরকার হইতে Elephant Preservation Act আমাদের এই জেলার উপর জারি করার ফলে আমরা এই অধিকার হইতেও বঞ্চিত হই। গতবৎসর হইতে তিন বৎসরের জন্য আমাদের বর্ত্তমান মান্যবর গবর্ণর বাহাদুর প্রতি হস্তীতে ৫০০৲ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্তে আমাদের জমিদারীতে এরূপ হস্তী আসিলে ধৃত করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে দিয়াছেন।

যাহাই হউক, হস্তী সম্বন্ধে শৈশব হইতেই আমাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। পাহাড় সরকারের অধিকারভুক্ত হওয়ার পর আমরা সরকার হইতে ইজারা লইয়া হাতী ধরিতাম। প্রতি হস্তীতে ১০০৲ রাজস্ব এবং একত্রে ২০০০৲ হইতে ৯০০০৲ পর্য্যন্ত সেলামী—এইরূপ বন্দোবস্তেই পূর্ব্বে ইজারা পাওয়া যাইত। প্রথম অনেক কাল পর্য্যন্ত সরকার আমাদিগকে অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন কিন্তু কালক্রমে ইহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে হইতে এক্ষণে গারো-পাহাড় সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারেই আমাদের কোনও অনুগ্রহ প্রাপ্তি একদা অসম্ভব হইয়াছে; ইহার উল্লেখই যথেষ্ট। মোট কথা এখন কয়েক বৎসর হইল সরাসরি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা হস্তী ধরিবার ক্ষমতা পাই না। খেদা প্রসঙ্গে এই কয়েকটী কথা প্রয়োজনীয় বোধে প্রদত্ত হইল।

এবার গারোপাহাড়ের হাতী মহল্লার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে ৩নং মহল্লা (No 3 mahalas) বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া গেল। ধার্য্য হইল—প্রতি কোঠে ধৃত হস্তীতে ৬৫০৲ টাকা এবং প্রতি ফাঁদে ধৃত হস্তীতে ৮৭৫৲ টাকা করিয়া রাজস্ব দিতে হইবে। খেদায় অন্যূন সাড়ে তিন শত কুলীর প্রয়োজন। এতদ্‌ ব্যতিরেকে রসদ সরবরাহ করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ২৫ হইতে ৫০ জন অতিরিক্ত লোক প্রয়োজন হয়।

খেদার কুলি সংগ্রহ কার্য্যটী সহজ নহে। ইহা ভিন্ন রসদ সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যও সহজ সাধ্য নহে। খেদার কার্য্য প্রায় ৪ মাস কাল চলে। প্রথমতঃ অন্ততঃ দুই মাসের সম্পূর্ণ রসদ প্রভৃতির যোগাড় রাখিতে হয়। দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশে যথাসময় রসদ সরবরাহ করিতে না পারিলে ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হয়। খেদার প্রাথমিক আয়োজন এইরূপ।

১। কুলি প্রভৃতি লোক সংগ্রহ।
২। রসদ সংগ্রহ।
৩। শিক্ষিত হস্তী সংগ্রহ।
৪। কোঠের সরঞ্জাম সংগ্রহ।
৫। বন্দুক সংগ্রহ।

আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ হইতে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কার্য্যে অগ্রসর হইয়া দেখা গেল বাধা বহু। খেদার প্রধান দুই অঙ্গই জুটিয়া উঠে না। মানুষ এবং শিক্ষিত হাতী—এই দুয়েরই অভাব। অনেক কাল খেদা না হওয়ায় শিক্ষিত লোক এবং শিক্ষিত হাতী উভয়েরই অভাব হইয়াছে। সুতরাং কুলী সংগ্রহ দায় হইয়া উঠিল। প্রাচীন লোক যাহারাও আছে তাহারা প্রায়ই কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। যাহাদের পাওয়া গেল, তাহারাও দুই মাসের মাহিয়ানা অগ্রিম লইল। এইরূপে ১৮ জন মাত্র সর্দ্দার পাওয়া গেল; কিন্তু বস্তুতঃ সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০ জনের অধিক লোক সংগৃহীত হইল না। কুলি চালনা প্রভৃতি কার্য্য অনেকটা যুদ্ধ ব্যাপারের মত। বস্তুতঃ খেদা অভিযানকে একটা ছোট খাট সমরাভিযান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং কুলীদের শাসনে রাখার ক্ষমতা না থাকিলে এই রূপ কার্য্য পরিচালনা অতি কঠিন। বস্তুতঃ শাসনের ভীতি ছাড়া কায পাওয়া অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে।

কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিলে কোনও কুলি পশ্চাৎপদ হয় নাই বরং কার্য্যের সময় তাহাদের পরিশ্রম ও সাহস অনেক সময়ই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। বসিয়া থাকার সময়ই কুলি পলায়ন করে; করিলে পুনরায় তাহাদের সংগ্রহ করিয়া কার্য্য করিতে বহু সময় যায়। যাহা হউক ইহাদের লইয়াই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর দেখা গেল না।
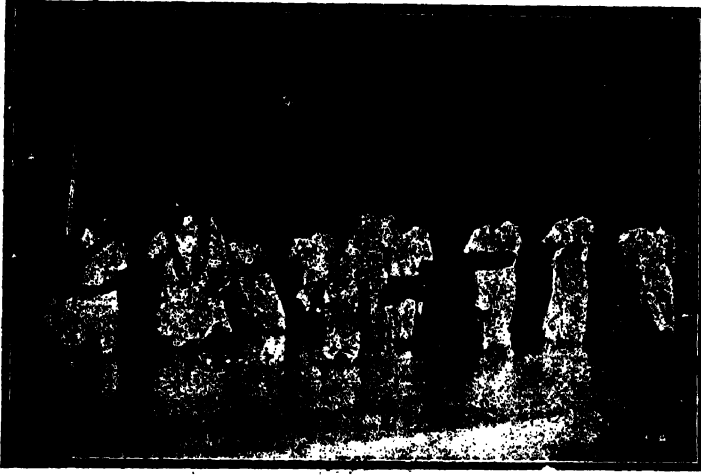
গুণেশ্বরীতে খেদার পরিচালকগণ।

প্রথম অভিযান গারো হিলের পূর্ব্ব দিকে হওয়াই সুস্থির হইল। তথায় পূর্ব্বেই পাঞ্জালি (অর্থাৎ trackers) পাঠান হইয়াছিল। তাহারা সংবাদ দিল—ঘোলপানির নিকট চিকিসিন নামক স্থানে ২৫। ৩০ টা হাতী আছে; সত্বর বহর (অর্থাৎ কুলি) তথায় পাঠান হউক, নতুবা হস্তী স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে পারে। কুলি পাঠাইতেও আমাদের ২। ৩ দিন বিলম্ব হইল। শেষ দল কুলি, খেদার কুলি এবং কোঠ বিভাগের কর্ম্মচারী মহেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী ও নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া ৫ই অগ্রহায়ণ পাঠান গেল। এই দিন হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে এক মাতৃহীনা পঞ্চ বর্ষীয় শিশু ৪। ৫ দিনের জ্বরে মরজগৎ হইতে চলিয়া যাওয়ায় সকলেই একটু বিষন্ন হইলাম। কিন্তু বিধাতৃ বিধান অখণ্ডনীয়। দুনিয়ায় মানুষের শোকাভিভূত হইয়া বসিয়া থাকার অবসর নাই। শোকাভিভূতের কর্ম্মে প্রবৃত্তির বিষয় গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিই শেষ কথা। বোধ হয় ইহাই আমাদের প্রেরণা আনিয়া দিল। খেদা কেম্প চিকিসিম নামক স্থানে ছিল, রসদ সরবরাহের কেম্প ছিল জগন্নাথপুর এই স্থান সুসঙ্গ হইতে ৭। ৮ মাইল দূর, গুণেশ্বরী নদীর তীরে। এখানে গরুর গাড়ীতেই মাল পাঠান যাইত। প্রত্যহ সুসঙ্গ এবং খেদা কেম্পে ডাক যাতায়াত করিত। আমরা খেদার ডাক পাওয়ার জন্য প্রত্যহ অতি উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতাম। অবশেষে একদিন সংবাদ আসিল—হাতী বেড় হইয়াছে; বোধ হয় বেড়ে ২৫। ৩০ টী হাতী আছে। সংবাদ পাওয়ার পর দিবসই আমাদের যাইতে হইবে ইহা পূর্ব্বেই স্থির ছিল; সুতরাং সংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা আমাদের মালামাল গুছাইতে লাগিলাম। পাহাড়ে ভার মালপত্র লইতে নাই। সুতরাং প্রত্যেকে একটা বাস্কেট, একটা ডাটি ব্যাগ, একটা হাত ব্যাগ, একটা বিছানা লইয়া প্রস্তুত হইলাম। অতিরিক্তের মধ্যে ছিল আমার একটা ক্যেমেরা; ইহা ছাড়া বাসনপত্র প্রভৃতি ছিল। সমস্তই আমরা রাত্রি ১১ টার মধ্যেই ঠিক করিয়া ফেলিলাম। স্থির হইল ১৩ই অগ্রহায়ণ প্রাতে ৭ টায় নিম্নলিখিত কয়েকজন রওনা হইব।

১। রাজা নীরদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

ভারবাহী হস্তীসমূহ কেম্পে যাইতেছে।

২। রাজা নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

৩। রাজা দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
৪। কুমার নরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
৫। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
৬। বাবু যতীন্দ্রনাথ সিংহ
৭। „ অখিলচন্দ্র লাহিড়ী
৮। „ উপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রভৃতি কর্ম্মচারী
৯। ব্রজনাথ দে ভৃত্য
১০। রজনীকান্ত দে ভৃত্য
১১। জগমোহন দে ভৃত্য
১২। রামকুমার দে
১৩। হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পাচক)

মালবাহী কুলি অভিযান।

১৪। রামগতি হাজং (পালোয়ান)
১৫। বঙ্ক হাজং (ঐ)
১৬। নন্দ বানাই ছাউনী প্রস্তুত কারক
১৭। শর্ম্মা হাজং
১৮। ফলি (বাজে চাকর) এবং
আমি।

এখন পর্য্যন্ত আমাদের কেবল মাত্র ৯টী হাতী সংগৃহীত হইয়াছে সুতরাং খেদার প্রধান দুই অঙ্গের যোগাড় যেমন হইয়াছিল তাহাতে ফল তদ্রূপ হইলেই বিচিত্র হইবে—এই ভাবিয়া তখনও আমরা ভীত হইতেছিলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
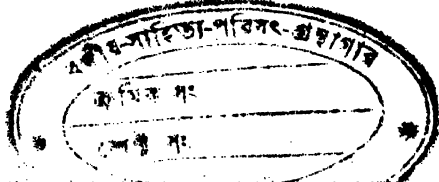
রামায়ণী-যুগে বিবাহের বয়স।

কন্যা বয়স্থা না হইলে স্বয়ংবর বিবাহ হইতে পারে না। সীতা কি তবে বিবাহকালে বালিকা ছিলেন ?

রামায়ণে সীতার বিবাহের বয়সের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। রামায়ণের বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্দেশ দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে; রামের বিবাহ বয়স সম্বন্ধেও এই এক পন্থাই অবলম্বনীয়।

বালকাণ্ডের বিংশ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে রাজা দশরথের মুখে রামের বয়সের উল্লেখ পাওয়া যায়। আপাততঃ এই বয়স সংখ্যা অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব।

বিশ্বামিত্র ঋষি যজ্ঞ করিবেন। যজ্ঞ রক্ষার্থ শক্তিমান বীর-পুরুষ প্রয়োজন; তাই ঋষি বিশ্বামিত্র রামকে সেই যজ্ঞ রক্ষার্থ লইয়া যাইতে আসিয়া রাজা দশরথের নিকট তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিয়া অপত্য বৎসল পিতার মন আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল; তিনি বিশ্বমিত্রকে বলিলেন—

"উন ষোড়শ বর্ষো সে রামো রাজীব লোচনঃ।
ন যুদ্ধ যোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥" ২।১।২০

দশরথ বলিলেন—'আমার রাজীব লোচন রামের বয়স ষোল হয় নাই—উনষোড়শ, আমি রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার তাহার শক্তি দেখিতেছি না'—ইত্যাদি।

এস্থলে অবগত হওয়া যাইতেছে, যখন রাম রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল উন ষোড়শ—অর্থাৎ ষোল বৎসর অপেক্ষা ন্যূন। কিন্তু এই উক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কেন না ইহারও বিরুদ্ধ উক্তি এই রামায়ণেরই অন্যত্র মারিচের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে।

অরণ্যকাণ্ডের ৩৮ সর্গে মারিচ রাবণকে দশরথের কথাই পুনরায় বলিতেছেন—

"উনদ্বাদশ বর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ।
কামন্তু মম তৎ সৈনং ময়াসহ গমিষ্যতি।" ৬।৩।৩৮

এই পরস্পর বিরোধী দুই উক্তির কোনটী ভুল, তাহার আলোচনা পরে করিব। এস্থলে আমরা দশরথের নিজ

মুখের উক্তিকেই অকৃত্রিম মনে করিয়া গ্রহণ করিলাম।

রাম ও লক্ষ্মণ যে অবশেষে রাজা দশরথের সম্মতিক্রমেই বিশ্বামিত্রের সহগামী হইয়াছিলেন, ইহা রামায়ণের স্বীকার্য্য ঘটনা; সুতরাং তাহার উল্লেখ বাহুল্য। রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হন; সেস্থানে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞান্তে তাঁরার সহিত রাজা জনকের ধনু পরিদর্শন জন্য মিথিলায় উপনীত হন। ইহার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং এই সময় রামের বয়স ষোড়শ অতিক্রম করে নাই।

আমাদের এই নির্দেশ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতেছে। যোগবাশিষ্ঠের ৫ম সর্গে বৈরাগ্য প্রকরণে রামের বিবাহ বয়স সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—

অথোনষোড়শ বর্ষে বর্ত্তমানে রঘূদ্বহে।
রামানুযায়িনী তথা লক্ষ্মণে শত্রুঘ্নেঽপিচ॥ ১
ভরতে সংস্থিতে নিত্যং মাতা মহ গৃহে সুখং।
পালয়ত্যবনিং রাজ্ঞি যথাবদখিলামিমাং॥ ২
জন্য বার্থঞ্চ পুত্রাণাং প্রত্যহং সহমন্ত্রিভিঃ।
কৃতমন্ত্রে মহাপ্রাজ্ঞে তজ্জ্ঞে দশরথে নৃপে॥ ৩

অর্থাৎ ছেলেদের ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইবার পুর্ব্বেই রাজা বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি এই বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। ইত্যাদি…

যোগবাশিষ্ঠ পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ হইলেও এই গ্রন্থে যে মূল রামায়ণের উক্তিই গৃহীত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যোগবাশিষ্ঠের এই সমর্থন দ্বারা এই দুটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে; ১ম—রামের ১৬ বৎসর বয়সে অথবা তাহার পূর্ব্বে ঊনষোড়শ বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল; ২য়—আরণ্যকাণ্ডের মারিচের মুখের উক্তি কৃত্রিম অথবা লিপিকারের ক্রটী। রামের যে ষোল বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণের অন্যান্য স্থান হইতেও প্রমাণিত হইবে; সে সকল স্থানের উল্লেখ পরে করিব।

রামের ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে বিবাহকালে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির বয়স যে তাহা অপেক্ষা ও ২ | ১ বৎসরের ন্যূন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহের সময় সীতা-উর্ম্মিলা প্রভৃতির বয়স কত ছিল, এখন তাহাই আলোচনার বিষয়। রামায়ণে সে সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট নাই।

সীতার পালক পিতা জনকের মুখেও সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ নাই। জনক কেবল বলিয়াছেন—

"ভূতলাদুত্থিতা সাতু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা॥১৪
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থি তাং তাস্ত বর্দ্ধমানাং মমাত্মজাম॥ ১৫।১।৬৬

"ব্যবর্দ্ধত" ও "বর্দ্ধমানাং এই দুইটী বয়স জ্ঞাপক শব্দ মাত্র জনকের মুখে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দ দুটীর প্রথমটীর অর্থ "ক্রমশ বাড়িতে লাগিল' দ্বিতীয়টীর অর্থ 'বৃদ্ধির অবস্থায়।" ইহার অধিক বয়স নির্দ্দেশ সূচক কোন ইঙ্গিত রাজা জনকের মুখে অবগত হওয়া যায় না।

এস্থলে সীতার বিবাহের বয়সের উল্লেখ না থাকিলেও আরণ্যকাণ্ডের ৪৭ সর্গে ও সুন্দরকাণ্ডের ৩৩ সর্গে সীতার নিজ মুখে—সীতার বয়সের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দণ্ডকারণ্যে ছদ্মবেশধারী রাবণকে ব্রাহ্মণ অতিথি বিবেচনা করিয়া সীতা তাহার নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকুণাং নিবেষণে
ভুঞ্জানাং মানুষাণ ভোগান সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিনী॥৪
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজা মন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমতো রাজমন্ত্রিভিঃ॥ ৫।৩।৪৭

অর্থ—বিবাহের পর আমি স্বামীগৃহে সুখ-সম্ভোগে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করি। অতঃপর ত্রয়োদশ বৎসরে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা রামকে রাজ্য প্রদানের সঙ্কল্প করেন।

এস্থলে বয়সের কোন কথা নাই বটে কিন্তু বিবাহের পর কত দিন স্বামীসহ সীতা অযোধ্যায় ছিলেন, তাহার একটী নির্দ্দেশ আছে; এই নির্দ্দেশ দ্বারা রামের বনবাস কালের বয়স অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সীতার এই উক্তিও প্রমাদ শূন্য নহে, সুতরাং তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারেন না। বিশেষতঃ এই উক্তি কৌশল্যার উক্তির

বিরোধী। রামায়ণে এইরূপ পরস্পর বিরোধী উক্তির অভাবই নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচনের একটা প্রধান উপায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। স্থল বিশেষের অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ উক্তি বিশেষভাবে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এস্থলে ঐ বিরোধী উক্তি-গুলির উল্লেখ করিয়া তাহার বিচার করিতে চেষ্টা করিলাম।

রাম বনে গমনে প্রস্তুত হইয়া জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে, তিনি বলিয়াছিলেন—

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্ত তব রাঘব।

অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখ পরিক্ষয়ম॥ ৪৫।২।২০

"হে পুত্র, তোমার জন্মের পর এই সপ্তদশ বর্ষ আমি আমার দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া কাটাইয়াছি।"

কৌশল্যার এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যায়, রাম সপ্তদশ বর্ষে বনে গমন করিয়াছিলেন।

যদি উনষোড়শ বর্ষে রামের বিবাহ হইয়া থাকে, তবে কৌশল্যার এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইবে যে বিবাহের পর মাত্র এক বৎসর রাম সীতার সহিত অযোধ্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে বনে গমন করিয়াছিলেন। আরণ্যকাণ্ডের উপরোদ্ধৃত শ্লোকে কিন্তু সীতা বলিতেছেন, তিনি বিবাহের পর দ্বাদশ 'সমা' (বর্ষ) পতি সহ ইক্ষ্বাকু কুলে বাসের পর ত্রয়োদশ বর্ষে রামের রাজ্যাভিষেকের সঙ্কল্প হয় এবং এই সময় তাঁহারা বনে গমন করেন।

কৌশল্যার উক্তির বিরোধী এই যে উক্তি, এই উক্তির সমর্থন রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডেরও একস্থলে আছে। আরণ্যকাণ্ডে সীতা অতিথি বেশধারী রাবণকে যাহা বলিয়াছেন, সুন্দরকাণ্ডে প্রায় সেইরূপ কথাই অশোকবনে অবস্থিতা সীতা হনুমানকে বলিয়াছেন; যথা—

সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।

ভুঞ্জানামানুষাণ ভোগান্ সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিনী॥ ১৭

ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্।

অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে॥ ১৮। ৫। ৩৩

এই পরস্পর বিরোধী উক্তি দুটীর একটিকে অবশ্যই ভুল বা লিপিকর প্রমাদ অথবা কৃত্রিম বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। আরণ্যকাণ্ডের ও সুন্দরকাণ্ডের শ্লোক দ্বয়ের "দ্বাদশ সমা" শব্দের 'সমা'কে যদি 'মাস' বলিয়া পাঠ করা যায় এবং "ত্রয়োদশ 'বর্ষ' স্থলে যদি "ত্রয়োদশ মাস" পাঠ গ্রহণ করা যায়, এবং এই ভুলকে লিপিকর প্রমাদ বলিয়া মনে করা যায়, তবে মীমাংসার পন্থা বোধ হয় বা সহজ হইতে পারে।

সীতার পরবর্ত্তী উক্তি যেন এই পন্থা আরও একটু সহজ করিয়া দিতেছে। এখানে সীতার উক্তি আরো স্পষ্ট। সীতা ক্রমে অথিতি বেশধারী রাবণের নিকট তাঁহার নিজের ও তাঁহার স্বামীর বয়স বলিতেছেন—

মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।

অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥ ১০। ৩। ৪৭

অর্থ আমার স্বামীর বয়স পঞ্চবিংশ (পঁচিশ) ও আমার বয়স অষ্টাদশ বা আঠর।

সীতার এই উক্তিকে বয়স সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান কাল বাচক উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সীতার পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। যথা—

পঞ্চম বৎসরে বিবাহ + এক বৎসর অযোধ্যায় বাস + বনে গমনের ত্রয়োদশ বর্ষে সীতার নিকট অথিতি বেশে রাবণের আগমন ও এই কথোপকথন। মোট আঠর বা উনিশ বৎসর।

সীতার এই উক্তিকেও কিন্তু নির্ভুল বলিয়া নিরাপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কেন না, এই হিসাবে রামের বয়স সীতার কথিত পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়া যায়। যথা, কৌশল্যার উক্তি অনুসারে সপ্তদশ বর্ষে বনে গমন, আর ত্রয়োদশ বর্ষ বনে বাস মোট ত্রিশ বৎসর।

এই স্থলে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। আরণ্যকাণ্ডে মারিচের মুখে যে 'উনদ্বাদশ' বর্ষের কথা আছে, ঐ উনদ্বাদশ বর্ষই রামের বয়স ছিল—স্বীকার করিয়া যদি ইহার পরবর্ত্তী সময়ের পরিমাণ গণনা করা যায়, তবে কিন্তু সীতার এই বয়স জ্ঞাপক উক্তিতে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না।

* মাস শব্দ উল্টা সমা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু 'বর্ষ' শব্দ মাস হওয়া কঠিন। বোধ হয় মাস শব্দই প্রথমে ভুলে 'সমা' হইয়াছিল, তৎপর পূর্ব্ব অর্থ রক্ষার জন্য 'মাস' শব্দকে 'বর্ষ' করা হইয়াছে। প্রথমটী ভুল, দ্বিতীয়টী সেই ভুল সমর্থন জন্য ইচ্ছাকৃত ত্রুটী।

মারিচ রাবণকে বলিয়াছিল—রামের এগার (উনদ্বাদশ) বৎসর বয়সে রাম বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। সেই সময়ই রামের বিবাহ; বিবাহের পর এক বৎসর অযোধ্যায় বাস; অতঃপর তের বৎসর বনবাস; মোট পঁচিশ বৎসর।

মারিচের উক্তির সহিত সীতার উক্তির এই স্থলে কোন রূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়; কিন্তু তাঁহারা দ্বাদশ 'সমা' (বৎসর) বিবাহের পর অযোধ্যায় বাস করিলে তাহা হয় না। ঐ দ্বাদশ বৎসরের ও প্রবোধ পাওয়া যায়, যদি সীতার উক্তি অতীত কাল বাচক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ সীতা রাবণকে বলিতেছেন—আমরা যখন বনে আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম তখন আমার স্বামীর বয়স পঁচিশ ও আমার বয়স অষ্টাদশ ছিল। এইরূপ অর্থ করিলে মারিচের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা সীতার উক্তির দ্বারা হয়। যথা—

রামের বিবাহ ১২ + অযোধ্যায় বাস ১২ = মোট ২৪

সীতার বিবাহ ৫ + অযোধ্যায় বাস ১২ = মোট ১৭

বনবাসের কাল চব্বিশ ও সতরর এক বৎসর অধিক ধরিলে যথা ক্রমে ২৫ ও ১৮ এই বয়স সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ পিতা দশরথ ও মাতা কৌশল্যার উক্তির সহিত কোনরূপেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

আমাদের মনে হয়, যে পাণ্ডুলিপিকার মারিচের মুখে 'উনষোড়শ' শব্দটাকে 'উনদ্বাদশ' করিয়াছিলেন, তিনিই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সীতার মুখে বয়স জ্ঞাপক শব্দ দুইটি—"অষ্টাদশ" ও "পঞ্চবিংশ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া অন্যদিকে বিরোধ ঘটাইয়াছেন।

আমাদের এই নির্দ্দেশ সমর্থন জন্য আমরা রামায়ণের আর একখানা সংস্করণের পাঠ, এই স্থলে উদ্ধৃত করিব। ঐ পাঠের আলোচনায় আমাদের সংস্করণের জাল রচনা ধরা যাইতে পারিবে। বঙ্গদেশে বেণীমাধব দের একখানা মূল রামায়ণের সংস্করণ আছে। তাহাতে রাবণের নিকট সীতা যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, ঐ পরিচয় প্রসঙ্গে রাম সীতার বয়সের অন্তত্র নাই; পরন্তু অযোধ্যায় দ্বাদশ বর্ষ বাসের স্থলে সংবৎসর বাসের উল্লেখ আছে। তাহাতে সীতা বলিয়াছেন—

"দুহিতা জনক মাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রংতে ভার্য্যা রামস্য ধীমতঃ॥
সংবৎসরং চাধ্যসিতা রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিনী॥
তত সম্বৎসরাদূর্দ্ধং সমমন্যত মে পতিং।
অভিষেচয়িতুং রাজা সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ॥"

প্রচলিত রামায়ণের সংস্করণগুলিতেও এই শ্লোক গুলি আছে; কিন্তু তাহা কাণ্ডান্তরে। সুন্দরকাণ্ডের ৩৩ সর্গে সীতার মুখেই এই কথাগুলি হনুমানের নিকট বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে স্থলেও "সংবৎসর" স্থলে "সমা দ্বাদশতত্রাহং" ও "সম্বতসরাদূর্দ্ধং" স্থলে "ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে" আছে।

আদিকাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে আছে—বিবাহের পর ভরত ও শত্রুঘ্ন ভরতের মাতুলালয় চলিয়া যায় এবং রাম ও সীতা

"রামশ্চ সীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহূনৃতুন্।" ২৫। ১। ৭৭

বহুঋতু অযোধ্যায় অবস্থান করেন। দশরথের মৃত্যু হইলে ভরত ও শত্রুঘ্নকে লোক পাঠাইয়া অযোধ্যায় আনয়ন করা হয়।

যদি রাম-সীতার বিবাহের পর তাহাদের দ্বাদশ বর্ষ কাল অযোধ্যায় থাকা সমর্থন করিতে হয়, তবে ভরতেরও মাতুলালয়ে তত কাল থাকা অনুমোদন করিতে হয়। তাহা কি সম্ভব? কৌশল্যার উক্তি তাহার পরিপন্থি, উপরের শ্লোকের "বহূনৃতুন্" শব্দ দ্বারাও বার বৎসর বুঝাইতেছে না।

বেণীমাধব সংস্করণে কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত রাম সীতার বয়স জ্ঞাপক ১০ম শ্লোকটী নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে—

মম ভর্ত্তা মহাবীর্য্যোগুণবান সত্যবান শুচী।
রামেতি প্রথিতো লোকে সর্ব্ব ভূত হিতে রত॥

এই পাঠই যে অকৃত্রিম তাহাও বলা যায় না। প্রচলিত সংস্করণ গুলির মধ্যে রাম-সীতার বয়সের যে গোলমাল রহিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান জন্য, বেণীমাধব সংস্করণের আদর্শ পুস্তকে অথবা বেণীমাধব সংস্করণেই সংশোধন ছলে এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

আর এক কথা এই—উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলি অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিলে সীতার ৫ কি ৬ বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর এক বৎসর অযোধ্যায় থাকিয়া ৭ম বর্ষে বনে গমন গণনা করিতে হয়। এইরূপ বালিকাকে বনে লইয়া যাওয়ার সমর্থন বোধ হয়

কেহ করিবেন না। এইরূপ বয়সের বালিকার পক্ষে বনে গমনের ব্যবস্থা হইলে, সেইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জন-গণের মুখে বা আত্মীয় পরিজনের মুখে যেরূপ আপত্তি জনক কথা ও মন্তব্য সেই সময় বাহির হওয়া প্রয়োজন, রামায়ণের বন গমন বাপারে সে সম্বন্ধে একেবারেই কোন কথা নাই।

এইরূপ অবস্থায় এই পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলিকে ত্যাগ করিয়া বিচার করিলে কোন নূতন পন্থা পাওয়া যাইতে পারে কি না এইবার আমরা তাহাই দেখিব।

মহাকবি সীতাকে বাস্তবিকই একটী পুতুল সদৃশ করিয়া আনিয়া বিবাহ সভায় স্থাপন করিয়াছেন। ভবভূতির মহাবীর চরিতের সীতা এস্থলে যেমন চঞ্চলা চপলা, এ সীতা তেমন নহে। সমগ্র আদিকাণ্ডে সীতা প্রায় অদৃশ্যা—বিবাহ স্থলে তিনি নামে মাত্র পরিচিতা। এই নামে মাত্র পরিচিতা সীতার সহিতই রামের বিবাহ হইয়া গেল; সীতা রামের সহিত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। এই স্থলে এইরূপেই কেবল নামের দ্বারা পাঠকের সহিত সীতার সাক্ষাৎ হইল। অথচ এইরূপ একটী মূক বালিকার সহিত একটী মূক কিশোরের বিবাহকেই রামায়ণে স্বয়ংবর বিবাহ বলিয়া অভিহিত করা হইল। এস্থলে একথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য যে আদিকাণ্ডের কোন স্থলেই সীতার মুখে কবি একটী কথাও বাহির করান নাই।

অযোধ্যাকাণ্ডের ২১শ সর্গে আমরা প্রথম সীতার মুখে কথা শুনিতে পাই। অতঃপর ৩০শ সর্গে দেখিতে পাই, সীতা চপলা-মুখরা। রাম একাকী বনে গমন করিতেছেন শুনিয়া সীতা রামকে ভৎ'সনা-বাক্যে বলিতেছেন—

"স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইবমাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি॥" ২।২।৩০

রাম তুমি শৈলূশের ন্যায় এই সতী কুমারী * ভার্য্যাকে এতদিন সঙ্গে রাখিয়া নিজেই পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে চাও?"

সীতার এই উক্তিতে সীতার মুখেই সীতাকে কুমারী বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কুমারী শব্দ রামায়ণের দুই স্থানে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থ বয়স বাচক; দ্বিতীয় অর্থ—অবস্থা বাচক।

এই শ্লোকের 'কুমারী' শব্দ বয়স বাচক। অন্যত্র—

"নারাজকে জন পদে" তুষ্টানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতাং যান্তি কুমার্য্যো হেম ভূষিতাঃ॥২৭।২।৬৭

এস্থলে "কুমারী" (কুমার্য্যো) শব্দে অল্প বয়স্কা অবিবাহিতা বালিকা মাত্রকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে এই "কুমারী"—অবস্থা বাচক। এই শ্লোকের অর্থ—অরাজক রাজ্যে কুমারী কন্যারা (অর্থাৎ অবিবাহিতা বালিকারা) স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে পারে না।

অবিবাহিতা কন্যা মাত্রকেই কুমারী বলা হয় কিন্তু সীতা যে নিজকে কুমারী বলিতেছেন তাঁহা অবিবাহিতা অর্থে নহে; বয়সে কুমারী।

"দশমে কন্যকা প্রোক্তা"... ইত্যাদি স্মৃতির বিধান অনুসারে দশম বর্ষই "কুমারী" বা "নগ্নিকা" কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কন্যা শব্দই যে "কুমারী", নগ্নিকা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা কোষকারেরাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অবশ্য এই নির্দ্দেশ রামায়ণ-যুগের বহু পরকালবর্ত্তী স্মৃতির ও অভিধানের নির্দ্দেশ।

যাহা হউক। সীতার এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে ইহা অপেক্ষা আরো স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

সীতা অন্যত্র এক স্থানে বলিয়াছেন, তাঁহার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল। স্থানটী এইরূপ;—রাবণ বধের পর রাম জনকীকে সন্দেহ করিয়া পরিত্যাগ করিলে সীতা বাষ্পাকুল লোচনে রামকে বলিয়াছিলেন—

* "কৌমারীং" শব্দটীকে নানা ব্যক্তি নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কুমারী শব্দ ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া "কৌমারী অবস্থায় গৃহীত" এই অর্থ করিয়াছেন; কেহ বা "অন্য পূর্ব্বা নহে জানিয়া"—অর্থ করিয়াছেন। কেহ বা কুমারী সীতারই একটী নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে শ্লোকটীর কথায় কথায় অন্বয় করিয়া দেখাইয়া দিলাম—

হে রাম ত্বং শৈলূষইব চিরং অধ্যুষিতাং সতীং কৌমারীং ভার্য্যাং মাং তু পরেভ্যঃ দাতুমিচ্ছসি।—এখন পাঠক কৌমারীং শব্দের অর্থ বিচার করুন। কুমারী শব্দের অন্য একরূপ ব্যবহার ঋক্ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে অর্থ ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক কুমার সহ বর্ত্তমান ইতি কুমারী। ৮।৩।১।৮ ঋক দ্রষ্টব্য। ঋক্‌বেদে এই শব্দটী পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত।

মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহুতেন পুরস্কৃতম্। ১৫
ন প্রমাণীকৃত পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তি নচ শীলঞ্চ সর্ব্বংতে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।১৬।৬।১১৮

অর্থ—আপনি আমার চরিত্র সম্বন্ধে সমুচিত সম্মাননা করিলেন না; বাল্যকালে আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাও আপনি দেখিলেন না; আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি ও শীলতা তাহাও আপনি বিবেচনা করিলেন না।

সীতার এই উক্তিও কোন পরবর্ত্তী কবির কারিকরি প্রসূত কি না জানি না। আপাততঃ এই উক্তকে তাঁহার পূর্ব্ব উক্তি—'কুমারী ভার্য্যা' উক্তির সমর্থক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যদি তাহা সমর্থন যোগ্য হয়, তবে সীতার নয় দশ বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সীতার যদি এই বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বয়োঃ কনিষ্ঠা ভগিনী উর্ম্মিলা-মাণ্ডবী প্রভৃতির বিবাহ যে আরো অল্প বয়সে হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। * সীতাকে ও তাঁহার ভগিনীদিগকে বিবাহ কালে কবি যে ভাবে অন্তরালে রাখিয়াছেন, তাহাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। লক্ষ্মণ, ভরত বা শত্রুঘ্নের সহিত কোথাও আমরা তাঁহাদের স্ত্রীদের সম্মিলন দেখিতে পাই না। বোধ হয় নিতান্ত বালিকা বলিয়াই বিবাহের পর তাঁহারা সকলেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন; ভরত এবং শত্রুঘ্নও বোধ হয় সেই জন্ত পত্নী বিরহিত অবস্থায়ই মাতুল গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

রামায়ণে বাল্য বিবাহের আভাস থাকিলেও যৌবন বিবাহ যে তখন হইত না, এমন মনে হয় না রামায়ণে কিন্তু যৌবন বিবাহের উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ যদি আরো দশ বৎসর মধ্যে পূর্ণ না হইত, তবে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহার কোন ইঙ্গিতও রামায়ণে নাই। এইরূপ পণ, যে সমাজে প্রচলিত থাকে, সে সমাজ কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া চলিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

এই স্থলে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সমাজের অবস্থা সামান্ত ভাবে আলোচনা করিলে, আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সমীচীনতা ও অসমীচীনতার দিকে লক্ষ্য করিবার পক্ষে পাঠকগণের সুবিধা হইবে। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাহা করিলাম।

বেদে যৌবন বিবাহ ও বাল্য বিবাহ উভয় বিবাহেরই আভাস আছে। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে সমাজ বন্ধন খুব শিথিল ছিল; ক্রমে ধীরে ধীরে সমাজ ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। রামায়ণের যুগে আসিয়া আমরা প্রতি বিষয়েই সমাজ ধর্ম্মের দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়া একটা বিধি অনুসরণের অবস্থা দেখিতে পাই। এই অবস্থা বা ব্যবস্থায় সে যুগে বাল্যবিবাহই সমাজধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং সেজন্যই রামের যোড়শ বর্ষে ও সীতার বাল্য কালে এবং সীতার ভগিনীগণের আরো অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

উপনিষদ যুগে ও সূত্র যুগে এই অস্পষ্ট অবস্থা আরো একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন পুরুষের পক্ষে অন্যূন চব্বিশ বৎসর ও কন্যার পক্ষে "নগ্নিকা" বিবাহ-বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা বোধ হয় ক্রম-আলোচনারই ফল।

উপনিষদ দ্বিজাতির জন্য সমাবর্ত্তনের পর স্ত্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন; সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে নহে। সূত্রকারগণ এই ব্যবস্থারই অনুমোদন করিয়াছেন। উপনিষদ স্ত্রীর বয়সের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দেন নাই; সূত্রকারগণ তাহা দিয়াছেন। গোভিল,[১] হিরণ্যকেশিন,[২] বসিষ্ঠ,[৩] গৌতম[৪] বৌধায়ণ[৫] প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রকারগণ সকলেই 'নগ্নিকা' বা 'বালিকা' বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং অবিবাহিতা কন্যার রজো দর্শনকে দোষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(১) লক্ষ্মণের স্ত্রী উর্ম্মিলা যে বয়সে সীতার ছোট তাহা রাজা জনকের উক্তি দ্বিতীয়ামূর্ম্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি নসংশয়ঃ।২২।১।৭১ হইতেই বুঝা যাইতে পারে। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি যে উহাদের চেয়েও বয়সে ছোট ছিল উহাদের সম্প্রদানের পরে ইহাদের সম্প্রদান ব্যবস্থা হইতেই বোধ হয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

(১) গোভিল গৃহ্যসূত্র ৩।৪।৬
(২) হিরণ্যকেশীন গৃহ্যসূত্র ১।৬।১৯।২
(৩) বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৭০;
(৪) গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১৮।২১
(৫) বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ৪।১।১১

গিন্নি পাশের ঘরে গিয়ে ধপাৎ করে শুয়ে পড়লেন। বাবু ছুটে ডাক্তার ডাকতে গেলেন।

ডাক্তার এল, হাত ধরে বল্‌ল, "পাল্‌স্ বড্ড উইক্।" বুকে নল লাগিয়ে বল্‌ল, "হার্টও ভারি কুইক্।" চোক দেখে বল্‌ল পিউপেল কন্‌ট্রাক্টেট। জিব দেখি! জিব বা'র কর!"

খোকা জিব বার করলে না।

"ও ইয়েস এযে কোমা দেখছি। কেস হোপলেস; ভয় নাই, যে ওষুধ আসবে থ্রি অওয়ার্স পরে পরে খাওয়াবেন।

ডাক্তার ফস ফস করে প্রিসক্রপসন্ লিখে উঠে দাঁড়ালেন, ফি দিলেই পকেটে ফেলে মস মস করে চলে গেলেন।

ওষুধ এল, মুখে ঢেলে দেওয়া হ'ল, ওষুধ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

"খোকা, বাবা ঘুমিও না, কথা কও!"

এমন কথাত খোকা কখন শোনেনি! সে এত কাল কেবল শুনে আসছে; "চুপ কর, আর ঘুমা!" তাকে কথা কইতে, বা জেগে থাকতেত কেউ বলে নি! নূতন কথা শুনে খোকা চমকে চাইল। "মা কোথায়" বলতে গিয়ে বলতে পারল না। তার হাঁ করা মুখ একটু বেশী ফাঁক হয়ে গেল।

তার পর হাত দুটো মুঠো করে, চোখ কপালে তুলে ঝাঁকিমেরে উঠল।

পাশের ঘরে ঝি বলে উঠল—"বাবু জলদি আইয়ে মাই বেহুস হো গিয়া।"

বাবু দৌড়ে গেলেন।

তখন অন্য বাড়ীর লোক এসে খোকাকে উঠানে নামাল।

"মমুরে—"বলে মণি কেঁদে উঠল।

"চুপ কর, চেঁচাসনি, তোর মা'র ফিট হয়েছে!"

শ্রীসুরজিৎ দাস গুপ্ত

নর।

ভ্রূকুটি কুটিল আঁখি উন্নত শরীর,
বলদর্পী উচ্চভাষী প্রভুত্বগর্ব্বিত;
সে যেন ধরার মাঝে দিগ্বিজয়ী বীর,
চরণ আঘাতে তার মেদিনী কম্পিত।
সে জ্ঞান বিজ্ঞান বলে মহাবলীয়ান,
সাগরে ভূধরে শূন্যে গতি অব্যাহত;
নির্ভয়ে প্রকৃতি সনে করে রণ দান.
সে চাহে সমগ্র বিশ্ব হোক্ পদানত।
বিশ্ব নিয়ন্তার যেন মর্ত্ত্য প্রতিনিধি,
শাসিছে অমিত বলে অবনী নিয়ত;
ধর্ম্মনীতি কর্ম্মনীতি সে ব্যবস্থা বিধি.
ভাঙ্গিছে গড়িছে কত নিজ মনোমত।
চিনেছ কি বিশ্ববাসী কে সে ভাগ্যধর,
বিধাতার সৃষ্ট রাজ্যে সে-ই বটে নর।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

নারী।

লাজনম্রা স্থিরা ধীরা আনতা বদনা,
মূর্ত্তিমতী সরলতা কুসুম কোমলা;
সদা মুক্ত অফুরন্ত করুণা ঝরণা;
শ্বেত শতদল সম পূত নিরমলা।
তাহারি হাসিতে ফুল ফুটে অগণন,
ভাবেতে মধুরে ওঠে মধুপ ঝঙ্কার;
বুকে তার সুধা ভাণ্ড—জীবের জীবন,
কোলে খোকা ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনিছে ওঙ্কার।
বিশ্ব সেবাব্রতে তার উৎসৃষ্ট জীবন,
চরণ পরশে তার ধরণী সরসা;
তারি আবির্ভাবে ধরা সুখের ভবন,
দীর্ণ প্রাণে সে জাগায় শকতি ভরসা।
সে মোর আরাধ্য দেবী ধ্যানে আছি তারি,
সে ধরা পালন কর্ত্রী জগদ্ধাত্রী নারী।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

বৈদেশিকী।

এডিসনের জীবন-কথা

জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের নাম বোধ হয় সকলেই জানেন। যাঁহারা গ্রামোফোন সঙ্গীতে অবসর সময় বিনোদন করেন, তাঁহাদের এডিসনকে জানা প্রয়োজন। কারণ গ্রামোফোন যন্ত্রটির আবিষ্কারক মিঃ টি এডিসন। আমাদের দেশে একটা সংস্কার আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় উপাধি না হইলে কেহ বড় হইতে পারে না কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় সেরূপ নহে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকেই নিজ চেষ্টায় বড় হইতে পারেন। সম্প্রতি আমেরিকার সুবিখ্যাত পত্রিকা সায়েন্টিফিক্ আমেরিকানে এডিসন সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; আমরা তাহা হইতে এস্থলে বৈজ্ঞানিক এডিসনের জীবন-কথা উদ্ধৃত করিলাম।

বাল্যকালে এডিসনকে অনেকেই বোকা মনে করিত, এমন কি তাঁহার শিক্ষকদেরও অনেকের ঐরূপ ধারণা ছিল। শিশুকাল হইতেই তাঁহার অনুসন্ধিৎসা খুব প্রবল ছিল। সে সময়ে একদিন একটা পাতার রস প্রস্তুত করিয়া জনৈক বালিকাকে, সে উহা পান করিতে বলে। বালিকা তাহা পান করিতে অস্বীকার করে। তখন বালক এডিসন তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে উহা পান করিলে সে আকাশে উড়িতে পারিবে। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর বালিকা উহার অল্পমাত্র পান করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে, তখন ডাক্তার ডাকিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করা হয়।

মাতা এডিসনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তিনিই পুত্রকে অনেক সময় শিক্ষা দিতেন। ইংরেজ পরিবারে সকলে সমবেত হইয়া পাঠাদি করিবার নিয়ম আছে; একজন পাঠ করেন এবং অপর সকলে শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই পরিবারেও এডিসনের মাতা তাঁহার সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিতেন, এবং অন্যান্যেরা শ্রবণ করিতেন। এডিসনের পিতার নিকট যাহা দুর্বোধ্য হইত তাহাও বালক এডিসন বুঝিতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ঝোঁক ছিল।

এডিসনকে [illegible] অল্প দামে ডাকা হইত। এডিসনের যখন ১১ বৎসর বয়স তখনই তাঁহার কিছু উপার্জন করিয়া পরিবারকে সাহায্য [illegible] ইচ্ছা হয়। এই [illegible] ভাব প্রায় সমস্ত স্বাধীন দেশেই [illegible] দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ২৫।৩০ বৎসর বয়স [illegible] পিতার অথবা অপর কোন নিকট আত্মীয়ের গলগ্রহ [illegible] থাকিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না; এই গলগ্রহ একক [illegible] স্ত্রী পুত্রসহকারে থাকে; কারণ স্বাবলম্বী হওয়ার [illegible] হইয়া থাকে।

[illegible] এইরূপ মনোভাব ত্যাগ করিয়া একটু

চিন্তিত হইলেন; অবশেষে বালক মাতার অনুমতি লইয়া এক ট্রেণে খবরের কাগজ বিক্রয় করিবার অধিকার পাইলেন। তিনি ট্রেণের যে কামরাটি পাইয়াছিলেন তাহাতে নানা রূপ ফল মূল পুস্তক ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য রাখিতেন। উহাতে টেলিগ্রাফের কল কব্জা, বেটারি, তার এবং নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্যও রাখিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা ইচ্ছামত পরীক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত উহাতে একটি ক্ষুদ্র প্রেসও তিনি রাখিয়াছিলেন। এই সময় তিনি "উইক্‌লি হেরেল্ড" নামে একখানা ক্ষুদ্র পত্রিকাও ছাপাইয়া বিক্রয় করিতেন। তিনি ট্রেণে চলিবার সময়ে নানা ষ্টেশন হইতে নিকটস্থ পল্লীর নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহার পত্রিকায় বাহির করিতেন; ইহা ভিন্ন ষ্টেশনের অনেক সিগনেলার টেলিগ্রামের চলতিমুখে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতেন। এই সময়ে বালক এডিসনের কার্য্যের অবধিই ছিল না। তিনি সংবাদপত্র, ফল, মূল ইত্যাদি বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাগজখানার সম্পাদন ও মুদ্রণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যই একা করিতেন। এই সময়েও নিজের অধ্যয়ন ও রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক পরীক্ষার বিরাম ছিল না। বস্তুতঃ পক্ষে ঐরূপ অসাধারণ কর্ম্মী লোকই জগতে উন্নতি করিয়া থাকে।

ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। এক দিবস ট্রেণ চলিবার সময়ে ঝাঁকিতে হঠাৎ ফসফরাসের বোতল পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার ফলে ট্রেণের কাঠ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ গার্ড আসিয়া কয়েক বালতি জল ঢালিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। ইহার পরের ষ্টেশনে গার্ড এডিসনকে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহার জিনিস পত্র সমস্ত প্লেট্‌ফর্মে নামাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বালক নিরাশ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সংবাদপত্র বিক্রয়ের সময়েই এডিসন টেলিগ্রাফের দিকে বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়েন। সে সম্বন্ধে গবেষণা ও ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি তাঁহার নিজের বাড়ী হইতে সহকর্ম্মী ডাইকের বাড়ী পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার যোজনা করেন। বৃক্ষই তাহাদের টেলিগ্রাফ পোষ্টের কার্য্য করে। বৃক্ষের সঙ্গে তার সংলগ্ন করিবার সময়ে ভাঙ্গা বোতলের গলার দ্বারাই তিনি ইন্‌সুলেটারের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। রাত্রি ভিন্ন টেলিগ্রাফের কার্য্য করিবার সময় নিদিষ্ট না। অথচ পিতা তাঁহাকে রাত্রি জাগিতে দিতেন না। সে জন্য বালক পিতাকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য রাত্রিতে খবরের কাগজ আনাইয়া পড়িতে দিতেন। পিতার কিন্তু তথাপি লক্ষ্য থাকিত যেন সে রাত্রি না জাগে। সেদিন তিনি ইচ্ছা করিয়াই সংবাদপত্র আনিলেন না। তাঁহার পিতার সংবাদপত্র পাঠের আকাঙ্ক্ষা [illegible] জন্মিয়াছিল। রাত্রিতে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করায় সে জানাইল—সংবাদপত্র আনা হয় নাই, তবে যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে টেলিগ্রাফে ডাইকের

ইহার পর স্মৃতিসমূহে সূত্রগুলির মতই পরিগৃহীত হইয়াছিল। ষোল বৎসরে পুরুষের বিবাহ স্মৃতিতেও গৃহীত হয় নাই। সুতরাং ঐ রীতিকে প্রাচীনতম অসংস্কৃত রীতিরই একটা নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

মা কোথায় ?

বিজনকে যখন নিয়ে গেল, খোকা কেঁদে উঠ্‌ল—"মাকে কোথায় নিয়ে যায় ?"

"কল্‌কাতায় নিয়ে যাচ্ছে। অসুখ সার্‌লে আবার আস্‌বে।"

"মুখে কাপড় চাপা দিচ্ছে কেন ? দম্ আট্‌কাবে !"

"ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে !"

"না, আমি যাবো !"

"যেতে নেই, সঙ্গে গেলে অসুখ সারে না !"

খোকা চুপ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

"ছিঃ, কাঁদে না, কাঁদলে আর মা আসবে না।"

খোকা ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

ওরা সব ভোরে ফিরে এসে "হরিবোল" দিল ; খোকা জেগে কেঁদে উঠ্‌ল—"মা কোথায় ?"

"চুপ্, কাঁদেনা ঘুমা !"

খোকা ঘুমালও না, কাঁদলও না, ধমক্ খেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগ্‌ল।

সেই থেকে খোকা খায় দায় ঘুমায়, কিন্তু মাঝে মাঝে বলেওঠে—"মা কোথায় ?"

খোকার দিদি মনি বলে—"লক্ষ্মী ভাইটি আমার কেঁদনা, মা কাল আস্‌বে !"

(২)

সংসার চলে না, ছেলে পিলের কষ্ট হয়, বিশেষ গুরুদেবের অনুরোধ ; কাজেই খোকার আবার নূতন মা এল।

খোকাকে সকলে মার কাছে নিয়ে বল্‌লে—"এই দেখ তোর মা এসেছে।"

খোকা প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। শেষে সকলের অনুরোধে মা যখন তাকে কোলে নিল, সে মার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌ল। তারপর মার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজে চুপ করে রইল, দু' চোখ বেয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

(৩)

খোকা মাকে পেয়ে এক নিমিষ ছাড়তে চায় না। মা কাছে না বস্‌লে খাবে না, সাম্‌নে না দাঁড়ালে নাবে না ; মা যেখানে যাবে সঙ্গে সঙ্গে যাবে, ঘোম্‌টা দিলে চেঁচাবে,—"কাপড় চাপা দিও না, কাপড় চাপা দিও না ; কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে !"

এক তিল না দেখ্‌লে বলে—"মা কোথায় ?"

তার সদাই আতঙ্ক—আবার যদি মা চলে যায়।

তার মার কিন্তু এ সব ভাল লাগে না। খোকা "মা" ডাক্‌লে তার প্রাণ চটে ওঠে। সে এই বয়সেই মা হতে রাজি নয়। দোজ্‌বর তার কোন দিনই পছন্দ ছিল না ; সোয়ামীর সোহাগে সেকথাটা যদিও সে ভুলে থাকে ও "মা" ডাক্‌লেই সেটা জেগে ওঠে।

আর যার মা মরে ওর স্বামীকে দোজ্‌বর করে গেছে সেই সতীন-কাঁটাকে ও কেমন করে ভালবাস্‌বে। স্বামী মেজে ঘষে বাইরটাকে এক রকম কাঁচা করে রেখেছে। ঐ ছেলে মেয়ে দুটো হতেইত হাতে কলমে ধরা পড়ছে যে বাইরে যতটা দেখাচ্ছে, সে ততটা কাঁচা নয় ! তাই ছেলেটাকে ও সইতে পারে না।

না পার্‌লেইবা আর কি করা যায়। যা' ইচ্ছা হয় তা'ত আর হয় না !

(৪)

"বয়স বাড়ে আর দোষ্ বাড়ে"। খোকার বাড়াবাড়ি ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ল। আগে সারাদিন ত্যক্ত করে সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়্‌ত এখন রাত্রেও সোয়াস্তি দেয় না। মায়ের কোলে না শুলে সে ঘুমাবে না, মার গা থেকে তা'র হাত খানা সরিয়ে দিলেই "মা কোথায়" বলে কেঁদে উঠবে। এমন হ'লে কি আর সওয়া যায় ? তার বাবাও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

এক মাগী খোট্টা ঝি ছিল, সে বল্‌লে—"মাই, হামারা দেশমে ছেলিয়া লোককো থোড়া থোড়া আফিম্ খিলাতা, মোজ্‌মে রতা রোতা নেই।"

(৫)

আজ কাল খোকা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। সকালে একটা লাড়ু খেয়ে যেখানে সেখানে চুপ্ করে বসে থাকে,

সন্ধ্যা না হ'তেই ঘুমিয়ে পড়ে, একঘুমে রাত কেটে যায়।

পাড়ায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। একালে এমন সৎমা দেখা যায় না। ছেলেটাকে কি পোষই মানিয়েছে!

খোকা কিন্তু আধমরা মত হয়ে উঠ্‌ল। খায় দায়, গায় গতায় না। কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। যেখানে সেখানে বসে বসে ঝিমায়; সে দিকে কেউ নজর করে না।

(৬)

পাড়ার রায় বাবুদের বাড়ী বিয়ে। বাড়ীসুদ্ধ সবাই চলেছে নিমন্ত্রণ খেতে। খোকা বায়না ধরেছে "নেমো যাবো!"

মণি এসে বল্‌লে "মা, মনু যাবে বল্‌ছে, জামা কাপড়—"

মা সেজেগুজে পান খেয়ে আর্সিতে ঠোঁট্ দেখ্‌ছিলেন, ঝাম্‌টা মেরে বলে উঠ্‌লেন, এখন আবার বাক্স খুল্‌বে কে! প্যান্ট্‌টা পরিয়ে তোর কাপড় খানা গায় দিয়ে দে। রাত দিন ভাল জামা পর্‌লে ছিড়বে না? পুজা আস্‌ছে পরবে কি? রোজ রোজ কিনে দেবে কে!"

মনি মুখখানা চূণ পানা করে চলে গেল। তালি দেওয়া খাকির প্যান্ট্‌টা পরিয়ে, নিজের শাড়ীখানা চা'র ভাঁজ করে মাথা শুদ্ধ গা ঢেকে হাত গলিয়ে খোকার ঘাড়ের কাছে বেঁধে দিল।

খোকার খুসি দেখে কে! সে নাচ্‌তে নাচ্‌তে মা'র কাছে এসে বল্‌লে, "মা আমি লাঙ্গা পোছাক্ পলেছি।"

মা চোখের কোণে এক ছিটে হেসে মুখ কুঁচ্‌কে বল্‌লেন "আ—হা, কিছিরি! মরণ আর কি! মণি, যেতে হয় তোর সঙ্গে যাক্, ও সঙ্ নিয়ে আমি যেতে পার্‌ব না।"

খোকা মায়ের সঙ্গে যাইবে; ধমক্ চমক্ কিছু মানে না।

"ঝি, একটা লাড়ু দেত!"

ঝি লাড়ু এনে দিল। খোকা এক কামড় মুখে করেই বল্‌ল "তেত নাড়ু খাবো না। আমি নেমো যাব, সঙ্গে খাবো!"

"খা, খা বলছি, নৈলে নিয়ে যাব না।" খোকা মুখ সিটকে সিটকে নাড়ু গেল্‌তে লাগ্‌ল।

মা মণিকে বল্‌লেন, "ছাড়া কাপড়টা ধুয়ে রেখে যাও না! এসে আবার আমার পর্‌তে হবেত! নেমন্তন্নের নামে যে তর সয় না! ঘরে কি খেতে পাও না? এইত এক পেট্ খেয়ে উঠেছ!"

মণি কাপড় ধুয়ে এসে দেখে, খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, হাতে আধখানা নাড়ু, চোখে জল।

"মা, মনু ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"ঘুমাক্, ডাকিস্‌নি কাঁদবে এখন! তুই যাবিত যা!"

মণি বল্‌লে—"যাব না!"

মা চলে গেল। মণি খোকার মাথা সোজা করে শুইয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

(৭)

মণি বল্‌ল "মা, ভাত হয়েছে!"

"ছেলেটাকে তুলে আন! নৈলে খেতে বস্‌বো আর চেঁচাবে!"

"মনু, মনু, মা ডাক্‌ছে! খাবে এস!"

খোকা চোখ্ বুজেই জড়ান আওয়াজে বল্‌ল "মা কোথায়?"

"এই যে মা, ডাক্‌ছে!"

খোকা একবার চোখ টেনে চেয়ে, আবার ঘুমিয়ে পড়্‌ল। চোখ মাতালের মত লাল!

"মা, মনুর কি হয়েছে দেখ্‌বে এস!" মণি কেঁদে উঠল

"কি হ'বে আবার!" মা তাড়াতাড়ি এসে "ওঠ" বলে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। খোকা টলে পড়ে গেল।

"উঃ, পারিনে আর; সারা রাত ঘুমাইনি মনে করেছিলাম শীগগির দুটো মুখে দিয়ে একটু শোব, কি আপদ! তোর বাপকে ডেকে দে!"

বাপ এল, দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল।

"দেখ দেখ, আজ আবার কি মুর্ত্তি ধরেছে।"

বাপ হাস্‌তে চেষ্টা করে হাস্‌তে না পেরে ঢোক্ গিল্‌ল মাথা চুল্‌কাতে চুলকাতে বল্‌ল "তাইত,—কি করা যায়!"

"যা করতে হয় কর! ডাক্তার ফাক্‌তার ডাক্‌তে হয়ত ডাক! শেষে যেন আমায় দোষ পেতে না হয় আমার পেছনেত সবাই লেগেই আছে। ভালটাত কেউ দেখবে না, মন্দ হলেই যত দোষ। উঃ, কি মাথ ধরেছে; শরীলে আর দ্যায় না।

বাড়ী হইতে সংবাদ আনিয়া দিতে পারেন; কারণ ডাইকের নিকট সংবাদপত্র আছে। পিতা সম্মত হইলে বালক কলে বসিয়া ডাইককে ডাকিয়া টেলিগ্রাফে যথারীতি সংবাদ আনিয়া পিতাকে দিতে লাগিলেন, নিজেরও টেলিগ্রাফ চালাইবার শিক্ষা কার্য্য চলিতে লাগিল। এইরূপে প্রতি রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ চলিতে লাগিল। ইহাতে এডিসনের হাত দুরস্ত হইতে লাগিল, এবং পিতাও বুঝিলেন যে কিছু রাত্রি জাগিলে এডিসনের বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

এই সময়ে ডাইকের বাড়ী ভিন্ন নিকটস্থ আরও কয়েক বাড়ীর সহিত এডিসন টেলিগ্রাফের যোগা যোগ করিলেন। তখন তিনি বৃক্ষ ছাড়িয়া দিয়া বাঁশের খুঁটি দিয়া টেলিগ্রাফের পোষ্ট বানাইলেন। প্রায় ২০০ হাত দূরে যে এক বাড়ীর সহিত টেলিগ্রাফের যোগ করিয়াছিলেন সেই বাড়ীর বালকটি অনেক সময়ে এডিসন কি সংবাদ পাঠাইতেছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া এডিসনকে জিজ্ঞাসা করিত—সে কি সংবাদ পাঠাইতেছে। ইহাতে এডিসন অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, কারণ অপর লোকে হয়ত মনে ভাবিত যে তাহাদের টেলিগ্রাফ কিছু নহে।

তাহাদের ঐ টেলিগ্রাফের পোষ্ট অনেক সবজী বাগানের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। এক দিন রাত্রিতে এক গাভী ঐ রূপ এক সবজী বাগানে প্রবেশ করিয়া একটি টেলিগ্রাফের পোষ্ট উপরাইয়া ফেলে এবং গরুটি তারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন নিজকে ছাড়াইবার চেষ্টা করায় বহু পোষ্ট পড়িয়া যায় এবং গরু তারের মধ্যে আরও জড়াইয়া পড়ে। তখন নিরুপায় হইয়া সে চীৎকার করিতে থাকে। চীৎকারের ফলে প্রতিবেশীগণ বাহির হইয়া তার কাটিয়া গরুটিকে মুক্ত করে কিন্তু এডিসনের বহু যত্নে প্রতিষ্ঠিত টেলিগ্রাফের লাইন একেবারে ধ্বংশ হইয়া যায়। এই সময় এডিসন সিগ্‌নেলারের কার্য্য পাওয়াতে এই লাইনটি আর সংস্কার করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। (বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

বিশ্ব-পন্থ।

(দাদূর হিন্দী হইতে)

ধন-ধান্যে পূর্ণ ধরা, অনন্ত আকাশ,
চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, নিশা, সলিল, বাতাস,
রহিয়াছে নিরন্তর বিশ্ব-সেবা-রত;
কাহার আদেশে এরা পালে এই ব্রত?
মহম্মদ মহনীয় কার পন্থা ধরি?
জেব্রেইল জাগিল বিশ্বে কার অনুসরি?
অনন্ত ঈশ্বর বিনা, এই পৃথিবীর
ছিল কি তা'দের কোনো মুরসীদ পীর?
হে জগদ্‌গুরু, ওহে অলখ-ইলাহী!
তুমি হে আশ্রয় শুধু আর কেহ নাহি।

গল্পমালিকা।

ক্ষুদে

একরত্তি মেয়ে। মা ডাকিলেন, "ক্ষুদে, ভাত খাবি না? আয়!"

"না। কেন?"

"বিশু দাদা যে বল্লে, কাল তারা খায়নি!"

বিশু ও-পাড়ার গরীব বিধবার ছেলে।

মেয়ে

"খোকাকে দিলে আমায় দিলে না?"

মা তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মেয়ের আব্দার দেখ!"

বাবা একটু কুণ্ঠিত চাহনি চাহিয়া বলিলেন, "আর ত নেই মা।"

মেয়ে বাবার বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া রহিল।

ঘোড়দৌড়

"সই, দুটো টাকা ধার দিতে পার?"

"কেন?"

"ছেলেটার অসুখ; বেদানা খেতে চাচ্ছে! পথ্যি পাঁচনও কিছু নেই!"

"আজ উনি মাইনে পাননি বুঝি?"

"পেয়েছেন। তা নিয়ে সেই গড়ের মাঠ না কোথায়—ঘোড়ার বাজী জিত্‌তে গেছেন। বলেছেন, কাল আঙ্গুর বেদানা সব নিয়ে আস্‌বেন; আর নীলরতন সরকারকে এনে দেখাবেন।"

ফিরিওয়ালা

"বাবু, এটি রাখুন! বেশ জিনিষ!"

"কত নেবে?"

"দশ আনা।"

"বড্ড বেশী!"

ফিরিওয়ালা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, আট আনাই দেবেন।"

"না, দরকার নেই।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ফিরিওয়ালা মুখ কালি করিয়া উঠিয়া গেল। পয়সা কয়টি পাইলে আজকার আহারটা জুটিত!

বাবার ঘুম।

"আঃ! জ্বালাতন কর্‌লে—ঘুমুতে দেবে না দেখছি!"

মা চার বছরের ছেলেটিকে থামাইবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন। বাবা জোরে ধমকাইয়া উঠিলেন। ছেলে থামিল, বাবাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। সকালে উঠিয়া দেখিলেন, ছেলে জ্বরের ঘোরে এলাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মন গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল।

চুড়ি পরা।

"চুড়ি চা-ই—বালা চা-ই!"

"চুড়িওলা, এদিকে এস!" মেয়েটি দরজা খুলিয়া ডাকিল। চুড়িওয়ালা কলতলার আঙিনায় তাঁহার ঝাঁকা নামাইল।

"রোসো, দিদিকে নিয়ে আসি!"

দিদি আসিলেন। দু হাত ভরিয়া চুড়ি পরিয়া খুকি দিদির হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

"দিদি, তুইও পর্‌বি, আয়।"

"ছিঃ! আমাকে যে পর্‌তে নেই!"

সাদা থানের কাপড়ের দিকে চাহিয়া চুড়িওয়ালার চোখ দুটিও ছল্‌-ছল্‌ করিয়া উঠিল।

পিতৃহীন।

বাবা বাড়ী আসিয়াছেন। সঙ্গে কত খেলেনা! ছেলে-মেয়ে সব 'আমাকে এটা দাও, ওটা দাও' বলিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বাবা সকলের মন রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দরজার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া একটি ছেলে ঘরের ভিতর চাহিয়াছিল।

বাবা কহিলেন, "ও কে, মিনু?"

মিনু বড় মেয়ে, একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি হইয়াছে। বলিল, "বাঃ, ও কে চেন না? রমুদা,! ওর বাবা নেই!"

বাবা একটি লাল কাঠের বল তুলিয়া ছেলেটিকে ডাকিয়া দিলেন। খোকা আব্দারের স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওটা আমার! আমি দেবো না!" মিনু বলিল, "ছিঃ! তোর ত দুটোই রয়েছে!"

বাবা মেয়েকে আদরে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন।

উপেক্ষিতা।

"আঃ! ঘুমুতে দেবে না?"

সে ত কিছুই করে নাই। হঠাৎ স্বামীকে একটু স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র!

দিনে দেখা হইল। সে স্বামীর দৃষ্টিকে নিজের দিকে ফিরাইবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিল। স্বামী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন সে কি পাইয়াছিল! আর আজ সে কি হারাইয়াছে!

ভাই বোন।

"আমাকে একটা দেনা, দিদি!"

বোন ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কোণে বসিয়া কমলা-লেবু খাইতেছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "যাঃ, এখান থেকে চলে যা বল্‌ছি!"

ভাই মুখ ভার করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল।

"যাচ্ছিস্ কোথা আবার? দাঁড়া!"

বোন ভাইটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কমলার কোষগুলি ভাল করিয়া ছাড়াইয়া এক একটি ভাইয়ের মুখে আবার এক একটি নিজের মুখে তুলিয়া দিতেছিল।

চাঁদার খাতা।

"বন্যাপীড়িতদের—"

ছেলেটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বাবু বলিয়া উঠিলেন, "পাজি, জোচ্চোর, ভণ্ড! এখানে কিছু হবে না!"

পক্কশ্মশ্রু কয়েকটি উকিলকে লইয়া বৃদ্ধ রায় বাহাদুর আসিয়াছেন। হাতে একখানি মরক্কো চামড়ার বাঁধানো খাতা।

"শহরের পতিতাদের উদ্ধারের জন্য একটি থিয়েটারের ষ্টেজ—"

"আর বল্‌তে হবে না। আপনার মত উদারহৃদয়ের উপযুক্ত কাজই বটে!"

বাবু চাঁদার খাতা টানিয়া লইয়া নিজের নামের নীচে অঙ্ক লিখিলেন ১০০০৲ এক হাজার টাকা।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

নন্দিনী-নান্দী।

(সংস্কৃত তামরস ছন্দে বিরচিত)

নেমেছেরে আজ ভূমে নন্দিত নন্দন!
খোলা বুকে তাই, খুকি, তোর করি বন্দন!
ধরণীতে তুই কি রে বন্দিত মন্দার!
মরুমাঝে ছুটলি কি জাহ্নবী বৃন্দার!
কোথা এলি! মর্ত্তে, মা, বাড়্বে না গৌরব!
উবে যাবে আবডালে স্বর্গীয় সৌরভ!

ছুটি হৃদি-মন্থনে ইন্দিরা উদ্ভব!
স্বামী-বধূ দুই বঁধু তাই করি উৎসব!
মরে' আছে হিন্দুরা; মিল্‌বে কি নিস্তার!
সমাজেরে বল্‌জোরে—নোস্‌বোঝা চিন্তার!
এবে নারী যায় চুরি; চোখ ফেটে বয় নীর!
ভেড়া কিরে জন্মালো গর্ভেতে সিংহীর?

বিকশিত হয় যেন তোর হৃদি-উৎপল!
যেন নারী-গৌরবে হয় ধরা উজ্জ্বল!
নারী কবে দুর্ব্বলা? সয় কোথা সংঘাত?
মেরে মরে' মান রাখে; যম যেন সাক্ষাৎ!
আমি জানি শক্তিরা শক্তিতে ভরপুর!
যেন দলি' যাস্ চলি' সব বাধা বন্ধুর!

আছে আজি দেশ যুড়ি' ভণ্ডামি বাগ্‌জাল!
এলি যদি ওঠ্ জ্বলি' দগ্ধিতে জঞ্জাল!
কু-আচারে কোণ্‌-ঠাসা ধর্ম্মটা হিন্দুর!
থেমে গেছে হৃৎক্রিয়া নাম শুনি' সিন্ধুর!
মুখে মোরা খুব বড়; হাম্‌-বড়া কীর্ত্তন!
ঘরে ঘরে তাই ছুঁচা আজ করে নর্ত্তন!

দে, মা কালী, আজ মোরে শান্তির আশ্বাস!
হাসিনিধি চাই পেতে, চাই দৃঢ় বিশ্বাস!
বীণাপাণি তুই পুন, পথ দেখা কীর্ত্তির!
কমলা গো, আজ খেদা সব ক্ষুধা প্রার্থীর!
আজি তোরা নিন্দিত, নন্দিত হোস্ ফের্!
মনে যেন রয় গাথা—জয় হবে সত্যের!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

দ্বন্দ্ব ও তাহার প্রতিকার।

জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, উত্থান ও পতন এই দ্বন্দ্বকে লইয়াই জগৎ প্রপঞ্চ। এই দ্বন্দ্বের, তরঙ্গে তরঙ্গে জীব উঠিতেছে পড়িতেছে, মহাপ্রকৃতি তাঁহার মোহিনী মায়ার প্রভাবে, দ্বন্দ্বময় বিচিত্রক্রীড়ারঙ্গে যেমন নাচাইতেছেন, আত্মবিস্মৃত সুরাসুরনর তেমনি নাচিতেছে। তাঁহারি অঘটন ঘটনায় জীব কখনো হাসিতেছে কখনো কাঁদিতেছে। মলয়ের মৃদুল নিশ্বাসে উল্লাসে অধীর হইতেছে; আবার বিকট ভীম প্রভঞ্জনের আবির্ভাবে ত্রাসে অভিভূত হইতেছে, সুখের শারদ পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নাসারে সিক্ত ও পুলকিত হইতেছে. আবার দুঃখ অমানিশার করাল-কৃষ্ণ-ভ্রূকুটিতে মুহ্যমান হইতেছে। সে কখনও উঠিতেছে কখনো বা অধঃপতিত হইতেছে, কখনো প্রভাতরবির নবগৌরবে সে উদীয়মান, কখনো বা অস্তাচলচূড়াবলম্বী সান্ধ্যরবির ম্লানিমায় সে বিমলিন। কখনো তাহার দৃপ্ত পদভরে ধরাবক্ষ বিকম্পিত হইতেছে, আবার কখনো সে দীনহীন অকিঞ্চনের ন্যায় ধূলিতলে অবলুণ্ঠিত হইতেছে, ইহাই তার অদৃষ্ট, কালের অমোঘ নিয়ম; দৈবের অব্যর্থ বিধান।

সুখ থাকিলে দুঃখও থাকিবে, উত্থান থাকিলে পতনও থাকিবে, জন্ম হইলে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী, জগতের এই দ্বন্দ্ব-রহস্যের তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা। তাই মনে প্রশ্ন হয় কেন "নিরমল বিধাতার মানস" হইতে জগতের এই দ্বন্দ্ব মলিনতার রচনা? বিচিত্রসুন্দরী এই ধরণীর বিশ্ববিমোহিনী সুষমার মাঝে কেন এ বিরোধ সংঘর্ষের বিভীষণ অভিনয়? যুগে যুগে যে দেখিতেছি, কালীর ত্রিভুবন ত্রাসকর তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্বমণ্ডল থর থর কম্পান্বিত হইতেছে, তাঁহার শাণিত কৃপাণাঘাতে লক্ষ জীব মুণ্ড দেহচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, রক্তের খরস্রোতে মেদিনী প্লাবিত হইতেছে, ইহাই কি করুণাময়ী জগজ্জননীর কল্যাণলীলা অথবা শোণিত তৃষাতুরা মাতার উদ্দেশ্য, সৃষ্ট আপন সন্তানেরই রুধিরে সর্ব্বগ্রাসিনী পিপাসার নির্ব্বাণ?

জ্ঞানিগণ কিন্তু বলিতেছেন—হে মানব! তোমার দৃষ্টি মোহ-কলুষিত—তাই মায়ের এই ভৈরব ধ্বংসলীলার অন্তরালে তাঁহার প্রসারিত বরাভয় কর যুগল, তাঁহার স্নেহোচ্ছাসিত

দৃষ্টি, তাঁহার হাস্ত-প্রসন্ন আনন তুমি দেখিতে পাইতেছ না? মোহের কৃষ্ণ যবনিকা অপসারিত কর—দেখিতে পাইবে—মহাপ্রকৃতি অন্তরের মধ্য দিয়া কোন্ মঙ্গলেরই অভিমুখে বিশ্বলীলা পরিচালিত করিতেছেন—আপাতঃ দৃশ্যমান বিরোধ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া কোন্ দৈব-সামঞ্জস্যই বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন—দেখিতে পাইবে, বিশ্বে, নিবিড় অন্ধকারের গর্ভ হইতেই আলোকের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, কৃষ্ণবর্ণ তরল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র মন্থন করিয়াই দেবভোগ্য অমৃত উপজাত হইতেছে।

ঋষিগণ তৃতীয়-নয়নে আপাত-প্রতিয়মান বিরোধ-রাশির অভ্যন্তরে যে সুমহান্ ঐক্য সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদের উপলব্ধিগম্য নহে—তাই দুঃখ-মৃত্যু জগতে প্রকৃতির নিখিল কল্যাণ প্রসূতি কোন্ দৈবী ইচ্ছা চরিতার্থ করিতেছে, তাহা আমরা সহজে বুঝি না। ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তা উদ্ঘাটিত করিতে গিয়া অগ্রে ইহার আদি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, অজ্ঞানই দ্বন্দ্বের নিদান।

যে জীব একদিন তাহার দ্বন্দ্বাতীত পরমানন্দঘন স্বরাজ্যে ঈশ্বররূপে বিরাজমান ছিল, অজ্ঞানের অধীনতায় সে আপন নিত্য-মুক্ত স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাই না সে আজ সুখ দুঃখে বিচলিত, জন্মমরণের অভিঘাতে বিপর্য্যস্ত! বস্তুত জীবের এই অজ্ঞানরাজ্যে দ্বৈত থাকিবেই। যেখানে সকলই সম্পূর্ণ শাশ্বত, আপন মঙ্গল মহিমায় অখণ্ড ও অবিনাশী, আত্মার যে অনন্ত ব্যোমে, সীমাহীন বিস্তারে, জ্ঞানের প্রশান্ত জ্যোতিঃ দেদীপ্যমান, সেখানে নাই সুখদুঃখের ছায়া; মৃত্যুর ক্ষীণ রেখাও সেখানে প্রতিভাত হয় না। আর যখনই সেই মহাসূর্য্য মায়ার মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হইল, তখন চিত্রবিচিত্র বিবিধ বর্ণে সৃষ্টি বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল, এক অদ্বিতীয় কেবলানন্দই সুখদুঃখ জন্মমৃত্যুর আকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িল।

জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ সুখ দুঃখ উভয়েরই অতীত, অসিদ্ধ অবস্থায় কিন্তু সে চাহে তাহার বিকৃত অসম্পূর্ণ জীবন লইয়া সুখে থাকিতে, ভ্রান্তিবশে বুঝিতে পারে না যে দুঃখ সুখেরই সহোদর, উভয়ে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে চির-মিলিত। মহাপ্রকৃতি তাই মানবের আপাত রমনীয় স্বচ্ছন্দ জীবন-গতি পদে পদে বাহত করিতেছেন;—উদ্দেশ্য, দ্বন্দ্বের আঘাতে তাহাকে সচেতন করিয়া তোলা; সে যে আত্মবিস্মৃত মহাপুরুষ এই জ্ঞান তাহার অন্তরে জাগ্রত করিয়া তোলা। জীবকে প্রতি পাদবিক্ষেপে তাই দুঃখ-মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

অজ্ঞান জীব সংকীর্ণ দৈহিক জীবন লইয়াই পরিতুষ্ট। তাই কবির ভাষায়,

"মৃত্যু করে লুকোচুরি,
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি,
ভেসে যায়, তারা সবে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।

মৃত্যু যে মানব জীবনকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছে, ইহার মধ্যে প্রকৃতির নিগূঢ় ইঙ্গিত হইতেছে, যে আমরা আমাদের প্রকৃত জীবন এখন ও পরিজ্ঞাত হই নাই। আমাদের জীবন সত্তার কোন্ এক অনির্ব্বচনীয় অন্তস্তলে যে জন আকাশেরই ন্যায় মহান্, সমুদ্রেরই ন্যায় অতলস্পর্শ গভীর! অন্তরের অমৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া এই চিরজীবন লাভ করিতে হইবে, নহিলে মৃত্যু আমাদের অনন্ত সহচর!

তেমনি পতনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি এই শিক্ষা দান করিতেছেন যে মানুষ তাহার অহমিকার খণ্ড শক্তি লইয়া কখনো ঈশিত্ব লাভ করিতে পারে না। বিশ্ব—শক্তির এক মহাসিন্ধু। ইহার এক লহরীর চূড়ায় তুমি যত উর্দ্ধেই উত্থিত হও সহস্র উর্ম্মির আঘাতে তোমায় বিচূর্ণ হইতে হইবে। বিশ্বের সহিত প্রতিযোগিতায় উন্নতি মানবের ভবিষৎ অনিবার্য্য ধ্বংসেরই কুক্ষিতে নিহিত। অহং ত্যাগ না করিলে আমরা কখনও সে মহাশক্তির অধিকারী হইবনা—যাহা অপরিমিত অপরাহত অবার্য অশুভহন্ত্রী যে শক্তি বিশাল দেব-সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতেই নিয়ত নিরত।

মৃত্যু ও পতনের ন্যায় দুঃখেরও মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞান নাশে ব্রতী রহিয়াছেন। জীব সদা সুখের কমনীয় ডোরে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। যে সুখের আদিতে কামনার আকুল উন্মাদনা, তাহার অন্তিম বিষাদময় হইবে, ইহাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান। যাহার প্রাণ বাসনায় বিক্ষিপ্ত হয়, সেই অমৃতের আস্বাদে চিরবঞ্চিত তাহার সুখ স্বপ্নেরই ন্যায় অলীক, মরীচিকারই ন্যায় ভ্রান্তির মায়ায় সমাচ্ছন্ন, দুঃখ তাহার চিরসাথী। যিনি বিজিতেন্দ্রিয়,

সমর্থ, ধীর, যিনি সমু্দ্রের ন্যায় অবিক্ষুব্ধ তিনিই বিমল আনন্দের অধিকারী—ত্রিদিবসেব্য অমৃত পানে চিরতৃপ্ত, পরাশান্তিতে আপূর্ণ।

প্রকৃতির মহাশিক্ষা ক্রমশ আমাদের অন্তরে রেখাপাত করিতেছে। অশুভ সংস্কার সংহনন পূর্ব্বক শুভ চিন্তায় আমাদিগকে পরিপূর্ণ করিতেছে। মৃত্যু, দুর্ব্বলতা ও দুঃখের সহিত পরিচিত হইতে আমরা ক্রমশ আত্মস্থ হইতে শিখিতেছি। দেখিতেছি যে আমাদের প্রতি চিন্তা, কর্ম্ম ও ভোগ মৃত্যুকেই বরণ করিয়া আসিয়াছে। বুঝিতেছি যে আমাদের জীবনের সকল সম্পদ, আমাদের আধারের সকল ঐশ্বর্য্য মৃত্যুরই চরণে এতদিন উৎসৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই মর্ম্মান্তিক সত্য যখন আমাদের চিত্তে ভাসিয়া ওঠে, তখন ত্রিতাপদগ্ধ আমরা অন্তর্ম্মুখী না হইয়া কি পারি ?

আধি-ব্যাধি সমাকুল এই সংসারের নিখিল দুঃখ কিরূপে পরিনির্ব্বাপিত হইবে, এই চিন্তায়ই একদিন রাজপুত্র শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ধরায় তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। অতুল ধনৈশ্বর্য্য, সুখসম্ভোগের অগণিত উপকরণ, অসামান্য-রূপবতী মনোরমা দয়িতা এ সকলের সমাবেশ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? তথাপি বৃথাই ধনজন যৌবন তাঁহার চরণ বেড়িয়া বেড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; তাঁহার মহান্ সংকল্প ভ্রষ্ট হইল না। ব্যাধির বীভৎসতা জরার নিদারুণতা ও মৃত্যুর ভীষণতাই তাঁহার অন্তর পরম নির্ব্বেদে পরিপূর্ণ করিল; তাঁহার জীবনগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে মোহ হইতে বোধির পথে লইয়া চলিল।

আমরা তাই বলিতেছি, প্রকৃতির দুঃখ দ্বন্দ্বই আমাদের সুপ্তচৈতন্যকে বন্দীদশা হইতে বিমুক্ত করে—বিরোধের আঘাতই আমাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়—রুদ্রদেবের বিষাণ রবেই আমাদের মোহতন্দ্রা অস্তমিত হয়—ভৈরব যখন দূর হইতে শৃঙ্গাধ্বনি করেন, কাপুরুষ তার দুয়ার অর্গল বদ্ধ করিয়া গৃহকোণে লুক্কায়িত হয়, কিন্তু বীরসাধক নির্ভীক হৃদয়ে ছুটিয়া যান, তুচ্ছ জীবনের ক্ষুদ্র মায়া বিসর্জ্জন করিয়া রুদ্রকে বরণ করিয়া আনেন, রুদ্রের দক্ষিণ মুখ তাঁহার নিকটে আর অপ্রকাশিত থাকে না।

বস্তুত দুঃখ-দ্বন্দ্বের ভীষণতায়, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইলে আমাদের চলিবে না। দ্বন্দ্বজয় ভিন্ন জীবন-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। সুখ ও দুঃখ উভয়ই আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। মৃত্যুর অন্তরে যে অমৃত রহিয়াছে, বিজয়ী জীবাত্মা তাহা উদ্ধার করিয়া আনিবে বলিয়াই না মৃত্যুর সার্থকতা? বীর্য্যবর্ম্মে ও ধৈর্য্যকবচে যাহার অঙ্গ সুরক্ষিত, দুঃখমৃত্যুর বিষদিগ্ধ শর তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। আমাদের এইরূপ অসাধারণ ধারণ সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা আমরা নীলকণ্ঠেরই ন্যায় কালকূট পান করিয়াও অজর অমর রহিতে পারি।

সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি অসম্ভব। সাধনায় সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ না করিলে নির্দ্বন্দ্ব কেহই হইতে পারেন না। তাই সুদৃঢ় সংকল্পে সাধনায় ব্রতী হওয়া চাই। অন্ধকারের পরপারে, আদিত্যবর্ণ যে মহাচৈতন্য আপন জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ—সাধনার ঘর্ষণে সকল অজ্ঞানের বিঘ্ন সকল বাসনার আবরণ নিঃশেষেই বিদূরিত করিয়া সেই স্বপ্রকাশকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মার প্রকাশে দুঃখদ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। সূর্য্যের উদয়ে রাত্রির অন্ধকার নিঃশেষেই তিরোহিত হয়।

জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমাত্মাই আমাদের ইষ্ট। সাধনক্রমে ইষ্টের স্ফূর্ত্তি যতই হইতে থাকিবে, দ্বন্দ্বের প্রবলবেগ ততই মন্দীভূত হইয়া পড়িবে। ক্রমে দুঃখদ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াই অন্তর হইতে খসিয়া পড়িবে। ইষ্টের উপসনায়, তাঁহার নিয়ত স্মরণে, তাঁহার নিকট আত্মনিবেদনে আমাদের মোহমালিন্য ঘুচিতে থাকিবে। তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে সুখ দুঃখ আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মেরই ফলমাত্র। জগজ্জননী আমাদের ভববন্ধন ঘুচাইবার জন্যই আমাদের কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা নিঃশেষিত করিতেছেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ের মধ্যেই তখন তাঁহারই করুণাময় হস্ত প্রসারিত দেখিতে পাইব। শীতোষ্ণসুখদুঃখদ মাত্রাস্পর্শ আমরা তখন অনায়াসেই সহন করিতে পারিব। সুখের তরে লালায়িত হইব না—দুঃখেও মুহ্যমান হইয়া পড়িব না।

এইরূপে ইষ্টমন্ত্র যখন শ্বাসে প্রশ্বাসে আমাদের সমগ্র জীবন অধিকার করিবে, তখন কামনা বাসনার বন্ধন আমাদিগকে আর আবদ্ধ করিতে পারিবে না সেই নিঃস্পৃহ

অবস্থায় আমরা এই মহাসত্য উপলব্ধি করিতে পারিব—যে সুখ দুঃখ আমার নহে—ইহা নিম্নপ্রকৃতির। দেহাত্মাভিমান সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া সাধককে এক অন্তর্জ্জগতে উপনীত করিবে। প্রকৃতির সকল আঘাত দেহ-প্রাণের উপর দিয়াই বহিয়া যাইবে নির্লিপ্ত-মন সে সকলের বাহিরে দ্রষ্টৃরূপে অবস্থান করিবে মাত্রাস্পর্শে সে হইবে উদাসীন। দুঃখদ্বন্দ্বের তখন প্রতীতি হইবে মাত্র কিন্তু পূর্ব্বের সে ঘনিষ্ট অনুভূতি আর হইবার নহে।

উদাসীন অবস্থাও অতিক্রম করিয়া মানব ত্রিগুণাতীত অবস্থা বা মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিগুণময়ী মায়ার অধীনতায় যে সুখ দুঃখ জন্মমৃত্যুর দ্বন্দ্বভোগ করিতেছি, ত্রিগুণাতীত অবস্থায় তাহা আর সম্ভব হইতে পারে না—তখন আমরা নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান্। তখন আমরা পরাশান্তি, পরমজ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী। দ্বন্দ্বের মূলোচ্ছেদে অখণ্ড সমতায় আমরা তখন পরিপূর্ণ। নিখিল কামধারা বক্ষে ধারণ করিয়াও আপূর্য্যমান অচল প্রতিষ্ঠ মহাসমুদ্রের ন্যায় তখন আমরা অনুদ্বেলিত। দোষবীজক্ষয়ে এক অনাদি অনন্ত অপরিমেয় অমৃতসাগরে তখন সকল আধি, ব্যাধি, মৃত্যু বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

মন্ত্রী নির্ব্বাচন।

১

সকল পশুর আন্দোলনে ব্যস্ত পশুরাজ,
শুধুই কেবল ঝগড়া ঝাটি বন্ধ রাজ কাজ,
সবাই বলে সমস্বরে,
"মন্ত্রী শেয়াল নষ্ট করে,
দেখছি মোরা সকল কাজে রাজার দোষ কি ভাই,
শেয়াল হতে মোদের মধ্যে জ্ঞানী কি আর নাই ?"

২

রাজা মশাই রাজ-বুদ্ধি খানিক খরচ করে,
আজ্ঞা দিলেন বনের পশু জড় হবার তরে,
বনের ধারে মস্ত মাঠে,
বসি রাজা রাজার পাটে,
জ্ঞানী গুণী মন্ত্রী জনেক করে নিবেন ঠিক,
সকল পশু খুসী এবার রক্ষা সকল দিক।

৩

সভায় বসে রাজা মশাই বলেন সবে ডেকে,
"মন্ত্রী হবার যোগ্য কে কে কওত একে একে ?
যার যা গুণ মন্ত্রী হবার,
শুনে আমি করব বিচার,
মন্ত্রী নিয়োগ করব এবার সকল দেখে শুনে,
মন্ত্রী যদি হতেই চাও কেউ—হবে নিজের গুণে।"

৪

দীর্ঘ শৃঙ্গ লম্বা দাড়ি ছাগল বুদ্ধিমান্,
হেলে দুলে সভা স্থলে হলেন আগুয়ান।
"রাজার পরে আমার দাঁড়ি,
মন্ত্রী হতে আমিই পারি ;
নিরামিষই খাদ্য আমার হিংসা মোটে নাই,
ক্ষুরের মত বুদ্ধি বলে মন্ত্রী হতে চাই।"

৫

শুনে সকল, বরাহ রাজ দাঁত করিয়ে বার,
বলেন হেসে "ছাগল তব বুদ্ধি চমৎকার,
দাঁতেই দেখ আমার বুদ্ধি
বিষ্ঠাতেও মোর চিত্ত শুদ্ধি,
বল শুনি কোথায় পাবে আমার মত ত্যাগী
বস, বস, মন্ত্রী পদটা আমিই নেব মাগী।"

৬

গ্রাম্য কুকুর এবার দাঁড়া মন্ত্রী হবার তরে,
"যতই বল, বরাহ ভাই তুমি আমার পরে।
সুখাদ্যেতে যেমনি নিষ্ঠা,
তেমনি জেন আমার বিষ্ঠা,
তারপর লোকের কাছে রাজ নীতির চাল
শিখে নিছি অনেক করে থেকে অনেক কাল।"

৭

"চুনুপুটীর আস্ফালনটা সয়না গায়ে আর,"
গর্জ্জি উঠি ব্যাঘ্র মশাই বলেন বারংবার ;
"হিংসা নাহয় দিবই ছেড়ে,
আমি থাকতে মন্ত্রী কে রে ?

দেখিস্ নারে সারা গায়ে তিলক চমৎকার!
পরম সাধু গুণী জ্ঞানী কেইবা হেন আর?"

৮

একে একে সবাই তখন মন্ত্রী গিরি চায়,
সমান ত্যাগী সমান জ্ঞানী লম্বা বক্তৃতায়।
রাজা ভাবেন তাইত একি!
রাজ্য শুদ্ধ সবাই দেখি,
ত্যাগ ধর্ম্মের পুণ্যে আজি জীবন দিতে চায়,
রাম-রাজ্য স্থাপন করতে আর কি অন্তরায়!

৯

রাজা তখন বলেন হেসে, শুনুন দিয়ে মন,
সমান ত্যাগী সমান জ্ঞানী ভক্ত প্রজাগণ।
হিংসা যদি গেলেন ভুলে,
মন্ত্রী ছাড়াও রাজ্য চলে,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে মিশে করুন গিয়ে বাস,
আমিও তবে এখন হতে নিলুম অবকাশ।"

১০

শেয়াল মন্ত্রী বলছে ধীরে "রাজার ধন্যবাদ,
আমার শুধু ধূর্ত্ত বলে রইল অপবাদ।
কর্ম্মদোষে আমিই দোষী,
তবু শুনে হলেম খুসী,
পশু রাজ্যে সবাই আজি ত্যাগের মন্ত্র গায়,
পাপী আমি পরকালের উপায় দেখি তায়!"

১১

আনন্দিত বড়ই রাজা ফিরেন সভা হতে,
ছাগল মেরে দেখেন ব্যাঘ্র বসে আছেন পথে;
"ব্যাঘ্র তোমার একি আচার,
বল্লে 'হিংসা নেইকো আমার'
সভার মাঝে মিথ্যা বলে করলে প্রতারণা,
হবে এমন" বল্লেন রাজা "ছিলনা মোর জানা।"

১২

"বক্তৃতাটা দিয়ে প্রভো শুকিয়ে গেছে গলা,
ছাগ-রক্ত না খেয়ে আর পথটা কি যায় চলা?
করুণ প্রভো একটু পান,
সভার কথা ভুলেই যান,
লম্বা চওড়া এসব কথা মুখেই শুধু বলা,
কাজের সাথে কথার মিল থাকলে কি যায় চলা?"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম, এ।

গ্রন্থ সমালোচনা।

গৃহ জ্যোতিষী---জ্যোতির্ব্বিদ ও মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত প্রণীত।

পুস্তকখানা নিজে নিজে কোষ্ঠিগণনা শিক্ষা করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। পুস্তকে মহাত্মা গান্ধী, সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ও মহারাজা সূর্য্যকান্তের কোষ্ঠী উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে "অদৃষ্ট ও পুরুষকার" গণনা প্রকার প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ তিনটি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থকার অনেক কঠিন বিষয় অতি সরল ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই শাস্ত্রের অনুশীলন পিপাসু পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। গ্রন্থ ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ী গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

হোমনাবাদের ইতিহাস---১ম ভাগ মৌলবী শাহ ছৈয়দ এমদাতুলহক ওরফে লালমিঞা কর্ত্তৃক প্রণীত; মূল্য আট আনা।

ইহা একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইলেও ইহাতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হোমনাবাদ পরগণার অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহুদিন যাবত ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহার সংগ্রহেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস বলিতে প্রকৃত পক্ষে যাহা বুঝায়, এই পুস্তক ঠিক তাহা নয়; তবে ইহা ১ম খণ্ড মাত্র; ইহাতে পরগণার প্রয়োজনীয় বিবরণই সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা এইরূপ সংগ্রহ গ্রন্থের সর্ব্বদাই অনুরাগী।

অকাল বসন্ত।

কে গো তুমি মার্‌ছ উঁকি যবনিকার আড়ালে!
শীত ঋতুর এ অভিনয়; চল্‌বে না মুখ বাড়ালে!
নেপথ্যে কি আজই তোমার শেষ হ'ল বেশ রচনা?
এখন আসার হয়নি সময় তাও কি তুমি বোঝনা?
মলয় বাতাস এসে আগে সাজাক্ আমের মঞ্জরি,
কোকিল বঁধু গাক্ আগে গান, ভ্রমর নাচুক্ গুঞ্জরি,
পাপিয়া সে বাজাক্ বাঁশী, ঝিঁ ঝিঁ বাজাক একতারা;
গোলাপ বেলা বকুল হেসে কর্‌তালি আজ দিক্ তারা,
তার আগেতেই এসে বঁধু কর যদি মনচুরি!
আম্‌রা সেটা তবে মোটেই কোর্‌বো না ত মঞ্জুর-ই!

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত কবিরাজ।

সাহিত্য সংবাদ।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলন—

গত ২৫শে পৌষ পূর্ণিমা-সম্মিলনের দশম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন পুরোহিত শ্রীযুক্ত ভবানীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়। বহু গল্প পদ্য রচনা সভায় পঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃষসিদ্ধান্তের 'হিন্দু সমাজ-প্রকৃতি', কবি শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষের 'যার কেহ নাই এই সংসারে' (কবিতা), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি—এর 'দুঃখ ও তাহার প্রতিকার,' শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর 'সঙ্গীতের সপ্ত স্বর', শ্রীযুক্ত সুরজিত দাশ গুপ্ত ভিষকশাস্ত্রীর গদ্য কবিতা 'লজ্জাবতী', শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের ছোট্ট ছোট্ট গল্প-সমষ্টি 'গল্প-মালিকা' এবং শ্রীযুক্ত বিক্রমাদিত্য ভৌমিকের 'জীবনোচ্ছ্বাস' (কবিতা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ণিমা-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন আগামী ২৬শে মাঘ রবি-বারের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই জেলাবাসী, জিলাবাসীর ও হৃদয়বান্ লেখক-লেখিকাদিগের রচনাই বাঞ্ছনীয়। একমাত্র মহিলাদিগের রচনাই সংশোধন করিয়া পড়িয়া দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন এবার ইষ্টারের ছুটিতে ঐতিহাস প্রসিদ্ধ ধামপালে হইবে। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন শাখার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর—সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য শাখার „
কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ—ইতিহাস শাখার „
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ—বিজ্ঞান শাখার „
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত—দর্শন শাখার „

এবার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে এক সারস্বত সম্মেলন হইবে। আশা করি সম্মেলন পরিচালকগণ ময়মনসিংহের প্রাচীন লুপ্ত গৌরব সারস্বত উৎসবটীকে এইরূপে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

স্থানীয় পোষ্টেল ও আর এম এস এসোসিয়েসন হইতে 'প্রচার' নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। শান্তি লাইব্রেরী হইতে "তপন" বাহির হইয়াছে। "সংস্কার" নামেও একখানা মাসিক পত্র এই নগর হইতে বাহির হইবার সূচনা হইয়াছে। সাহিত্য চর্চ্চায় ময়মনসিংহ মফস্বলের পথ প্রদর্শক হউক।

আল হেলাল সমিতি—ইসলামের প্রাচীন আদর্শের অনুকরণে মুশলমান সমাজকে উন্নত করিবার জন্য এবং প্রাচীন ইসলামীয় সভ্যতার আলোচনার উপায় সংপ্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে এই নগরের মুছলমান নেতাগণ আল-হেলাল সমিতি নামক একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সমিতি নিম্ন লিখিত প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। যে কোন জাতির লেখক প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

(১) ইসামের ছাত্র জীবনের আদর্শ।
(২) হজরৎ মুহম্মদের (দঃ) জীবনী।
(৩) ইসলামে নারীর স্থান।
(৪) প্রাচীন মুছলমানের শিক্ষা ও সাধনা এবং আধুনিক সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব।
(৫) মুছলমান রাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যুদয় পতন ও ভবিষ্যৎ—ইত্যাদি।

বিস্তৃত বিষয় নুতন বাজার ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য। আমরা এইরূপ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বদাই পক্ষপাতী। আশা করি আল-হেলাল সমিতির আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ জয়যুক্ত হইবে।
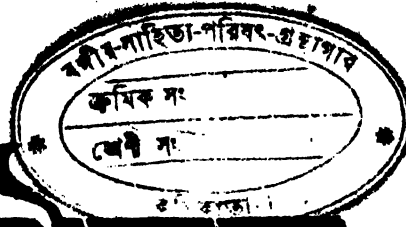
সৌরভ

ত্রয়োদশ বর্ষ। { ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩৩১ } দ্বিতীয় সংখ্যা।

মাধবীলতার মনের কথা।

(কণিকা)

১

বাপ মা-মরা মাধবী মেসোর সংসারে মানুষ। মাসীর আদরে বেড়ে উঠ্‌ল। গরীব মেসোর পয়সা নেই, বিয়ে দিল তেজ্‌বরে। বছর না পেরুতে ফিরে এল মাধবী, সিঁথির সিঁদুর মুছে, হাতের শাঁখা ভেঙে।

মাসীও মারা গেল। মেসো আবার বিয়ে কর্‌লে। নূতন মাসীর গা ভাল না। মাধবী সংসারের সব কাজ সেরে, নিজে রেঁধে হবিষ্য করে শেষ বেলায়।

২

একাদশী। মাধবী নির্জ্জলা উপোস করে রাতে রাঁধতে বসেছে। শরীর অবশ হয়ে তন্দ্রা এল। কাঁচা কাঠের সোঁ সোঁয়ানিতে সহসা সে শুন্‌তে পেলে, কে যেন বল্‌ছে, "ওগো, আমাকে পুড়িয়ে মের না! আমি কে জান? আমি মাধবীলতা!"

বাপ মা কে জানি না, বড় হয়ে দেখি কমলদীঘির ধারে বড় একটা গাছের নীচে আছি। তাকেই বাপ বলে জান্‌তেম।

ছেলেবেলা বেশ ছিলেম। সারাদিন নেচে খেলে কাটাতেম। বাবা আমাকে খেলা দিতেন। তাঁর ডালের ছায়া আমার কাছে ফেল্‌তেন, ধরতে যেতেম সরিয়ে নিতেন। ধরতে না পেরে ফিরে এলে আবার এগিয়ে দিতেন। ধরি ধরি সরে যায়।

ভোরে যখন আকাশ রাঙিয়ে রাঙা রোদ উঠ্‌ত, পাখীরা গান জুড়ে দিত; আমি তখন তালে তালে নাচতেম। খুসী হয়ে বাবা পাতা ঝর ঝরিয়ে তুড়ি দিতেন। সারাদিন আপন মনে নাচ্‌তেম।

সূয্যি যখন পাটে বসে রাঙা মেঘে হেলে পড়ত, পাখীরা ছুটে ছুটে বাসায় আস্‌ত, গাছেরা হাতছানি দিয়ে তাদের ডাক্‌তো; কমলদীঘির কমলদের চোখ মুদে আস্‌ত ঘুমে। ঝিঁঝিঁর 'ঘুম পাড়ানি' গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমিও ঘুমিয়ে পড়্‌তাম।

ভোরের হাওয়া ঠেলে, পাখীরা ডেকে জাগিয়ে দিত। কমলদীঘির কমলরা তখনও ঘুমুচ্ছে। পূব আকাশের রাংঙা রোদ এসে ধাক্কা দিচ্ছে, তবু তাদের হুঁস্‌ নেই। আমি তাদের আগেই জেগে পড়তেম।

এ রকমে নিদাঘের ঘুঘু ডাকা দুপুর, বর্ষার মেঘ-মেদুর দিনান্ত, শরতের অরুণ আলোর প্রভাত, ধানের গন্ধ পোরা হেমন্তের অপরাহ্ন, কোয়াসা মোড়া শীতের দীঘল রাত্রি, তারায় ভরা কোকিল ডাকা কত চৈতালি নিশিথ রাত কেটে গেল।

৩

আবার অরুণ আলোর শরত এলো।

"আজু কেন বা এমন হলো?" সারা গায়ে কার এ পুলক জাগ্‌ল? বাতাসে ভেসে আসে এ কার গন্ধ? আলোকে এ মাদকতা কে মাখিয়ে দিলে? পাখীর গান এত মিষ্টি লাগে কেন? কমল কাকে দেখে হাসে? চাঁদ কার তরে সারা রাত জেগে থাকে? তারায় তারায় এত কি কাণাকাণি? কিছুত বুঝ্‌তে পারি নে! কি হয়েছে আমার? দেখিত!

কমলদীঘির জলে ঝুঁকে পড়ে দেখি ;— এত শোভা আমার! কোথা থেকে এল! আমিত আর সে মাধবী নই! আমার সারা গা ভরে উঠেছে—ভরা ভাদরে এই ভরা দীঘির উছ্‌লে পড়া শ্যামল শোভারই মত!

আর খেলা ধূলো ভাল লাগে না। আমি যেন কেমন তর হয়ে গেছি। ঘুঘুর ডাকে মন উধাও হয়, মেঘের সাড়ায় সিউরে উঠি, অরুণ আলোয় চম্‌কে চাই, কুসুম বাসে নেশা আসে, শীতের দীঘল রাত আর কাটে না। কোকিল-ডাকে কান্না জাগে, চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না!

ওগো কেউ বল না গো—

"আমার কি হল অন্তরে ব্যথা!"

৪

এ রকমে আট মাস কেটে গেল। শেষে এক ফাগুনের ফাগ্‌-রাঙা প্রভাতে এ কার সুবাস ভেসে এল! মাতাল ভোম্‌রার ছুটোছুটি, প্রজাপতির লুটোপুটি, পাখীদের মাতামাতি। কেউ করে কুহু কুহু, কেউ বলে চোখ গেল, কেউ বা বৌর কথা শুন্‌তে অধীর।

ফিরে দেখি পেছনে দাঁড়িয়ে এক সহকার তরু মুকুলে মুকুলে ভরা! তার ডালে ডালে কোকিল ডাকছে, ভোমরা লুটো পুটি খাচ্ছে, এত কাছে এত দিনত দেখিনি! হায়! যাকে পাওয়ার লাগি পরাণ পাগল, সে কি এত কাছেই লুকানো থাকে?

চোখ তুলতেই চোখে চোখে পড়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিলেম। চাইতে ইচ্ছা হয়, চাইতে পারি নে। চাব কি চাব না—করে মিছে ভাবনায় রাত কেটে গেল। তার মুখের হাসি চোখে লেগে রইল।

"কিবা সে মধুর হাসি!

হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়া মরমে রহিল পশি।"

ভোরের হাওয়া বইল। ফিঙের ডাকে, দয়েলের শিশে জেগে অরুণ উঁকি মারল, আমি সারা রাত জেগে জেগে প্রভাতে ঘুমিয়ে পড়লেম্।

৫

খানিক বেলায় ঘুম ভেঙে দেখি রোদ উঠেছে। আজ যেন সব কেমন তর। কমলরা গাল টিপে টিপে হাসছে, ফুলেরা গলাগলি করে কি বলাবলি করছে, বাবাও যেন কেমন আনমনা; ওরা কি টেরপেয়েছে? কেমন করে জান্‌লো? ছি ছি বড় লজ্জা করে!

সারাদিন ভেবে ভেবে কাট্‌লো। বিকাল গেল, সন্ধ্যা এল; চাঁদ উঠ্‌ল, ফুল ফুট্‌ল; পাখীরা কলকলিয়ে বাসায় ফির্‌ল, সন্ধ্যা সুন্দরী আঁধারের ঘোমটা টেনে দিলে; আমাদের চার চোখ আবার এক হ'ল!

আমায় দেখে একটা ভোম্‌রা মঞ্জরি ছেড়ে ছুটে এসে ছোঁ মেরে গেল। আমের গন্ধ পোরা একটা দম্‌কা হাওয়া ধাক্কা দিল। আমার সারা গা সিউরে উঠ্‌লো।

চাঁদ যখন মাঝ আকাশে, পাতার আড়ালে কোকিল ঘুমিয়ে, ভোঁমরা ফুলের বিছানায় গা ঢেলে দিয়েছে, পদ্ম পাতে হংস মিথুন শুয়ে, সারা সংসার অসাড়, ঝিঁঝিঁর এক টানা রেশে সব সুর গেছে মিশে, চকোর চকোরি উধাও হয়ে জ্যোছনায় সাঁত্‌রে বেড়াচ্ছে, তাদের ক্ষীণ-কণ্ঠ আর চকা-চকির করুণ আলাপ।

আমি তখন মলয় মারুত ভর করে দাঁড়িয়ে দেখছি, কোথা থেকে একটা দুষ্টু দম্‌কা হাওয়া এসে হঠাৎ ঠেলে দিলে। আঃ কি কর বলে সরে এলেম। ফুলেরা খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল। বড় লজ্জা হ'ল। ভেবে ভেবে সারারাত কেটে গেল।

পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়ল, ঝিঁঝিঁর মূর্চ্ছ'না মিলিয়ে এল, ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল, প্রভাতি গাইতে হবে বলে পাখীরা গলা সানাতে বসে গেল। মন আর মানে না। একটা দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গ পেয়ে ছুটে যাচ্ছি, হঠাৎ হোঁচট্‌ খেয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলাম। বাতাস ফিরে দেখে 'ইস্‌' করে চলে গেল। বড় কান্না এল। মনে মনে ডাক্‌লেম কোথায় আছ তুমি, এসে হাত ধরে তুলে নেও। আমি যেতে পারিনে. বলে কি তুমি আসতে পার না?

হাওয়ার কাঁধে ভর করে রজনী গন্ধার গন্ধ যাচ্ছিল অভিসারে। সে দেখে বল্‌লে "কে গা তুমি, এই নিশুতি রাতে একলা পড়ে আছ? কাকে চাও?" আমি হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেম।

"আহা বড় লেগেছে? এস আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।"

এই বলে হাত ধরে তুলে সহকারের পাশে নিয়ে গেল, সেও অমনি হাত বাড়িয়ে ধরে নিলে।

তখন ভোমরারা গেঁজে উঠল, পাখীরা গান জুড়ে দিলে, কোকিল উহু উহু করতে, লাগল, কে একটা হিংগুটে পাখী "চোখ্ গেল চোখ্ গেল" করে চেঁচাতে লাগল। বাব'র একরাশ পাতা এসে পড়ল আমাদের উপর আশীসের মত।

জ্যোছ্না ডোবা ভোরের আলোয়, তারা মোছা আকাশের নীচে, এ রকনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। সে কথা আর কেউ জানে না। জানে শুধু ডুবে যাওয়া পূর্ণিমার চাঁদ, আর ঝ'রে পড়া বকুল।

সকাল হলে দেখি বাবা, খুসি হয়ে চেয়ে আছেন। বড় লজ্জা করতে লাগল।

৬

এখানে আমার কজন সাথী জুটে গেল। ভোর না হতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল ছায়ায় বসে খেলা করত। তাদের মাঝে মাধবী বলে একটী ছোট মেয়ে আস্ত। তাকে আমার বড় ভাল লাগত। আমি মনে মনে তার সনে মিতিন্ পাতিয়ে ছিলেম্। সে ফুল নাগাল পেত না, আমি নুয়ে পড়ে তাকে ফুল পাড়তে দিতেম। তার কচি হাতের 'পরশে' আমার গা ভরে উঠ্ত। সে এক দিন না এলে অস্থির হতেম।

মাঝে মাঝে কে একজন আসত—কোমর বেঁধে, আকুষি নিয়ে, সাজি হাতে; তাকে দেখলে আমাব বড় ভয় হ'ত। সে আমার সারা গা ছিঁড়ে খুঁড়ে ফুল কেড়ে নিয়ে যেত।

দুপুরে আসত আর এক দল, রাখালরা। গরু ছেড়ে দিয়ে ছায়ায় বসে বেনু বাজাত, ডাণ্ডাগুলি খেলত, ঝরা ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে গলায় পরত।

৭

আমার সারা গা ভরে উঠল ফুলে ফুলে! আমি সেই ফুলভরা গা দিয়ে প্রিয়তমকে আকড়ে রইলাম। তখন কে মাধবী, কে সহকার আর চেনা গেল না। সহকার হল মাধবী, মাধবী হয়ে পড়ল সহকার। পথে চলা লোকে দেখে, আর বলে "কী সুন্দর!" তখন কত ভোমরার আনা গোনা, কত পাখীর গান শোনা।

অনেক দিন মাধবীকে দেখিনি। লোকে বলে তার বিয়ে হয়েছে। শুনে সুখ হ'ল। আহা, সে আমার মত সুখী হোক্!

সুখ সইল না। কাল বৈশাখের কাল্ সাঁঝে কালো মেঘ দেখা দিল কালো আকাশের কোলে। কমল-দীঘির কালো জল কালী হয়ে উঠল। তা'রা একপংক্তির দাঁত মেলে, বিদ্যুতে চোখ রাঙিয়ে, ধমকে গগন ফাটাতে লাগল—প্রকাণ্ড দৈত্যের মত। গাছপালা সব থমকে রইল ভয়ে। পাখীরা চেঁচামেচি করে বাসায় ছুটল। আমার প্রাণ উড়ে গেল। ভারি ঝড় উঠল। কমলদীঘীর কমলরা চুবন্ খেতে খেতে হাঁপিয়ে উঠল। সোর গোল পড়ে গেল পাখীদের পাড়ায়। বেনু বন মাথা কুটতে লাগল। এক একটা গাছ পড়ে, আর আমার প্রাণ উড়ে যায়। শেষে কি আমারই কপাল ভাঙল! অনেক ক্ষণ ঝড়ের সাথে যুঝে মাটিতে আছড়ে পড়লেম আমরা। তারপর কি হ'ল জানি না!

৯

জ্ঞান হয়ে দেখি, সারা আকাশ ফরসা হয়ে রোদ উঠেছে। কত ভাঙা ডাল, ছেঁড়া পাতা, মরা পাখী পড়ে আছে—সাড়া সংসার ছড়িয়ে। কমলদীঘি এলোমেলো হয়ে পদ্ম-চোখ উলটে পড়ে আছে মরার মত।

ছেলের পাল লুট লাগিয়ে দিয়েছে। সময়ে যারা ছিল সাথী তারাই আজ সব ফুল ছিঁড়ে একি সাজে সাজিয়েছে আমায়!

দুপুরে রাখালের দল এসে আমাদের উপর উঠে নাচতে লাগল। গরু এনে সব পাতা খাইয়ে দিলে। হায়! অসময়ে কি এমনই হয়, আমার যা হয় হোক্। প্রিয়তমের দশা দেখে বুক ফেটে কান্না এল, "কি হল আমার" বলে কেঁদে উঠলেম।

"মাধবি, কেঁদ না। আজ আবার আমাদের বিয়ে। ঐ দেখ কারা আসছে!"

চেয়ে দেখি কুড়ুল কাঁধে দুজন দুষ্মন্! তারপর কি হ,ল জানি নে।

১০

আজ বড় জ্বালায় জ্বলে উঠেছি। কে আমার সারা

গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলে আজ যদি সে মাধবীকে পেতেম মনের কথা কয়ে মন হালকা হ'ত।

এমন সময় কাঁচা আম কাঠের জল চুইয়ে ফস ফস করে পড়তে লাগল।

"তুমি কাঁদছ? কেঁদ না, কেঁদ না, কেঁদ না! এই যে আমি তোমার কাছে!" এই বলে মাধবীলতা দপ করে জ্বলে উঠে অশ্রু মোছাতে গিয়ে নিজেই নিবে একটা ধোয়া হয়ে গেল!

"বলি তোমারই যেন একাদশী, আর কি কারো খাওয়া নেই? উনুন কোলে করে বসে বসে যে ঝিমুচ্ছ?"

মাধবী চম্‌কে চেয়ে দেখে, এক গা গয়না পরা নূতন মাসী দাঁড়িয়ে।

এমনি সময় দুরে কে পথিক গেয়ে উঠ্‌ল,—

"না হতে পতন তনু দহন হইল আগে।
আমার এ অনুতাপ তাহাকেত নাহি লাগে?
চিতে চিতা সাজাইয়ে, তাহে দুখ তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনার অনুতাপে।"

শ্রীসুরজিৎ দাসগুপ্ত কবিরাজ।

হাতী খেদা।

২

এই স্থলে প্রারম্ভেই খেদা পরিচালন সম্বন্ধে কয়েকটা কথার ও খেদা সম্বন্ধীয় কতগুলি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিয়া রাখিতে হইবে।

সর্ব্বাদৌ কতগুলি লোককে হস্তীযূথ অনুসন্ধান করিতে পাঠান হয়; ইহাদিগকে "পাঞ্জালি" কহে। পাঞ্জালী ৬ জন রাখিলেই চলে। হস্তীর অনুসন্ধান পাওয়া গেলেই দুই জন সেই সংবাদ বড় সর্দ্দারকে দেয়—অপর কয়েকজন হস্তীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া থাকে। হস্তীর আহার্য্য কিরূপ আছে, কোঠ-বাঁধার উপযুক্ত স্থান হইবে কি না, হস্তী আবদ্ধ হইলে বাহির করার সুবিধাজনক পথ পাওয়া যায় কি না; কোঠ তৈয়ারের গাছ নিকটে পাওয়া যায় কি না, লোক জনের জল কষ্ট হইবে কি না ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই পাঞ্জালীকে বড় সর্দ্দারের নিকট জানাইতে হইবে। কোথায় কত হস্তী আছে, তাহা পাঞ্জালী জানাইলেই বড় সর্দ্দার বহর লইয়া সেই স্থানের এক মাইল পথ ব্যবধান থাকিতেই—বহর দুই দলে পাঠাইয়া হস্তী যূথ ঘেরাও করে। আরণ্য হস্তী প্রায়ই পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত কোনও জল এবং বৃক্ষলতাপূর্ণ খাদ্য বহুল নিম্ন স্থানে থাকে। এইরূপ স্থানকে "খল" বলে। আরণ্য হস্তী সাধারণতঃ এক খল হইতে অন্য খলে যাইবার সময় একটা বিশেষ রাস্তা ধরিয়া গতায়াত করে, সেই রাস্তাকে "গড়মলম" বলে। ইহা ছাড়া চলিয়া ফিরিয়া খাইবার জন্য হাতীর অন্য আরোও বহু রাস্তা অথবা "মলম" থাকে। সর্দ্দারগণ তাহাদের কুলী লইয়া প্রথম সমস্ত পর্ব্বত ঘিরিয়া হাতীর চলা ফেরার সমুদয় পথ বন্ধ করে; এবং প্রত্যেক ১০০।১৫০ হাত অন্তর অন্তর দুইজন করিয়া লোক বসাইয়া যায়, এই কেন্দ্রগুলিকে "পুঁজি" বলে। প্রত্যেক পুঁজির লোক যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পারে তদনুযায়ী পরস্পরের মধ্যকার জঙ্গল তখনই কাটিয়া পরিস্কার করে এবং সম্মুখেরও ১৫।২০ হাত জঙ্গল কাটিয়া ফেলে। পুঁজি বসান কার্য্য প্রায়ই ৮ টা হইতে আরম্ভ হয় এবং বেলা ৩।৪ টার মধ্যে শেষ হয়। তখন সমুদয় পর্ব্বত ঘিরিয়া সুন্দর এক রাস্তা নির্ম্মিত হইয়া যায়। স্থানের সুবিধা অসুবিধার উপর পুঁজির ব্যবধান নির্ভর করে। যদি দেখা যায় কোনও স্থান দিয়া হাতী উঠিবার সম্ভাবনা নাই, তখন সেই পুঁজি না রাখিয়া আবশ্যক মত স্থানে ঘন পুঁজি বসান হয়।

পুঁজি রীতিমত বসান হইলেই "পাতবেড়" সম্পূর্ণ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পুঁজির লোক তাহাদের বনানী নির্ম্মিত ক্ষুদ্র আবাস রচনা করে এবং রাত্রি কালে জ্বালাইবার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখে। অগ্নিই বন্য জন্তুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায়। সন্ধ্যাগমে অগ্নি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত করিয়া প্রজ্বলিত হইলে সে দৃশ্য বড়ই মনোরম বোধ হয়। পুঁজির লোক পর্য্যায় ক্রমে একজন করিয়া সমস্ত রাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া থাকে। ইহাকে "পুঁজি রাখা" অথবা "পাতারাখা" বলে। প্রথম দিন এই ভাবেই যায়—পর দিবস যদি মনে হয় 'পাতবেড়ের' কোনও

পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন আছে। তবে সেই সামান্য কার্য্য সাধিত হইয়া কোঠের স্থান নির্ব্বাচিত হয়। এই কোঠের স্থান নির্ব্বাচনের উপরই ভবিষ্যৎ সফলতা নির্ভর করে। "গড়বলয়ের" উপরই কোঠের দরজা রাখা উচিত, কিন্তু যাহাতে হস্তী কোঠ দেখিয়া ভীত না হইয়া অনায়াসে কোঠে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাও দেখিতে হইবে। কোঠের স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেই স্থান পরিষ্কার করার এবং বেড় খাঁচানর (ছোট করার) প্রয়োজন হইলে বেড় খাচাইতে দ্বিতীয় দিবস যায়। তৃতীয় দিবস প্রত্যেক সর্দ্দার নিজ অধীনের কয়েক জন কুলিকে পাতা রক্ষা করিবার জন্ত রাখিয়া অপর লোকদিগকে কাঠ কাটিতে নিযুক্ত করে।

এক্ষণে "কোঠ" কিরূপ হয় তাহার বিবরণ দেওয়া যাউক। যে কাঠ নির্ম্মিত খোঁয়াড় বা স্থান হস্তী ধৃত করিবার জন্ত নির্ম্মিত হয়, তাহাকেই কোঠ বলে। কোঠটী বহু ভুজ বিশিষ্ট হয়। ইহার আকৃতি এস্থলে প্রদর্শিত হইল।
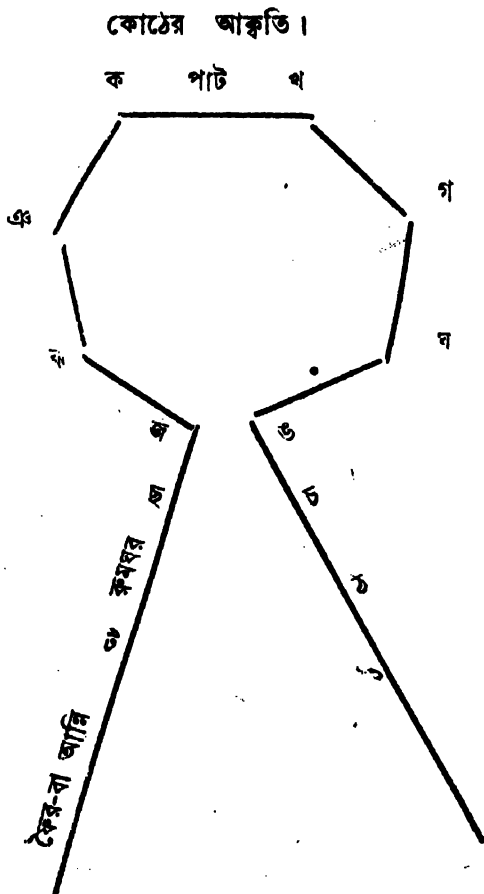
কোঠের আকৃতি।

ক পাট খ

গ

ঘ

ঙ

চ

ঠ

১

ঞ

ঝ

জ

ছ

ট

হাতীর সংখ্যার উপর কোঠের বাহুর অল্পাধিক্য নির্ভর করে। ক খ খ গ গণ ইহাদের প্রত্যেককে এক একটী পাট বলে। প্রত্যেক পাট ১২ হাত লম্বা হইয়া থাকে। এক এক পাট নির্ম্মাণের ভার এক এক সর্দ্দারের অধীনে থাকে। এক এক পাটে (ক হইতে খ পর্য্যন্ত) প্রথম কতকগুলি লম্বমান খুটি ফেলা হয়। খুটিগুলি প্রত্যেকটা ১½ হাত বেড় এবং ১২। ১৩ হাত লম্বা হয় এবং প্রত্যেক পাম্বা মাটির নীচে ২½। ৩ হাত প্রোথিত থাকে। প্রত্যেক খুঁটির মধ্যে ব্যবধান ১½ হাত অর্থাৎ ক হইতে খ পর্য্যন্ত ৯ টী খুঁটি প্রথমে প্রোথিত হয়। অতঃপর ১৩। ১৪ হাত লম্বা এবং ১ হাত বেড়ের ১৩ টী গাছ প্রোথিত কাষ্ঠ গুলির ভিতরের দিক দিয়া সমান্তরাল ভাবে একটীর পর একটী বাঁধিতে হয়। প্রথমটী ½ হাত উচ্চে এবং ক্রমে এই ভাবে ১০টী দেওয়া হয়, তাহার উপরকারগুলি ১ হাত ব্যবধান কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধেও দেওয়া চলে। ১৩ টী গাছ এই ভাবে দেওয়া হয়; ইহাদের "হাংড়া" বলে। হাংড়াএর পেছনে এক একটী "তেপাম্বা" দেওয়া হয়।

হাংড়া এবং single থাম্বায় ১২। ১৩ হাত লম্বা এবং ১" বেড় রসি (দড়ি) দিয়া বাঁধিতে হইবে। প্রত্যেক single থাম্বায় ৩। ৪ টী বাধ হইবে। প্রত্যেক তেথাম্বায় ২০। ২২ হাত লম্বা এবং ৩" বেড় দড়ি দিয়া ৫। ৬ টী বাঁধ হইবে। দড়ি বাঁধার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পাটের প্রত্যেক জায়গায় যে থানে হাংড়া এবং থাম্বা মিলিয়াছে—যেন বাঁধ ঠিক হয়। এই রূপে বাঁধা শেষ হইলে বহির্দ্দেশে একজন মানুষ সোজা দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলন করিলে যতটুকু পঁহুছে— সেই পরিমাণ উচ্চে একটা "হাংড়া" বাঁধিত হয়। পুনরায় ইহার দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চে অপর একটী হাংড়া বাঁধিতে হয়। ইতঃপর এই হাংড়াগুলিতে প্রত্যেক single থাম্বার সংযোগ স্থলে একটা করিয়া ভেজা দিতে হয়; এই ভেজাকে চলিত ভাষায় "পেলা" বলে। হস্তী

জোড়ে ধাক্কা দিলে যাহাতে এই ভেজা নড়িতে না পারে তাহার জন্য ইহাদের পশ্চাতে ছোট ছোট কাঠ প্রোথিত করিতে হয়। কোনও কারণে গর্ত্ত সম্পূর্ণ না করিতে পারায় কোঠ দুর্ব্বল হইয়াছে আশঙ্কা করিলে পেলার সংখ্যা বাড়াইয়া দিতে হইবে। ভেজা বাড়াইয়া দিলেই অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কোঠের দরজা যে পাটে হয় সেই লাট গড়মলমে রাখিতে হইবে দরজা প্রস্থে ৭ হাত পরিমাণ হয়। দুই দিক হইতে ২½ হাত পরিমাণ স্থান রাখিয়া দুইটী বৃক্ষ প্রোথিত করিতে হয়। এই বৃক্ষ দুইটী ১৬। ১৭ হাত লম্বা এবং ৪ হাত বেড়ে হয়—ইহাদের এক একটী টানিয়া নামাইতে প্রায় ৪০। ৫০ জন কুলী প্রয়োজন। ইহাদের ৪। ৫ হাত মাটির নিম্নে প্রোথিত করিতে হয়। রাজখাম্বার অগ্রভাগ অনেকটা মূল কাষ্ঠের মত থাকে। রাজখাম্বার দুই ধারে যে ২½ হাত পরিমাণ স্থান থাকে তাহা সাধারণ পাটের মতনই নির্ম্মিত হয়। সর্দ্দারের সংস্কারানুযায়ী রাজখাম্বা দুইটীই প্রথম ফেলিতে হয়; ইহা হইলে অন্য সর্দ্দারগণ কাজ করে। দরজার কাজের ভার প্রায়ই বড় সর্দ্দার নিজ অধীনে রাখে। রাজখাম্বা ফেলা হইলে দোচালার উপর একটী ধন্না দেওয়া হয়—এই ধন্নাও বেড়ে ২½। ২ হাতের নিম্নে হয় না। ধন্নার ৪ হাত নিম্নে আরও একটী ধন্না বাঁধিতে হয়। ইহা কোঠের Horizontal bar এর সামিল থাকিতে পারে। দ্বিতীয় ধন্নার উপর, দুইটী নিম্নে দোডালা যুক্ত খাম্বা বাঁধিতে হয়; ইহার প্রত্যেকে ৭হাত লম্বা হইবে। একটী প্রথম ধন্নার সহিত বাঁধা থাকিবে এবং দ্বিতীয়টীতে উঠিতে পারে মত দ্বিতীয় ধন্নায় বাঁধা থাকিবে। প্রথমটীকে "উঠানে ওয়ালা" এবং দ্বিতীয়টীকে "গিরানে ওয়ালা" মস্তুল বলে। প্রত্যেকটীর অগ্রে একটী করিয়া কপিকল থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় মস্তুলে মোটা রসি দিয়া বাঁধা থাকে। মস্তুলকে "গিরাফী" ও বলা হয়। দুইটী ৮ হাত লম্বা খুঁটি এবং তাহাতে ৯ হাত ৯½ লম্বা ৭। ৮ টী বাতি (i,e Horizontal bars) বাঁধিতে হইবে। এই বাতিগুলি পরস্পর দড়ির সাহায্যেই বাঁধা থাকে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে দরজাটাকে সম্পূর্ণ দড়ির নির্ম্মিত মনে হয়। প্রথম বাতি হইতে শেষ বাতি পর্য্যন্ত দুইটী মোটা ফাঁদ দিয়া আগাগোড়া পরস্পরের সহিত বাঁধা থাকে। এবং এই ফাঁদ ছিঠার ধন্নার সহিত বাধা থাকে। পুনরায় আড়া আড়ি ভাবে চারি কোণ সমস্ত বাতি বাঁধিয়া অপর দুইটি ফাঁদ থাকে। ইহার পর দ্বিতীয় ধন্নার সহিত এই দরজা মোটা ফাঁদ দিয়া ঝুলান থাকে। ইতঃপর সর্ব্ব নিম্নস্থ বাতির মধ্য ভাগে বাঁধিয়া দুই গেরাফীর কপির মধ্য দিয়া এক দড়ি চালনা করিয়া আন্নির বহির্দ্দেশে কোনও খুঁটিতে আবদ্ধ এক কপির মধ্য দিয়া দড়ি চালনা করিয়া দরজা টানিয়া তোলা হয়। ইহা তুলিতেও ৫০। ৬০ জন লোক প্রয়োজন। এই ভাবে দরজা ঠানিয়া দড়িটিকে এমন ভাবে এক সরু দড়ি দিয়া বাঁধা হয় যে অনায়াসে সেই বন্ধন খুলিতেই দরজা পড়িয়া যায়; তাহার নিকট এক তীক্ষ্ণধার "দাও" রাখা হয়, প্রয়োজন বোধে তাড়াতাড়িতে দড়ি কাটাও হয়। এইরূপ ভাবে গড়ের (অর্থাৎ কোঠের) কাজ হইতে থাকে এবং সঙ্গে রাজ খাম্বা ধরিয়া 'কন্দির্লের' মতন দুই লাইন প্রায় পাটের মতন করিয়াই বহুদূর পর্য্যন্ত বাঁধা হয়। গড়মলম দিয়া হাতী যাতায়াত করার সময়ও এই মলম হইতেই খলের মধ্যে আহারের কিম্বা ইতস্ততঃ বিচরণ করার কতকগুলি মলম থাকে। তাড়ানর সময় যাহাতে এই সকল মলম ধরিয়া হাতী অন্যত্র যাইতে না পারে, সেই জন্য এই প্রকার দুইটী লাইন করিতে হয়। ইহাকে "ফৈর" বা "আন্নি" বলে। রাজখাম্বা হইতে ১২ হাত উভয় দিকের আন্নি রীতিমত শক্ত করিয়াই বাঁধিতে হয়—এই স্থানটুকু প্রায় কোঠের পাটের মতনই করিতে হয়; কেবল মাত্র বহির্ভাগে উপরের ভেঁজা আর দেওয়া হয় না সুতরাং উপরের হাংড়া বাঁধাও অনাবশ্যক। আন্নি কতদুর পর্য্যন্ত বাড়াইতে হইবে, তাহা স্থানের উপর নির্ভর করে। ১২ হাতের পর খাম্বা ২ হাতের অধিক প্রোথিত হয় না; স্থান বিশেষে ইহা অপেক্ষায় কম হয়। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গড়ের পাটের নিয়মেই অন্যান্য কার্য্য হয়; তৎপর এক খুঁটি হইতে অপর খুঁটির ব্যবধানের কোনও বিশেষ নির্দ্দেশ থাকে না। প্রথম ধাক্কা সহে মতনই একার্য্য সাধিত হয়। প্রথম ১২ হাত স্থানকে "রুমঘর" বলে; রুম ঘরের পর আর তেখাম্বা দেওয়া হয় না। রুম ঘরের দুই পাটের

নির্ম্মাণ ভার দুই সর্দ্দারের অধীন। আম্লির কতক অংশ এক এক সর্দ্দারের অধীনে থাকে। বলা বাহুল্য, যে, কোঠের অপেক্ষা আম্লি বাঁধার কার্য্য অনেক সহজ সাধ্য। আম্লি বাঁধা শেষ হইলে কোঠের অভ্যন্তরে এবং আম্লির মধ্যে রীতিমত কৃত্রিম জঙ্গল তৈয়ার করা হয় এবং কোঠও আম্লির সমুদয় কাষ্ঠ নব তৃণ পত্রাচ্ছাদিত করিতে হয়, যাহাতে কোঠের কাষ্ঠ এবং অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখিয়া হস্তী সহসা ভীত হইতে না পারে। ইহা যতই স্বাভাবিক করা যায় ততই সুবিধাজনক। এই কার্য্যকে "জাঙ্গি" লাগান অথবা "বাগান" বানান কহে। হস্তী কোনও কারণে ভীত হইলে মানুষের সাধ্য নাই সেই পথ দিয়া তাহাকে চালান করে। Mr. Sanderson যদিও এই মত পোষণ করেন না, তথাপি এই বার যাহা দেখিয়াছি তাহাতে উক্ত প্রকার ধারণাই আমার বদ্ধমূল হইয়াছে। হস্তীর স্বভাবই এই যে তাহারা ভীত হইলে সদলে গড়মলম দিয়াই সহজে যায়; সেখানে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইলেই অন্য পথ দিয়া যায়। কোঠের নিকট বহু কাঠ লইয়া অনেক লোকে কাজ করয় স্থানের পরিবর্ত্তন বহুল পরিমাণেই সাধিত হয়, সুতরাং যাহাতে যতদূর সম্ভব অকৃত্রিম করা যায় তাহার চেষ্টা করা সমীচীন। নতুবা হঠাৎ ভীত হইলে সে হস্তী ধৃত করা সহজ সাধ্য নহে। এই কারণে হঠাৎ নিম্ন স্থানে (অর্থাৎ কোনও উচ্চ স্থানে উঠিয়াই নিম্নে যদি কোঠ দেখা যায়, এরূপ স্থানে,) কোঠ করা উচিত নহে। বৃক্ষ বহুল, আচ্ছাদন যুক্ত, ক্রমঃনিম্ন স্থানই কোঠের পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান। হঠাৎ উচ্চ স্থানও একই কারণে অসুবিধাজনক; অধিকন্তু নীচ হইতে হস্তীকে তাড়াইয়া আনাও কষ্টকর ক্রমঃনিম্ন সুবিধাজনক স্থান না পাইলে ক্রমঃউচ্চ স্থানই পছন্দ করিতে হয়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কোঠের সম্মুখে বৃক্ষের আবরণ থাকা অতি প্রয়োজন। ফলকথা কোঠের স্থান নির্ব্বাচনের উপরই খেদার সাফল্য নির্ভর করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

পর-চর্চ্চা।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

পূর্ণপূজারী ফিরি বাড়ী বাড়ী কুড়াইত আলো'চাল,
পুত্র তাহার বীরেন্দ্র বাবু নিছক সাহেবী-হাল।
পরের কাগজ নকল করিয়া করিয়াছে এম্, এ পাশ;
নিশ্চয় জেনো পাবে না চাকুরী, কাটিবে ঘোড়ার ঘাস।

কুঞ্জ বোসের কন্যার বিয়ে, শুনিয়াছ ভজহরি?
বিদ্যাপুরের রায়দের ঘরে, ছিছি বেন্নায় মরি!
পূর্ব্বে আছিল গোলাম গোষ্ঠী, কপালে হইল ধনী!
সমাজের হাতে আচ্ছা রকম শিক্ষা পাবেন মণি!

দীনবন্ধুর সিন্ধুক গুলি ভর্ত্তি হইল কিসে?
গুপ্ত খবর রাখোকি তোমরা? আমি পাইয়াছি দিশে;
ভাগাকুলের সেই-যে ডাকাতি, তারি সর্দ্দারী-ভাগ!
কারবারে ওর কি আর মুনাফা? কেবলি মুখের জাঁক!

দেনার দায়েতে নব নন্দীর নিঃশেষ হলো সব্,
তথাপি তাহার গৃহে চলিয়াছে নিত্য মহোৎসব!
ছাড়িয়া দিলেন পুত্র বিবাহে পঞ্চহাজার—সাধা;
লোকে বলে তারে ধার্ম্মিক সাধু, আমি বলি বেটা গাধা!

মাষ্টার গুলি নষ্টের গোড়া, তুষ্ট না রাখো যদি,
পুত্র তোমার নিশ্চয় ফেল্, জানি আমি নিরবধি!
দুষ্ট লোকের খোসামুদি করা অভ্যাস মোর নয়;
নতুবা কেষ্টা তিনটে বছর ষষ্ঠ কেলাসে রয়?

বিধু দত্তের বিধবা কন্যা বয়েস তাহার বারো
শুনিলাম নাকি হিন্দু মতেই বিবাহ হইবে তারো!
এ গাঁয়ের যত শিক্ষিত ছেলে পক্ষ নিয়েছে তার;
গেল সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, রক্ষে নাহিকো আর!

পান্নু পোদ্দার বড় জোৎদার, শিক্ষিত ছেলে গুলি,
দারুণ দেমাকে ভদ্রলোকের মর্য্যাদা গেছে ভুলি!
আমাদের সনে সমান আসনে বসিতে তাহার সাধ,
বেটা ছোট লোক ঘুঘু দেখিয়াছে, দেখেনি এখনো ফাঁদ!

বেটা বঙ্কিম 'ব্রেঞ্চ-হাকিম,' যাকে বলে অনাহারী,
মুর্খেরা তার সুখ্যাতি করে, বেটা নষ্টের হাঁড়ী!
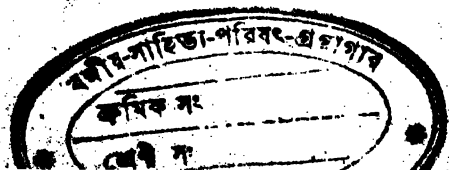
পঙ্কগণের ইঙ্গিত পেলে নিশ্চয় হাত মেলে;
নতুবা আমার মানগাটা দিলে মিথ্যে বলিয়া ঠেলে?

মধু মুনসেফ, মূর্খই শ্রেষ্ঠ, মেয়েটা করিল মাটী;
লজ্জা সরম গোল্লায় গিয়ে, সজ্জার পরিপাটি!
কলেজের পড়া মেয়েদের সাজে? নিতান্ত বাড়া বাড়ি!
এমন, পর্দ্দাবিহীন মর্দ্দানীদের কপালে ঝাড়ুর বাড়ি।

গান্ধি বলেন—খদ্দর পরো, চরকায় কাটো সূতো;
আর, স্বরাজের তরে টক্কর ল'ড়ে, স্বেচ্ছায় খাও গুঁতো!
ছত্রিশ জাতি হও এক জাতি, আজ্ঞা তাঁহার এই;
অর্থাৎ মোরা কাছয়বের রাস্তা খুঁজিয়া নেই!

নিন্দের মতো নিন্দুক ছুটি সংসারে নাহি আর;
পর-চর্চ্চার অর্চ্চনা বিনে অন্ন রোচেনা তার!
কর্ম্ম বিহীন মূর্খ গুলির ধর্ম্মই হলো ইহা;
শৈশব হ'তে কভু নাহি মোর ঐ-সবটাতে স্পৃহা!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ।

কত যুগ যুগান্তর অতীত হইল এই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্ আর্য্য ঋষিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে পুণ্য শ্লোক মহাপুরুষগণের পদরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া এই ভারতভূমি জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, যাঁহাদের আবির্ভাবে সমগ্র জগত পবিত্র হইয়াছিল, যাহাদের বিলুপ্ত প্রায় গৌরবের প্রতি আজিও সমগ্র বিশ্ব সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই আর্য্য ঋষিগণ যখন জগৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির হেতুভূত পরব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট অশরীরী বাণী আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ক তত্ত্ব সকল উপদেশ করেন; সেই সকল আকাশ বাণীই শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ। শ্রুতি মুখে তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া ঋষিগণ তদুপদিষ্ট সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জগৎ কারণ পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ পদবী প্রাপ্ত হন। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন ঋষিগণ ভ্রম প্রমাদ শূন্য, তাঁহারা শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ করিয়াছেন আমাদের তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য,- পালনে অসমর্থ হইলেও তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া উচিত, কদাচিৎ অবজ্ঞা করা সঙ্গত নহে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়ই যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া লওয়া হয়। এরূপ প্রণালীতে বিচার করা ভালই কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন অথবা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তানুসারে যদি শাস্ত্রোল্লিখিত কোন বিধি সমর্থন করা না যায়, তাহা হইলেই তাহাকে কুসংস্কার অথবা অযৌক্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। কারণ বিজ্ঞানের যতদূরই উন্নতি হউক না কেন এখনও অপরিসীম বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির অতি ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। এই অতি সামান্য আংশিক জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হয়তো ভবিষ্যতে এমন সুদিন আসিতে পারে যখন নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইবে, তখন হয়তো এখন যে সমস্ত আপ্ত বাক্য কুসংস্কার অথবা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও একটী কারণে এক্ষণকার দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ এই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব্বত্রই অনুমানের উপর নির্ভর করে। নিজের এবং অপরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবলম্বনেই সেই অনুমানের সৃষ্টি।

নানা কারণে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রম শূন্য নহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, সুতরাং উক্ত ইন্দ্রিয়গণের গঠন দোষে তত্তৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞানও দুষ্ট। যেমন নীল অথবা লাল বর্ণের কাচ অথবা পাথরের চশমার ভিতর দিয়া যে সমস্ত বস্তু দৃষ্টি গোচর হয় তৎসমুদয় নীল অথবা লাল বর্ণে অনুরঞ্জিত বলিয়া দর্শকের প্রতীত হয়; তদনুরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তাহাই উক্ত শারীরিক যন্ত্রের শক্তি ও গুণ দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। কামলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সকল পদার্থই হরিদ্রা বর্ণ দেখে। ইন্দ্রিয় যোগী অজ্ঞান বিকৃত শারীরিক যন্ত্র জন্য জ্ঞান ও এই প্রকারে দুষ্ট হইয়া

দর্শকের ভ্রান্তি উৎপাদন করে। পরন্তু যাহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত নয় তাহাদেরও এ সকল ইন্দ্রিয় স্বাভাবিক গঠন দোষে দুষ্ট বলিয়া দর্শকের নানা প্রকার ভ্রান্তি জন্মে। একটী দীর্ঘ সরল রাজপথের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে পথের উভয় পার্শ্বের ব্যবধান ক্রমশই হ্রাস হইয়া অবশেষে পার্শ্বদ্বয় একটি বিন্দুতে গিয়া সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। ইহা যে আমাদের ভ্রান্তি তাহা জানা সত্ত্বেও পুনরায় এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পূর্ব্ববৎ দৃষ্ট হয়।

আবার কোনও সরল রাজপথে যদি সমান্তরালে কতকগুলি স্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকে তাহা হইলে পথের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্তম্ভগুলির পরস্পর ব্যবধান ক্রমশই হ্রাস হইয়া অতি দূরবর্ত্তী স্তম্ভগুলি পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। এই প্রকার ভুল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গঠন দোষ জাত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও যে স্বাভাবিক গঠন দোষে দুষ্ট তাহাও নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু আমরা সাধারণতঃ যাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলি তাহা তিন অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অংশটি মাত্র প্রকৃত প্রত্যক্ষ, অপর দুই অংশ স্মৃতি ও অনুমান। যখন বিশেষ কোন বর্ণ বিশিষ্ট এক শিশি ঔষধ কোন ব্যক্তির নয়ন গোচর হয় তখন দর্শক প্রথমে চক্ষুদ্বারা ঐ বস্তুর স্থূল অবয়ব দর্শন করে। এই টুকুই মাত্র প্রকৃত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের স্মৃতি শক্তি উদ্দীপিত হইয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে এইরূপ অবয়ব ও গুণ বিশিষ্ট পদার্থ পূর্ব্বেও তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং তাহা 'ক' নামে অভিহিত। এই টুকু হইল স্মৃতির কার্য্য। তাহার পরেই অনুমান শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া সাম্য বৈষম্য বিচার দ্বারা দৃশ্যমান পদার্থটি যে 'ক' এই সিদ্ধান্তে উপনীত করায়। এইরূপ স্থলে চক্ষুরাদি শারীরিক যন্ত্র দোষ হেতু দর্শকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুষ্ট হইতে পারে। মনের চঞ্চলতা ও জড়তা বশতঃ স্মৃতি শক্তি যথেষ্ট উদ্দীপিত নাও হইতে পারে, তজ্জন্য ভ্রমও হইতে পারে এবং অনুমান বিষয়ে সাম্য বৈষম্য প্রভৃতি বিচারের অভাব হেতুও নানাপ্রকার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। ফলতঃ ঔষধাদি সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্তি বশতঃ অনেক দুর্ঘটনার কথাও শ্রুতি গোচর হয়।

আবার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এবং অনন্ত কালের অতি ক্ষুদ্র এক নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্র আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানেই এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন অদ্য তাহা ঐ বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হওয়ায় তাঁহারই যুক্তি বলে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব নানা কারণে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অধুনা যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইতেছে তাহা ভ্রম প্রমাদ শূন্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু ব্রহ্মবিদ্ আর্য্য ঋষিগণ যোগ বলে অভ্রান্ত দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া শিষ্যদিগকে তাহাদের অধিকার অনুসারে যে সকল তত্ত্ব উপদেশ করিতেন তাহার অভ্রান্তত্ব ও নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

অদ্যাপি ভারতের নানা স্থানে কত কত যোগী মহাপুরুষগণ লোক চক্ষুর অন্তরালে সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। জীবের প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম দয়া নিবন্ধন কখন কখনও তাঁহারা লোক সমাজে প্রকাশ পাইতেছেন। সম্প্রতি অনেক পাশ্চাত্য প্রদেশ বাসীগণও এবম্বিধ সাধক মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা এই সমস্ত মহাপুরুষদিগের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন প্রকার মীমাংসাই সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রাচীন ঋষিগণ যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যায়। তাহাদিগের কোন প্রকার ভ্রমও লক্ষিত হইলে তাহাদের যথার্থ ভাব আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম মনে করা উচিত, তজ্জন্য কদাচ তাঁহাদিগের উপদেশ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মুক্তাগাছা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

প্রাচীন চীনের রাজনীতি ও সমাজনীতি।

চীন অতি প্রাচীন দেশ। প্রাচীন চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মঙ্গ বা মঙ্গোলিয়ার নাম ঋগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। (১) চীন মিশরের চেয়েও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান চীনের মৃন্ময় পাত্রের চিত্রলিপি মিশরের বহু প্রাচীন সমাধি মন্দির ও স্তম্ভের গাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইটালিয়ান্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রোসোলিনি অনুমান করেন, ইহুদী ব্যবস্থাপক মোসেসের সমসাময়িক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মিশরীয় নরপতিগণ চীনের মৃন্ময় পাত্রের আদর্শ ও চিত্রলিপি স্বদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। (২) আবার কাহারও মতে (৩) মৎস্যপুরাণ বর্ণিত সপ্তলোকের মধ্যে জনলোকই বর্ত্তমান চীন। কাজেই কল্ডিয়া, এসিরিয়া, মিডিয়া, গ্রীস্ প্রভৃতির ন্যায় চীনের প্রাচীনত্বের দাবী ও অগ্রগণ্য

সকল প্রাচীনদেশের বুকের উপর দিয়াই পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে; যুগে যুগে ইহাদের সভ্যতা ও সাধনা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু চীন ইহার প্রাচীন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান গুলিকে আপন বুকের উপর এমনি ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে যে শত আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মাঝখানেও এগুলি অটুট ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই রক্ষণশীলতাই চীনের বৈশিষ্ট্য। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই চীনের সভ্যতা ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে; আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার ফলেই যেন চীনবাসী আজও স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সভ্যজগতের চক্ষে মহীয়ান হইয়া রহিয়াছে।

সুদূর অতীতে জগতের আর কোনও প্রাচীন জাতি স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য চীনাদের ন্যায় এত বড় প্রাচীর নির্ম্মাণ করে নাই। চীন সম্রাট চিংওয়াং পরাক্রান্ত তাতারদের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়াই চীনের উত্তর সীমান্তে খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে এই বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণে প্রজাগণকে আদেশ দিয়াছিলেন। প্রজাগণ দেশের ও দশের উপকারার্থ বিনা বেতনে দেওয়াল গাঁথা সুরু করিল। যাহারা কাজ করিল, কেবল তাহাদের আহারের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ দেওয়া হইল। এইরূপে এত বড় বিরাট ব্যাপার অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া গেল। মিশরের প্রজাগণও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ৭ বৎসরের খাদ্য শস্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত (১) পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিল বটে কিন্তু চীন প্রজাদের ন্যায় স্বদেশের কল্যাণ কামনায় এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে নাই। মিশরে বেকার সমস্যা মীমাংসা করাই ছিল পিরামিড্ নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই তাহাতে প্রজাদিগকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

চীনবাসীদের এই ত্যাগ মূলক রক্ষণ শীলতার উপরই তাহাদের রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রতিষ্ঠিত।

চীন সম্রাটের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। পিতা যেমন পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, সম্রাটও ছিলেন ঠিক সেইরূপ প্রজাগণের সুখদুঃখের নিয়ন্তা। সম্রাটকে প্রজাগণ "স্বর্গ-পুত্র" মনে করিয়া পূজা করিত। সম্রাট অতি আড়ম্বরের সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন যথাশক্তি প্রজারঞ্জন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সম্রাটের ভগবানে অচলা ভক্তি দেখিয়া প্রজাগণের হৃদয় আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে ভরিয়া উঠিত। রাজা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের বিধি ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি মানিয়া চলিতে হইত। রাজা যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করিতেন সেদিন হইতেই ব্যবস্থাপক সভা (Loard of Rights) তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতেন। সম্রাটকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রি সভা ছিল।

চীন যখন সাম্রাজ্য ছিল তখন ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে একজন রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনিই প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অধীনে আর একজন শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তিনি রাজ প্রতিনিধিকে রাজ্যশাসনে সহায়তা করিতেন। আবার

(১) মহা ব্রাহ্মণ ভূমিষ্ঠঃ। ঋঃ সং উমেশ বিদ্যারত্ন।

(২) Clare's "Ancient China" P 527.

(৩) মানবের আদি জন্মভূমি ১৭১—১৭২ পৃঃ।

(১) An Universal History, P. 425—26.

প্রত্যেক প্রদেশ কতকগুলি জিলায় বিভক্ত ছিল। প্রতি জিলায় একজন শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার অধীনে অনেক কর্ম্মচারী থাকিত। প্রজাদের নিকট হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হইত তদ্দ্বারা রাজ কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়া হইত। প্রত্যেক প্রদেশ বা জিলার শাসনকর্ত্তা এরূপ সুদক্ষতার সহিত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ও রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন যে স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারীদের বেতনের জন্ত রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ হইতে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইত না।

চীনের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে মান্দারিণ বলা হইত। মান্দারিণ ব্যতীত অপর কেহ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিত না। মান্দারিণেরা নয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহারা টুপির উপর বিভিন্ন আকারের ও বর্ণের বোতাম ব্যবহার করিত। এই বোতামগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত কে কোন্ শ্রেণীর মান্দারিণ। মান্দারিণদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট; কিন্তু তাহাদের নৈতিক চরিত্র তত উন্নত ছিল না। নৈতিক চরিত্র অবনত হইবার কারণও যে না ছিল, এমন নয়। তাহাদের বেতন ছিল অতি সামান্ত। আবার তাহারা প্রায়ই নিয়মিত সময়ে বেতন পাইত না। অধীন কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দিয়া স্থানীয় আয় হইতে উদ্বৃত্ত হইলে তাহারা নিজের প্রাপ্য বেতন গ্রহণ করিত। রাজকোষ হইতে তাহাদের বেতনের জন্ত এক কপর্দ্দকও দেওয়ার বিধি ছিল না। যখন স্থানীয় নির্দ্দিষ্ট আয় হইতে তাহাদের প্রয়োজনানুসারে টাকা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকিত তখন তাহারা বাধ্য হইয়া অসদুপায় অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জনের বন্দোবস্ত করিত। এই দুর্নীতির ফল ভোগ করিত দরিদ্র হতভাগ্য প্রজা। কারণ প্রজাদের নিকট হইতেই ছলে বলে কৌশলে এই অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হইত। চীন দেশের আইনানুসারে মান্দারিণগণ তিন বৎসরের অধিক সরকারী চাকুরী করিতে পারিত না। মান্দারিণের আফিসে কেহ কোন বিষয়ে বিচার প্রার্থী হইলে তাহাকে উৎকোচ দিতে হইত। অন্তথা প্রজাদের মোকদ্দমা গৃহীত হইত না অথবা গৃহীত হইলেও ইহার সুবিচার হইত না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্।

১

বোলো না, বোলো না কভু—মহেশ্বর চির-অগোচর!
দিক্‌চক্রবালচুম্বী চেয়ে দ্যাখো সুনীল গগন!
নক্ষত্র শোভিত রাত্রি, সুগন্ধিত পুষ্পিত কানন!
নেত্র বিস্ফারিয়া হের মৌনব্রত অটল ভূধর!
সত্য বলো ইহাদের নাহি কি গো আদি শিল্পীকর?
কে রচিল পশু-পাখী নর-নারী অপূর্ব্ব শোভন?
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কে গো বাঁচাইয়া রাখিছে জীবন?
গর্ভস্থ শিশুর তরে দুগ্ধে ভরে পীন পয়োধর?

কার্য্যের আছেই আছে কোনো এক দুর্জ্ঞের কারণ!
উড়ায়ে তর্কের ধূলি বৃথা তারে চাহ আবরিতে!
বিধাতা সহজলভ্য, তার সাথে চলে আলাপন!
সবার মাঝারে হেরি, আছে সে যে সারা ধরণীতে!
'কল্পনা প্রবণ' বলি' বিদ্রূপিছ আজি অকারণ!
আছি মোরা তারি মাঝে, বহে সেও শিরা-ধমনীতে!

২

মায়াচ্ছন্ন জীব সবে, নহি তবু মোহান্ধ মানব;
আমারে চলিতে দাও দীর্ঘ সোজা জীবনের পথে!
বলো, ঘৃণ্য ভাবুকতা! ভ্রমি তবু কল্পনার রথে;
ভেঙো না, ভেঙো না 'ভুল', নাহি চাহি পাণ্ডিত্য-গৌরব!
জনক-জননী-স্নেহে তারি স্নেহ করি অনুভব!
ভ্রাতা ভগিনীর যত্নে হেরি তারে কত শত মতে!
বহিছে দম্পতী-প্রাণে প্রেমরূপে হৃদয়-পরতে!
সন্তানের হাস্যে লাস্যে ফোটে তার সৌন্দর্য্য-বিভব!

শোক দুঃখ ভীতি মাঝে জাগে চিত্তে তার সমাদর!
নহি শাস্ত্র-শৃঙ্খলিত, সুবিশ্বাস সম্বল আমার!
নিয়ত লভিতে তারে নাহি হব তার্কিক প্রবর!
তাহারে যে চাহে পাবে,—জানি আমি, মানি অনিবার!
মোরা নানা শাস্ত্রপথে ঘুরে' মরি হইয়া কাতর!
তর্কে পরাজিত হয়ে মর্ম্মে আমি সাড়া পাই তার!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

রামায়ণী সমাজে বিধবার অবস্থা।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রথা কিরূপ ছিল, তাহা রামায়ণ হইতে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায় না। রামায়ণে অযোধ্যার রাজ পরিবারের বিধবাগণের আচার ব্যবহার বা বৈধব্য চিহ্ন সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। ভরত পিতার মৃত্যুর পর মাতুলালয় হইতে আসিয়া স্বীয় জননী কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়াও পিতৃ-বিয়োগের কোন আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিবার পূর্ব্বে পত্নীর বৈধব্য চিহ্ন গ্রহণের প্রথা এখন নাই; বোধ হয় তখনও ছিল না। ভরত আসিয়া পিতার মৃত দেহ দাহ করিলে পর বোধ হয় বৈধব্য রীতি ও নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সে চিহ্ন বা সে রীতি যে কিরূপ ছিল, তাহার কোন আভাস রামায়ণে নাই।

রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক যুগেও যে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই থাকিতে হইত, তেমন কোন নির্দ্দেশ, বা বাণী বৈদিক রচনায় আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না; কোন বিশিষ্ট নিয়মই যে বিধবাকে অবলম্বন করিতে হইত না, এমনতর নির্দ্দেশও অবশ্য বেদ সংহিতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋক্ বেদের একটী ঋকে, উপমাচ্ছলে বিধবার শয়ন কালে দেবর সম্ভাষণের উল্লেখ আছে।[১] অন্য একটী ঋকে নারীকে বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি সংগ্রহ করিতে ও উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া সংসার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[২] কিন্তু ঋক্‌বেদের কোথাও বৈধব্যাচরণের কোন রীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঋক্‌বেদ সংহিতায় অথবা রামায়ণে বিধবার রীতি নিয়মের কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলেও বৈদিক সূত্রগ্রন্থ সমূহে বিধবার জীবন যাত্রার স্পষ্ট বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে।

ঋক্‌বেদীয় বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে[৩] বিধবার বৈধব্য আচরণের সম্বন্ধে যে বিধান আছে, তাহা এইরূপ :— স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী ছয় মাস ভূমি শয্যায় শয়ন করিবে ও ধর্ম্ম সঙ্গত নীতি নিয়ম[৪] প্রতিপালন করিবে; লবণ ও দূষিত খাদ্য[৫] গ্রহণ করিবে না। ছয় মাস গত হইলে স্নাত-শুদ্ধ হইয়া প্রেতের সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবে; অতঃপর নিঃসন্তান হইলে গুরুজনের নির্দ্দেশ অনুসারে মৃত পতির জন্য সন্তান উৎপাদন করিবে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় সমাজের ধর্ম্মসূত্রকার বৌধায়ন বলিতেছেন[৬] বিধবা এক বৎসর পর্য্যন্ত মধু, মাংস, মদ্য ও লবণ আহার করিবে না এবং এই রূপ নিষ্ঠার সহিত ভূমি শয্যায় শয়ন করিবে; ইহার পরে অপুত্রক হইলে গুরুগণের নির্দ্দেশ অনুসারে দেবর দ্বারা একটী পুত্র সন্তান উৎপাদন করিবে।

মৌদগল্য ঋষি বসিষ্ঠের বিধানে সায়দিয়া ছয় মাস বৈধব্য ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; এসম্বন্ধে বৌধায়নের সহিত বসিষ্ঠ ও মৌদগল্যের বিধানের ঐক্যতা দৃষ্ট হইতেছে না। বৌধায়ন যে মৌদগল্যের বিধান আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সূত্রেই উল্লেখ আছে।[৭]

সূত্র যুগের দুইটী প্রধান সমাজের চলিত রীতির কথাই আমরা এস্থলে উল্লেখ করিলাম। বসিষ্ঠ ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা বিধবাকে[৮] ও বৌধায়ন অপুত্রক বিধবাকে নিয়োগ ক্রমে অপত্য লাভের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অপত্যবতী বর্ষীয়সী বিধবার জীবন যাত্রা কিরূপ ধারায় পরিচালিত করিতে হইবে তাহার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা কোন সূত্রকারই প্রদান করেন নাই।

সূত্র যুগের পর স্মৃতির যুগ। স্মৃতি সমূহে বিধবার ব্রহ্ম-চর্য্যের বিধানই স্পষ্ট ব্যবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি সমূহে বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্য্যের নির্দ্দেশ থাকিলেও নিঃসন্তান বিধবার পক্ষে নিয়োগ ক্রমে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন ব্যবস্থাও অনেক স্মৃতিকার দিয়াছেন।

---

১ ঋক্‌বেদ ১০।৪০।২ ২ ঋক্ ১০।১৮।৭

৩ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৫৫, ৫৬

৪ 'ধর্ম্ম সঙ্গত নীতি-নিয়ম' অর্থে কি বুঝায় ধর্ম্মসূত্রে তাহা নাই। বসিষ্ঠ ধর্ম্ম সূত্রের টীকাকার কৃষ্ণ পণ্ডিত—একবেলা আহার কে নীতি-নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫ দূষিত খাদ্য অর্থে টীকাকারেরা পলাণ্ডু প্রভৃতি, অভক্ষ্যবস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৬ বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ২।২।৪।৭, ৯

৭ বৌধায়ন ধর্ম্ম-সূত্র ২।২।৪৮

৮ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৫৯

সূত্রযুগ ও স্মৃতিযুগের দুইটী সমাজ বিধির স্পষ্ট উল্লেখ এই দুইশ্রেণীর সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই বিরুদ্ধ ভাব হইতে এই দুইটী যুগের দূরত্ব অনুমান করা যাইতে পারে; আমরা তাহা গ্রন্থান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বাল বিধবার পক্ষে ও নিঃসন্তান বিধবার পক্ষে গুরুজনের উপদেশে নিয়োগ ক্রমে অপত্য উৎপাদনের ব্যবস্থা বিধান করিয়াও কোন ধর্ম্ম-সূত্রকার বা স্মৃতিকার এক রমণীর একাধিক বার বিবাহের ব্যবস্থা দেন নাই। বৈদিক কাল হইতে স্মৃতি রচনার কাল পর্য্যন্ত আর্য্য রমণীগণের একবার মাত্র বৈবাহিক মন্ত্রে স্বামীগ্রহণ রীতিই অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে।

বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে যে সকল বেদ মন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। যে মন্ত্রগুলিকে বিধবা বিবাহের সমর্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দুইটী ঋক্‌মন্ত্রের নির্দ্দেশ পূর্ব্বে করা হইয়াছে; আর একটী মন্ত্র এই—

"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত।
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতি বিন্দেত॥[১০]

অর্থ—যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষে দুই স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষে বিবাহ করিতে পারে না।

এই মন্ত্রে এক সময়ে কোন নারী দুই ভর্ত্তা গ্রহণ করিতে পারে না, ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় বার মন্ত্র বিবাহের যুক্তি সমর্থিত হয় না। কোন বৈদিক সূত্রকারই এই মন্ত্রের সমর্থন করিয়া পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীর মৃত্যুতে বা জীবিত কালেই এখনও যেমন দুষ্টা স্ত্রী পর পুরুষের আশ্রয় লইতে পারে, সেকালেও তাহা পারিত; ঐরূপ নারীকে বসিষ্ঠ,[১১] পরাশর[১২] প্রভৃতি ঋষিরা 'পুনর্ভূ', বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুনর্ভূ বা দ্বিতীয় স্বামী সংগ্রহ-কারিণী সম্বন্ধে নারদ বচন[১৩] এবং মনুর বচন অনুরূপ।[১৪]

মন্ত্র-বিবাহ একবার হইয়া গেলে, সেই কন্যার উপর স্বামী পরিবারের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও বৈদিক উদ্বাহ-মন্ত্রের নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া মনু এক কন্যার একবারের অধিক মন্ত্র-বিবাহে একেবারেই সম্মতি দেন নাই।[১৫]

বৌধায়ন, বসিষ্ঠ প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মসূত্রকার—বিবাহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে সে কন্যার পিতৃ প্রভুত্ব হেতু—পুনর্ব্বার তাহাকে পত্যন্তরে মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই পিতারই দান অধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন।[১৬] স্মৃতিকারেরা এরূপ ব্যবস্থাও দেন নাই।

রামায়ণে কিন্তু আর্য্য সমাজের চিরন্তন প্রচলিত ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন প্রথাটীর কোন উল্লেখ দৃষ্টি হয় না; বিধবা নারীর পত্যন্তর গ্রহণেরও কোন স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয় না।

---

১০ এই মন্ত্রটী বেদ মন্ত্র কি না, আমরা তাহা অবগত নহি। মাধব-পরাশরীর ভাষ্যে, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচার গ্রন্থে, পসন্নকুমার দানিয়ারীর বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে এই মন্ত্রকে বেদ মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু কোন গ্রন্থেই ইহা কোন্ বেদের মন্ত্র, তাহার নির্দ্দেশ নাই। যাহা হউক, এই মন্ত্রে কোন পক্ষেরই তর্ক স্পষ্ট সমর্থিত হয় না।

১১ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।১৯।২০।

১২ অক্ষতদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে।
অন্যা অপিন্নভোক্তবং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা। ৫ম অধ্যায় বৃহৎপরাশর।

১৩ নারদ সংহিতা ১২।৪৮ ১৪ মনু ১১।১৭৫

১৫ মনু ৫।১৬২ পরাশরের নষ্টে মৃতে ... ... প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা বিবাহিতা কন্যার জন্য নহে; অক্ষতপূর্ব্বা কন্যার জন্য। এই বচনটী নারদ বচন প্রয়োজন অনুসারে পরাশরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং এখন তাহার অপপ্রয়োগ চলিয়াছে।

১৬ বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ১।১৩; বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৭৪ বসিষ্ঠ বর্দ্ধিষ্ণুসী বিধবার স্বেচ্ছায় পতি গ্রহণেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন (১৭।৭৭—৭৮) কিন্তু বিধবার পতিকুলে কোন পুরুষ জীবিত থাকা কাল পর্য্যন্ত নহে। ১৭।৮০

রামায়ণে আর্য্য সমাজের কোন আলোচনায় এরূপ প্রথার উল্লেখ না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য বানর সমাজে এই প্রথাগুলির অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যার সমাজে বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া দেবরের ভোগ্যা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন প্রথাও এই সমাজের সমাজ-প্রথা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈদিক কাল হইতে অপেক্ষাকৃত নবীন স্মৃতির রচনা কাল পর্য্যন্ত দেবরের যে অধিকার, সমাজপতি আর্য্য ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন রামায়ণের সমাজে আর্য্য দেবরগণের সেই অধিকার ছিল না—ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে রামায়ণের যুগকে অথবা রামায়ণের রচনা কালকে এই সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র রচনারও বহু পরবর্ত্তী যুগে আনিয়া ফেলিতে হয়। আমরা রামায়ণকে বা রামায়ণের যুগকে তেমন অর্ব্বাচীন মনে করি না। রামায়ণের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-আলোচনা করিলে যে কোন অস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারাও আর্য্য সমাজের এই প্রচলিত রীতিটীর অস্তিত্বের আভাস প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, এমন বিশ্বাসও আমাদের নাই। আমরা এই প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্য সমাজের যে স্পষ্ট আভাস রামায়ণে আছে, তাহার আলোচনা করা যাউক এবং তাহা আশ্রয় করিয়া আর্য্য সমাজের অবস্থা বিবেচনা করা যাউক।

দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য বানর সমাজে দেবরের অধিকার কিরূপ ছিল, বালী ও সুগ্রীবের পরস্পরের পত্নীর প্রতি পরস্পরের ব্যবহার ও সেই ব্যবহার সম্বন্ধে জন-মত ও রাজ-মত তাহা নির্দ্দেশ করিবে। আমরা এইক্ষণে সে সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালী মায়াবী দৈত্যের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়া প্রত্যাগমন না করায়, বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব বালীর মৃত্যু হইয়াছে, অনুমান করিয়া নিজের স্ত্রী রুমাকে উদ্ধার করিয়াছিল এবং কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিল; বালীর স্ত্রী তারাকেও পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল। এই ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিতে যাইয়া সুগ্রীব রামের নিকট নিঃসঙ্কোচে বলিতেছে :—

"রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ।"

ইহার পর সুগ্রীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে স্ত্রী হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া রামের নিকট তাহার বিচার প্রার্থনা করিতেছে। সুগ্রীব বলিতেছে—"বালী ফিরিয়া আসিয়া আমাকে আমার উত্তরীয় পর্য্যন্ত লইবার অবসর না দিয়া (এক-বস্ত্র) নির্ব্বাসিত করিয়াছে, এবং আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। ২।৪।১০

এস্থলে প্রথমে বিচার্য্য—জেষ্ঠভ্রাতা বালীর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব যে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা ন্যায় সঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল কি না? দ্বিতীয় বিচার্য্য—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধ। সমাজ যাহার প্রশ্রয় দিতে পারে না, এবং দেয় না, এমন অনেক ঘটনা সমাজে ঘটিতে পারে; ঐরূপ ঘটনাকে সমাজের প্রচলিত আচার বলিয়া অভিহিত করা যায় না; করাও সঙ্গত নহে।

বালী ও সুগ্রীবের পরস্পরের স্ত্রীকে লইয়া পরস্পরের বিহার তৎকালীন সমাজের অনুমোদিত ছিল কি না এস্থলে তাহার বিচার প্রয়োজন। প্রথম ঘটনা—অর্থাৎ বালীর স্ত্রীকে লইয়া সুগ্রীবের ব্যবহার সম্বন্ধে বালীর পুত্র অঙ্গদ বলিতেছে—

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্য্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্।
ধর্ম্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ॥ ৩
কথং স ধর্ম্মং জানীতে যেন ভ্রাত্রা দুরাত্মনা।
যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতংমুখম্॥

"জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া ধর্ম্মতঃ মাতৃবৎ, সুতরাং যে ব্যক্তি সেই জীবিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করে, সেই জুগুপ্সিত ব্যক্তির ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপেসম্ভব হইবে? (এইরূপ করিয়া) সুগ্রীব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।"।

অঙ্গদের এই উক্তি হইতে দেখা যায়, বালীর জীবিতকালে তাহার স্ত্রীর সহিত সুগ্রীবের ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিত ব্যভিচার বলিয়া বানর-সমাজ কর্ত্তৃকই উক্ত হইতেছে; সুতরাং ইহাকে (অনার্য্য) সমাজের প্রচলিত প্রথা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় ঘটনা,—সুগ্রীবের স্ত্রীর সহিত বালীর ব্যবহার।

ইহার সম্বন্ধে জনপদাধিপতিরূপে রাম বালীকে বলিতেছেন,—

ভ্রাতুর্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১৮

অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।

রুময়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ॥

"তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে অনুগমন করিতেছ। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং ইঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূ তুল্যা। অতএব,

* * * "কামার্ত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।"

স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে তুমি বধের যোগ্য।

এই স্থানে বক্তা রাম। রাম যাহাকে সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা অনার্য্য সমাজের স্বীকার্য্য নাও হইতে পারে; বিশেষতঃ, রাম এ স্থলে বালি-বধের ছল খুঁজিতেছিলেন; সুতরাং এ স্থলে বালীর কার্য্য অনার্য্যদিগের সমাজ বিরুদ্ধ হইয়াছিল কি না, স্পষ্ট বুঝা গেল না। সুগ্রীবের আচরণকে অঙ্গদ যেরূপ অন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল, সেইরূপ (অঙ্গদের ন্যায়) বানর-সমাজের যদি কেহ বালীর এই কার্য্যেকেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিত, তাহা হইলে, তাহা দ্বারা এই কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করা যাইত।

তৃতীয়,—বালীর মৃত্যুর পর বিধবা তারাকে সুগ্রীবের স্ত্রীরূপে গ্রহণ। রামায়ণে এই আচরণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় নাই। বিধবা তারার সহিত সুগ্রীবের বিবাহের কোনও কথা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। লঙ্কা-কাণ্ডের ২৮ সর্গে শুক রাবণের নিকট সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

এতাং মালাঞ্চ তারাঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।

সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ॥ ৩২

অর্থ—"সুগ্রীব রামের সাহায্যে বালীকে বধ করিয়া মালা, তারা ও শাশ্বত কপিরাজ্য লাভ করিয়াছেন।

এ স্থলে "তারা-লাভ" সমাজ ও ধর্ম্ম-সঙ্গত বিধানের অনুমোদিত কি না, তাহা অপ্রকাশ।

বালী মৃত্যুকালে সুগ্রীবকে বলিতেছেন,—"যাই হউক, তুমি অদ্যই এই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। প্রাণ, রাজ্য, প্রিয় দ্রব্য, বিপুল রাজলক্ষ্মী এবং নির্ম্মল যশ ত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম। * * আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রিয়তম পুত্র অঙ্গদকে তুমি তোমার ঔরষ পুত্রের ন্যায় দেখিও। * * এই তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিপদ-সূচক বিবিধ কার্য্যবিজ্ঞানে সম্যক নিপুণা, ইনি যাহা বলিবেন, যথার্থ ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা করিবে। তারার মত যেন কিছুমাত্র অন্যথা না হয়।"

বালীর এই অন্তিম উক্তি হইতেও কিষ্কিন্ধ্যা-সমাজে জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ায় বিধিসঙ্গত অধিকারের কোনও আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু রামের নিকট সুগ্রীবের "রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ—" এই নিঃসঙ্কোচ উক্তি ও অঙ্গদের "যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবিতকালে তাহার পত্নীকে গ্রহণকরে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কোথায়?"—এই দুটি উক্তির প্রমাণে, জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তাহার পত্নীতে কনিষ্ঠের অধিকার অনেকটা কিষ্কিন্ধ্যা সমাজের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

জিজ্ঞাসা।

শুধুই কি এ জীবন নিশার স্বপন?
লীলাময় বিশ্ব ধারা
চন্দ্রমা তপন তারা
মিথ্যা এই গিরি নদী গগন ভুবন?

প্রভাত নিশিথ সন্ধ্যা দীপ্ত সূর্য্য কর
বিরাট সুনীল সিন্ধু
বরষার বারি বিন্দু
স্বপ্ন এ বিরাট সৃষ্টি মিথ্যা চরাচর?

শুধুই কি প্রকৃতির উন্মত্ত খেয়াল?
ছয় ঋতু আসে যায়
নীল গগনের গায়
ভাসে মেঘ, ওড়ে পাখী, একি মায়াজাল?

মমতা, করুণা, প্রীতি, সিদ্ধি ও সাধনা,
সুখ, দুঃখ, শোক, শান্তি,
জীবনের ভুল ভ্রান্তি,
মন্দিরে মন্দিরে কত দেব আরাধনা,

বিটপী বল্লরী আর ফোটে যত ফুল,
রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ,
সুমধুর গীতি ছন্দ,
শুধু মায়া, শুধু ছায়া, শুধু মহাভুল ?

অনন্ত জীবন ওই বায়ু বহি আনে,
সতীর অমল প্রাণ,
জননীর আত্মদান
নাহি তুমি, নাহি আমি, সহেনা এ প্রাণে।

অপূর্ব্ব শৃঙ্খলাময় বিশ্ব চরাচর,
কহ আজি দয়াময়!
মিথ্যা নয় স্বপ্ন নয়
সমাপ্ত হবেনা কিছু জীবনের পর।

বুঝি যেন প্রাণে প্রাণে হে মঙ্গলময়।
অনন্ত উদ্দেশ্য ভরা
তোমার এ ভাঙ্গা গড়া
সত্য এ বিরাট বিশ্ব, শুধু খেলা নয়।
নিখিলের প্রতি বিন্দু প্রতি অনুকণা
মাঝে তুমি স্বপ্রকাশ
দূরে যাক্ অবিশ্বাস
সত্য হোক্ জীবনের এ মহা সান্ত্বনা।

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী।

মুক্তাগাছা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।

গুরুজী।

কৃষ্ণচরণ সার্ব্বভৌমের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক পল্লীতে। আদালতের ভাষায় কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যবসায় গুরুগিরী হইলেও বস্তুতঃ ব্যবসায়ী গুরু তিনি ছিলেন না। হালের গুরুগিরী ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি কখনও কোন শিষ্য বাড়ী "ফেরী" করিতে বাহির হইতেন না। অনেক লিখা লিখি সাধ্য সাধনার পর শিষ্যের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বুঝিলেই হঠাৎ অযাচিত ভাবে শিষ্য গৃহে তিনি উপস্থিত হইতেন। তাঁহার ছোট বড় অনেক রকমের শিষ্যই ছিল। বড় শিষ্যের কাঞ্চন প্রণামী পাইয়াও যে প্রকার আশীর্ব্বাদ করিতেন, ছোট শিষ্যের রজত প্রণামী পাইয়া বা প্রণামী না পাইয়াও তেমন আশীর্ব্বাদে তিনি বিরত থাকিতেন না। এক কথায় প্রণামী বিনিময়ের ওজনে তিনি কোনও শিষ্যকে আশীর্ব্বাদে তারতম্য করিতেন না।

কৃষ্ণচরণের চলতি দেখিয়া তিনি যে কি প্রকারের লোক তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। কৃষ্ণচরণ উৎকট নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও তাঁহার জাতিগত বিদ্বেষের অভাব দেখিয়া সকল জাতিই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। বক্‌রীইদের সময় দূর পল্লীতে পল্লীতে হিন্দুর আরাধ্য পশুর ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকিলেও কৃষ্ণচরণের নিকটস্থ স্থানে বা নিজ পল্লীতে মুসলমানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই জন্তুটার হত্যা বিষয়ে নীরব থাকিত। ইদের দিন ছোট বড় মুসলমানগণ কৃষ্ণচরণের "দোওয়াটা" না পাইলে নিজ নিজ মনের কোণে একটা অভাব বোধ করিত। কৃষ্ণচরণও সমাগত মুসলমানদিগকে "বাবা রহিম কেমন আছিস্", "ইব্রাহিম চাচা কেমন আছ" ইত্যাদি সম্বোধনে সকলকে নিজ বাড়ীতে অভ্যর্থনা করিয়া স্নেহাশীষ দিয়া বিদায় দিতেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভাল মন্দের উপদেশটা লইতে সর্ব্বদাই কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আসিত। এমন কি মুসলমান ব্যাপারীরাও ব্যবসায় বাণিজ্য পক্ষে কোন্ দিনটি ভাল তাহা জানিতেও কসুর করিত না। এক কথায় কৃষ্ণচরণ নিজ অঞ্চলে "গুরুজী" বলিয়াই আখ্যাত হইতেন।

টোলের পড়ুয়াগণ তাহাদের অধ্যাপকের কাণ্ড দেখিয়া মাঝে মাঝে অবাক্ হইয়া যাইত। একদিন ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন "ঘরে চা'ল বাড়ন্ত হইয়াছে"। কৃষ্ণচরণ একটী কপর্দ্দকের সংস্থানও নাই দেখিয়া একখানি শিষ্য প্রদত্ত গঙ্গাজলী শাল আনিয়া ভৃত্য পেলারামকে দিয়া বলিলেন "যাত বাবা পেলু, আজিকের দিনের সদায়টা কিনে নিয়ে আয়।

পেলুবাবা যখন দশটি টাকার সদায় করিয়া বাকী শালের মূল্য নিজের ট্যাকে গুঁজিয়া ফিরিয়া আসিত গুরুজী একবারও জিজ্ঞাসা করিতেন না যে শালই বা কত বিক্রী হইল, কি ইবা ঝিচিল, আর কি ইবা খরচ হইল।

তারা প্রকারান্তরে কথাটা অধ্যাপকের কানে তুলিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন "বাবারা খরচ চলিয়া যাইতেছে এইত বেশ। "জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।" অত ভবিষ্যৎ ভাবিলে ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়। শিষ্যেরাই শালখানা দিয়াছিল আবার প্রয়োজন হইলে ভগবান তাহাদের দ্বারাই দেওয়াইবেন।"

টোলের পড়ুয়াগণ কেবল কৃষ্ণচরণের কাছে শুষ্ক ন্যায়ের ফাঁকি ও কচ্‌কচি ছাড়া সময় সময় অধ্যাপকের জীবন্ত বিশ্বাসের উদাহরণ দেখিয়া নিজ নিজ মনে ভগবানের একটা প্রত্যক্ষ স্বত্বা অনুভব করিত। আর সুদূর গৃহ হইতে আসিয়া অধ্যাপকের গৃহে তাঁহার ব্রাহ্মণীর মাতৃতুল্য স্নেহের ভিতর দিয়া আড়ম্বর হীন শ্রদ্ধা প্রদত্ত সফেন অন্নের ভিতর একটা অমৃতের আস্বাদ পাইত। এইপ্রকার আড়ম্বর বিহীন নিভৃত পল্লী দেশে সুগভীর প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় বিকার হীন কৃষ্ণচরণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকেই নিজের সাধনা করিয়া নীরবে পরপারের প্রতীক্ষায় দিনগুলি গণনা করিয়া যাইতেছিলেন।

সে দিনটা ছিল শিব চতুর্দ্দশী। শিবরাত্রি উপলক্ষে যে কেবল কৃষ্ণচরণই উপবাসী ছিলেন এমন নহে। তাঁহার টোলের ছাত্রগণও উপবাসী থাকিয়া শিব পূজার আয়োজন করিতেছিল। কেহ বা বিল্ব-পত্রান্বেষণে গ্রামে বাহির হইয়াছে, কেহ কেহ বা এঁটেল মাটী দ্বারা শিব রচনা করিতেছিল। অকৃত্রিম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত সকলেই কোন না কোন একটা পূজার অনুষ্ঠানে লাগিয়া গিয়াছে। পর্ব্বোপলক্ষে টোলে অপঠন।

কৃষ্ণচরণ প্রাত্যহিক নিয়মের উপরে আজ তাঁহার পূজা আহ্নিকের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন, মণ্ডপ গৃহে শিব পূজায় ধ্যানমগ্ন কৃষ্ণচরণ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন 'হেই পণ্ডিত তোমকো নায়েব বাবু হুজুরমে খাজানাকো আস্তে আবি বোলায়া'।

কৃষ্ণচরণ বুঝিলেন জমিদারের নায়েব খাজনার তলব দিয়া জনৈক খোট্টা বরকন্দাজ পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণচরণের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া জানাইয়া দিলেন যে তিনি যাহাই হউক অদ্যই একটা মীমাংসা নায়েব বাবুর সহিত করিবেন। তেলে ভিজান নূতন নাগরাই জোড়ার মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে বরকন্দাজটা অন্তর্ধান করিল।

পূজান্তে কৃষ্ণচরণ বাহিরে আসিলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া পড়ুয়াগণ একটু শঙ্কিত হইল। তাহারা তাহাদের অধ্যাপককে বহু দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে কিন্তু এরূপ কোনও দিনত, দেখে নাই। স্থির প্রশান্ত সমুদ্র আজ হঠাৎ উদ্বেলিত কেন?

কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণচরণ সার্ব্বভৌম তাঁহার জনৈক ছাত্রকে ডাকিলেন। একখানা পত্র দিয়া বলিলেন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যেন তাহা নায়েবকে দিয়া আসে।

সদরের নায়েব মফঃস্বলে আসিয়াছেন, কাছারী গুলজার। যে প্রকারেই হউক "রেন্ত" সদরে পাঠাইতে হইবেই, নতুবা মনিবের "গোঁসার" যথেষ্ট ভয়। হিসাব পরিষ্কার জন্য নিরীহ রায়ত ছাগল, ভেড়া, গরু বেঁচিতেও কসুর করিতেছে না। সদর নয়েব মহাশয় মধ্যাহ্ন সুনিদ্রার পর রাস্তার দিকে চাহিয়া আছেন—কোনও রায়ত আসিতেছে কিনা; বিশেষতঃ কৃষ্ণচরণ সার্ব্বভৌমের টাকাটা এই বৈকালেই পাইবার কথা।

ভজুয়া চাকরটাকে গড়গড়ার আগুনটা আরও একটু উস্‌কাইয়া দিবার জন্য নায়েব মহাশয় ডাকিতেছিলেন; এমন সময় একটী যুবক একখানা পত্র আনিয়া নায়েব মহাশয়কে দিলেন। নায়েব মহাশয় একটুখানি ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন—

পরম শুভাশীর্বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ:—স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জোতটুকু দিয়াছিলেন তাহার বকেয়া খাজানা আদায় জন্য সকালে আপনি বরকন্দাজ পাঠাইয়াছিলেন। জোতটার খাজানার বন্দোবস্তের একটা রফা করিতেছি তাহা জ্ঞাতান্তে আপনি তন্মত ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।

সমস্ত সকালটা আমি একটা সমস্যার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। যমরাজ যে দেবতার ভয়ে মার্কণ্ডকে লইতে পারিয়াছিলেন না, সেই দেবতার পূজায় নিরত আমাকে আপনার সামান্য একটা বরকন্দাজ

ডাকিয়া তাঁহার পূজা বিঘ্ন করিতে পারিল কোন্ সাহসে? আমার সমস্যার মিমাংসা হইয়াছে—ইহা দেবতারই শিক্ষা। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দারিদ্র্যই আমার বরেণ্য। আগামী কল্যের জন্য সঞ্চয়ের চিন্তা না করিয়া ভগবানে আত্ম-নির্ভরই আমার ধর্ম্ম। বাড়ীতে শাক পাত যা হয় তাহাই আমার যথেষ্ট, তেঁতুল গাছের কচি পাতাও সুখাদ্য। এক মুঠো চা'ল—তাহা ঠাকুর নিজ সেবার জন্য নিজেই যোগাড় করিতে পারিবেন।

আমার বিনীত প্রার্থনা আপনাদের দত্ত জোত আমি সানন্দচিত্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি। ইহা দ্বারা যে কোন ব্যবস্থা করিয়া আপনাদের প্রাপ্য টাকার যে কোন বন্দো-বস্ত করিয়া লইবেন। ঐহিক দিন যাপনের পক্ষে আমার সামান্য ব্রহ্মোত্তর বাস্তুই যথেষ্ট।

ইহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ-চরণের নাতি নাতকুড় অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে। জমিদারের বর্ত্তমান দেওয়ান কৃষ্ণচরণেরই পৌত্র। জমিদারীর কাগজ ঘাটিতে ঘাটিতে যখন সে তাহার পিতামহের পরিত্যক্ত বিষয়ের বর্ত্তমান আয় দেখে তখন সে ভাবে, "ঠাকুর্দা কি সেন্টিমেণ্টালিষ্টই (ভাবপ্র ছিলেন, এতবড় একটা বিষয় সামান্য কারণে ত্যাগ করিলেন।"

শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী বি, এ।

অবান্ধব।

(মাতৃকা ছন্দে)

যার কেহ নাই এ সংসারে
আপন তাহার বিশ্বজুড়ে,
শান্তিকুটীর হর্ম্ম্য তাহার,
সোণায় গড়া পাতার কুড়ে।
গৃহে গৃহে জননী তার,
ভাই বোনের ত নাই গণনা,
পিতার স্থানে বিশ্ব-পিতা,
নাইবা থাকুক তার ললনা।
বকুল গোলাপ নন্দন্ তার
তনয়া তার শিউলি বেলী,
কতই কথা কয় মল্লিকা
পারুল পলাশ যুঁই চামেলী।
কুমুদ কহ্লার অরবিন্দ
গন্ধরাজের হাসির ভাষা,
চিত্তে তাহার নৃত্য করে
মিটায় শত গন্ধ আশা।
নীপ-শিহরণ পুলক জোগায়
মর্ম্মে মর্ম্মে পরশ ক'রে,
ফুলগাছের ঐ স্বর্ণলতা
কোল দেয় তায় সোহাগ ভরে।
মধুর মলয় মূর্চ্ছনা তার
কর্ণে ঢালে কতই মধু,
মর্ম্মরিয়ে মৃদুল বায়ে,
পর্ণপুঞ্জ বল্‌ছে "বঁধু"।
লক্ষ যোজন সুদূর হ'তে
চন্দ্রমা তার অধর চুমি,
কী যে পাগল করে তারে
স্বর্গ করে মর্ত্ত্য ভূমি।
তারকার ঐ তরুণ হাসি
তাহার হাসির ঝরণা ছুটায়,
বিশ্বেরি আনন্দ যত
তাহার প্রাণে আত্ম লুটায়।
ভৃঙ্গ বধূ গুঞ্জরিয়া,
কুঞ্জ পানে যায় যেখানি,
সঙ্গ মাগে, যার কেহ নাই
সিন্ধু পানে কল্লোলিনী।
কুঞ্জলতা কুঞ্জ রচি
বদ্ধ করি রঙ্গপুরে,
নির্জ্জনে তার মর্ম্মকথা
গুঞ্জে নীরব কথার সুরে।

স্বপ্ন রাজ্য সৃষ্টি করে,
সপ্ত বর্ণ ঐ রভসে,
শান্তি-নির্ঝর পরছে ঝরি,
বাদ্‌লা রাতে কী হরষে!
ঊর্ম্মি-মুখর সিন্ধুরাণী,
ডাক্‌ছে তারে লহর তুলি,
নিভৃতে আর সৈকতে মোর
আঁধার রাতের ঘুম্‌টা খুলি।
নীল নভসে বলাকা-সার
বিষ্ণু-কণ্ঠে শ্বেত উপবীত,
মুগ্ধ করে নেত্র তাহার
চিত্তে জাগায় ঘুমন্ত গীত।
গোধূলির ঐ দীপ্ততারা
সন্ধ্যা-বাতি জ্বালায় চিতে,
গন্ধে হৃদি পূর্ণ করে,
ভাবের ধূপ আর ছন্দঃ গীতে।
কল্প-সখী সঙ্গিনী তার,
নিত্য শুনায় কতই কথা,
জিজ্ঞাসিলে হয় মুখরা
উত্তরে তার নাই অন্যথা।
সহচর তার স্বাধীন পবন
স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষে,
"অধীনতা পাপের বোঝা"
গর্জ্জি কহে দারুণ রোষে।
এম্‌নি যত অনুরেণু
চতুর্দ্দিকে দিচ্ছে সাড়া,
আত্মীয় তার বিশ্ব জুড়ে,
হোক্‌ সে যতই লক্ষ্মীছাড়া।
যার কেহ নাই এ সংসারে—
এই কথাটা ভাবছে যারা,
কে বলে তার নাইকো কেহ,
প্রাণের অধিক আপন তারা।

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

গীতি-কবি এবং গীতি-কবিতা।

গীতি-কবিতা নানা মানসিক অবস্থার (Mood) মধ্য দিয়া গীতি-কবির নিজেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

কবি সৃষ্টি করেন; গীতি কবি প্রকাশ করেন। কবি যেখানে স্বভাবের শোভাকে ফুটাইয়া তুলিতে চান, গীতি-কবি সেখানে সেই শোভাদর্শনে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাই বর্ণন করেন।

কবি আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া শুধু তাঁহার সৃষ্টিকেই সম্মুখে উপস্থাপিত করেন; গীতি-কবি নিজের উপরেই সমস্ত আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করেন।

জগতের সমগ্র নর নারী চরিত্র লইয়াই কবির খেলা। গীতি-কবি তাঁহার নানা কবিতার ভিতর দিয়া শুধু একটী মাত্র চরিত্রকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন—সেটি তাঁহার নিজের।

যে ভাব সার্ব্বজনীন নহে, যাহা তোমার নিজের স্বভাবের রঙ্গে রঙ্গীন্‌ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তাহাকে আমি ঠিক তোমার মত সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া গ্রহণ না-ও করিতে পারি। তাই গীতি-কবিতায় ছন্দ ও ভাষার এত বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্য।

আমিত্ব প্রবল না হইলে, আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইতে না পারিলে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা লেখা অসম্ভব।

কবিতা প্রকৃতিরই নূতন রূপ সৃষ্টি (Creation), গীতি-কবিতা তাহারই ব্যাখ্যা (Interpretation)।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

গ্রন্থ সমালোচনা

পারস্য প্রতিভা—মৌলবী মহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্‌ এম, এ, বি, ল প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹

পারস্য প্রতিভা ইংরেজী গ্রন্থাদির ছায়াবলম্বনে লিখিত হইলেও গ্রন্থকারের লিপিকুশলতার গুণে ইহা বেশ সুখ পাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত পারস্যের অমর কবি ফের্দ্দৌসী, হাফেজ, অমর খৈয়াম, সাদি ও জালাল উদ্দীন রুমীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি পুস্তক খানি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আদরণীয় হইবে।

অভিভাষণ।

আনন্দমোহন কলেজের সারস্বত সম্মিলনে পঠিত।

সারস্বতগণের সম্মিলন ও ভাবের আদান প্রদান যে আত্মীয় শক্তি সঞ্চয়ের একটী প্রকৃষ্ট উপায়—তাহা আজ কাল এ দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; সেজন্য আজ দিকে দিকে সাহিত্য সম্মিলনের সাড়া পড়িয়াছে। বাংলার বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মিলিত হইবার সুযোগ প্রথম করিয়া দিয়াছিলেন, বঙ্গের তদানীন্তন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল্। ১৮৭৫ সালে স্যার রিচার্ড তাঁহার 'ম্যেটাসে' একবার ও 'বেলভেডিয়ারে' আর একবার কলিকাতার সাহিত্যিক মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া প্রতীচ্য ভাবে এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। অতঃপর বাংলার সিভিলিয়ান বহু ভাষাবিদ বিম্‌স্ সাহেব বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ স্থাপনের এক অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার পন্থা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিম্‌স্ সাহেবের উদ্দেশ্য অন্তর্বিধ হইলেও এই সকল প্রচেষ্টায় বাঙ্গলার সাহিত্য সমাজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে একটু বেশী পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল এবং একটু বেশী উন্নত হইয়াও চলিয়াছিল এবং সেই জন্যই বোধ হয় বাঙ্গালা সাহিত্য আজ বিশ্ব সাহিত্যের বৈঠকে স্থান পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালায় সাহিত্য-সম্মিলন চেষ্টা রাজপুরুষগণই প্রথম করিয়াছিলেন। বিম্‌স্ সাহেবের অনুষ্ঠান পত্র প্রচারের পূর্ব্বেই কলিকাতায় 'কলেজ রি ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মফঃস্বলেও অনুরূপ সমিতি স্থাপিত হইয়া তাহাতে প্রবন্ধ ও কবিতাদি পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু মফঃস্বলে সাহিত্য-সম্মিলনের চেষ্টা বোধ হয় তত প্রাচীন নহে।

মফঃস্বলে সাহিত্য-সম্মিলনের চিন্তা প্রথম স্ফুরিত হয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের মনে। দক্ষিণা বাবু বিশ্বপর্য্যটক স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর সহযোগে মুর্শিদাবাদে এক সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিবার কল্পনা করেন। নানা কারণে তাঁহাদের কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৩০৩ সালে এই নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়; এই অধিবেশনের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে এক সাহিত্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার ও স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় উক্ত সাহিত্য প্রদর্শনী জয়যুক্ত হইয়াছিল। অমর বাবু এই প্রদর্শনীর সংস্রবে ময়মনসিংহে সারস্বত সম্মিলনের উদ্যোগ করেন। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ সেই প্রস্তাবিত সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণে স্বীকৃতি প্রদান করেন। 'সমবায়' নামে তাঁহার অভিভাষণ পঠিত হইবে বলিয়াও বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈবাধীন রবীন্দ্রনাথ আসিতে পারিবেন না—টেলিগ্রাম আসায় সেই সম্মিলনের কল্পনাও পণ্ড হইয়া যায়। ইহার পর বরিশালের সাহিত্যিকগণ বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনের বৈঠক উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনের যে আয়োজন করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক সংস্রবে তাহাও পণ্ড হইয়া যায়। অবশেষে কাশিমবাজারের স্বনাম ধন্য মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কাশিমবাজারে সম্মিলনের উদ্যোগ হয়। ইতিমধ্যে মহারাজার পুত্র বিয়োগ ঘটে, সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তিত হয়। এই রূপে পুনঃ পুনঃ নিষ্ফলতার ভিতর দিয়া আসিয়া বাঙ্গালার সারস্বতগণের প্রথম সম্মিলন কাশিমবাজারেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই বাঙ্গালার সারস্বত সম্মিলনের সূচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সম্মিলন যে সুফল প্রসব করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহের সাহিত্যচর্চ্চার ইতিহাসে খুব বিরল নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ময়মনসিংহ গীতিকা, কবি গঙ্গানারায়ণ রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণের আবিষ্কার ও আলোচনা, দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা আবিষ্কার প্রভৃতি তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আমরা এই সুযোগে এই তিনটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থলে বিবৃত করিব।

১৩১৮ সালে এই নগরে এই কলেজ প্রাঙ্গনে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল, সেই অধিবেশনের সম্পাদক রূপে আমার উপর অন্যান্য অনেক কার্য্যের সহিত ময়মনসিংহের পল্লি-সাহিত্য উদ্ধারের এবং পল্লি-বিবরণ সংগ্রহের ভারও অর্পিত হইয়াছি।। সেই ভার গ্রহণ ও কার্য্য সম্পাদনের জন্যই শ্রীমান চন্দ্রকুমার দের সংগৃহীত এই "ময়মনসিংহ গীতিকা"। "সৌরভ"

পত্রে চন্দ্রকুমারের এই পল্লি-সাহিত্য গুলি প্রকাশিত হইলে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রণেতা রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ এখন ডি, লিট্ এই চন্দ্রকুমারের সাহায্যে সেই সকল পল্লি-গীতি উদ্ধারে সচেষ্ট হন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে থাকে। ফলে লর্ড রোণাল্ডসের পৃষ্ঠ-পোষকতায়, দীনেশবাবুর প্রযত্নে এবং কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্যে সেই সকল গীতি-সাহিত্য "ময়মনসিংহ গীতিকা" নামে আজ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় "Ballads of Mymensingh" নাম দিয়া ঐ সকল গীতিকার এক ইংরেজী অনুবাদও প্রচার করিয়াছেন, তাহার ফলে ময়মনসিংহের পল্লি-সাহিত্য আজ জগতের মনীষী মণ্ডলীর আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু ভাষাবিদ ফরাসী মহিলা শ্রীমতী ষ্টেলা ক্রামরিশ এই বেলেড্স পড়িয়া লিখিয়াছেন—"জগতের যত ভাষার গীতি-সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় আছে—এমনটী আমি আর কোন ভাষার ভিতর পাই নাই।"

লর্ড লিটন এই মন্তব্য পাঠ করিয়া দীনেশ বাবুকে ময়মনসিংহ বেলেড্সের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং অর্থ সাহায্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। দীনেশবাবুর চিঠি আজ আমাদিগকে এই সুসমাচারই প্রদান করিতেছে।

দ্বিতীয়—ভাস্কর পরাভব বা মহারাষ্ট্র পুরাণের আলোচনার কথা। ১৯০৫ সালে এই নগরে যে সাহিত্য প্রদর্শনী হইয়াছিল সেই প্রদর্শনীতে আমরা বহু প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ঐ সকল হস্ত লিখিত পুঁথির মধ্যে কয়েক খানা—অমূল্য পুঁথিও ছিল; তাহারই একখানা এই ভাস্কর পরাভব বা মহারাষ্ট্র পুরাণ। ইহা একখানা ইতিহাস গ্রন্থ। মহারাষ্ট্র বীর ভাস্কর পণ্ডিতের বাঙ্গালা আক্রমণ ইহার বিষয়। ইহার রচয়িতা গঙ্গানারায়ণ দেবের নিবাস কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ধারীশ্বর গ্রাম। গ্রন্থকার জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেবদিগের হিসাব নিকাশ কর্ম্মচারীরূপে যখন মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালার সেই ভয়াবহ উৎপাত—"বর্গীর হাঙ্গামা" সংঘটিত হয়। গ্রন্থকার নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাই তিনি পদ্যে বিবৃত করিয়া গ্রন্থাকারে লিখিয়াছিলেন।

আমাদের প্রস্তাবিত সাহিত্য সম্মিলন—১৯০৫ সালের প্রাদেশিক সম্মিলন ও সাহিত্য প্রদর্শনীর সহিত—হইতে না পারিলেও সাহিত্য প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এই অমূল্য গ্রন্থ গুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যখন ময়মনসিংহের অনুকরণে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সাহিত্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিলেন, তখন আমাদের প্রদর্শিত ভাস্কর পরাভব প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থগুলি এখান হইতে নেওয়াইয়া তথাকার প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিলেন। এবং ভাস্কর পরাভব সম্পূর্ণ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিলেন। ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ঐতিহাসিক মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। অধ্যাপক স্বর্গীয় J.N. Das. আমার নিকট ঐ গ্রন্থের বিবরণ জানিতে চাহিলেন। অতঃপর তিনি "An Eighteenth Centuary Mss." শীর্ষক ধারাবাহিক বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত করেন। উহা Indian Daily News পত্রে, কলিকাতা রিভিউ পত্রে এবং ঢাকা রিভিউ পত্রে যথাক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন বাঙ্গালার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকের মহারাষ্ট্র আক্রমণের অধ্যায় নূতন করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে সম্পূর্ণ ভাস্কর পরাভব গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়—চন্দ্র-দ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা। আমরা দনুজমর্দ্দন দেবের নামাঙ্কিত যে কয়টী মুদ্রা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনের সময়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিয়াছিলাম ঐ মুদ্রাগুলি এখন ঢাকা মিউজিয়মে গচ্ছিত আছে। মিঃ ষ্টেপল্টন ঐ গুলির আলোচনায় বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্নেহাস্পদ শ্রীমান নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঐ গুলির আলোচনায় আর এক নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রীফিথ পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আপাততঃ এই তিনটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াই আমি অতি গর্ব্বের সহিত বলিতেছি এগুলি ময়মনসিংহের

সাহিত্যিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গুলির সফলতার নিদর্শন।

আজ ময়মনসিংহের যে দিকে দিকে সাহিত্য চর্চ্চার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহা সময়ের শুভ-লক্ষণ। গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলন, মুক্তাগাছা অয়োদশী সম্মিলন, কিশোরগঞ্জ কিশোর সম্মিলন—আজিকার এই ছাত্র সম্মিলন—ইহাদের সকল গুলিরই প্রয়োজনীয়তা আছে—উপকারিতা আছে। এই সকল সম্মিলন সাহিত্য পিপাসু ব্যক্তিগণের সাময়িক আবেগ অথবা হুজুগের ফল হইলেও, সে ফল হইতে যে বীজ অঙ্কুরিত হইবে, তাহা অবহেলার সামগ্রী হইবে না; হইতে পারে না।

সাহিত্য চর্চ্চায় ময়মনসিংহ আজ তাহার যে সম্পদ জনসমাজে উপস্থিত করিয়াছে—বোধ হয় বাংলার অন্যকোন জিলাই এত খানি সম্পদের পরিচয় দিতে পারে নাই, ইহা ময়মনসিংহের প্রকৃতই গর্ব্বের কথা।

আজ আমাদের স্নেহাস্পদ ছাত্রগণ এই যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন, ইহা যদি স্থায়ী হয় তবে কালে যে ইহা হইতেও এমনতর ফলই প্রসূত হইবে, ইহা সুনিশ্চয়। এই সম্মিলন যদি ইহার পর না-ও হয়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আজকার এই অনুষ্ঠানের স্পন্দন হইতে যে দুটী চারিটী চিত্তে অমৃত সিঞ্চিত হইবে তাহা হইতেই বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ হইবে—ময়মনসিংহের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। ভগবান এই শুভানুষ্ঠান জয়যুক্ত করুন।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

কালো মেয়ে।

মেয়েটি কালো, খুব কালো। নাম কিন্তু তার' গৌরী। কালো হবে ভয়ে ঠাকুরমা নাম রেখেছিলেন গৌরী। নামের জোরে যদি উৎরে যায়।

তা' কি হয়! গৌরী ক্রমেই কালো হ'তে লাগ্‌ল। মা ডাক্‌তেন পেঁচি। রাগ হলে ডাক্‌তেন কাল্ পেঁচি। পাড়াপড়সীরা ডাক্‌ত কালী। কেবল বাবা আদর করে ডাক্‌তেন কালিন্দী।

গৌরী বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। খাওয়া কমিয়ে দেওয়া হ'ল; তবু তা'র কাল রূপে কান্তি এল, কাজল চোখ উজল হ'ল। মায়ের বকুনি বাড়্‌ল, বাবার ভাব্‌না সুরু হ'ল।

কালো মেয়ের সকল কাজেই দোষ। আর তা'র দোষের জন্য দায়ী তার কাল রঙ্।

সে ফর্সা কাপড় পর্‌লে সকলে বলে "যে ছিরি, তার আবার বাবু গিরি!" এলোচুলে থাক্‌লে বলে "আহা! যেন শেওড়া গাছ থেকে নেমে এলেন।" কি কর্‌লে যে তা'কে মানাবে সে তা' বুঝেই উঠ্‌তে পারে না।

এ রকমে চা'র দিক থেকে ঘা খেতে খেতে তা'র মন শামুকের মত মুস্‌ড়ে গেছে। সে যেন সবার কাছেই অপরাধী। সে নিজকে জগতের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়। কেউ তা'র দিকে তাকালে সে ভাবে আমাকে দেখ্‌ছে; সইতে না পেরে সরে যায়।

সন্ধ্যায় তুলসী তলায় ছোট প্রদীপটি জেলে দিয়ে পৈঠায় বসে আন্‌মনে আকাশ পানে চেয়ে ভাবে—আকাশওত কাল, ও যখন জোছ্‌না ধোয়া শাদা মেঘের শাড়ী পরে, ওকেত কেউ কালো বলে না।"

মা'র ধমকে চম্‌কে চায়।

সকালে জল আন্‌তে গিয়ে ঘাটে বসে আন্‌মনে ভাবে 'তাল পুকুরের নীল জল গাছের ছায়ায় কালো হয়ে যায়, একেত কেউ কালো বলে না।'

জল আন্‌তে দেরী হয়; মা বকে।

বিয়ের বয়স উৎরে যায়। বাবার মাথায় ঘাম পায়ে পড়্‌ল। অনেক খোজা খুজির পর বর জুটল; তারা দেখ্‌তে এল। কালো দেখে ফিরে গেল।

মায়ের গঞ্জনা, বাপের শুক্‌নো মুখ, পাড়াপড়সীর ফিস্‌ফিসানি গৌরীকে মুস্‌ড়ে ফেল্‌ল। সারাদিন কিছু খেলোনা, পড়ে রইল। বাবা সইতে গেলেন, মা বল্‌ল "ভয় নেই, ও মেয়েকে যমেও ছোঁবে না!"

সারা রাত গেল। ভোরে পাড়ার লোক কান্না গোল শুনে ছুটে এসে দেখে রান্না ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। গৌরী মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে।

ধরাধরি করে বাইরে এনে দেখে, গৌরী আর কাল নেই, তার সারা গা রাঙা হয়ে গেছে।

পাখী ডেকে উঠ্‌ল, কালো আকাশ অরুণ কিরণে লাল হয়ে গেল।

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

আনন্দমোহন কলেজের সারস্বত সম্মিলনে পঠিত।

নিদাঘ ও বর্ষা।

শ্মশানের প্রজ্বলিত চিতাগ্নির মত নিদাঘের প্রখর আতপে যখন বিশ্বদেহ দগ্ধ হতে থাকে, আকাশে বাতাসে দিকে দিকে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন অশান্তি ও যাতনার আর অন্ত থাকে না।

তৃপ্তি স্বস্তি ও সজীবতার কণাটুকুও জগতে দুর্ল্লভ হয়ে পড়ে—দীনা, মলিনা খিন্না ধরণীর দগ্ধতাম্র প্রতিমূর্ত্তি অন্তরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় একটা বিষাদেরই মিড় টেনে দ্যায়।

গ্রীষ্মের এ পরিম্লান শ্রী আমাদের চির পরিচিত। প্রসন্নসলিলা প্রবাহিনী ক্ষীণ স্রোতে বইছে—হ্রদ তড়াগ শুষ্ক, শীর্ণ দীর্ঘিকার ভরা বক্ষে কঙ্কাল পঙ্‌ক্তির মত দীর্ঘ সোপানশ্রেণীই শুধু বাহির হয়ে পড়েছে। অপূর্ণতার নগ্ন দৃশ্য নিয়ে খিন্ন চরাচর আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

শস্যশূন্য প্রান্তরে পুষ্পরাজি পিঙ্গলছবি ধারণ করে, যোজনের পর যোজন বিস্তৃত হয়ে রয়েছে,—নাই তার সেই হরিৎ শোভা, সেই সুশ্যাম সজীবতা, সেই প্রাচুর্য্যের ঐশ্বর্য্য।

বিপিনে বিপিনে শুষ্ক-পর্ণ-পাদপ জীর্ণ গলিত শাখা প্রশাখা ঊর্দ্ধে প্রসারিত করে, কোন নিরুদ্দেশের আর্ত্ত অভিলাষে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কোথায়—তার সেই তারুণ্যের কোমল লাবণ্য,—সেই বিচিত্রা কুসুমিতা সমৃদ্ধি,—সেই মুকুলিত কিশলয় সম্ভার!

অবসাদ, অতৃপ্তি ও অনৈশ্বর্য্যের মর্ম্মান্তিক হাহাকার নিয়ে, বিশ্বের অন্তরবাসিনী কোন্ তপস্বিনী শিবৈকশরণা তপঃপরায়ণা উমার মত, নিমীলিত-নয়ন-পল্লবে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, নির্ব্বাক্ অধরে, ধ্যানাসনে আসীনা? কার একাগ্র প্রতীক্ষায় তাঁর কত দুঃখতপ্ত দিন ও বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হচ্ছে? কার সিংহাসন তলে তাঁর বেদনাতপ্ত আকুল ক্রন্দন মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হচ্ছে?

হিমাচলের মত বিপুল মৌন ভঙ্গ করে, বাঞ্ছিতের ত্রিলোকপাবনী সুরধুনী সদৃশ কৃপাধারা অযুত ধারায় ঝরতে লাগল। স্নিগ্ধ-মঙ্গল নির্ঘোষে সজল জলদ স্বর্গের আশ্বাস বহন করে, ঘন ঝঙ্কারে, মর্ত্ত্যে দিব্যবাণী মন্ত্রিত করে, দিয়ে গেল—ভরে গেল লজ্জানম্রা ধরা—কূলে কূলে প্লাবিত হল। নির্ম্মল শীতল স্নানে নিখিলের অখিল দাহ জুড়িয়ে গেল—আকণ্ঠ অমৃত পানে প্রকৃতির অধীর পিপাসা মিটে গেল—ফিরে পেল সে তার নবীন যৌবন, তার সুপ্ত সম্পদ্, তার হারানো সমৃদ্ধি, সবুজ ঐশ্বর্য্যের অপর্য্যাপ্ত বিকাশে দিকে দিগন্তে সে সার্থক হয়ে উঠ্‌ল।

বাহিরে ও অন্তরে নিদাঘ ও বর্ষার এ চিরন্তন চিত্র আমরা দেখেছি। জীব যখনি ত্রিতাপে দগ্ধ হয়ে, আধি ব্যাধির জ্বালায় আকুল হয়ে, পাপের খরতাপে জ্বলে, পুড়ে, একান্ত নিষ্ঠায় ঊর্দ্ধের শরণাপন্ন হয়, তখনই আসন্ন আনন্দের কলধ্বনিতে অন্তর আকাশ আপূর্ণ করে, করুণার সান্দ্রবর্ষা নেমে আসে।

পুণ্য স্নানাভিষেকে তাকে শুচি-স্নিগ্ধ করে দ্যায়,—শুষ্ক হৃদয়ে তার লাবণ্যের হিল্লোল, অমৃতের লহরী লীলায়িত হয়ে যায়—মলিন দীন আধারের কুরূপ ঘুচিয়ে সে সুরূপ ও স্বরূপ লাভ করে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

গৌরীপুর পূর্ণিমা-সম্মিলনে পঠিত।

নব্য কবিকুলের প্রতি।

জাগো, নব্য কবিকুল, স্বজাতির সৌভাগ্য-নির্ম্মাতা!
বহাও নূতন খাতে তীব্র বেগে কবিতার ধারা!
সাম্য-সাম গাহো আজি, নর নারী হোক্ মাতোয়ারা!
না জাগিলে জনগণ ছাই ভস্ম কেন লেখো যা'তা'!
করুণা যতীন্দ্র চুপ, কালিদাস মাসিকের ত্রাতা।
কুমুদ দিতেছে আশা, সাবিত্রী কি হবে আত্মহারা?
গণতন্ত্র প্রচারিতে হেমেন্দ্র যে তুলেছিল সাড়া!
মোহিত প্যারীর কণ্ঠে ধ্বনিতেছে অতীতের গাথা!

চণ্ডীচরণের গানে ফোটে পল্লী-সৌন্দর্য্যের ছবি!
শ্রীপতি ও পরিমল আত্মপ্রেমে রহে উদাসীন!
আত্মম্ভরী স্বজাতিরে জাগাইছে নজরুল কবি।
ক্লান্ত দেবকুমারের প্রমথের থামিয়াছে বীণ!
ভাগ্যে আজো মৃত্যু-ভয়ে কবিগুরু গাহে না পূরবী!
লিখো না, লিখো না আর বাজে কথা উদ্দেশ্য বিহীন!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য সংবাদ।

গত ২৭শে মাঘ সোমবার গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বাগছি বি, এ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভায় বহু প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল। মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের 'গীতিকবি ও গীতিকবিতা', শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ মহাশয়ের 'নিদাঘ ও বর্ষা', কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাশ গুপ্তের 'তেতালা' শীর্ষক তিনটি গদ্য কবিতা, সভাপতি মহাশয়ের 'বর্ত্তমান রুশিয়া', শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্তের 'পরচর্চ্চা', শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'নন্দিনী নান্দী', ও 'ভিতরের ডাক', শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষের 'শাপভ্রষ্টা' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলি সৌরভে প্রকাশিত হইতেছে।

দ্বাদশ অধিবেশন আগামী দোলপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইবে। সাহিত্যপ্রাণ বাণী সেবকবৃন্দেরই সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

গত শারদীয় পূজার পর হইতে মুক্তাগাছার সাহিত্যিকগণও মাসে মাসে সমবেত হইয়া প্রবন্ধাদি পাঠ ও পঠিত প্রবন্ধাদির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রতি শুক্লা ত্রয়োদশীতে তাঁহাদের সম্মিলনের অধিবেশন হয়। মুক্তাগাছার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার ও সুলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা সাহিত্য সম্মিলনের একজন পৃষ্ঠপোষক। সম্প্রতি মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

মুক্তাগাছা চির দিন কমলার সেবায় লিপ্ত থাকিলেও এক সময় ইহা বাণীসেবকগণের কলকাকলীতেও মুখরিত হইয়াছিল। আজ পুনরায় কমলায় বিনোদকুঞ্জে বাণী বন্দনার আয়োজন দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। বরদায়িনী বাণী নবীন সারস্বতগণের শ্রীচেষ্টা জয়যুক্ত করুন।

এবার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজে এক সারস্বত সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ সৌরভে মুদ্রিত হইল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহের যত্ন হইতেছে। যহাদিগের গৃহে প্রাচীন পুঁথিগুলি অনাবশ্যক আবর্জ্জনা রূপে বিরাজমান থাকিয়া উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেছে—তাহারা এই সুযোগে তাহা উপযুক্ত মূল্য লইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়িয়া দিতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেই প্রস্তুত। এইরূপ স্থানে প্রদান করিলে তাহা যে সযত্নে রক্ষিত হইবে ও জাতীয় ইতিহাস সংকলন কালে তাহার উপাদান রূপে প্রযুক্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। যাহারা অর্থ লইয়া এইরূপ পুঁথির স্বত্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহারা "কিউরেটার ঢাকা মিউজিয়াম--রমনা পোঃ ঢাকা" এই ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া পুঁথির বিবরণ জানাইতে ও মূল্য স্থির করিতে পারেন।

ধলার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত সচিত্র "ভারত পথিক সগর" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য দেড় টাকা।

এই সহর হইতে "সংস্কার" নামে আর এক খানা নূতন মাসিক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সংস্কারের প্রথমসংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আশা করি নবীন সহযোগী তাহার নামের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া কর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবেন।

জামালপুরের সুপ্রাচীন মেলা আরম্ভ হইয়াছে। এবারকার মেলায় বিশেষত্ব এই—এবার এই মেলার সংস্রবে একটী সাহিত্য প্রদর্শনীর ও অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে এ জেলার প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি, জেলার নানা স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রা, জেলার ঐতিহাসিক স্থান সমূহের আলোক চিত্র, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত পুরাতন চিত্রিত ইষ্টক ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ প্রদর্শনীতে দেশের ঐতিহ্য সংগ্রহের একটী বিশিষ্ট উপায় তাহা বলাই বাহুল্য।

ত্রয়োদশ বর্ষ। চৈত্র—১৩৩১ তৃতীয় সংখ্যা।

সম্পাদক
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী।

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শৃঙ্খলিত আরণ্য হস্তী।

সৌরভ

ত্রয়োদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩৩১ | তৃতীয় সংখ্যা।

নারী-মঙ্গল।

আজ কাল মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রায়ই এদেশের নারী জাতি সম্বন্ধে নানা কথা দেখতে পাই, এবং এ বিষয়ে মেয়েরাই বেশী আলোচনা করেন; লেখায় সংযমের ভাব বড় কম। কেউ বা লেখেন—আমরা পুরুষদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারলে আর দেশের মঙ্গল নেই। কেউ বা বলেন—রাজনীতি ক্ষেত্রে, বিদ্যায়, যশে, তাঁদের সমকক্ষ হতে না পারলে জন্মই বৃথা। স্বাধীনতার হাওয়া তাঁদের প্রাণে বেশ খেলছে কিন্তু এরূপ উশৃঙ্খলতার নামতো স্বাধীনতা নয়। ভারতের পুরাণ ইতিহাসে আমরা যা দেখতে পাই, তাতে সীতা সাবিত্রীর চরিত্রের মহত্ব কি তাঁদের স্বামীদের চেয়ে কিছু কম ছিল? প্রাণ ঢালা আত্মবিসর্জ্জনের নামই কি দাসীত্ব! এই কলিযুগেই সেদিনও রাজপুতের মেয়েরা যে দৃশ্য দেখিয়ে গিয়েছেন তাতে সে সময়কার ইতিহাসের অর্দ্ধেকটা কি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে না কি? সেই পতিপ্রাণা—জ্ঞানে ধর্ম্মে মহিমায় দীপ্তশ্রী তেজস্বিনী মহিলারা কি শুধু অধীনতারই ফলস্বরূপা ছিলেন! অবশ্য হিন্দুসমাজে অনেক অত্যাচার অবিচার মেয়েদের বিরুদ্ধে চলে আসছে। যে কাঁটা গাছ সমাজের অস্থি মজ্জায় মধ্যে একেবারে শিকড় গেড়ে বসেছে তা তোলার উপায় অনেকটা আমাদের নিজদেরই হাতে; ভিতরে ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করে, তাকে নির্ম্মূল করবার চেষ্টা আমাদেরই করতে হবে, কিন্তু ভিতরটা আবর্জ্জনায় ভরা রেখে শুধু [illegible] চাকচিক্যশালী করে তুল্‌লে সুফলের চেয়ে [illegible] বেশী [illegible] সম্ভাবনা! পুরুষদের চেয়ে পবিত্রতার দরকারও মেয়েদেরই বেশী, কারণ আমরা তো শুধু স্ত্রী নই, মেয়ে নই, আমরা যে মা। এই খানেই নারীকে দেবী হতে হবে। সন্তান যে জননীর মধ্যে এতটুকু ত্রুটী, এতটুকু অপবিত্রতাও দেখতে চায় না; তার আশা—সংযমে নিষ্ঠায় মাতৃত্বের প্রাণ ভরা স্নেহে একদিন হয় তো জননী তার নিজের রক্ত মাংসে গড়া সন্তানকেও পতনের হাত থেকে রক্ষা করে দেবতা করে তুলবে। দেশে স্ত্রী শিক্ষার খুবই দরকার হয়ে পড়েছে কিন্তু যা দিয়ে চললে আমরা পুরুষদের সমান অধিকার না পেয়েও তাঁদের অনেক উপরেই চলে যেতে পারি, আমাদের সেই চিরন্তন সরল সোজা পথ এখন আর বড় একটা কারুরই নজরে পড়ে না। এদেশে গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি অনেক মহীয়সী বিদুষী নারী জন্ম নিয়েছেন। আবার যদি সে রকম স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন দেশে হয়, তবে খুবই সুখের বিষয়, কিন্তু যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রধান করে আজ ভারতীয় পুরুষবৃন্দ দিন দিন নিজদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলছেন, যে শিক্ষার বিষময় সংক্রামক ক্রিয়ার ফলে তাঁদের জীবনীশক্তিরূপিণী নারীকেও রাণীর আসন থেকে পথের ধুলায় টেনে এনেছেন, সেই শিক্ষা যদি মেয়েদের জীবনেও প্রধান হয়ে ওঠে, তাহলে সত্যিই বোধ হয় ভারতের নিজস্ব বিশেষত্ব বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দেশের পক্ষে এর চেয়ে দুর্দ্দিন আর আছে কিনা জানি না। অবশ্য অনেক বিষয়েই আমাদের অধিকার নেই, কিন্তু সত্যই যদি আমরা কোন দিন সে অধিকারের উপযুক্ত পাত্রী হই, সে নিষেধে কিছুই আটকাবে না। বন্যার জল কেউ কোন দিন রোধ করতে পারে নাই—এটা

একেবারেই ঠিক। তার পর আমাদের জীবনের আর একটা দিক যেটাকে আমরা প্রায় সকলেই এখন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ করেছি—সে সব নারী জীবনে প্রধান শিক্ষার বিষয় বলে এখন আর বড় একটা কেউ মনে করেন না; সেই সুশৃঙ্খলায় সংসার চালানো, সুসন্তান গড়ে তোলা, ভাল খাবার তৈরি করা সুন্দর সুন্দর গৃহশিল্প প্রভৃতি কাজও মেয়েদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা এখন একুল ওকুল দুকুল হারাতে বসেছি। সরোজিনী নাইডু হতে পারছেন কজন মেয়ে? কিন্তু ভাল করে বাংলা না শিখেই ফার্ষ্ট বুকের হরিণের গল্প পর্য্যন্ত পড়ে নিজকে মহা শিক্ষিতা মনে করে ধরাকে সরা দেখছেন অনেকেই। ভুলপথে চলে আমরা নিজেদের যে কতদূর নীচে এনে ফেলেছি, তা কেউ দেখছেন না। করুণা মমতা, স্নেহ প্রীতি, ক্ষমা, সৌজন্য সেবা, প্রভৃতি নারীর যে সব স্বাভাবিক গুণ সংসারকে স্বর্গ করে তোলে আমরা তা বাড়াবার চেষ্টা না করে হারাতে বসেছি। স্বার্থ সর্ব্বস্বা, কলহ প্রিয়া, কর্কশ স্বভাবা স্ত্রীলোকই এখন ঘরে ঘরে বেশী দেখতে পাওয়া যায়, ফলে শ্বাশুড়ী, বধূ, ননদিনী, ভ্রাতৃ বধূ এবং যায়ে যায়ে অসদ্ভাব অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে—যখন যাঁর সুবিধা তখন তিনিই অন্যকে নির্য্যাতন করেন, এতেই দেখতে পাই যে পুরুষদের চেয়ে আমরা নিজেরাই নিজদের শত্রুত্ব বেশী করি অর্থাৎ নারীর প্রতি অত্যাচার নারাই বেশী করে থাকে এবং এ সবই শিক্ষার অভাবে সন্দেহ নাই; কিন্তু শিক্ষা দেয় কে? ছেলে মেয়ের মনে সুবৃত্তির বীজ বপন করা মায়ের কাজ। যদি সত্যই কোনো দিন দেশের ঘরে ঘরে সুমাতা গৃহিণী গড়ে তুলতে পারা যায়, তবে সেই দিনই দেশের সত্যিকারের মঙ্গল করা হবে। বহু দিন আগেই কবি গেয়ে গিয়েছেন "তোর না জাগিলে ভারতললনা এভারত আর জাগে না জাগে না" কিন্তু ভারতের নারী আজ যে ভাবে জাগতে যাচ্ছে, এতো তার জাগরণ নয়; এ যে একেবারেই মৃত্যু।

শ্রীবিভাবতী দেবী।

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত।

বাঁশী।

গ্রামের সখের থিয়েটারের ম্যানেজার বাবুর—এখন অধিকারী মশায় বললে দোষ হয়—কাছে এক্‌টারের উমেদার এলেই তিনি আলু কয় প্রকার, আর তা কি কি রসে একট্ করতে হবে তার পরীক্ষা নিতেন। যারা আসতো তারা কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকতো। ম্যানেজার বাবু আর কিছু না বলে তাদের কাউকে বা শুধু খেতে দেওয়া অথবা দু চার খানা কাপড় দেওয়ার প্রস্তাবেই রাজী করিয়ে দলে ভর্ত্তি করে নিতেন। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও হ'ত। কানু কাঁচা মুখ খানি বিষণ্ণ করে বললে "দাদা বড্ড মারে. বৌদি'র বকুনির চোটে ঘরে থাকতে পাল্লুম না—পড়াও হ'ল না, কি করি?" ম্যানেজার আলুর প্রশ্ন না করেই তাকে নিয়ে নিলেন। কোন রকমে দল ভর্ত্তি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, অথচ পয়সাটাও বেশী দিতে না হয়।

দলের কারু কোন আত্মীয় যদি উমেদার হয়ে অসত তা হলে তারা তাকে শিখিয়ে রাখত—বোলো আলু তিন প্রকার, রাঙ্গা আলু, সাদা আলু, গোল আলু। এর একটিংও ত্রিবিধ রসে করা যেতে পারে—বীররসে, করুণ রসে ও হাস্য রসে।

বিমলের অনুরোধে সুরেশ তাকে শিখিয়ে পরীক্ষা দেবার জন্যে ম্যানেজার বাবুর কাছে উপস্থিত করলে। তিনি ডায়মন কাটা কিনারার পেতলের রেকাব থেকে কিছু দোক্তা সংযোগে দুটো পান মুখে গুঁজে, তাঁর অর্দ্ধ-শায়িত বপুটিকে হাতের ভরে একটু তুলে প্রশ্ন করতেই বিমল তাঁর বিরাট ভুরিটির তরঙ্গিত অবস্থা দেখেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক ভয় পেয়ে একটু ঢোঁক গিলে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললে—আলু তিন প্রকার। তারপর একেবারে নির্ব্বাক্। মাথা চুলকিয়ে আড় চোখে সুরেশের দিকে চেয়ে যখন দেখলে সুরেশ অন্যদিকে চেয়ে আছে তখন থতমত খেয়ে বলে ফেললে—ভুলে গেছি।

ম্যানেজার বাবু সবই বুঝতে পারলেন। সুরেশকে ধমকিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—

"ওহে আর একটা নতুন প্রশ্ন ঠিক করে দাও।"

বাড়ী বসে ভাবছি; দূরে শুনলাম কে গেয়ে উঠলো "বাঁশী বাজত বাজত রাধা রাধা।" হঠাৎ মনে হ'ল—পেয়েছি, বাঁশীর প্রশ্নই করা যাবে।

মনে চিন্তার ঢেউ খেলে গেল। আচ্ছা বাঁশীত অনেক প্রকার; এদের বোধহয় চার শ্রেণীতে বিভাগ করা যেতে পারে। প্রথম—যা ঠোঁটের আলগা ফুঁয়ে বাজে; যেমন পুরাতন 'সরল বাঁশের বাঁশী'; নূতনের মধ্যে ফ্লুট প্রভৃতি। দ্বিতীয় যা ঠোঁটের চাপা ফুঁ এ বাজে—পুরাতন সানাই, নূতন ক্লারিওনেট, ওবো প্রভৃতি। তৃতীয় যা গাল ও ঠোঁটের চাপে বাজে—পুরাণো তূরী, ভেরী, তুবরী, শঙ্খ ইত্যাদি; আর নূতনের মধ্যে কর্ণেট, ইউফানিয়াম, ট্রেম্বোন। চতুর্থ—কলের বাঁশী। এ সম্পূর্ণ নূতন শুধু কলেই বাজে। কখনো ভোঁ দেয়, কখনো সিটি মারে।

বাঁশীর তানে গোপিনী মন হারাইত, যমুনা উজান বইত। সাপ হরিণ প্রভৃতি পশুও মুগ্ধ হয়ে আকর্ষিত হয়। পূজা বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কাজে—আবার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদের হৃদয়ে উন্মাদনা আনবার জন্যও বাঁশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রথম তিন রকমের বাঁশী—আদি বীর করুণ প্রভৃতি নানা রসেই বেজে থাকে কিন্তু এ বাঁশী বাজে কোন রসে? বাঁশীর গুণ অনেক কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন এই কলের বাঁশীর গুণ এক মুখে বলা যায় না। এ বাঁশী মনকে কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই বাজে। রেল বা ষ্টীমারের বাঁশী এক ফুঁএ কত লোককে কত ভাবে আপ্লুত করে। যারা যুদ্ধে যাচ্ছে তাদের মনে শত্রু বিনাশের আশা, দেশ ও আত্মরক্ষার গর্ব্ব, আত্মীয় বিচ্ছেদ জনিত কারুণ্য কত কি জাগিয়ে তোলে ঐ বাঁশীর ফুঁ। তীর্থ যাত্রীকগণ তীর্থদেবতার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে ভক্তিভরে গম্ভীরধ্বনি তোলে ঐ বাঁশী শুনে। প্রণয়ী বা প্রণয়িনী প্রিয় দর্শনে যাচ্ছে তাদের আনন্দ, আশা, পীড়িতের সংবাদ প্রাপ্ত, যাত্রীদের উৎকণ্ঠা, যাত্রা, থিয়েটারওয়ালা এবং বরযাত্রীদের মনে ব্যস্ততার আশঙ্কার সঙ্গে ভাবী আমোদের উৎসাহ, উপার্জ্জন কারীদের মনে পয়সার নেশা—এই রকম কত কি আর জাগিয়ে তুলছে ঐ বাঁশী। তারপর মিলের বাঁশী। প্রথম ভোঁ বাজতেই যে যে অবস্থাই থাকুক তাড়াতাড়ি কাজে যাবার জন্যে প্রস্তুত। আবার বাজতেই পিপীলিকার মত জনস্রোত কারখানার দিকে ছুটলো। দিনের শেষে আবার বাঁশী বেজে উঠলো শ্রান্ত অবসন্ন মনের ভিতরও একটু সাড়া পড়ে গেল--কার্য্যাবসানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সকলেই ছুটে বেড়িয়ে পড়ল।

প্রাচীনরা এ বাঁশীর মর্ম্ম মোটেই জানতো না। তখন রেল, ষ্টিমার, পাটের কল, কাগজের কল বা নূতন নূতন বিলাসের উপকরণ তৈরি করবার কল ছিল না। তখন এই সব বিলাস দ্রব্য জোগাতে গিয়ে পেটকে বঞ্চনা করতে হ'তো না। ঘরে ভাত ছিল, খেয়ে দেয়ে হেসে খেলে বেড়াতো; ছোট খাট বিবাদ গ্রামেই মিটিয়ে ফেলতো। কচিৎ কখনো বড় বড় মামলা বা উৎসব, তীর্থ যাত্রায় সময় নৌকা, হাতী, ঘোড়া, পাল্কী প্রভৃতিতে আপন সুবিধা মত চলতো। 'সমবায়ী' সুবিধার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াতে হ'তো না। অবসরের অভাব ছিল না; ঈশ্বরের ভজনায় আত্ম তৃপ্তি হ'তো, রামায়ণ মহাভারত পাঠে মন তৃপ্ত হ'তো, গ্রামোৎপন্ন ভোজনে দেহ তৃপ্ত ও সুস্থ থাকতো।

এখন কলের বাঁশীরই জয়। এই ভারতেই অনেক কল হয়েছে, সেখানে দু তিন লক্ষ লোক কাজ করে থাকে,—যাদের বাড়ী নেই, জমী নেই, রোজ আনে, রোজ খায়। কল গেলে তাদের অনশন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাদের কাছে এ বাঁশী কবির নিকট সুদূর হতে ভেসে আসা মধুর সঙ্গীতের চেয়েও বেশী প্রিয়—বিশেষ ছুটীর ভোঁ যখন বাজে। পৃথিবীর ¼র্থ অংশ লোক আজ এই কলের বাঁশীর পানেই উৎকর্ণ হয়ে আছে।

শ্যামের বাঁশী আর বাজে না; অতি দুঃখেই কবি লিখেছিলেন "একবার বাঁশী বেজেছিল যমুনারি কূলে।" বাজলেই বা কে শুনতে পারে, সবাই বেঁচে থাকার যুদ্ধেই মগ্ন,—"প্রাণ রাখিতেই সদা প্রাণান্ত।" হয়ত এমন দিন আসবে যখন জগতে কলের বাঁশী ছাড়া আর কোন বাঁশীই বাজবে না। যাক্—

উমেদার এলে বাঁশীর প্রশ্নই করা যাবে—আপনারা কি বলেন?

শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত।

রামায়ণী সমাজে বিধবার অবস্থা।

(২)

সুগ্রীবের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুগ্রীবকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননাকারী বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সুগ্রীব বুঝিয়াছিল, এবং বিশ্বাস করিয়াছিল যে, বালি দৈত্য-যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। সুগ্রীব সংবৎসরকালমধ্যে তাহাকে আগমন করিতে না দেখিয়াই তাহার মৃত্যু অনুমান করিয়া বালীর পরিত্যক্ত রাজ্য ও তারাকে গ্রহণ করিয়াছিল। মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করা তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্মের বহির্ভূত হইলে, সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণের প্রথমেই আপনার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে সাহস করিত না। সে তাহার কার্য্য সময়োচিত ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়াই ভাবিয়াছিল, তাই নিঃসঙ্কোচে রামের নিকট বলিয়াছিল—

"রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ।"

কিন্তু বালী ও অঙ্গদের মনে অন্যরূপ ধারণা ছিল; তাই তাহারা সুগ্রীবের আচরণ ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল এবং বালী প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে সুগ্রীবকে এক বস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়া কনিষ্ঠের (সুগ্রীবের) পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিল।

সুগ্রীবের তারা গ্রহণ ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া উক্ত হয় নাই। পরন্তু সুগ্রীব যখন রাম প্রসাদে কপিরাজ্য লাভ করিয়া স্ত্রীগণ সম্ভোগে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিল, এবং লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই আচরণে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার কামিনী-কণ্ঠ-নিনাদিত অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বুদ্ধিমতী তারা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিল—"আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না; সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ নহেন; বিশেষতঃ

"রাম প্রসাদাৎ কীর্ত্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাংমাঞ্চ পরন্তপ॥" ৫।৪।৩৫

রামের প্রসাদেই সুগ্রীব কীর্ত্তি, শাশ্বত বানর-রাজ্য, নিজের পত্নী রুমা ও আমায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

অন্যত্র লক্ষ্মণ তারাকে সুগ্রীব-পত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তারা লক্ষ্মণকে প্রবোধ বাক্য বলিলে লক্ষ্মণ তাহাকে বলিতেছেন:—

কিময়ং কাম বৃত্তস্তে লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ।
ভর্ত্তা ভর্তৃহিতে যুক্তে ন চৈবমববুধ্যসে॥ ৪৩।৪।৩৫

অর্থ—ভর্তৃ হিতকারিণী তোমার পতি সুগ্রীব কামবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম ও অর্থ লোপ করিতে বসিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না?

এই আলোচনায় গৃহীত যাবতীয় শ্লোকই যে অকৃত্রিম তাহা বলিবার উপায় নাই; তথাপি মোটামুটী এই সকল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে রামায়ণের যুগে দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য সমাজে বিধবা ভ্রাতৃবধুর প্রতি দেবরের অধিকার ছিল।

ভারতীয় সমাজে দেবরাধিকার যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিই সমস্বরে ঘোষণা করিতেছে। এই সনাতন রীতি কেবল ভারতীয় আর্য্য এবং অনার্য্য সমাজেই আবদ্ধ ছিল না, সুপ্রাচীন ইহুদী সমাজেও প্রচলিত ছিল।[১৭] সুতরাং বাল্মীকি যে আর্য্য সমাজের সমাজরীতি কল্পনা কুশলতার বলে অনার্য্য সমাজে আরোপ করিয়াছেন, এস্থলে এরূপ চিন্তারও অবকাশ খুব বেশী নাই। তবে এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর প্রতি জ্যেষ্ঠ দেবরের (অর্থাৎ ভাসুরের) যে ব্যবহারের উল্লেখ উপলক্ষে রামের মুখে এবং জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর প্রতি দেবরের যে ব্যবহারের জন্য অঙ্গদের মুখে ধর্ম্ম, নীতির বা স্মৃতির দোহাই প্রদর্শিত হইয়াছে—ঐ দুইটী বিষয়ের মূল নীতি কত প্রাচীন?

ভাসুর-ভাদ্রবধুর মধ্যে যে একটা "গর্হিত" সম্পর্ক স্মৃতি[১৮] কারেরা প্রদর্শন করিয়াছেন বৈদিক সূত্র

---

১৭ Old Testament (আদি পুস্তক ৩৮।৮) পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রাচীন সমাজ বিধির সাদৃশ্যতা প্রদর্শন জন্য এ স্থলে বাইবেলের দেবর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পাঠের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

"যিহুদা ওননকে কহিল তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর ও তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর।"

দেবর প্রাচীন পাশ্চাত্য সমাজেও যে "দ্বিতীয় বর" রূপে গণ্য হইত, বাইবেলের এই উক্তি তাহার পরিচায়ক।

১৮ "স্মৃতি" শব্দটী বৈদিকযুগের কোন গ্রন্থে ব্যবস্থাশাস্ত্র বা সংহিতা অর্থে থাকা আমরা আপত্তাজনক বলিয়া মনে করি। ব্যবস্থাশাস্ত্র গুলি বহু পরবর্ত্তী যুগে যখন সংগৃহীত হইয়া শ্লোকাকারে সংহিতা বদ্ধ

গ্রন্থগুলিতে তেমন গর্ব্বিত ভাব দৃষ্ট হয় না। মনু কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে স্নুষা তুল্যা ও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে মাতৃ তুল্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১৯] রামের ও অঙ্গদের উক্তি এই মনু-বচনেরই যেন পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়। ভাসুর-ভাদ্রবধূর মধ্যে তেমন 'গর্ব্বিত' সম্পর্ক বৈদিক যুগে থাকিলে বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রের ঋষি সে গর্ব্বিত ভাবের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেন বলিয়া মনে হয় না। বসিষ্ঠ-ধর্ম্ম সূত্রকার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোন অপরাধের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন।[২০]

মহাভারতকারও ভাসুর ভাদ্রবধূর সম্পর্কের গুরুত্ব লক্ষ্যের বিষয় মনে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সত্যবতী যখন ভীষ্মের নিকট ব্যাসের নিয়োগ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তখন অম্বিকা ও অম্বালিকা যে সম্বন্ধে তাহার ভাদ্র বধূ এবং ব্যাস ভাসুর হেতু শ্বশুর তুল্য গুরু— এ সম্বন্ধে কোন তর্কই উপস্থিত হয় নাই।

মনুর স্মৃতিতেই আমরা দেবর (ভাসুর) ভাদ্র বধূর সম্পর্কের পার্থক্য বিচার বোধ হয় প্রথম লক্ষ্য করিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, মনু দ্বিজাতিবর্ণের পক্ষে নিয়োগ প্রথাও অবৈধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।[২১] এই ব্যবস্থা উল্লেখিত মহাভারতীয় নিয়োগ ব্যবস্থার বিরোধী ব্যবস্থা। এ অবস্থায় মনুর এই ব্যবস্থাকে মহাভারতেরও পরবর্ত্তী ব্যবস্থা বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

জ্যেষ্ঠ দেবর (ভাসুর) ও কনিষ্ঠ দেবরের পার্থক্য সূত্রকারগণ বা মহাভারতকার করেন নাই বলিয়াই যে এই সম্পর্ক দ্বয়ে কোন পার্থক্য ছিল না, এমন চিন্তাও একদেশদর্শী।

রামায়ণে প্রদর্শিত লক্ষ্মণের চরিত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে পরবর্ত্তী যুগে যে ঠাট্টা করিবার রীতি সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল,[২২] রামায়ণে সে রীতি দেখা যায় না; বরং তাহার বিপরীত রীতিই দেখা যায়। লক্ষ্মণ সীতাকে গুরুবৎ সম্মান করিত বলিলেও বোধহয় অতিশয় উক্তি হইবে না। কেন না, লক্ষ্মণ কদাপি সীতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে নাই; তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদা তাঁহার পদাভিমুখীই থাকিত। অবশ্য কবি এখানে অতিশয় উক্তির সাহায্যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এই সৃষ্টির ভিতর যে দেশ কালের প্রভাব নাই, তাহা বলা যায় না।

রামায়ণেরযুগে নিয়োগ প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেও দেবর ভ্রাতৃজায়ার ব্যবহারিক সম্মানের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সধবা ভ্রাতৃজায়াকে মাতৃ-তুল্যা জ্ঞান করা ও সেই ভ্রাতৃজায়া বিধবা হইলে তাহাকে পত্নীরূপে ব্যবহার করা—যদি একই শাস্ত্রের বিধান হয়, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠান যেমন অসঙ্গত নহে, ঐ প্রথার ব্যভিচার স্থলেও তাহা ব্যভিচার বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। ব্যভিচার ভদ্র ইতর সকল সমাজেই সমান অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। সুগ্রীবকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার পত্নীকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর পত্নীরূপে ব্যবহার জ্ঞানকৃত ব্যভিচার; এইরূপ জ্ঞানকৃত ব্যভিচার নীতিশাস্ত্রে দূষণীয়। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর প্রতিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবিত থাকা অবস্থায় পত্নীত্বের দাবী ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, সুতরাং ব্যভিচার। তারার প্রতি সুগ্রীবের ব্যবহার যদিও জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে, তথাপি বালী ও অঙ্গদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সুগ্রীব বালীকে ছলে-বলে আবদ্ধ রাখিয়া আসিয়াই বালির রাজ্য ও পত্নী অধিকার করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় রাম ও অঙ্গদ

হইয়াছিল, তখন তাহা স্মৃতি হইতে সংগৃহীত বলিয়া "স্মৃতি" নামে অভিহিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাশাস্ত্রের "স্মৃতি" সংজ্ঞাটী বৈদিক নহে।

১৯ মনু সংহিতা ৯।৫৭

২০ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ২০।৮ ব্যবস্থাটী এইরূপ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে দার গ্রহণ করিলে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। এই ত্রুটীর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে তাহার বিবাহিতা পত্নী অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবশ্য প্রায়শ্চিত্তান্তে কনিষ্ঠের পত্নী কনিষ্ঠকে প্রদান করিবেন।

২১ মনু ৯।৬৪ মনুর এই ব্যবস্থা তাহারই প্রদত্ত অন্য ব্যবস্থার বিরোধী। বিরোধের কারণ সাময়িক প্রক্ষিপ্ততা।

২২ কবি ভবভূতির রচনায় এই ভাবটী দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-রামচরিতে সীতার প্রতি লক্ষ্মণের ব্যবহার সম্বন্ধেই আমরা এস্থলে ইঙ্গিত করিতেছি

কাহারও উক্তি অস্বাভাবিক হয় নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা—প্রচলিত সমাজ ধর্ম্মেরই ইঙ্গিত; মনুর স্মৃতিতে সেই ইঙ্গিতই গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মনু 'জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ স্নুষা তুল্যা' ব্যবস্থা দিয়াও পরের শ্লোকেই—"সন্তান সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ পরস্পরের স্ত্রীতে গমন করিলে পতিত হইতে হয়"—এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

মনুর এই বচনে "বিধবা" শব্দ নাই, কিন্তু "সন্তান সম্বন্ধে" এই ভাবটী আছে। ইহার পরবর্ত্তী ব্যবস্থা—'স্বামী দ্বারা সন্তান না জন্মিলে দেবর বা সপিণ্ড দ্বারা ঈপ্সিত সন্তান লাভ করিবে।' এস্থলেও "বিধবা" বা এইরূপ ভাব জ্ঞাপক কোন শব্দ না থাকায়, স্বামীর বর্ত্তমানে স্বামী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া (মহাভারতের কুন্তীর ন্যায়) এবং স্বামী অভাবে (মহাভারতের অম্বিকা অম্বালিকার ন্যায়) গুরুগণের নিয়োগ ক্রমে—এই উভয় ব্যবস্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; এই ব্যবস্থা বেদ-ব্রাহ্মণ-স্মৃতি এবং মহাভারত গ্রাহ্য বটে।

সমাজ সৃষ্টির আদিম কাল হইতে নবীন স্মৃতির ব্যবস্থা কাল পর্য্যন্ত যদি এই রীতি অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিতে হয়—এবং এই সঙ্গে রামায়ণের সমাজের প্রাচীনতাও স্বীকার করিতে হয়, তবে রামায়ণের যুগেও যে আর্য্য সমাজে দেবর-স্বামীত্বের ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্রজ-পুত্র উৎপাদনের প্রথা ছিল, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

রামায়ণের একস্থলের একটী ঘটনার বর্ণনা হইতে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে। এস্থলে বিষয়টীর আলোচনা করা গেল।

মায়া মৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া রাম চলিয়া গেলে সীতা লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যে যাইতে আদেশ করেন। লক্ষ্মণ তখন সীতাকে মহাবাহু রাম সম্পর্কে কোন চিন্তা করিতে নিবারণ করিলে "ক্রুদ্ধাসংরক্তলোচনা সীতা" লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

> সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
> মমহেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥ ২৪
> তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা
> কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥ ২৫।৩।৪৫

অর্থ—রে দুষ্ট চরিত্র, তুই নিশ্চয় আমার লোভে কিম্বা ভরতের নিয়োগ ক্রমে অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকী রামের সঙ্গে—আসিয়াছিস। কিন্তু রে সুমিত্রা পুত্র, তোর কিম্বা ভরতের সেরূপ বাসনা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।...

এই উক্তি সীতা চরিত্রের বিরোধী; এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, সেকালে দেবরের স্বামীত্বাধিকার প্রচলিত ছিল; সেই রীতি-চিন্তা হইতেই সীতার মুখে এইরূপ উক্তির উদ্ভব স্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এ স্থলে প্রতিবাদেরও যুক্তি আছে। প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন—এই স্থলে এইরূপ অস্বাভাবিক রূঢ় উক্তিরই প্রয়োজন। কবিও সুতরাং সেইরূপ করিয়াছেন। এইরূপ একটা চরিত্র বিরোধী কথা উপস্থিত না হইলে লক্ষ্মণের মত অনুগত ভ্রাতার ভ্রাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণ উপস্থিত হয় না; কাব্যেরও গতি রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়।

বাস্তবিক মহাকবি লক্ষ্মণের চরিত্রে যে উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন সীতার চরিত্রের আদর্শ-উপাদানের চেয়ে তাহা কোন অংশেই ন্যূন নহে, হীন নহে; বরং লক্ষ্মণের চরিত্র অনেক বিষয়ে সমুন্নত ও উচ্চভাব পূর্ণ। লক্ষ্মণকে ভ্রাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করাইতে হইলে কবিকে এমনতর কোন সমস্যার সৃষ্টি না করিতে পারিলে, তাহা কদাপি স্বাভাবিক হইবে না; তাই সীতার মুখে কবি এমন ধারার কথা বাহির করাইয়াছেন। ভাষার কথা যাহা হউক, এইরূপ চিন্তা এখানে অস্বাভাবিক নহে, প্রক্ষিপ্তও নহে।

কিন্তু সীতা চরিত্রের উপাদানওতো উপেক্ষার বিষয় নহে! তাই এই অনুমানের অবকাশ আছে যে—সে কালে আর্য্য সমাজেও দেবর স্বামীত্বের রীতি প্রচলিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে এই স্থলে আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্রের একটী সূত্রের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আপস্তম্ব সূত্র করিয়াছেন—কন্যা যে স্বামী লাভ করিয়া উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহাতে কেবল স্বামীর সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হয়, তাহা নহে; কন্যা শ্বশুর কুলের সহিতই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই জন্যই স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ভ্রাতাগণও ঐ কন্যাতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে।[২৪] বসিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্রের একটী বিধানও যেন এই

২৪ আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্র ২।১০।২৭।৩

আপত্তস্বহূত্রের সমর্থক। বসিষ্ঠ সূত্র করিয়াছেন—"বিধবা যদি পুত্রকামী হইয়া ভর্ত্তা সংগ্রহের ইচ্ছা করেন, তাহাকে স্বামীর পরিবারেই তাহা করিতে হইবে; স্বামীর পরিবারে একটী পুরুষ জীবিত থাকিলেও তিনি—অন্যত্র ভর্ত্তা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

নাল্পে সুখমস্তি।

(১)

সুধার ধারা যাচ্ছে বয়ে, তৃষ্ণা মেটাও প্রাণ ভরে'!
দুঃখ-সুখের চিন্তাকে আজ জয় করে' নাও গান করে'!
গাইছে পাখী কুঞ্জবনে,
সে গান শোনো আপন মনে,
চাঁদের আলোয় একলা বেড়াও রাত্ দুপুরে প্রান্তরে!

(২)

বনে বনে যে ফুল ফোটে, ভোগীর সে যে মন তোষে!
ভোগের তরে জীবন পেলে, সম্ভোগে রও সন্তোষে!
মুক্ত গায়ে গাছের ছায়ে,
জুড়াও জীবন মলয় বায়ে,
সময় গেলে মরবে ভেবে, কাঁদবে শেষে আপ্‌শোসে!

(৩)

দিন চলে' যায়, আঁধার আসে; তাতে তোমার ভাব্‌না কি?
যা হবার তা হচ্ছে হবে, জীবনটা ভাই নয় ফাঁকি!
বিশ্ব বিরাট অর্থে ভরা,
ব্যর্থ নহে সৃষ্ট ধরা,
[illegible] পুঁথি আঁকড়ে তবু তর্ক করা চাই নাকি?

(৪)

শাসন্‌-শেকল সেধে পরে যে-সব মানুষ মন্‌-মরা!
তাই সবলে টিট্‌কারি দ্যায়, করছে হাসি মস্করা!
আর কি তবে পুরুষ নারী,
পিয়াস মেটাও তাড়াতাড়ি,
পরের [illegible] পরে, চলুক জীবন ভোগ করা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

দুটী চিত্র।

ছোট লোক।

লোকটা ছিল ছোট খাটো একটুখানি। খেতো এত্ত কটি। প'রত এত টুকু। শু'তো ঘরের একটি টেরে। তার সবই ছোট, বড় ছিল কেবল কাল মুখে বেজায় এক জোড়া গোঁপ।

অনেক দিনের পুরাণ নিমক হালাল নফর, নাম নিদ্‌ কাহার।

ধীরে আস্তে কাজ করে যায়, মুখে কথা নাই। দুলে দুলে রাস্তার একটি পাশ ধরে চলে। জামাআলা লোক দেখ্‌লে মুনিবের জাত বলে হাতের জিনিসটা মাটিতে রেখে ভূঁয়ে পড়ে গড় করে।

"নিদা কেমন আছিস্?"

হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে সড়ো দাঁড়ায়; চোখে মুখে কাকুতি ফুটে উঠে।

কেউ যদি বলে "নিদু কথা কওনা কেন?"

"ওমা কথা কি কইতে পারি! কি বলতে কি বলে ফেল্‌বো!"

"নিদু, আস্তে চল যে?"

"ও বাবা, জোরে কি চলা যায়! রাস্তায় কত ভদ্দর-নোক, ছায়া মাড়িয়া ফেল্‌বো।"

"নিদু এত কম খাও?"

"গরীব নোকের কি বেশী খেতে আছে বাবু!"

"নিদু খাটো কাপড় পর যে?"

"আ—সব্বনাশ, নৈলে ভদ্দর নোকের মত দেখাবে যে!"

"এত জায়গা থাকতে অত কোণায় শোও কেন নিদু?"

"তা শোব না! মেজেতে শুই আর আমার গায়ে পা বেধে কেউ হোচট্ খেয়ে ব্যথা পাক্!"

এক দিন দেখি লম্বা কাপড়ে পা থেকে মাথা ঢেকে, হাত পা ছড়িয়ে, মানুষের কাঁধে চড়ে, হন্ হন্ করে চলেছে নিদু! আজ তাকে সবাই পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

এত সাহস নিদুর কি করে হ'ল?

সবাইকে সব ছেড়ে দিতে দিতে কোন্ জোরে বলে নিদু কোন্ নিকষে আছড়ে প'ল, যাতে আজ নিজের দর বুঝ্‌তে পেয়েছে?

বড় লোক।

কল্‌কাতায় আমার বাসার সাম্‌নেই দাসেদের তেতলা বাড়ী। দাসেরা মস্তবড় লোক। রথে তাদের খুব ধূম হয়। এক মাস আগে থেকে গানের তালিম চলে। যাঁরা তালিম দিতে আসেন, রোজ রাত্রে তাঁদের যে একটা খাওয়ার ঘটা হয়, তা বেশ বোঝা যায়,—সকালে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা পাতার কাঁড়ি থেকে, কাকগুলা যখন লুচির টুকরা, দমের আলু, রাবড়ীর খুরি, দৈ-এর গ্লাস টেনে বা'র করে।

রথের তিন দিন কাঙালীদের পাকা খাওয়ান হয়। পাকা মানে চুন শুড়কি নয়। তেলে ভাজা লুচি, টোকো দই, দাগী আম।

শেষ দিন তাদের কাপড় দেওয়া হয়। কাঙালী জোটে বিস্তর, কাপড় থাকে খান কয়েক, কাজেই সবাই পায় না।

বেশী লোক হ'লে পাতা পেতে খাওয়ান না। বাবুরা তেতালার বারান্দা থেকে লুচি ছুঁড়ে ফেল্‌তে থাকেন, কাঙালীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হল্লা করে লুটো পুটি কর্‌তে কর্‌তে লুফে নায়। দু'চার জন চালাক সন্ন্যাসী ছাতা খুলে উল্‌টে ধরে ভিড়ের ভিতর বেড়াতে থাকে……লুচি ছাতায় এসে পড়ে।

রোগা পট্‌কায়া ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে পড়ে' তক্ষুনি উঠে হাত তুলে উপর পানে চেয়ে "বাবু আমাকে, বাবু আমাকে" কর্‌তে থাকে। ছেলে ও মেয়ের পাল আশে পাশে থাকে; যা হাত ফস্‌কে রাস্তায় পড়ে কাদা মাথামাথি হয় তাই নিয়ে মারামারি করে।

বাবুরা হাত তালি দিয়ে হাস্‌তে থাকেন। দুধারের বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে মেয়ে মদ্দ তামাসা দেখে।

২

পাকা খাওয়া শেষ হয়ে গেল; কাঙালীরা প্রায় চলেই গেছে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়্‌ছে। এক বুড়ো পাত্‌লা ছেঁড়া চাদর গায়, লাঠী ঠুকে ঠুকে কাঁপ্‌তে কঁপ্‌তে আমার দোকানের সাম্‌নে এসে বল্‌ল "বাবু, রথ আলা বাড়ী কোন্‌টা?" আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

সে বাবুদের রকে উঠে, লাঠী গাছটা দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে রেখে চাদরটা খুলে নিঙড়ে নিয়ে গায় দিল। তারপর লাঠী গাছটা হাতে করে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগ্‌ল।

একটি বাবু বেরিয়ে এলেন ভিতর থেকে। সোনালী চশ্‌মা চোখে, খোলা গা খালি পা, কাপড় গুটিয়ে পরা, হাত দুটা ঝুলিয়ে আঙুল ছড়িয়ে রেখেছেন। দেখ্‌লে মনে হয় কাজে ভারি ব্যস্ত।

এসেই ঝাজাল আওয়াজে বল্‌লেন, কি চাই?"

"রাজা বাবু, আমার একটা ছেলে, হাঁসপাতালের ডাক্তার বলেছে বাঁচবেনা। লুচি খেতে চেয়েছে। তাই এসেছি, এক খানা লুচি যদি আমাকে দাও; বলে এসেছি হাপিত্তেশ্ হয়ে বসে আছে। বড় অসুখ, উঠ্‌তে পারেনা, তাই আন্‌তে পারলাম না।"

চাকর এসে বল্‌ল, "বাবু ঠাঁই হয়েছে!"

না না, ও সব কিছু হবে না! এই, কেয়ারী বন্ধ্ কর্ দেও!"

বাবু চলে গেলেন।

দারোয়ান দরাম্ করে কপাট বন্ধ করে দিল।

পর দিন দৈনিকে দেখ্‌লাম,

"কলিকাতার সুবিখ্যাত দাস ভবনে রথ যাত্রা উপলক্ষে সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে সমিষ্টান্ন পাকা খাওয়াইয়া প্রত্যেককে এক এক খানি নূতন বস্ত্র দান করা হইয়াছে। এরূপ দান প্রশংসনীয়।"

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত।

কর্ম্ম।

কল্পতরু কল্পনার সুখের স্বপন,
স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ যথা হয়!
কর্ম্ম বলে, "সর্ব্বোপরি আমারি শরণ,
কল্পতরু স্পর্শমণি বাক্যে শুধু রয়!"
কল্পতরু বলে "দিব যাহা তুমি চাও,"
স্পর্শমণি বলে, "লৌহে স্বর্ণ দিয়ে যাও!"
বিজ্ঞ বলে, "বিদ্যা অর্থ, ও সকলি দিবে"
কর্ম্ম বলে, "সবই আমি, এস মম দিকে!"

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

হাতী খেদা।

(৩)

এখন কুলিদের কার্য্য প্রণালীর পুনরালোচনা করা যাউক। কাঠ কটিতে একদিন হইতে দেড় দিন প্রয়োজন হয়; কাঠ কাটা শেষ হইলে কাঠ কোটের স্থানে লইয়া যাওয়া একটা প্রধান কার্য্য। চতুর্থ দিনে কতক কুলি গর্ত্ত করিতে থাকে, এবং কতক কুলি গাছ নামাইতে থাকে। গর্ত্ত করিতেও প্রায় ১½। ২ দিন প্রয়োজন হয়। প্রস্তর বহুল স্থান হইলেই অধিক সময়ের আবশ্যক। ইহার পর কোঠ বাঁধিতে ১½। ২ দিন প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃক্ষাদি রোপন এবং সমুদয় কোঠ আচ্ছাদন করিতেও ৩। ৪ ঘণ্টার প্রয়োজন হয়। মোট কথা কুলির সংখ্যা প্রচুর থাকিলে ষষ্ঠ দিনে খেদা করা যাইতে পারে।

হস্তী তাড়ানর দিবস কতকগুলি শুষ্ক বন কেরোসিন যুক্ত করিয়া তিন লাইনে রাখিতে হয়—১ম অগ্নির মুখে —২য় ইহার ২৫। ৩০ হস্ত অগ্রে; তৎপর আরও ২৫। ৩০ হস্ত অগ্রে। ইহাদের অগ্নিরেখা বলে। প্রচলিত কথায় "আলো" কহে।

কেবল মাত্র কোঠ ও আগ্নি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে ৪। ৫ দিন প্রয়োজন হয়। কুলিদের সংখ্যা কম থাকিলে এবং গাছ দূর হইতে আনিতে হইলে ৬। ৭ দিন পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়। যাহাই হউক কোঠের কার্য্য শেষ হইলে তৎপর দিন প্রাতে আহারাদি করিয়া পাতা রাখার লোক রাখিয়া সর্দ্দারগণ তাহাদের সাহসী কুলিকে লইয়া কোঠের স্থানের নিকট সমবেত হয়। তথায় যে, যে কার্য্যের উপযোগী, তাহাকে বড় সর্দ্দার সেই কার্য্যের ভার দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে এক একটী ঠাটা (শব্দ করিবার নিমিত্ত বংশ নির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ) থাকে। হস্তী ইহাদের শব্দ পাইলে অত্যন্ত ভীত হয়। সর্দ্দারগণের মধ্যে যাহারা বন্দুক ব্যবহার করিতে জানে তাহাদের বন্দুক এবং ১০ টা ফাঁকা আওয়াজের উপযোগী সামগ্রী এবং ২। ৩ টা ৬নং ছিটা গুলি ও ২। ২½ ড্রাম বারুদে ভরা—এইরূপ দেওয়া হয়। ইতঃপর কতক সর্দ্দার ও কুলিকে "গুলানর" (অর্থাৎ হাতী তাড়াইয়া কোঠে ফেলানর) জন্য এবং কতক ব্যক্তিকে আগ্নির অগ্রে লুক্কায়িত রাখা হয়। যাহারা গুলানের জন্য যায়, তাহাদের "গুলানেওয়ালা" এবং যাহারা আগ্নির মুখে থাকে তাহাদের "তুরীওয়ালা" বলে।

অনেক সময় হাতীকে গুলানেওয়ালারা তাড়াইতেই হাতী সবেগে চলিয়া আসে—গোলানের লোকেরা তখন অনেক পিছাইয়া পড়ে—তুরীর নিকট হাতী আসিলেই দুই দিকের তুরীর লোক একত্র মিলিত হইয়া হস্তীকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং হস্তীকে আগ্নির মধ্যে তাড়াইয়া ফেলে। আগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতেই বাহিরে আবরণ মধ্যস্থিত ব্যক্তি ক্ষিপ্র পদে আসিয়া আলায় আগুণ ধরাইয়া দেয়—এই সকল লোকের খুব সাহসী হওয়া প্রয়োজন, নতুবা অনেক সময় ভয়ে পূর্ব্বেই অগ্নি যোগ করিলে সমুদয় কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। এমনও হয় যে অর্দ্ধেক হস্তী আসিতেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে অপর অর্দ্ধেক কখনই আসে না এবং যাহারাও আসে, তাহারাও অপরগুলির মায়ায় ফিরিয়া যায়; সুতরাং এই স্থানে সাহসী লোক থাকা চাই।

বড় সর্দ্দার লোক স্থির করিয়া দিলেই "গুলানেওয়ালারা" দুই দিকে দিয়া এক এক জনের নায়কত্বে চলিয়া যায় এবং উভয় দল মিলিত হইয়াই এক Bugle এর শব্দ করে, তৎপরই খট্ খটিয়ার শব্দ এবং চীৎকার করে এই শব্দ পাওয়া মাত্র দলের সমস্ত হস্তী এক হয় এবং নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে গড় মলম ধরিয়া পলায়নপর হয়। এই সময় হস্তীগুলির ভীতি ব্যঞ্জক আকৃতি দেখিলে এবং ক্রোধ দর্শন করিলে যুগপৎ আনন্দ ও ভীতির উদ্রেক হয়। কর্ণদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া শুণ্ড কুঞ্চিত করিয়া সবেগে গুলানেওয়ালার দিকে অগ্রসর হইয়া সম্মুখের পদ দিয়া সবেগে ধূলি প্রভৃতি ছিটাইয়া দেয়; কখন বা দল অগ্রসর হইতেছে হঠাৎ এতাদৃশ একটী হস্তিনা ২৫। ৩০ হাত দৌড়াইয়া আসিয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই অবস্থায় ইহাদিগকে ঠিক একখানা চলনশীল ইঞ্জিনের মত প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মজা এই, এত সদর্পে আসিয়াও সহজে মনুষ্যকে আক্রমণ করে না। শাবকযুক্ত হস্তিনীই এবম্বিধ আক্রমণ অধিক

করিয়া থাকে। সাধারণতঃ হস্তীকুল যখন বুঝিতে পারে যে তাহারা শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তখন গড়মলম ধরিয়া সবেগে পলায়নপর হয়। পলায়নের সময় হস্তিনীই অগ্রে যায় এবং সর্ব্ব পশ্চাতে কোনও গুণ্ডা হস্তী থাকে, মধ্যস্থলে সন্তানবতী হস্তিনীগুলি স্ব স্ব বাচ্চাসহ থাকে। মিঃ সেণ্ডারসন হস্তীর স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন; আমরাও ঠিক এইরূপই দেখিয়াছি।

যখন গুলানেওয়ালারা এইরূপে হস্তী যূথ তাড়াইয়া আনিতে থাকে তখন কোঠের নিকট এবং পশ্চাতের লোক মৃতবৎ চুপ্ করিয়া থাকিবে; একটুও শব্দ সেই দিক হইতে হইতে পারিবে না।

প্রায়ই "তুরীর" মুখ পর্য্যন্ত হস্তী এক দৌড়ে আসিয়া সেইখানে অস্বাভাবিকত্ব কোন কিছু বুঝিতে পারিলে গড় মলম কাটিয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহে। কিন্তু এমন সময় পশ্চাতে কোনও উচ্চ বৃক্ষ সমারূঢ় ব্যক্তি তুরীওয়ালা দিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিতে থাকিবে; তখন তুরীর লোক আনক্কানুসারী ঠাটা প্রভৃতির শব্দ করিবে। হস্তী সাধারণতঃ অত্যন্ত ভীরু, কাজেই অত্যন্ত জোর না করিলে অথবা সবেগে ফিরিতে না চাহিলে বন্দুকের শব্দ না করাই বিধেয়। কারণ অধিক বন্দুক মারিলে বন্দুকের শব্দের ভয় থাকে না, এবং অবশেষে এমন হয় যে বন্দুকের শব্দ শুনিলেই সেই দিকে ক্ষিপ্ত প্রায় ধাবমান হয়। আগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই তুমুল শব্দ করা প্রয়োজন। তখন গুলানেওয়ালারা সোজা হস্তীর পশ্চাতে চলিয়া আসে এবং তুরীওয়ালারা দুই দিক দিয়া চলিয়া যায়।

হস্তী আগ্নির অগ্রভাগের নিকটবর্ত্তী হইলেই চারি দিক হইতে তাহাদিগকে মানুষে ঘিরিয়া ফেলে। তখন তাহারা এমন শব্দ করিতে থাকে যে মনে হয় সেখানে যেন একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে! সাধারণতঃ ইহাতেই হস্তী প্রাণে এক দৌড়ে কোঠে প্রবেশ করে। কোঠে প্রবেশ করিবার সময় কে অগ্রে প্রবেশ করিবে, ইহাই হস্তীর উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়! হস্তী প্রথম অগ্নি পার হইলেই তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হয়। ইহাতে বিশেষ ভীত হইয়া হস্তীগুলি আরও অগ্রসর হইতে থাকে। যেথায় অগ্নি সংযোগ করিলে প্রায়ই পলায়ন করার আর পথ থাকে না; কোনও বিঘ্ন ঘটে না। সমুদয় হস্তী ঢুকিতেই দরজার রসি কাটিয়া দিতে হয়। তখনই হস্তী "গড় দাখিল" হইল। হস্তী ঢুকিয়াই সোজাসুজি চলিতে থাকে এবং কোঠের পাটে ধাক্কা লাগিতেই হাতী ঘুরিয়া পুনরায় দরজার দিকে ধাবমান হয়। এই সময়ই দরজা ফেলাইয়া দিতে হয়; নতুবা হস্তী বাহির হইয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ দলের সমুদয় হস্তী একেবারেই ঢুকিয়া যায়, কোন কোন সময় এমনও হয় যে কতক হাতী বাহিরেই থাকিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে বাহিরের কতক গুলির আশা পরিত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। রসি কাটিবার জন্য একব্যক্তি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে এবং এক ব্যক্তি দড়ি কাটার সময় নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোনও উচ্চ বৃক্ষারূঢ় অথবা কোনও সুবিধাজনক স্থানে থাকে। সে কোনও প্রকারে বংশী ধ্বনি করিলেই অপর ব্যক্তি দরজার দড়ি কাটিবে। এই বংশীবাদকের দায়িত্ব এবং বিবেচনার উপর "ঝাপ" ফেলানর কার্য্য নির্ভর করে।

দরজা ভীষণ শব্দে পতিত হইতেই হস্তীগুলি ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিস্ফারিত কর্ণে শুণ্ড কুঞ্চিত করিয়া দরজার দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া থাকে। সামান্য কাল এই ভাবে গেলেই যখন সে নিজের অবস্থা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে, তখন প্রবল বেগে কোঠের পাট আক্রমণ করিতে থাকে। প্রত্যেক ধাক্কায় কোঠ কাঁপিতে থাকে এবং মনে হয় যেন এইবার বুঝি কোঠ ভাঙ্গিয়া গেল। কোঠে যাহাতে ক্রমাগত হস্তী আক্রমণ করিতে না পারে সেই জন্য প্রত্যেক সর্দ্দার স্ব স্ব "পাট" রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। প্রত্যেক পাটের নিকট ৪।৫ জন ব্যক্তি বংশাগ্র তীক্ষ্ণ করিয়া বসিয়া থাকে; হস্তী পাট আক্রমণ করিতে চাহিলে খোঁচা মারে। এইরূপে খোঁচা খাইয়া হস্তী আর কোঠের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। এই রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে "কুথি" বলে। হস্তী গড়দাখিল হইতে যদি ৫ টা বাজিয়া যায় অর্থাৎ সন্ধ্যা হইয়া যায় এবং সেই রাত্রিতে পালিত কুম্‌কী (হস্তিনী) ঢুকিতে না পারে, তবে সমস্ত রাত্রি কুথিদিগের দ্বারাই গড় রক্ষা করিতে হয়, নতুবা ক্রমাগত আক্রমণ হেতু খুব সুদৃঢ় গড়ও ভাঙ্গিয়া যায়। হাতী

গড়দাখিল হইলেই উহাকে বন্ধনের চেষ্টা করা উচিত। এই কার্য্য যতশীঘ্র সম্ভব সম্পাদিত না হইলে বহু বিপদের আশঙ্কা।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আর্গির প্রথম ১২ হাত কোঠের মতই শক্ত করিয়া নির্ম্মিত হয়। সেই দুই আর্গির মধ্যে একটা পাট নির্ম্মিত হয়, অর্থাৎ ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ছোট একটা গড় হয়; ইহাকে "রুমকোঠ" অথবা 'রুম ঘড়" বলে। পালিত হাতী রুম ঘরে প্রবেশ করাইয়া দরজা উত্তোলন পূর্ব্বক কোঠে প্রবেশ করাইতে হয়। বড় "গুণ্ডা" অথবা মোক্না" থাকিলে কুম্কী পিছাইয়াং প্রবেশ করে। নতুবা অনেক সময় গুণ্ডা আক্রমণ করিলে কুম্কী এবং মাহুত অত্যন্ত আহত হইতে পারে। হস্তিনী গুলি যথা সম্ভব গাত্র সংলগ্ন হইয়া প্রবেশ করে। সমুদয় কুম্কী প্রবেশ করিলে, দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কুম্কী প্রবেশ করিলেই, কোনও কোনও হাতী তাহাদের আক্রমণ করিতে আসে, কিন্তু মাহুতদের হাতে "জাঠী" (বংশাগ্রে তীক্ষ্ণ লৌহ বিশিষ্ট পদার্থ) দিয়া খোঁচা দিলেই তাহারা পশ্চাৎপদ হয়। হাতী ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে মহুতকে আক্রমণ করিয়া মারিতে পারে।

হাতীগুলি কোঠে বদ্ধাবস্থায় পরস্পরের গাত্র এমন ভাবে ঘর্ষণ করিতে থাকে, এবং একে অপরের পেটের নীচে গলার নীচে সঙ্কুচিত ভাবে থাকে যে সেস্থলে ২০। ২৫ টী হাতী থাকিলেও তথায় ১০। ১২টী হাতী আছে—এরূপ প্রতীয়মান হয়। পালিত কুম্কী সাধারণতঃ সর্ব্ব বৃহৎ হাতীকে এই অরণ্য হাতীর দল হইতে পৃথক করিয়া লয় এবং দুইটী কুম্কী পশ্চাৎ দিক হইতে চাপিয়া ধরে; দাইদার তখন ঘোড়ার জোড়ান দেওয়ার মত "পশ্চাতের দুই পদ আবদ্ধ করে; এই কার্য্যকে পরতালা ভরা বলে। এইরূপে সমুদয় হাতীর পরতালা ভরা হইলে মোটা ফাঁদ (অর্থাৎ খুব মোটা রশি) পদ দ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া কোঠের তেখাবার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এই কার্য্যকে "গাছ লওয়ান" বলে। হাতীকে গাছলওয়াইলে তখন আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাহুত যখন গোপনে একটা একটা করিয়া পরতালা বাঁধিতে থাকে, তখন হাতী সুখ স্পর্শানুভব করিয়া বিভোর হইয়া থাকে। দাইদার যখন থামের মত পদের পশ্চাতে থাকিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার কার্য্য করিতে থাকে, তখন হাতীর বিশালত্ব এবং মনুষ্যের আয়তনের ক্ষুদ্রত্ব অথচ বুদ্ধির তারতম্য হেতু হাতীর দুর্দ্দশা ইত্যাদি বিষয় ভাবিয়া যেমন আনন্দানুভব করা যায় তেমনই প্রতিমুহূর্ত্তে দাইদারের বিপদের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু দাইদার নিশ্চিন্তে এবং হেলায় তাহার কার্য্য সমাধা করিয়া সগর্ব্বে হাতীর উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহার কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। গাছ লওয়ানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাতী তাহার যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে না কিন্তু ইহার পরই নিজের অবস্থা বুঝিয়া মুক্তির প্রয়াস করে ইহা আর এক উপভোগ্য দৃশ্য বটে।

পরতালার রশি বেড়ে ২½"।৩" অধিক হয় না। প্রত্যেক রশির শেষে একটা ফাঁদ থাকে তাহার অগ্রভাগ ক্রমসূক্ষ্ম সর্পের দেহের মত। প্রথম এক পদে (দক্ষিণ পদে) এক বাঁধ উঠান হয়, ইহাকে "নাগ পেঁচ" বলে এবং পরে অন্য পদে, উহা ঘুরাইয়া আনিতে হয়। বন্ধনটা অনেকটা ∞ এইরূপ হয়। এক পরতালা ১৩। ১৪ হাত লম্বা হয়। এক পরতালা "ভরা" (বাঁধা) হইলে সেই পরতালার অগ্রভাগ অপর একটী ফাঁদে বাঁধিয়া লইতে হয়। এইরূপে বৃহৎ কুম্কীর ৬ পরতালা ভরিলেই চলে। বৃহৎ গুণ্ডার ১২। ১৪ পরতালা পর্য্যন্তও ভরা হয়। পরতালা ভরা হইলে বন্ধন দৃঢ় করার জন্য মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন দিতে হয়, ইহাকে "মাঝ লওয়ান" বলে। এই মাঝ লওয়ান হইলেই পরতালা ভরা শেষ হইল। পরতালা ভরার সময় হাতীর লোমে যাহাতে টান না লাগে সেই বিষয় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হাতীর লাথি কখনও ঠিক সোজা যায় না, সুতরাং এই কার্য্য করার সময় মাহুত ঠিক সোজাসুজি হাতীর পশ্চাতে থাকিয়াই কার্য্য করে। "দাইদার" হাতী বন্ধন করিলেই কার্য্য আরম্ভ হয়। দাইদার শিক্ষিত কুম্কীর উপরে থাকে এবং হাতী ভিড়ান হইলেই সে নামিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করে। এই হস্তীর অগ্র পদের উপর দড়ি দিয়া ২। ৩টী সিঁড়ির মত বাঁধা হয়, যাহাতে বিপদ হইলে চট্ করিয়া নিয়স্থিত লোক উপরে উঠিতে পারে। এই হস্তীগুলি

অত্যন্ত সুশিক্ষিত হওয়া চাই। এক হস্তী বাঁধিতে বহুবার মাইদারকে উঠিতে নামিতে হয়।

ইহার পর হস্তীকে বাহির করার পালা। প্রথমে গলায় মোটা ডোল দিয়া বাঁধিয়া সেই ডোল কুম্‌কীর কোমড়ে বাঁধিতে হয়। ডোল মারিয়া চড়ি (সরু রসি—যাহাতে ফাঁদ হাতীর গলায় আট্‌কাইয়া না যায়) "ভরিতে" হয়। হস্তীর আকার এবং শক্তি বুঝিয়া গলায় ২। ৩। ৪ এবং পশ্চাৎ পদে ১ কিম্বা ২ ডোল বাঁধিতে হয়। অত্যন্ত বৃহৎ গুণ্ডা হইলে পশ্চাৎ পদে ৩টী ৪টী পর্য্যন্ত ডোল বাঁধা হয়। ডোলের ওজন ২৫ সের হইতে এক মণ দশ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ডোলের নির্ম্মাণ প্রণালীও পরতালার মতই—তবে ইহা পরতালা হইতে অনেক বড়। ডোলের সূক্ষ্ম ভাগ অগ্রস্থিত গর্ত্তের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া একটী ফাঁদ নির্ম্মাণ করিয়া আরণ্য হস্তীর মস্তকের উপর লইয়া শুণ্ডের উপর ফেলিতেই শুণ্ড গুটাইয়া লয়; এই সময় ডোলের দড়ি টানিলেই ফাঁদ কসিয়া যায়। তখন একটু টানিয়া "চড়ি" (সরু দড়ি) দিয়া ফাঁদের মাথা ডোলের দড়ির সহিত বাঁধিয়া দিতে হয়, যাহাতে টানাটানিতে ফাঁস না লাগিয়া যায়। এইরূপে হস্তী বদ্ধ হইলে পর তালা খুলিয়া তাহাদের বাহিরে আনা হয়। প্রথম বাহিরে আসিয়াই তাহারা মনে করে এই বার বোধ হয় মুক্ত হইল। বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই প্রাণ-পণে পলায়নের প্রয়াস পায়। তখন পালিত হস্তীর অবস্থা দেখিলে বড়ই বিস্মিত হইতে হয়; এক একটী ৭' ৬" উচ্চ হস্তনীকে অতি কষ্টে ঐ প্রকার তিনটী পালিত হাতী প্রথমে টানিয়া রাখিতে পারে। অবশ্য এইরূপ টানাটানির পর দ্বিতীয় দিবসই হাতীর গলা এবং পদদ্বয় কাটিয়া যন্ত্রণা হয়; তখন ক্রমশঃ ৪ হাতীর স্থানে ২ হাতী এবং ২। ৩ হাতীর স্থানে এক হাতীই এই প্রকার এক একটী আরণ্য হাতীকে টানিয়া রাখিতে পারে।

মোটামুটি হিসাবে হাতী কিরূপে ধৃত করা হয় তাহার বর্ণনা দেওয়া গেল। এখন আমাদের এইবারকার অভিযানে কিরূপ দেখিলাম ও বুঝিলাম তাহার বর্ণনা দেওয়া যাউক।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

বসন্ত গীতি।

(সন্তোকা)

কে যাও চঞ্চল চরণে?
ভূমে যে তব অঞ্চল লুটে
পড়ে না কি তা স্মরণে?
ঝুরু ঝুরু ঝুরু দখিণা বায়
বাস না অঙ্গে থাকিতে চায়
বাসনা স্রোতে ভাসায়ে তরী
অধীরা হ'লে কি কারণে?
নিছিলে যে ফুল আঁচল ভরি
এলে কি নিঃশেষ করিয়ে?
চির নন্দিত বন্ধুর পায়
দিলে কি সকলই ধরিয়ে?
বিথায়ে মোহন মধুর হাসি
পরাণে লইয়ে পুলক রাশি
চলিলে কি নীপ কুঞ্জ হ'তে
পুঞ্জ কুসুম হরণে?
আবেশ নিমেষ ভুলেছে আঁখি -
প্রবেশ করিছ গহনে,
আজি কি কি ফুলে সাজাবে বন্ধুরে
সুন্দরী, মাধব দহনে?
র'য়েছে. কত না কণ্টক লতা,
জড়ালে অঙ্গে পাইবে ব্যথা,
অতি ভোরে যাবে তুলিতে কুসুম
কি নীতি অনুসরণে?
কপোলে উজলে চুম্বন দাগ
অন্তরে সোহাগ ধরে না,
শিথিল গুম্ফিত কাঁচলি বন্ধ
উরস পরশ করে না;
ছিলে কি সেথা আধেক নিশি
সরম হীন মরমে মিশি?
অলস নয়ন মেলিলে শেষে কি
উষার কনক কিরণে?

শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ।

নূতন রোগ।

লিখিতে বসিয়াই সামাজিক ব্যবহারের খাতিরে একটা [illegible] কথা লিখিতে হইল। জগতে নূতন কিছুই নাই, ভগবান অনাদি, সৃষ্টিও তাঁহার অনাদি। তিনি পূর্ণাৎ পূর্ণতর, কিছুরই তাঁহার অভাব নাই, প্রয়োজনও নাই, তথাপি কেন সৃষ্টি করেন, তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর, অথচ নিষ্প্রয়োজনে তিনি কিছুই করেন না। ঐশিক সৃষ্টিকে মানবীয় সৃষ্টির ন্যায় মনে করিলে চলিবে না, মানব সমাজ যেরূপ ক্রমশঃ বিদ্যা বুদ্ধি ও বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়া দিন দিন কত উন্নতি লাভ করে, কত কল-কারখানা ও রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে, ঈশ্বর সেরূপ সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন। তিনি অসীম জ্ঞানশালী ও সর্ব্বশক্তিমান, যাহা করিবার প্রয়োজন, তাহা এক সময়ই করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা আবির্ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিতে পাই মাত্র।

আমরা যাহা নিজের চক্ষুতে দেখি না, লোকের মুখে শুনি না, ইতিহাস পুরাণাদিতে যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাই না, এমন একটা পদার্থ দেখিলেই নূতন বলিয়া মনে করি। কিন্তু যাহাকে নূতন বলি তাহা যে কোন কালে বা কোন যুগেই ছিলনা, একথা সমীচীন বলিতে পারি না। জগৎ অনন্ত, কাল অসীম, কোন্ কালে কোন্ স্থানে কোন্ পদার্থের আবির্ভাব ছিল বা আছে, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের জানিবার সাধ্য নাই। হয়তো লক্ষবর্ষ বা ততোধিক কাল পরে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন পদার্থ আমাদের চক্ষুর সামনে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে নূতন হইলেও বাস্তবিক নূতন নহে। আজকাল হেলির আবিষ্কৃত ধূমকেতুকেও অনেকে নূতন ধূমকেতু বলিয়া থাকেন. সুতরাং তাহা হইতেও অধিক কাল পরে যে পদার্থ পৃথিবীতে আসে তাহাকে নূতন বলা কিছুই অস্বাভাবিক নহে।

নূতন রোগের মধ্যে প্রথম 'গণোরিয়া'। ইহা আমাদের দেশে কোন দিনই ছিল না, অন্য দেশ হইতে উপস্থিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে যে বিংশতি প্রকার প্রমেহের কথা আছে তাহা 'গণোরিয়া' নহে। গণোরিয়ার সহিত প্রমেহের কোন লক্ষণই মিলে না। গণোরিয়ায় হরিদ্রাভ পূয নির্গত হয়, জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, জননেন্দ্রিয় মধ্যে ক্ষত হয়, প্রস্রাব ধারে হয় না, কোন কোন সময় জননেন্দ্রিয়ে ও কোষ মধ্যে স্ফীতত্বা উপস্থিত হয়। পরিণামে গ্রন্থিবাত উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রমেহে ইহার কোন লক্ষণই হয় না। প্রমেহের উপদ্রব পীড়কা অর্থাৎ গাত্রে নানা জাতীয় স্ফোট আর গণোরিয়ার উপদ্রব গ্রন্থিবাত বা আমবাত।

কারণও এক নহে। প্রমেহের কারণ নিদ্রাধিক্য, কায়িক পরিশ্রমের অভাব, মিষ্টবস্তু, নূতন অন্ন, দুগ্ধ দধি প্রভৃতি কফবর্দ্ধক বস্তু। ইহার একটীও গণোরিয়ার কারণ নহে। গণোরিয়ার একমাত্র কারণ এই রূপ কুৎসিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহবাস। কদাচিৎ গণোরিয়ার পূয রক্তযুক্ত শয্যা কি বস্ত্র ব্যবহারেও এই রোগ হইতে দেখা যায়। গণোরিয়া ও সিবিলিস উভয়ই সংসর্গজাত ঔপসর্গিক রোগ। পরস্পর জগাই মধাইর ন্যায় প্রায় এক প্রকৃতির রোগ, তবে সিবিলিসের কেরামত কিছু অধিক, গণোরিয়ার কেরামত তদপেক্ষা অল্প।

প্রমেহ ও গণোরিয়া রোগ যখন এক নহে, তখন চিকিৎসাও তাহার এক হইতে পারে না। গণোরিয়ার উগ্রম অবস্থায় প্রমেহের ঔষধে কিছু মাত্র ফল হয় না। ইহা আমরা শত শত স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়গণ কেন যে এরোগে প্রমেহের ঔষধ দেন এবং তাহাতে কি ফল পান তাহা তাঁহারাই জানেন।

এই রোগে কবাব চিনি, শ্বেত চন্দন, বাবলার আঠা, শীমুলমূল, নিশাদল, গন্ধক, অনন্তমূল বিশেষ উপকারী। ঐ সকল ঔষধ এবং আরও কয়েকটী ঔষধের যোগে আমি কয়েক পদ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উহাতে অনেক সময় সন্তোষজনক ফল হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নূতন রোগ 'সিবিলিস।' সিবিলিসকে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদীয় রোগ মনে করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উপদংশ ও সিবিলিস এই উভয় রোগই প্রথমতঃ এক স্থানে হয় বলিয়া এক রোগ হইতে পারে না। যাহা উপদংশের কারণ, তাহা সিবিলিসের কারণ নহে।

আঘাত কিংবা হিংস্র জন্তুর নখ, দন্ত প্রভৃতি কিংবা

ধৌত না করা অথবা অতিশয় রমণ বশতঃ জননেন্দ্রিয়ে যে ক্ষত হয় তাহারই নাম উপদংশ। যোনি দোষেও উপদংশ হয়, একথা আয়ুর্ব্বেদে থাকিলেও যোনি-দোষ এখানে উপদংশবতী নারীর সংসর্গ নহে, টীকাকার তাহার অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন।

এই উপদংশের বিষ ক্রিয়া নাই, ইহা শরীরে প্রবেশ করিয়া মানুষের অন্য কোন অনিষ্ট করে না।

যে সকল লোকের সিবিলিস আছে, একমাত্র তাহাদের সংসর্গেই সিবিলিসের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। এই রোগ শরীরে প্রবেশ করিয়া পরিণামে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি রোগে পরিণত করিয়া এক এক দম্পতিকে দুরবস্থার শেষ সীমায় উপনীত করে। যাহাদের সিবিলিস্ আছে তাহাদের পুত্র কন্যা জীবিত প্রসূত হয় না, হইলেও ঐ বীজ নিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং এই রোগ এক এক বংশকে অধঃপাতের চরম সীমায় উপস্থিত করে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীয় উপদংশে ইহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহার চিকিৎসাও অতি সংক্ষিপ্ত, সিবিলিসের চিকিৎসা নহে।

সিবিলিস পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না। প্রাচীন কোন গ্রন্থে ইহার অস্তিত্বের কোন কথা নাই, বহু কাল পরে ভিন্ন দেশ হইতে ভারতে এই রোগ উপস্থিত হইয়াছে। কতদিন হইতে এদেশে এরোগের আগমন তাহা নিশ্চয় রূপে বলা সহজ সাধ্য নহে, তথাপি আমরা আনুসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি যে—আড়াই শত বৎসরের কিছু পূর্ব্ব হইতে এ দেশ সিবিলিসের পদার্পণ ঘটিয়াছে।

বিদ্যাপতি কৃত "বৈদ্যরহস্য" নামক গ্রন্থে সিবিলিসকে ফেরঙ্গ দেশজ রোগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি একটী ঔষধের ফলশ্রুতিতে লিখিয়াছেন—

ফেরঙ্গ দেশজং রোগং দুস্তরঞ্চ-ব্যপোহেতি।

অর্থাৎ এই ঔষধে দুঃসাধ্য ফেরঙ্গ রোগকেও বিনাশ করে।

১৫৯৭ শকাব্দে বিদ্যাপতি বৈদ্যক রহস্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আড়াই শত বৎসরের লোক। তাহার উক্তি দ্বারা জানা যায় যে ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে ফেরঙ্গ রোগের আমদানি হইয়াছিল। কলিকাতার দেবেন্দ্রনাথ সেনও তাঁহার মুদ্রিত মাধব নিদানের শেষে ফেরঙ্গ রোগের কয়েকটী বচন মুদ্রিত করিয়াছেন, ফেরঙ্গ দেশে ফেরঙ্গিনী সংসর্গে এই রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐ বচনে বর্ণিত। কিন্তু ঐ বচন তিনি কোথায় পাইলেন তাহা অপ্রকাশিত। বচনের ভাষা আধুনিক, বোধ হয়, ঐ রোগ এদেশে আসিবার পরেই ঐরূপ বচন রচিত হইয়াছে। যাহা হউক এই অসভ্য রোগ সুসভ্য ভারতে উপস্থিত হইয়া দেশকে পয়মাল করার উপক্রম করিয়াছে।

তৃতীয় নূতন রোগ—ক্রিমি বিশেষ। আয়ুর্ব্বেদে মানবের শরীরাভ্যন্তরে তিন স্থানে নানা বিধ ক্রিমির কথা আছে। একপ্রকার ক্রিমি রক্তের ভিতরে জন্মে, তাহারা—"অপাদাবৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্মাৎ কেচিদদর্শনাঃ।"

তাহাদের পা, নাই বর্ত্তুল আকার ও তাম্র বর্ণ। ইহারা এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুর গোচর নহে।

এই বচন দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে প্রাচীন কালে ভারতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, না থাকিলে চক্ষুর অগোচর বস্তুকে পাদ শূন্য ও তাম্র বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত না। প্রাচীন কালে ভারতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রও ছিল, সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। দূরবীক্ষণের নাম দীর্ঘ চক্ষুঃ, আর চশমার নাম উপচক্ষুঃ ছিল। আজ এ সকল অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিব না। ক্রিমির কথাই এখন বলিব। রক্তজ ক্রিমি কুষ্ঠাদি রোগ জন্মাইয়া থাকে।

আর এক জাতীয় ক্রিমি আমাশয়ে জন্মে। ইহারা ঠিক কেঁচোর মত; তাহার কতকগুলি শ্বেত বর্ণ কতকগুলি তাম্র বর্ণ। চামরার দোয়ালের মত চেপ্টা ক্রিমির কথা আয়ুর্ব্বেদে থাকিলেও আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর এক জাতীয় সূক্ষ্ম ক্রিমি মলের মধ্যে জন্মে ও মলের সহিত বহির্গত হয়। ইহা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদে আর কোন ক্রিমির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দেশ বিশেষে আর একপ্রকার ক্রিমির কথা আছে। ইহারাও আজ কাল আমাদের দেশে পৌঁছিয়াছে এবং মাথা গজাইয়া উঠিতেছে। ইহাদের নাম "গিনিওয়ার্ম"। ইহারা দীর্ঘ সূত্রের ন্যায়। হস্ত পাদ পৃষ্ঠ বক্ষ প্রভৃতির মাংসের মধ্যে

বাস করে। ইহারা শক্তিশালী হইলেই শরীরের কোন এক স্থানের চর্ম্ম মাংস বিদারণ করিয়া ক্ষত উৎপাদন করে এবং ক্ষত স্থানে সূত্রবৎ একটা কিক কিকিত বাহির করিয়া দেয়। সুদক্ষ চিকিৎসক দ্বারা ক্রমে আকর্ষণ বলে ঐ ক্রিমি বাহির করাইতে না পারিলে ক্ষত স্থান ফুলিয়া পচিয়া ক্রমে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি আকর্ষণে ছিন্ন হইয়া এই ক্রিমির কিয়দংশ মাত্র বাহির হয়, অবশিষ্ট শরীর মধ্যে থাকে, তবে আরও বিপদের কথা বটে। ইহারা প্রায় পুরোভূজের ন্যায়, ছিন্ন হইলেও মরে না, যে স্থানে ছিন্ন হয় সেই স্থানে আবার ক্ষত উৎপাদন করে।

অতএব ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে আকর্ষণ করিয়া বহুদিনে নিঃশেষ করিয়া বাহির করিতে হয়। যেদিন যতটুক বহির্গত হয় সেইটুকু একখানা কাঠিতে জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিতে হয়। এই নূতন রোগ আজও আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না বটে কিন্তু একবার যখন পৌছিয়াছে তখন ইহারা যে দলে দলে ভারতের রক্ত শোষণ করিতে আসিবেনা, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে।

আর এক জাতীয় ক্রিমি আছে তাহারা অতি অভিনব, এখন পর্য্যন্ত ইহাদের নামকরন হয় নাই। অল্প দিন হইতে অতি অল্প লোকের চক্ষুঃগোচর হইতেছে। ইহাদের বৃত্তান্ত আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন চিকিৎসা গ্রন্থে নাই। এলোপেথি, হোমিওপেথি, বাইকেমিক, হেকিমী কি কবিরাজি—ইহার কোন গ্রন্থেই ইহাদের কোন খোজ খবর পাওয়া যায় না। ইহারা মানুষের পেট জন্ম ও সময় সময় মলের সহিত বাহির হইয়া পড়ে। দেখিতে অনেকটা আমের পোকার মত; বর্ণও ঐরূপ কালো। ইহাদের পা আছে, পাখাও আছে, হাটিতে পারে উড়িতেও বিলক্ষণ পটু। ইহারা যত উড়িতে পারে আমের পোকা তত উড়িতে পারে না। উদর হইতে বাহির হইয়া উহারা ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে।

আজকাল ২।৩ জন লোকে দেখিয়া শুনিয়া এই ক্রিমির কথা বিশ্বাস করেন বটে কিন্তু ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই জাতীয় ক্রিমির কথা কেহ বলিলে লোকে তাহাকে পাগল বা গাঁজাখোর বলিয়া মনে করিত।

আমি এই ক্রিমি বরিশালে ৩ জনের, যশোহরে ১ জনের, কলিকাতা ২ জনের, ময়মনসিংহে ৪ জনের উদর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছি। আমার ৫৬ বৎসর চিকিৎসা কালের মধ্যে মোট দশটী লোকের এই জাতীয় ক্রিমি দেখিয়াছি।

এই ময়মনসিংহ নগরে সহকারী হস্পিটালে যখন ডাক্তার সনাতন বসাক ছিলেন তখন জেলার উপকণ্ঠে সেওড়াগ্রামে একটী মুসলমান শিশুর এই রোগ জন্মিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব ক্রিমির কথা আমি ডাক্তার বাবুর নিকট বলিলে, তিনি শ্রবণমাত্রে বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে বলিয়া উঠিলেন মহাশয়! বলেন কি, আমরা সমুদ্রে উড্ডীয়মান মৎস্যের কথা শুনিয়াছি; আপনি যে মানুষের পেটে উড্ডীয়মান ক্রিমির আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, না হউক, আমি আত্মীয় ভাবে বলিতেছি এ কথা আর কোথাও বলিবেন না। কালিদাসের কুমার সম্ভবে আছে পুরাকালে পাহাড়ে পাখা ছিল, তাহারা আকাশে উড়িয়া বেড়াইত, আপনার এই উড়ন্ত ক্রিমির কথা উড়ন্ত পাহাড়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে।

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা নিজে যাহা না বোঝে, বা না দেখে, তাহার অস্তিত্ব কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। যাহাহউক, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া ডাক্তার বাবুকে জব্দ করিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া রোগীর পিতার নিকট বলিলাম, দেখ তোমার পুত্রের রোগ বড় কঠিন, আমি একা চিকিৎসা করিতে সাহস পাইনা, সনাতন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ডাক্তারকে মল ও ক্রিমি দেখাইতে হইবে, যতক্ষণে বাহ্য না হয় ততক্ষণ ডাক্তার খানায় থাকিতে হইবে। মিঞা সাহেব পুত্রের মমতায় পরদিন শিশুকে ডাক্তারখানায় আনিল, আমিও সেখানে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার বাবু উড়ন্ত ক্রিমি দেখিবার উৎসাহে শিশুটীকে পিতার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া রাখিলেন। ঘণ্টাখানেক পরেই তাহার বাহ্য হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু খবর পাইয়াই নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবার তরল মলের সহিত ১৪।১৫টা উড়ন্ত ক্রিমি বাহির হইল। ডাক্তার বাবু কাঠী দিয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগি-

[illegible], ক্রিমিকুলও যেন কাটার খোচার অপমান বোধ করিয়া প্রতিশোধ দিবার জন্য বিষ্ঠা মাখা গায়ে উড়িয়া [illegible] বাবুর পোষাক নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। [illegible] আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

এই জাতীয় ক্রিমি প্রায়ই শিশুদিগের হয়, দেখিতে যেরূপ অদ্ভুত উহাদের কার্য্য সেরূপ অদ্ভুত নহে। ক্রিমি [illegible] পেটে সামান্য বেদনা হয় এবং ঘন ঘন পাতলা [illegible] হয়। আহার্য্য বস্তু সহজে জীর্ণ হয় না, কাহারো [illegible] সামান্য জ্বর হইয়া থাকে। আমি যত জনের এই ক্রিমি দেখিয়াছি তাহার একটীও এই রোগে মারা যায় নাই। কেহ বা বহুদিন পরে আপনা হইতেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহবা আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিমির ঔষধ খাইয়া [illegible] দিনে ভাল হইয়াছে। যখন বিনা ঔষধেও ভাল হইতে দেখিয়াছি তখন যাহারা ঔষধ খাইয়াছে তাহারা ঔষধে, কি [illegible] আপনা হইতে ভাল হইয়াছে—তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। অদ্য পর্য্যন্ত এই ক্রিমির পৃথক কোন ঔষধ [illegible] হয় নাই।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

যন্ত্রাসুর।

[illegible] প্রতাপে দেবতারা আজ ভূলোক হইতে [illegible]। পৃথিবী জুড়িয়া এই অসুর অপ্রতিহত প্রভাবে [illegible] শাসন চালাইতেছে। ইহার প্রধান মন্ত্রী [illegible] জড়বিজ্ঞান; তাহার অসামান্য কৌশলের সহায়তায় [illegible] আজ অসাধ্য সাধন করিতেছে।

[illegible] অসীম সাহস। তাহার অহঙ্কারের চূড়া [illegible] উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আজ আকাশের সঙ্গে [illegible] করিতে চায়। সসাগরা বসুন্ধরা তার ভোগের দাসী, [illegible] ঐশ্বর্য্য-সম্পদ অকাতরে বিতরণ করিয়াও তিনি [illegible] সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইতে পারিতেছেন না। [illegible] প্রকৃতিকে অষ্ট-পাশে বাঁধিয়া অসুর তার বৈর প্রভুত্ব পরি-[illegible] করিতেছে। পীড়িতা, লাঞ্ছিতা, শৃঙ্খলিতা প্রকৃতি [illegible] ক্রীতদাসীর মত নির্ব্বাক [illegible] তার উদ্দাম অত্যা-[illegible] করিয়া চলিয়াছেন।

ওদিকে দেবতারা [illegible] মধু হইতে বঞ্চিত হইয়া ফিরিতে [illegible]। [illegible] ভক্তদের দুর্দ্দশার সীমা নাই।

সঙ্গীতের দেবতা, সাহিত্যের দেবতা, শিল্পের দেবতা, অন্ত কাহার ভক্তি বিহ্বল আত্মনিবেদনের নিষ্ফল অন্বেষণে ফিরিতেছেন? এক অঞ্জলি [illegible] আজ তাঁদের কাহারও নিকট হইতে পাইবার আশা নাই।

যখন অনাদৃত দেবতারা বিষাদ নীরে ভাসিতেছেন, ধরিত্রীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, তখন যন্ত্রাসুরের ষোড়শোপচারে পূজা—এক ভীষণ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

কারখানা যজ্ঞশালা হইতে যন্ত্রযজ্ঞের করালকৃষ্ণ ধূমরাশি নির্গত হইয়া বিশ্বের নিশ্বাস সংরুদ্ধ করিয়াদিতেছে।

দেব পূজায় ছাগ মহিষ বলি হয়, কিন্তু এই যন্ত্রাসুরপূজায় শত লক্ষ মানবের হৃদয় শোণিত নিরন্তর উৎসৃষ্ট, নিষ্ঠুর যন্ত্রাসুরের নির্দ্দয় দরবারের কাছে দয়ামায়ার অবসর নাই।

মিথ্যাধর্ম্মের ছদ্ম আবরণে বিরাট অনৃত মূর্ত্তিটি ঢাকিয়া ঐ দেখ যন্ত্রাসুর সহস্রের শ্রদ্ধাকুসুমাঞ্জলিতে ভূষিত হইতেছে! কত ভক্ত উদ্বেল হৃদয়ে তাহার স্তুতি পাঠ করিতেছে। কত বন্দী তার অযুত অবদান মুক্ত কণ্ঠে গাহিয়া গাহিয়া ফিরিতেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি, কত শাস্ত্র এক বাক্যে কীর্ত্তন করিতেছে, যে এই যন্ত্রাসুরই শাশ্বত, সত্য ও অদ্বিতীয়। আচার্য্য পুরোহিতেরা তারস্বরে দিকে দিগন্তে বিঘোষিত করিতেছেন, "হে মানবগণ! তোমরা সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই যন্ত্রদেবেরই শরণ লও, ইনিই তোমাদিগকে ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করিবেন।"

সবদেবতারই মূলমন্ত্র রহিয়াছে, উপাসকেরা সেই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করেন, কেন না বীজমন্ত্রই দেবতার স্বরূপ।

আমাদের যন্ত্রদেবের কি কোনও বীজ নাই? অবশ্যই আছে। তাহা আধুনিক সভ্যতার সর্ব্ববিদিত মহামন্ত্র—

"অধিকতমের প্রভূতম সুখসাধন"

মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান ভোগপ্রবণতায় এ বীজের জপ; [illegible] বিলাস প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া ইহার অবশ্যম্ভাবী, প্রত্যক্ষ [illegible] ধ্বংসেই ইহার অনিবার্য্য পরিণতি।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

গৌরীপুর [illegible] সাহিত্য সমিতিতে পঠিত।

বসন্ত রোগের টিকা।

বসন্ত অতি ভয়ানক রোগ, ইহার অপকারিতা ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এই রোগ নিবারণ জন্য টিকা দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। টিকা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কৃত্রিম উপায়ে কোন রোগের বীজ শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে শরীর উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। এই উদ্দেশ্যে টিকা দান প্রণালী অবলম্বন করিয়া কতগুলি ভয়ানক রোগের নিবারণ জন্য চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

আধুনিক রোগতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বহু যত্ন ও বহু পরীক্ষা করিয়াও টিকা দ্বারা বসন্ত ব্যতীত অন্যকোন রোগ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই।

আমাদের দেশে দুই প্রকার টিকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। বসন্ত বীজ দ্বারা টিকা এবং গোবীজ দ্বারা টিকা; বসন্ত বীজ দ্বারা টিকা দেওয়ার নাম বাঙ্গালা টিকা, ইহার ইংরেজী নাম ইনাকিউলেসন; সাধু ভাষায় নৃসূর্য্যাধান কহে। গোবীজ দ্বারা টিকা দেওয়ার নাম ইংরেজী টিকা, ইহার ইংরেজী নাম ভ্যাক্সিনেশন, সাধু ভাষায় ইহাকে গোম-সূর্য্যাধান কহে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে বসন্ত বীজ দ্বারা টিকা দেওয়ার প্রথা ছিল, কিন্তু এখন আইন দ্বারা উহা নিবারণ করিয়া সর্ব্বত্রই গোবীজ টিকা প্রচলিত করা হইয়াছে। উভয় বিধ টিকা দান প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বসন্ত-বীজ টিকা।

প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে বাঙ্গালা টিকা প্রচলিত ছিল সত্য কিন্তু ঠিক কোন সময় হইতে এই প্রথা এদেশে প্রথম আরম্ভ হয় তদ্বিষয় নিশ্চয়রূপে জানা যায় না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনপোল নগরে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরের লেডী মণ্টেগুর পুত্রের বসন্ত বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া হয়। লেডী মণ্টেগু ঐ নগর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিজ কন্যাকে টিকা দিয়া ইংলণ্ডে এই প্রথা সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন। বসন্ত রোগের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিষ্কার বসন্তের গুটী হইতে বীজ অর্থাৎ পুঁজ গ্রহণ করিয়া ঐ টিকা দেওয়া হইত। স্বয়ং উৎপন্ন বসন্ত রোগ অপেক্ষা এইরূপ টিকা দ্বারা উৎপাদিত বসন্ত মৃদু প্রকৃতির ও অল্পকাল স্থায়ী হইত। কিন্তু সময় সময় এই প্রথানুসারে টিকা দেওয়ায় অতি ভীষণ ফলও ফলিত। উহা দ্বারা বসন্ত বিষ সঞ্চারের দ্বার মুক্ত হইত বলিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গোবীজ প্রচলিত করেন।

গোবীজ টিকা।

বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গো-বসন্তের গুটীকা হইতে, অথবা গোদেহ হইতে গৃহীত বীজ দ্বারা মনুষ্য দেহে উৎপন্ন গুটিকা হইতে বীজ লইয়া টিকা দেওয়ার নাম ইংরেজী টিকা বা গোবীজ টিকা।

অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশেও গোবীজ টিকা প্রচলিত ছিল। ইহার কতক প্রমাণ ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা হইতে প্রচারিত বিজ্ঞাপনেতে পাওয়া যায়, তাহার একটী প্রমাণ যথা —

ধেনু স্তন্যা (?) মসূরীকা নরানাঞ্চ মসূরিকা
শস্ত্রেনোৎকৃত্য তৎ পূয়ং বাহুমূলে নিধাপয়েৎ
তৎ পূয়ং রক্ত মিলিতং স্ফোট জ্বর করং ভবেৎ॥

গোবীজ টিকা পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে প্রচলিত থাকিলেও উহা যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই লোপ পাইয়া বাঙ্গালা টিকার প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিন্দু মাত্রেও সন্দেহ নাই।

যে যাহা হউক, ডাক্তার জেনারের পূর্ব্বে ইউরোপের কোন ডাক্তার এই গোবীজ টিকা আলোচনা করেন নাই। ডাক্তার জেনারই গোবীজ টিকার আবিষ্কারক বলিয়া খ্যাত। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত গ্লচেষ্টার সায়রের অধীন বার্কেল নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্লচেষ্টার সায়রের কোন এক ডাক্তারের এপ্রেন্টিস্ থাকা কালে তিনি তথাকার একটী স্ত্রীলোককে বলিতে শুনিয়াছিলেন, আমার বসন্ত রোগ হইতে পারে

না, কারণ আমার একবার গোবসন্ত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে উক্ত প্রদেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে গোদোহন করিতে করিতে যাহার অঙ্গুলিতে গোবসন্ত হয়, তাহার আর কখনই বসন্ত হয় না। এই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া, তিনি এই বিষয় আলোচনা করিতে থাকেন। তাঁহার সেই আলোচনা পরীক্ষা ও চিন্তার ফলে এই মীমাংসায় উপনীত হন যে গোবীজ দ্বারা মনুষ্যকে টিকা দিলে তাহার বসন্ত রোগ হইতে পারে না।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ মে তারিখে জেনার সর্ব্বপ্রথম একটী আট বৎসরের বালককে গোবীজ টিকা দেন গোবসন্ত আক্রান্ত একটী গোপ কন্যার হস্তস্থিত বসন্ত গোটিকা হইতে এই বীজ লইয়া ঐ বালককে টিকা দেন। গোবীজ টিকা দেওয়ার পর ঐ বালকের শরীরে বসন্ত বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহার বসন্ত রোগ হইল না। তৎপর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এ সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখেন ও তাহাতে তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। উহার সার মর্ম্ম এই—

১। গোবসন্ত বীজ দ্বারা মনুষ্যদিগকে উপযুক্তরূপে টিকা দিতে পারিলে তাহার আর বসন্ত রোগ হইবে না।

২। দুগ্ধবতী গাভীর বাঁটে ও বালে এক প্রকার বসন্ত হইয়া থাকে ঐ বসন্ত গোটী হইতে বীজ লইয়া টিকা দিতে হইবে, অন্যকোন ফুস্কুরী (যাহা বসন্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে) হইতে বীজ লইয়া টিকা দিলে বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবে না।

৩। ডাক্তারগণ অতি সহজে মনুষ্য শরীরে বসন্ত বীজ প্রবেশ করাইতে পারেন।

৪। একবার গোবসন্ত বীজ দ্বারা একজনকে টিকা দিয়া তাহার গোটী হইতে বীজ লইয়া অন্যকে টিকা দেওয়া যাইতে পারে। গোবীজ দ্বারা টিকা দিলে লোক যে প্রকার বসন্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে কোন টিকা গৃহীতার টিকা হইতে বীজ লইয়া টিকা দিলেও ঠিক সেইরূপ রক্ষা পাইতে পারে।

এই সময়ের তিন বৎসর পর জেনার সাহেব এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে তিনি ৬০০০ লোককে মানব দেহে প্রবিষ্ট বীজ পরাম্পরার টিকা দ্বারা সফলতার সহিত টিকা দিতে পারিয়াছেন; এইরূপ বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া যায় বলিয়া ভ্যাক্সিনেসন আরও অধিক সমাদৃত হইয়াছে।

অতঃপর অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, স্পেন, ইটালী এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে এই প্রথা প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল; সাধারণের উপকারী বলিয়া ডাক্তার জেনারও নানা প্রকার সম্মানে সম্মানিত হইতে লাগিলেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে তাঁহাকে ২০০০০ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে এই প্রথা প্রচলিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, এদেশেও ক্রমে বাঙ্গালা টিকা রহিতার্থ এবং গোবীজ টিকা প্রচলিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন।

অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সকল শিশুরই চারিমাস বয়স হইলেই টিকা দিতে হইবে— এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্নে এই দেশের সর্ব্বত্রই এখন এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রামগতির সদুত্তর।

বনমালি ন্যায়রত্ন যান শিষ্য বাড়ী
তখন হয়েছে বেলা দণ্ড দুই চারি।
দেখেন রামগতি তথা বসে তে-পথায়
শীতের সুমিষ্ট রোদ শরীরে পোহায়।

অমনি তাহারে প্রশ্ন করেন গোসাঁই
জাতি নাকি গেছে তব শুনিবারে পাই?
আস্তে ব্যস্তে উঠি নতি করি কর-যুর
কহিলা রামগতি "আজ্ঞা, গেছে কত দূর?

তার সাথে আপনার কোন খানে দেখা"?
প্রশ্নের উত্তরে হ'ল পণ্ডিতের ঠেকা।

শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ।

সঙ্গীতের ত্রিমূর্ত্তি

প্রথম রস রূপ।

সঙ্গীতবিৎদিগের মধ্যে যিনি কবি এবং ভাবুক তিনিই শুধু এইরূপের পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

হৃদয়ের পাত্রেই রস নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যিনি হৃদয়বান্ তিনিই রসকে সৃষ্টি করিতে এবং বিতরণ করিতে সমর্থ।

হৃদয় দ্বারাই হৃদয়কে জয় করিতে হয়। তোমার হৃদয় যখন রসের প্লাবনে উদ্বেল হইয়া উঠিবে অপরের হৃদয়ও একমাত্র তখনই সেই তরঙ্গের আঘাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে।

নদী যখন বর্ষা সলিলে বেগবতী—উপনদীগুলি তখনই স্রোতশালিনী।

শ্রোতা যখন ভাবের আবেগে বেপথুকে প্রাপ্ত হইবেন তখনই বুঝিতে হইবে সঙ্গীত আজ রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

দ্বিতীয় কলারূপ।

যিনি শিল্পী একমাত্র তিনিই এই রূপের পরিচয় পাইয়াছেন।

শুধু সাধনা দ্বারা এই রূপকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। স্বতঃস্ফূর্ত্ত শিল্প প্রতিভা সাধনা দ্বারা মার্জ্জিত হইলেই ইহাকে প্রকাশ করা সম্ভবপর।

শিল্পী সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করেন এবং সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তোলেন।

সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে কিন্তু সে রূপ নিরাভরণ হইলে চলিবে না।

অলঙ্কার—ভূষিত করিবার জন্য; স্বাভাবিক শোভাকে অন্তরালে রাখিয়া তাহার উপরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নহে।

তানে এবং মূর্চ্ছনায় শোভিত হইয়া লীলায়িত ছন্দের গতিতে সঙ্গীত যখন শ্রোতার নিকট অনন্ত সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে আজ কলা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয় বিজ্ঞান-রূপ।

যিনি বিচার শক্তি সম্পন্ন, যিনি জ্ঞানী, একমাত্র তিনিই এই রূপকে লাভ করিতে পারেন।

বিচার দ্বারা সপ্ত স্বরকে পরিমিত করিতে হইবে এবং বিচার দ্বারাই রাগাদির স্বরূপ নির্ণীত হইবে।

জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর; সঙ্গীতের প্রাণ বস্তুকে জানিতে হইলেও জ্ঞানেরই আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক।

বিশুদ্ধ রাগে, পরিমিত স্বরে এবং ছন্দের নিরূপিত গতিতে সঙ্গীত যখন শ্রোতার নিকট প্রবুদ্ধ উপভোগের আনন্দকে লইয়া উপস্থিত হইবে তখনই বুঝিতে হইবে সে আজ বিজ্ঞান-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

ত্রয়ীকে যিনি অবগত হইয়াছেন ব্রহ্মকে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যিনি এই ত্রিমূর্ত্তির সম্যক পরিচয় পাইয়াছেন তিনিই সঙ্গীতকে প্রকৃষ্টরূপে লাভ করিয়াছেন।

এইরূপ ত্রয়কে যিনি একত্ব প্রদান করিবেন তিনিই শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ এবং তিনি যে আনন্দ বিতরণ করিবেন তাহা ব্রহ্মানন্দেরই তুল্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

দোলের দোলন।

আম্র মুকুল ফুটেছে মাধব কোকিল উঠিল জাগি,
কুন্দকুসুম শিশির মাখান পূজার অর্ঘ্য লাগি!
অরুণ উদয়ে তরুণ কিরণে জাগায়ে আবীর-ভাজ,
ভক্ত জনের হৃদি-দোলনায় দোল হে বিশ্বরাজ!
দুলিয়া দুলিয়া বহিছে মলয় তরুলতা দেয় দোল্,
শাখীর শাখায় পাখীরা দুলিছে গাহিয়ে মধুর বোল্।
অলিরা দুলিছে কুসুমের বুকে মোহন কুঞ্জ-মাঝ,
ভক্ত জনের হৃদি-দোলনায় দোল হে বিশ্বরাজ!
নিখিল ভুবন ব্রজধাম হলো দোল লীলা রসে মাতি
পূর্ণিমা আজ হিন্দোলে বরে অখিল উজোর কাঁতি।
ফাগুনে ফাগের ললিত ছটায় ধারয়ে হোরির সাজ
ভক্ত জনের হৃদি দোলনায় দোল হে বিশ্বরাজ!
আবীর রাগে রঞ্জিত কর আকাশ বাতাস সব,
জনম-মৃত্যু-শঙ্কা হরহে শুনায়ে মুরলী রব।
দুলির তালে দুলিছে বিশ্ব বাজিছে মুরজ ঝাঁঝ,
ভক্ত জনের হৃদি-দোলনায় দোলে হে বিশ্বরাজ!

শ্রীযামিনীকুমার বিদ্যাবিনোদ।

প্রীতি-উপহার।

মাঘ মাস। প্রেসে ভিড় লাগাই ছিল। সরস্বতী পূজার চিঠি, মাঘোৎসবের হেণ্ডবিল, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, রকমারী প্রীতি উপহার, তার উপর বন্ধুবর গৌরহরি বাবুর নূতন মাসিক পত্রিকা। এ অবস্থায় প্রুফ দেখার সময় দূরে থাকুক, নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ ছিল না। ইহার পর নিজেদের পত্রিকার কাজ ও অন্য গ্রাহকের কাজ তো আছেই।

নিজেদের কাজ মুলতবী রাখিয়া, বাজে কাজের প্রুফ রিডারের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া একমনে গৌরহরি বাবুর "বিভীষিকার" প্রুফ দেখিতেছিলাম। শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বদিন কাগজ বাহির করিয়া দিতে হইবে; নতুবা তাঁহার ব্যবহার রুক্ষ হইবে, মেজাজ গরম হইবে, উৎসাহ নিস্তেজ হইবে, বন্ধুতা-বন্ধন ছিন্ন হইবে, সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্যয়িত অর্থ সমস্তই নাকি জলে যাইবে। প্রকৃত প্রস্তাবেও এগুলি সত্য। নূতন সাহিত্যিকের অনেক নবীন উদ্যম মুদ্রাযন্ত্রের এইরূপ অপরিহার্য্য ব্যবহারে যে ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

১টা বাজে, তখনও স্নান হয় নাই। পত্রিকার প্রুফটা না দেখিয়া দিলে কম্পোজিটার বসিয়া থাকিবে তাই অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাহা দেখিতেছিলাম। এমন সময় একটা সুন্দর টুকটুকে বালক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"একটা প্রীতি উপহার ছাপিতে চাই আমি ..."

সহস্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও গ্রাহককে বিমুখ করিয়া দেওয়া বা একটু সামান্য মিষ্ট মুখের কৃপণতায় গ্রাহকের মনে বিরাগের সঞ্চার হইতে দেওয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে যে সঙ্গত নহে—এদিকে বেশ লক্ষ্য ছিল। আমি ছেলেটির দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম—"দেখি কিরূপ প্রীতি উপহার!"

"আমার নিকট নাই, একটা নমুনা দেখিয়া আমি পছন্দ করিয়া নিব।"

আমি তাহাকে ম্যানেজারের নিকট যাইতে ইঙ্গিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারকে ডাকিয়া দিলাম। সে তাহাকে লইয়া গেল এবং উপহারের ফাইল বুক খুলিয়া তাহাকে দেখিতে দিয়া সেও তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের দিগে মনোযোগ প্রদান করিল।

২

মিনিট বিশের মধ্যে স্নান আহার শেষ করিয়া আসিয়া দেখি, দুপুরে যে জমাদ্দারের আসিবার কথা ছিল, সে খবর পাঠাইয়াছে তাহার কাঁপুনী ধরিয়া জ্বর উঠিয়াছে সুতরাং এ বেলা আসিবে না। তখন ম্যানেজারকে প্রেসম্যান করিয়া, কম্পোজিটারকে ফর্ম্মা আটিতে দেওয়া হইল; এবং নিজেই কাগজ কাটিতে বসিয়া যাওয়া গেল, উপায় নাই—কাজ 'মুলতবী' পড়িলে তাহা 'কয়ছল' করা সুকঠিন। বিশেষ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় কাজগুলি দিতেই হইবে। আর পর রাত্রিও আছে—"বিভীষিকাও" আছে।

কাজের এইরূপ বন্দোবস্ত করা গেল বটে কিন্তু ব্যবস্থা মত কাজ বেশী দূর অগ্রসর হইতে লাগিল না। উপায় নাই—শেষ, যাহাদের কাজ নিতান্তই আজ না দিলে নয়; তাহাদেরই কাজ চলিল। সেই বালকটী তাহার প্রীতি উপহারখানা যে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাওয়া প্রয়োজন, তাহা ম্যানেজারকে বুঝাইয়া দিয়া কম্পোজিটারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার কম্পোজের কার্য্যে আগ্রহ সহকারে সাহায্য করিতেছিল।

এইরূপ বিশৃঙ্খলায় পড়িয়া মাথা এবং মেজাজ উভয়ই যখন বেজায় গরম এবং বেতাল হইয়া উঠিল, তখন কাগজ কলম রাখিয়া চস্মা খাপের ভিতর পুরিলাম; তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। একটী পরিচিত কলেজের ছোকরা বাইকে চড়িয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ করিল—"রাম বাবুর বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ—রাত্রি ৮ টায় বিবাহ দেখিবেন; কাল দ্বিপ্রহরে আহার করিবেন।"

ধন্যবাদ জানাইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

৩

রাত্রি ৮ টায় বিবাহ বাড়ীতে যাইয়া দেখি, মহা বিভ্রাট বাঁধিয়াছে। বিবাহ হইবে না; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিতে আসিয়া বরের পিতার কি এক গোপন ব্যবহারে একেবারে উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়াছেন—তাঁহারা ঐ বরে কন্যা

সম্প্রদান কিছুতেই করিবেন না।

বরের পিতারও মূর্ত্তি উগ্র।

বিষয় কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন স্পষ্ট তত্ত্ব অবগত হওয়া গেল না। নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকগণও কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। এমন একটা বিভ্রাট কোন ভদ্রগৃহের বিবাহে একেবারেই হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। পাত্রী পক্ষের সহিতও যে আলাপ পরিচয় না ছিল, তাহা নহে। বিভ্রাট গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখিয়া কন্যাকর্ত্তার দরবারেই যাইয়া ভিতরের কথা জানিতে চেষ্টা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"ব্যাপার কি মহাশয়, আপনারা কি একটা সম্মান অসম্মানের ভয় করেন না? আজ যদি বিবাহ নাই হয়—তখন ক্ষতিটা কার? ছেলের বিবাহ আজ না হলে, কাল হইবেই। মেয়ের পক্ষে কিন্তু....."

কন্যা কর্ত্তা কথা শেষ করিতে দিলেন না। উগ্র মূর্ত্তিতে সম্মুখে আসিয়া—একটা লাল রঙ্গের কাগজ উড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—

"না হয়—না হইবে, তাই বলিয়া জুচ্চুরীতে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না...সতীনের ঘরে মেয়ে দেওয়া অপেক্ষা বাঘের মুখে ফেলিয়া দিব—সেও ভাল......"

সে কেমন? কি বিষয় বলুন দেখি? ছেলে তো দুর্ঙ্গবর নয়—আপনাদিগকে কে বলিল, এইরূপ কথা?"

"নয়! দেখুন দেখি!" বলিয়া ভদ্র লোকটী আমার হাতে সেই লাল কাগজ খানা ধরিয়া দিলেন।

দেখিলাম, তাহা এক খানা সোণার পাউডারে মুদ্রিত প্রীতি-উপহার; ছাপা—আমাদেরই প্রেসে।

আমি বলিলাম "ইহাতে কি আছে? এ যে একখানা প্রীতি-উপহার—পাত্রের ভগিনীগণ তাঁহাদের ভ্রাতাও ভ্রাতৃবধূর উদ্দেশে দিয়াছেন।

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে কন্যা পক্ষের আর একজন ঐ প্রীতি-উপহারের দুটী ছত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—পড়ুন, পড়ুন দেখি

দেখিলাম, তাহার একটিতে পাত্রকে লক্ষ্য করিয়া লেখা রহিয়াছে—

"লক্ষ্মী সরস্বতীরূপে দেখিও দোঁহারে।"

আর একটীতে পাত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে

"আপন বোনের মত দেখিও উহারে।

সাগ্রহে তখন আদ্যন্ত সকলটা-লেখা পড়িয়া ফেলিলাম এবং ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলাম। আমি তখন যুক্তকরে কন্যাকর্ত্তাকে বলিলাম—"আপনারা একটা ভুলের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আর একটা প্রকাণ্ড ভুল গড়িয়া তুলিয়াছেন—এ পাত্র দ্বিতীয় বর নয়; ইহার ঘরে সপত্নী নাই—আপানারা যে কি প্রকারে এইরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা শীঘ্রই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। আপাততঃ আমার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আশ্বস্ত হন—এবং শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হন। আপনাদের মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিবার হেতুটা যে ভিত্তিহীন তাহা নহে।"

এই সময় আরো দুই একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমার কথার সমর্থন করিয়া পাত্রের যে এই ১ম বিবাহ, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন।

কন্যাকর্ত্তাকে এইরূপে সান্ত্বনার পথে আনিয়া সেই বিভ্রাটের বীজ প্রীতি উপহার খানা লইয়া দৌড়িয়া বর কর্ত্তার গৃহে আসিলাম।

প্রীতি-উপহারটাই যে এই বিভ্রাটের মূল কারণ, তাহা ভাবিয়া আমার প্রচুর লজ্জা বোধ হইতে থাকিলেও এইরূপ একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এইরূপ একটা বিভ্রাট হওয়ায় তুলনায় তাহা অতি সামান্য—বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিয়া বরকর্ত্তা রাম বাবুকে বিভ্রাটের কারণ বুঝাইয়া বলিলাম এবং কিরূপে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে তাহাও সলজ্জভাবে বিবৃত করিলাম। প্রীতি-উপহারখানা আমার হাতেই ছিল। আমি প্রীতি-উপহার ঘটিত গোলের কথা প্রকাশ করিলে সকলেরই দৃষ্টি প্রীতি-উপহারের সেই পংক্তিদুটীর প্রতি নিপতিত হইল।

বরকর্ত্তা রাম বাবু তাঁহার নবাগত দৌহিত্রটীকে ডাকিয়া আনিলেন। দেখিলাম এই বালকটাই প্রীতি উপহার ছাপাইবার জন্য আমার নিকট গিয়াছিল।

তাহাকে প্রীতি উপহারের লেখা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে অম্লান বদনে উত্তর করিল—প্রেসের ফাইল বুকের

সে উপহারটী তাহার পছন্দ হইয়াছিল তাহাতে কেবল বর কন্যার নাম বদলাইয়া তাহাই সে ছাপাইয়া আনিয়াছে। সে আরো বলিল—লিখিবার সময় অভাবে এবং লিখাইবার লোক অভাবেই সে এরূপ সহজ পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল।

এইরূপ অনাবিল আনন্দের ব্যাপারে যে এমনতর বিভ্রাটের বীজ নিহিত থাকিতে পারে তাহা তাহার বালক বুদ্ধিতে আসিতে পারে নাই। প্রকৃত ব্যাপার তখন সকলেই বুঝিলেন। সকলের দৃষ্টিই তখন যেন আমার সলজ্জ মুখের উপর স্থাপিত রহিল। উপায় নাই। ঘটনাটীর যে শেষ মীমাংসায় এত সহজে উপনীত হইতে পারিলাম এই সম্বন্ধেই আমার পরম সান্ত্বনা হইল।

প্রীতি উপহারের বিভ্রাটে বিবাহের প্রথম লগ্ন কাটিয়া গিয়াছিল। অতঃপর শেষ রাত্রির সুতহিবুক যুগ আশ্রয়ে শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

ভুল ভাঙ্গা।

এক

এমে পাশ করেছি, এখনও বিয়ে করিনি; আমার প্রতিজ্ঞা ছিল নিজে না দেখে বিয়ে কর্‌ব না। কিন্তু এইখানেই আমি মস্ত ভুল করেছিলাম।

যাকে প্রথম দেখে ছিলাম তাকে সুন্দরী না বল্‌লেও সুশ্রী বলে ঘরে আন্‌লে ঠকা হয় না, কিন্তু আমার তাতে মন উঠেনি; তবে লজ্জায় পছন্দ হয়নি বল্‌তে না পারায় বিয়ে হয়ে গেল।

দিন একরকম সুখেই কেটে যাচ্ছে—কিন্তু প্রেমে নয় আত্ম গরিমায়, গর্ব্ব এই যে, মেয়েটাকে বিয়ে করে আমি একটা মস্ত ত্যাগ স্বীকার করেছি। প্রথম ২ সে যা করে, আমায় সুখী কর্‌বার জন্য করে—ভেবে মনে ২ খুব সুখ অনুভব কর্ত্তুম্। মনে ভাবতুম যখন ওকে বিয়ে করেছি তখন ওকে অসুখী করবার কোন দরকার নেই; আমি নিজে কোন খারাপ ব্যবহার করব না; তবে ভালবাসতে পারব না বোধ হয়। আমি যে তাকে ভালবাসি না, রাণু ইহা কিছু দিন পরেই বুঝতে পেরেছিল, কারণ আগে সে খুব গল্প করত, এবং কথায় কথায় অভিমান করত।

দুই

কিছুদিন পরে সে নিজ হ'তে কথা বলা একরূপ বন্ধ করল, আমি কথা বললেও সে প্রায় সব কথার উত্তর দিত না। যা দু একটা কথার উত্তর না দিলেই নয়, তারই উত্তর দিত।

এমন কি আমি কোথাও গেলে একখানা চিঠি দিতেও বলে না, এবং চিঠি না দিলেও আর আগের মত ঝগড়া করে না; আগে এই চিঠি লেখা নিয়ে দেরী হলে সে অভিমান করে কত লিখত।

এখনও সে অন্য লোকের সঙ্গে খুব গল্প করে, কিন্তু আমার কাছে আসলেই যেন কেমন গম্ভীর হ'য়ে যায়।

তার এই ভাব দেখে আমার মনে হতো, সে মনে ভাবে আমি তার উপযুক্ত হইনি—সেই জন্য সে ওরকম করে।

আমি মনে এই ভুল ধারণা করে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্ত্তুম্ যাতে তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হতো যে আমি বিয়ে করে তাকে কৃতার্থ করেছি। এক এক দিন রেগে এমন ধরণের কথাও বলেছি, যে তাকে বিয়ে করাটা আমার নিতান্তই অনুগ্রহ।

সে তাতেও কিছু বলত না; শুধু প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে একটু চাইত। তার এই চাউনিতে যে কি ছিল জানি না, আর আমার রাগ করা হতো না।

তাকে আদর করতে চাইতুম। সে কিন্তু আমার এই আদর গ্রহণ করত না।

তার এই গর্ব্বিত ভাবটাই আমাকে মুগ্ধ করত। সে যে কাঙ্গালের মত আমার ভালবাসা পাওয়ার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে আমার দানকে রাণীর মতই হেলা ভরে ফিরিয়ে দিত, এই জন্যই আমি রাণুকে সত্য ২ ভালবাসতে সুরু করলুম।

তিন

কিছুদিন পরে রাণু তার বাপের বাড়ী গেল। যাওয়ার সময় বোধ হয় কর্ত্তব্যের খাতিরে বলে গেল—মাঝে মাঝে যেন খবর দিই।

এতেও আমি যেন একটু অবাক হয়ে গেলাম। অনেক দিন এরকম একটু কথাও যে তার মুখে শুনিনি।

সে চলে গেলে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল; তার উপর আবার কোন চিঠি পাচ্ছি না। আজ চিঠি পেয়েছি—সে ভাল আছে।

আমি তার কাছে লজ্জায় চিঠি দিতে পারলেম না। আমি যে এতদিন তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি তাই মনে করে। ভেবে ঠিক করে রেখেছি এবার সে এলে নিশ্চয় একটা বোঝাপড়া করব।

অনেক দিন মনে করেছি যে এর একটা যা হয় মীমাংসা করে ফেলি, কিন্তু কিছুতেই তা পারিনি।

রাণুকে এইসব কথা বল্লেই সে অন্য কথা বলত, না হয় চুপ করে থাক্‌ত; তাতে আমার গর্ব্বে আঘাত লাগত; আমিও চুপ করে যেতুম।

ভাবতুম আমি তো তোমায় অসুখী করতে চাই না। তুমি নিজেই যখন দুঃখ বরণ করে নেবে তার আমি কি করব?

চারি

এক মাস পরে সে ফিরে এল। আজ আর আমার সহ্য হচ্ছে না; মনকে দৃঢ় করেছি—আজ একটা যা হয় করব। শুয়ে শুয়ে কেমন করে কথাটা উঠাব তাই ভাবছি; এমন সময় রাণু এসে আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পরল। তখন পর্য্যন্ত কোন উপায় খুঁজে পাইনি, দেরী করলে পাছে রাণু ঘুমিয়ে পরে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা জেলে একেবারেই প্রশ্ন করলুম "রাণু আমি কি তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছি?"

প্রথমে সে কোন উত্তর দিল না, জবাব না পেয়ে তার ডান হাতটা একটু জোরে চেপে ধরে আবার প্রশ্ন করলুম, সে শুধু বলল "লাগে যে"। হাতটা ছেড়ে দিলুম।

তার কথায় বুঝলুম এ সম্বন্ধে সে কোন কথা বলতে চায় না, কিন্তু আমার কেমন রোখ চেপেছিল; দৃঢ় স্বরে বললুম "আমি তোমার সঙ্গে কি মন্দ ব্যবহার করে'ছি তোমার বলতেই হবে।"

উত্তরের আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম, দেখলুম, তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে; তার পরেই মুখে স্বাভাবিক ভাব এনে, কোনরূপ আবেগ প্রকাশ না করে, শান্ত সংযত কণ্ঠে উত্তর দিল, "মন্দ না হলেও ভাল ব্যবহার করনি।"

একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম! এরকম উত্তরের আশা করিনি; আমি আবার বললুম "ভাল ব্যবহার করিনি?"

সে উত্তর দিল "যা করা উচিত ছিল তা করনি?"

ক্ষীণ স্বরে বললুম "যা করা উচিত ছিল তা করিনি?"

সে বেশ সংযত স্বরেই বলল—আমি তাকে বিয়ে করে একটা মস্ত ত্যাগ স্বীকার করেছি—এই ভুল ধারণা নিয়ে গর্ব্ব করা চলে না; স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য আমি তাকে তা দিইনি. বৃথা আত্ম গরিমায় অন্ধ হয়ে তাকে কৃপা করেছি, ভালবাসিনি এতে তার নারীত্বকে অপমান করতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

রাণুর এই কথা শুনে আমার যেন চমক ভাঙ্গল তার দিকে আর চাইতে পারলুম না।

সব ত্রুটী স্বীকার করে আবেগের সঙ্গে তাকে বুকে টেনে নিলুম, সেও বেশ সহজ ভাবে নিজকে আমার কাছে ছেড়ে দিল। ঘরের আলোটা উজ্জ্বল হয়ে হাসতে লাগল।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সংগ্রহ।

ডাক্তারের প্রয়োজনীয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ্।

কৃষি সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে আমাদের বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড, লাঙ্গল, বীজ, সার ইত্যাদি নানা উপকরণের কথা মনে হয়। সমুদ্রের তলদেশে যে কৃষি হইয়া থাকে তাহার খবর হয়ত অনেকে রাখেন না। স্পঞ্জ, প্রবাল প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য বহু প্রকার উদ্ভিদ আমরা সমুদ্র গর্ভ হইতে পাইয়া থাকি, আজকাল কীটানুতত্ত্ববিদ্ ডাক্তারগণ কীট (Microbes) কর্ষণ করিবার জন্য যে এগার এগার (Agar-Agar) ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাও একরূপ সমুদ্রজাত উদ্ভিদ্। ইহা দ্বারা একরূপ জখমেরও চিকিৎসা হইয়া থাকে। প্লাষ্টার অব পেরিস্ (Plaster of Paris) দ্বারা সাজ (Moulds) তৈয়ার করিতেও ইহার ব্যবহার হইয়া

থাকে। বিয়ার প্রভৃতি মদ ইহা দ্বারা পরিস্কৃত হয় এবং রেশমের সূতা শক্ত করিতেও ইহার প্রয়োজন। কেল্প নামক ক্ষীর একরূপ সমুদ্রজাত উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কেল্পের মধ্যে অনেক প্রকার মৎস্য বৃদ্ধি পায় বলিয়া কেলিফর্ণিয়া গভর্ণমেন্ট্ এই সকল মৎস্য আবাদের সময়ে কেল্প কাটিতে দেন না।

এই কেল্প ২।৩ ফুট হইতে নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া প্রায় ১০০ ফুট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এখন নানারূপ যন্ত্রপাতি সাহায্যে এই উদ্ভিদ কাটা হইয়া থাকে। জাহাজে মাত্র ৫ জন নাবিক নিয়া কল কব্জা সাহায্যে ঘণ্টায় প্রায় ৮২৫ মন কেল্প কাটা হইয়া থাকে। জাপানেও এই কেল্পের ব্যবসা বহুদিন যাবৎ প্রচলিত আছে। তথায় স্ত্রীলোকগণ সমুদ্র গর্ভে ডুব দিয়া এই কেল্প কাটিয়া থাক। একদিনে একজন মাত্র ১২ ডুব দিতে পারে। এইরূপে সংগ্রহ করিয়াই জাপান বহু এগার-এগার এমেরিকা এবং ইউ-রোপে চালান দিয়া থাকে। এই এগার-এগার প্রায় ১০০৲ টাকা মন বিক্রয় হয়। এই সকল জলজ উদ্ভিদ সুবিধা মত কাটিতে পারিলে বৎসরে ৩।৪ ফসল কাটা যায়। সুবিধা এই, এই কৃষিতে কোনরূপ চাষের দরকার হয় না।

পায়জামায় বিপদ।

বেলগ্রেডে (Belgrade) পায়জামা ব্যবহার করা এক বিপদের কথা। তথায় যে সব পাগল গারদে থাকে তাহাদিগকে সর্ব্বদা পায়জামা পরিধান করিতে দেওয়া হয়। সে জন্য পায়জামা পরিহিত লোক বাহিরে দেখিলে লোকে তাহাকে পাগল মনে করে। কিছুদিন হয় এক রাত্রিতে অত্যন্ত গরম পড়ে। সে সময়ে এক জন যুবক রাত্রির পোষাকে (পায়জামা পরিহিত অবস্থায়) বাগানে পায়চারি করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হয়। সে সময়ে নিকটেই এক বাড়ীতে গান বাদ্য হইতেছিল। সে উন্মনস্ক ভাবে চলিতে ২ ঐ বাড়ীর নিকট উপস্থিত হয়। সে সময়ে এক পাহারাওয়ালা তাহাকে দেখিতে পাইয়া পলাতক পাগল বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার সময়ে সে একটী টুপি চায়। তখন পাহাড়া-ওয়ালা পাগলের উপযোগী একটী টুকরি (waste-paper basket) তাহার মাথায় দিয়া তাহাকে আদালতে উপস্থিত করে। রাস্তার লোক তাহা দেখিয়া হাসিয়া কুটপাটি। যুবক গান শুনিবার সখের বিড়ম্বনায় লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল।

আর একদিন এক গৃহস্থ রাত্রিতে বাড়ীতে চোর আসায় চোরের পিছু ২ ধাওয়া করে। রাস্তায় দৌড়াইতে ২ তাহারা এক পুলিশের সম্মুখে উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে গৃহস্থের পরিধানে রাত্রির পোষাক অর্থাৎ পায়জামা ছিল। চোর পালাইবার উপায় নাই দেখিয়া এক উপস্থিত বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। চোর গৃহস্থকে দেখাইয়া পুলিশকে বলে "আমাকে পাগলের হাত হইতে রক্ষা কর।"

কর্ম্মনিষ্ঠ বুদ্ধিমান পুলিশ তৎক্ষণাৎ পায়জামা পরিহিত গৃহস্থকে পাগল মনে করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। ইত্যবসরে চোর নির্ব্বিঘ্নে তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। পায়জামা পরিহিত গৃহস্থ একরাত্রি থানায় কাটাইয়া পরদিন বাড়ী ফিরে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

সাহিত্য সংবাদ।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের কার্য্য ও মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনের কার্য্য বেশ রীতিমত চলিয়াছে। ২৭শে ফাল্গুন গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের ১১শ অধিবেশন এবং ২৪শে ও ২৫শে ফাল্গুন মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গৌরীপুরে মাসে একবার এবং মুক্তাগাছায় মাসে দুইবার সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। এই উভয় সম্মিলনেই প্রচুর প্রবন্ধ গৃহীত ও পঠিত হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা—তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানেরই উদ্যোক্তাগণের উৎসাহ ও উদ্যম অটুট রাখুন।

বাঙ্গালার প্রাচীন নাট্যকার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে স্বর্গ প্রয়াণ করিয়াছেন। ফরাসী সাহিত্যে ইহার বিশেষ অধিকার ছিল। মঙ্গলময় পরম পিতা ইহার আত্মার সদগতি এবং পরিবারের হৃদয়ে শান্তি দান করুন।

Shourabh—Reg. No. 745.

ত্রয়োদশ বর্ষ। বৈশাখ—১৩৩২ চতুর্থ সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী।

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

খেদা কেম্প।

সৌরভ

ত্রয়োদশ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩২। } চতুর্থ সংখ্যা।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্-সি)

[রাধানগরের সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শখার সভাপতির অভিভাষণ]

আলোচ্য বিষয়ে কোনও কথা বলার পূর্ব্বে আমার প্রতি এবারের বিজ্ঞানশাখার পরিচালনের ভারার্পণ জন্ম আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অযোগ্য হস্তে গুরুভার পড়িলে যাহা হইয়া থাকে এস্থলেও তাহাই ঘটিয়াছে। আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমার দীন নিবেদন, আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

নূতন বাঙ্গালার সকল সাধনার আদি প্রবর্ত্তক এবং বিশেষভাবে সরল বাঙ্গালা গদ্য লিখন প্রণালীর প্রথম পথপ্রদর্শক * ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলনের প্রধান উদ্যোক্তা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়া অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষেরা নব বাঙ্গলার আদি তীর্থে আজ সাহিত্যসেবীদিগকে একত্রিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা সকলেই তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। লাঙ্গলপাড়া রামমোহনের পিতৃভবন, রঘুনাথপুর রামমোহন রায়ের নিজস্ব আবাসস্থল, উভয় পল্লীই তাঁহার জন্মস্থান রাধানগরের পারিপার্শ্বিক গ্রাম। সম্মিলনের ত্রিরাত্রপ্রবাসী তীর্থযাত্রীরা এই তিন গ্রামে অভ্যর্থনাসমিতির অতিথি হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন।

বিজ্ঞানে ভারতবাসীর পৈত্রিক সম্পদ সামান্য নহে। কিন্তু ১৬০২ খৃষ্টাব্দের পরে এদেশে বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার মৌলিক গবেষণা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। †

বিজ্ঞানশিক্ষার ধারা এদেশে পুনপ্রচলনের জন্ম ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে) রাজা রামমোহন তাঁহার দেশবাসীদের পক্ষ হইতে লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট যে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন আপনারা সকলেই সেই পত্রের কথা অবগত আছেন। অনুবাদ না করিয়া ঐ পত্র হইতে কয়টি ছত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। লুপ্ত বিজ্ঞানালোচনার পুনরুদ্ধারে রাজার আগ্রহ মুখবন্ধরূপে সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার কার্য্যের সহায় হউক।

"I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature

* মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের বাড়ীতে বাঙ্গালা গদ্যে একশত বৎসরের পূর্ব্বের লেখা একখানা স্মৃতি গ্রন্থের কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। শুনিয়াছি উহার ভাষা ও অক্ষর এত দুর্ব্বোধ্য যে উহাকে গদ্যের আদর্শ না বলিলেও চলে।

† "The decline of scientific knowledge among Hindus does not date back from a remote period, the last of the annotations on scientific works, which are characterised by skill, acuteness, intelligence and judgement is dated 1602 A. D. *Civilization in Ancient India*" (1903). P, 57.

in Europe before the time of Lord Bacon the progress of knowledge made since he wrote. It will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatom with other useful sciences which may be accomplished * * * * by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing colleges furnished with necessary books, instruments and other apparatus * * * * to instruct in those useful sciences in which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above inhabitants of other parts of the world."

বাঙ্গালার গদ্যের ও বাঙ্গালার বিজ্ঞানের সেই আদি-প্রবর্ত্তক মহাত্মার জন্মস্থানে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আমরা তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণের সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

অনেকেই মনে করেন "বিজ্ঞান" কথাটা ইংরেজী Science এর নামান্তর। বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যে এ শব্দটি এই অর্থে কে প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। ১৩০৪ সালের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় "জ্ঞান শব্দের উপরে উপসর্গের প্রয়োগ" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিতে বিজ্ঞানশব্দের বহুল ব্যবহার রহিয়াছে।

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞান-শিল্পশাস্ত্রয়োঃ"

(অমর ১ম কাণ্ড ধী বর্গ)

ভরতমল্লিক "শিল্প শাস্ত্র" বলিতে চিত্র, ব্যাকরণাদি চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার কথা ধরিয়া লইয়াছেন। পঞ্চদশীর টীকায় বিজ্ঞান "নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

গীতার টীকায় রামানুজ বিজ্ঞান বলিতে বিবিক্তাকার-বিষয় জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত চিৎ, অচিৎ, বস্তুর জ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আবার তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে বিজ্ঞান শব্দে "নিখিল ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ সব সংস্কৃতমূলক ব্যাখ্যায় প্রবেশ করিবার আমার কোনও অধিকার না থাকিলেও মোটামুটি ইহা সাহস করিয়া বলা যায় যে ইংরেজীতে Science বলিতে যাহা বুঝায় প্রাচীন সংস্কৃতে ব্যবহৃত "বিজ্ঞান" কথাটি তাহার পরিভাষারূপে ব্যবহার করিতে কোনওরূপ আপত্তির কারণ নাই। ইংরেজীতে জ্ঞানশিক্ষার শাস্ত্রগুলিকে মোটামুটি Science এবং Art এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যে সব শাস্ত্র সত্যের সাধনায়, সত্যের অনুশীলনে, সত্যনিরূপণে নিযুক্ত সেগুলিকে Science আর যেগুলি সৌন্দর্য্যের আরাধনা, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চায় নিযুক্ত, সেগুলিকে Art নামে অভিহিত করা হয়। *

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, শব্দশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই গণিত জ্যোতিষাদির সঙ্গে Science এর অন্তর্গত। আর Art বলিতে কাব্য, সাহিত্য, ভাস্করবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি চিত্তবিনোদনকারী সুকুমার কলাশাস্ত্র বুঝায়। রস ও রূপতত্ত্ব Art এর অধিকার; রসাত্মক বাক্য কাব্য, রূপ-রচনায় চিত্রকর ও ভাস্কর স্থপতিদের লালিত্যের অপরূপ সৃষ্টি। লীলা খেলা লইয়া রূপজগতে আনন্দের অবতারণা Art এর অঙ্গীভূত

বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দাঁড়াইতেছে তাহাতে শব্দের দ্ব্যর্থতা সত্যানুসন্ধানের ও সত্যনিরূপণের বিশেষ প্রতি-বন্ধক। একটি শব্দের দুই অর্থ বা একই অর্থে দুইটি শব্দ সত্য নির্দ্ধারণে বিশেষ অসুবিধা জন্মাইয়া থাকে। সেই জন্যই বিজ্ঞান বিভাগে পরিভাষা লইয়া সর্ব্বদা উৎকণ্ঠার উৎপত্তি। সাহিত্যপরিষদ ও সাহিত্যসম্মিলন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে বিশেষ উদ্যোগী ও এ কার্য্যে

* অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science এবং Art এই বিভাগের সঙ্গে আমাদের এই বিভাগ বা সংজ্ঞা মিলিবে না

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে আপনাদের নিকট আমার একটা বিশেষ নিবেদন আছে, আর তাহার উপপত্তির জন্য আমাকে কতকগুলি বাহুল্যের অবতারণা করিতে হইতেছে বলিয়া সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

অনেক দিন হইতে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকারগণ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির অনুবাদ করার সময় অনেক নূতন নূতন শব্দের উদ্ভাবন করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্দ চয়নপ্রণালীর যে বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি রহিয়াছে তাহা জানিবার তাঁহাদের সুবিধা হয় নাই বলিয়া বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষায় এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাদের নূতন শব্দ চয়নের প্রণালী নানারূপ— কতকগুলি আক্ষরিক, কতকগুলি শাব্দিক, আর কতকগুলি মূল শব্দের আর্থিক অনুবাদ।

দুই একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় আমার কথাটা একটু পরিষ্কার হইবে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় উচ্চ প্রাইমেরীর বিজ্ঞান পাঠ ম্যাকমিলান কোম্পানি বাহির করিয়াছিলেন। উহা পাঠশালার ছেলেদের মুখস্থ করিতে হয়। এই বইয়ে অনুবাদিত শব্দগুলির একটা নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চাই। "Weather cock" এর বাঙ্গালা করা হইয়াছে "আবহাওয়ানির্ণয়কারী মোরগ।" এরূপ হাস্যকর উদ্ভাবিত শব্দের সংখ্যা বহুল। মনে রাখিবেন ইহা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য গ্রন্থ। "আবহাওয়া" আমাদের দেশ প্রচলিত একটি উর্দ্দু শব্দ। আমরা জানিতাম উহার অর্থ "জল-বায়ু"। কোনও অপরিচিত স্থানের জল বায়ু কিরূপ, সেই অর্থেই "আবহাওয়া" চলিয়া আসিতেছিল। জলবায়ুর ইংরাজী আমরা জানিতাম "climate"। ইংরেজী climate এবং weather সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। আমরা আবহাওয়া অর্থে climate বুঝিতাম; আমাদের ছেলেদের মুখস্থ করিতে হইল আবহাওয়া অর্থে "weather"। আবহাওয়ার এই নূতন প্রয়োগ ক্রমে সাধারণ ব্যবহারে আসিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার দৈনিক পত্রে এই আবহাওয়া এক্ষণে Weather Report এর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে।

এরূপ শত শত ভুল শব্দ অনুবাদিত হইয়া ভাষার আবিলতা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহার সংস্কারের একটা স্থায়ী চেষ্টার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলনে ইহার আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আপনাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, এরূপ আর একটা নূতন উদ্ভাবিত শব্দের কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শব্দটি Dyarchyর অনুবাদ কাগজওয়ালারা এখন লিখিতেছেন "দ্বৈতশাসন"। "দৈত্য শাসন" কথার উচ্চারণসাদৃশ্যে মনে হয় কেহ বুঝি মহাত্মা গান্ধীর Satanic Government" কথার সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্য উপহাস করিয়া ঐরূপ সমভাবে উচ্চারিত দ্ব্যর্থসূচক শব্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন। আর একজন ঐ শব্দের বাংলা করিয়াছিলেন "দ্বিধা-বিভক্ত শাশনতন্ত্র।" এই তর্জ্জমাটিতে অর্থানুভব হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এক "বসুমতী" ভিন্ন অন্য কোনও কাগজে বা গ্রন্থে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখিতেছি না। আর একটি শব্দের কথাও উল্লেখ করিব। শঙ্কর তাঁহার পাতঞ্জল ভাষ্যে "প্রাকৃতিক আপূর" বলিয়া একটী শব্দের উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতে স্পষ্টই ঐ শব্দে "fossil" বুঝায় অথচ fossil এর অনুবাদের জন্য একটি নূতন শব্দ রচনা করা হইয়াছে তাহা "জীবাশ্ম"। আমরা নূতন শব্দ কিরূপ অনভিজ্ঞের ন্যায় বাংলা ভাষায় প্রবেশ করাইতেছি তাহার আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা সকলেই ধ্রুব নক্ষত্রের কথা জানেন। ইহারই পারিপার্শ্বিক দুইটি নক্ষত্রমণ্ডল সকলেরই বিশেষ পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণে (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১২ কল্প, ২৬ ও ২৭ শ্লোক) এই দুই নক্ষত্রমণ্ডলের বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত তথাদৃষ্ট ছোট মণ্ডলটি ধ্রুব নক্ষত্রের অধিক সান্নিকট—উহার নাম "শিশুমার" আর দূরস্থিত বৃহত্তর, নক্ষত্রমণ্ডলটির নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিয়া পুরাণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহাদের বিশেষ উল্লেখ আছে। সপ্তর্ষি-

মণ্ডল (সপ্ত+ঋষি) অনেক সময় সপ্ত ঋক্ষমণ্ডল রূপে লিখিত হইয়াছিল। ঋক্ষের অর্থ ভল্লুক—সেই হেতু লাটিন ভাষায় এই মণ্ডল দুইটির নামকরণ হইয়াছিল Ursa major এবং Ursa minoris। বুঝিতে কাহারও কষ্ট হওয়া উচিত নয় যে এই লাটিন নাম দুইটার জন্য ইউরোপীয় শব্দ ভারতীয় জ্যোতিষের নিকট ঋণী। ইংরেজী তরজমায় ইহাদের পরিচয় ও সংজ্ঞা Great Bear এবং Little Bear। আর আমাদের দেশে ছেলেদের জন্য যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বাঙ্গালায় তাঁহারা ইহাদের নাম ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন বড় ভল্লুক ও ছোট ভল্লুক !! দেখুন আমাদের "শিশুমার" কি আশ্চর্য্য অবরোহণ প্রণালীতে ছোট ভল্লুকে দাঁড়াইয়া আমাদের ভাষাতেই ঘুরিয়া আসিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক শব্দ ও সংজ্ঞা উদ্ভাবনের কতকগুলি নিয়মপ্রণালী আছে। ঐ গুলিকে "নামবাদ" (Rules of Nomenclature) বলা হইয়া থাকে। এই নিয়মের একটা প্রধান সিদ্ধান্ত হইতেছে পূর্ব্ববাদ (Law of Priority)। এক অর্থে বহু শব্দ প্রচলন রোধ করার জন্য এই সিদ্ধান্তটির বিশেষ প্রয়োজন। এই নিয়মটির কথা মনে রাখিলে, পরিভাষা সংকলন অতি সহজ কাজ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগকে একটু বিব্রত হইতে হইবে। বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের দেশে ইউরোপীয় সংস্রবের (তাহা গ্রীকীয়ই হউক আর ইংরেজীই হউক) পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত বলিলে একটুকুও অন্যায় হইবে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বহুল বিলোপ সাধিত হইয়া থাকিলেও প্রক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ উপলব্ধি করাও কঠিন। পণ্ডিতেরা বলেন, ঋগ্বেদে আমাদের সকলেরই বিশেষ পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল "কালপুরুষ" (Orion) "প্রজাপতি" নামে অভিহিত হইয়াছে এবং রোহিণী নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। বাংলায় পাশ্চাত্য জ্যোতিষের যে সব গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার অনেকগুলিতে এই "প্রজাপতি" নামটি পাওয়া যায় না। এই "প্রজাপতি" নামের অন্তরালে অনেক তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। এই নামটি লোপ পাইলে তাহার সন্ধানও লোপ পাইবে।

বীজগণিত ও জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের ভূরি ভূরি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান। আর যে সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, পুরাণ ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রে তাহার অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থান পাইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের এক অধিবেশনে "হিন্দু ও বৌদ্ধ" বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে অনেকগুলি ঐরূপ শব্দের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখানে তাহার দুই-একটি উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। Syllogism সংস্কৃত "অবয়ব" শব্দের প্রতিশব্দ। যাহারা বাঙ্গালায় Syllogism এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারা উহার জন্য নানারূপ নূতন শব্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন। অধ্যাপক Cystalএর নিকট প্রথম শুনিয়াছিলাম, ব্রহ্মগুপ্ত বীজগণিতের আদি আবিষ্কারক। এখন জানা যাইতেছে ব্রহ্মগুপ্তেরও বহুপূর্ব্বে বীজগণিতের অতি সূক্ষ্ম সমস্যা "কুট্টক" (Integers) ইত্যাদির সমাধান শ্রীধর পদ্মনাভ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। নূতন করিয়া এখন যিনি বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বীজগণিত লিখিবেন, তাহার এই সব প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা না করিয়া নূতন পরিভাষা চয়ন করিলে চলিবে কেন?

বীজগণিতের যে অবস্থা, অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাই। চিত্রবিদ্যা স্থাপত্যবিদ্যা ব্যবহারিকশিল্প, চিকিৎসাশাস্ত্র এই সমস্ত বিভাগেই রাশি রাশি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান। "মানসার" এর ন্যায় সুবৃহৎ গ্রন্থ এইরূপ শব্দভাণ্ডারে পূর্ণ। সেগুলি ভুলিয়া বা না বুঝিয়া নূতন নূতন শব্দ আবিষ্কার করা কি বাতুলের কার্য্য হইবে না? আমাদের অনেকেরই ধারণা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যাবিভাগে প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ দরিদ্র। আয়ুর্ব্বেদের বিপুল ভেষজসম্ভার ছাড়িয়া দিলেও যে শব্দসম্পদ এই বিভাগের জন্য রহিয়াছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। আধুনিক উদ্ভিদবেত্তারা হয় ত ভাবেন নাই যে, মনু পর্য্যন্ত উদ্ভিদাদির সুন্দর শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন (মনু ১ম অধ্যায় ৪৬—৪৮)। রসায়নশাস্ত্রে

রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসরাকরত্ব প্রভৃতি বিভাগীয় বিশিষ্ট গ্রন্থ ব্যতীতও তন্ত্রে পুরাণে কত পরিভাষা রহিয়াছে। জীববিদ্যাবিদেরা হয় ত শুনিলে কৌতূহলী হইবেন যে টিমিয়া সলিয়ামের (Taenia solium) অদ্ভুত জীবনপ্রবাহের বিবরণ অথর্ব্ববেদে বর্ণিত রহিয়াছে। আর সম্ভবত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অথর্ব্ববেদের নিকট উহার বিবরণ এমন কি নামের জন্যও ঋণী। শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এরূপ কত দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণের জন্য আমরা সকলে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতেছি। সুশ্রুত বিষচিকিৎসা ব্যাপদেশে সর্প মক্ষিকা, কীট, কৃমির শ্রেণীবিভাগের যে সব বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহা দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ সব শ্রেণী বিভাগ বিশেষ বিশেষ মৌলিক জীববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত।

দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া মোটামুটী বলিতে চাই যে, বঙ্গে বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভবপর করিতে হইলে বিশুদ্ধ পরিভাষার সঙ্কলন অতিশয় গুরুতরভাবে আবশ্যক। আর উহার জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে যে সব বৈজ্ঞানিক শব্দ রহিয়াছে তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা। তাহা না হইলে নূতন উদ্ভাবিত উদ্ভট শব্দের আমদানীতে বাঙ্গালার শিশুবিজ্ঞানসাহিত্য বৃথা বাগজালে আচ্ছন্ন ও মুহ্যমান হইয়া পড়িবে। সাহিত্য-পরিষদ এবিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় এই সম্মিলনক্ষেত্রেই ইহার প্রকৃত বিধায়ক হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে আমার যে নিবেদন আছে, তাহার প্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য যথাসময়ে আপনাদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তবে তাহারই পূর্ব্বাভাসরূপে আরও দুই চারিটি কথা এই অভিভাষণে আলোচনা করিতে চাই। আমার মনে হয় সম্মিলনের কার্য্যকরীশক্তি তিন দিনের বক্তৃতার উৎসবে ও আদর আপ্যায়নে শেষ না হইয়া একটা বর্ষব্যাপী কার্য্যপ্রণালীর সমাধানের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আর পরিভাষা সঙ্কলন, পরিভাষার আলোচনা ও সংস্কার তাহার একটা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে সম্মিলন চারি শাখায় বিভক্ত। সাহিত্য, দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান। পুরাতত্ত্বও যে বিজ্ঞানেরই শাখা তাহা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এই প্রত্যেক বিভাগেই ভাষাসম্পদ নূতন নূতন শব্দ সম্ভারে দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার মনে হয় প্রতি বৎসরে নবরচিত শব্দমালার একটা নির্ঘণ্ট বর্ষব্যাপী চেষ্টায় প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। প্রতি বিভাগে বর্ষকালের জন্য এক একটি স্থায়ী ক্ষুদ্র সমিতি বার্ষিক অধিবেশনে গঠিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি এরূপ একটি প্রস্তাব আপনাদিগের সম্মুখে এবার কার্য্যকরি অধিবেশনে উপস্থিত করিব। সাহিত্য পরিষদের সহায়তায় আপনাদের নিযুক্তিয় সেই সমিতি বর্ষব্যাপী চেষ্টায় আগামী বর্ষে যতগুলি নূতন বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গালার নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ, সাময়িক প্রবন্ধে ও সংবাদ পত্রে নূতন ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিবেন, শব্দ কর্ত্তার নাম ও গ্রন্থপত্রের পরিচয় সহ তাঁহারা ঐ সব শব্দের একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবেন। বর্ষশেষে আগামী সম্মিলনের কার্য্যকরিসভায় সেই নির্ঘণ্ট উপস্থাপিত করা হইবে; তখন ঐসব নূতন শব্দের বৈধতা, ব্যবহারশুদ্ধতা, প্রাচীন পর্য্যায়ের শব্দাদির সহিত সমালোচিত হইবে। ঐ নির্ঘণ্ট আলোচিত মন্তব্যসহ বার্ষিক বিবরণে মুদ্রিতও প্রকাশিত হইবে। আমি কেবল বিজ্ঞান-শাখার জন্যই এই ব্যবস্থার বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। কেন না গোড়াতেই বলিয়াছি, সত্যানুসন্ধান ও সত্যনিরূপণই বিজ্ঞানের কার্য্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিভাগে সৌন্দর্য্যের রূপস্রষ্টার শ্লথ ভাব ব্যঞ্জনের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। আমার মনে হয় এইরূপ একটা নির্ঘণ্টের সাহায্যে আমরা আর কিছু না করিতে পারিলেও ছেলেদের "ছোট ভল্লুক" ও "আবহাওয়া নির্ণয়কারী মোরগে"র ন্যায় হাস্যকর শব্দ মুখস্থ করার বিড়ম্বনার কতকটা প্রতিরোধ জন্মাইতে পারিব।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বিশুদ্ধতার জন্য বিপুল প্রাচীন সংস্কৃতপ্রভৃতি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। এই বিষয়ে বঙ্গের শাস্ত্রকুশল পণ্ডিতকুলের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত বাঙ্গালাভাষার বিজ্ঞানবিদের গত্যন্তর নাই। এসব প্রমাণ করিতে উদাহরণের কোনও

অভাব হয় না—আবার আলোচনায় এ রকম সব শব্দ বাহির হইয়া পরে যে তাহাতে একেবারে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরাতো সকলেই জানি, gunpowderএর বাঙ্গলা বারুদ। বারুদ কথাটা উর্দ্দূ—আর জিনিসটা চৈনিক। ইহাইত আমাদের সকলের ধারণা। অথচ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতেরা বলেন "ঔর্ব্বাগ্নি" প্রাচীন সংস্কৃত কথা—শুধু কথার কথা নহে; পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন তাঁহার নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাতে নীতিচিন্তামণি হইতে উহার প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"দগ্ধেধং শোরকঞ্চৈব পার্ব্বত্যাবীর্য্যমেব চ।
একীকৃত্যাংশভাগেন ক্রমান্ধ্যা সান্তবেদিতি॥"
"দারুণো হুতভুক্তেন দহ্যতে সলিলাদিকং।"

শুধু বারুদ নয়, মনু ছয় প্রকার দুর্গের বর্ণনা করিয়াছেন (৭ম অধ্যায়—৭০, ৭৫ এবং ৭৬ শ্লোক)। আর "শতঘ্নী" বলিতে কি কামান বুঝিতে হইবে? মহাভারতে, রামায়ণে উহার উল্লেখ আছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ শল্যের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় দ্বারকাকে সুরক্ষিত রাখিয়া গিয়াছিলেন

"ঔর্ব্বাগ্নিং প্রোথিতং কৃত্বা শতঘ্নীং গুড়কৈর্যুতাং।"
হরিবংশ।

তবে "প্রবাদ" অপ্রামাণ্য, শাস্ত্রের "শ্লোক" প্রক্ষিপ্ত, ইহাই আমাদের ঐতিহাসিকদিগের সিদ্ধান্ত। মাটি খুড়িয়া তুলিতে না পারিলে বর্ত্তমান পুরাতত্ত্বে কোনও কথা গ্রহণযোগ্য হয় না। সৌভাগ্যক্রমে তাহাও হইয়াছে। Sir Arthur Cautley গঙ্গার জলপ্রণালীর খোদাই কার্য্যে সমতলের ৭০ ফিট নীচে হস্তিনাপুরের ভগ্নাবশেষ পাইয়াছিলেন। তাহাতে ছোট কামানের মত একটা যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। উহাই কি "শতঘ্নী"? কামানকে "শতঘ্নী" না বলিতে চাও, উত্তম; কিন্তু "শতঘ্নী" বলিতে যে কামানের পূর্ব্বানুকৃতি বুঝাইবে তাহা না মানিলে চলিবে কেন?

গত বর্ষে নৈহাটী সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখায় পঠিত একটি প্রবন্ধে "আর্য্য" ও "দ্রাবিড়" এই দুইটি কথা লইয়া বাঙ্গালায় লোকতত্ত্বের লেখকেরা যেরূপ শিল্পচাতুরীতার পরিচয় দিতেছেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলাম। এই দুইটিই অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ। ম্যাক্সমুলার কুক্ষণে হিরাটের নিকটবর্ত্তী আরিয়ানা প্রদেশ হইতে Aryan শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রুতিসমতার জন্য আজ প্রাচীন "আর্য্য" শব্দ তাহার প্রতিশব্দে দাঁড়াইয়াছে। দ্রাবিড় বলিতে বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণবর্ত্তী মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পাঁচটি প্রদেশকে বুঝাইত। আজ দ্রাবিড় এক কল্পিত "অনার্য্য" জাতির সংজ্ঞা হইয়াছে। আর এই দুই কল্পিত জাতির কাল্পনিক মিশ্রণে "আর্য্য-দ্রাবিড়-সঙ্কর" "মোঙ্গল-দ্রাবিড়-সঙ্কর" প্রভৃতি অদ্ভুত ও কাল্পনিক মিশ্র বর্ণের নাম সংখ্যা বাড়িয়াছে। গত বর্ষেই বলিয়াছিলাম, এই সমস্ত অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় লোকতত্ত্ব পাঠে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মনিয়োগ; প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলে এসব বাক্‌জাল ও ভাষার আবর্জ্জনা বাড়িতে পারিবে না। আর একটা বিপদ ঘটিতেছে আমাদের হেলেনিক (Hellenic) ও পারসিক * মোহ হইতে। আমাদের ভিতর এখনও অনেকেরই যুক্তিপ্রণালী রাশিচক্রের কল্পিত ঐতিহাসিক তত্ত্বে ঘুর্ণ্যমান। কোনও কোনও সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—আলেকজেণ্ডারের ভারত-অভিযানের সময় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রীকদের নিকট হইতে রাশিচক্রের নাম ও রূপ শিক্ষা করিয়া ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমনিই এই মাপকাঠি লইয়া তাহারা সমস্ত শাস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আর যাহাতক ভারতীয় কোনও পুঁথি বা প্রস্তাবে রাশিচক্রের নাম বা গন্ধ পাওয়া গেল অমনি স্থির হইল তাহা ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এই মাপকাঠির অলীকতা প্রদর্শিত হইলেও সেই হেলেনিক মোহ তাঁহাদের ঘুচিতেছে না। Sir William Jones হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মনস্বী প্রাচীন গ্রন্থাদির সময় নিরূপণের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তমূলক প্রণালী দূর করিতে লেখনী ধারণ করিয়াও কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই।

Epping, Strassmaier এবং Jensen, উৎকীর্ণ ইষ্টকফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—খৃঃ পূঃ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে একেডিয়ান

* যথা—Parsi-politan polish.

পঞ্জিকাতে ও তৎপর সেমেটিক, বেবিলোনিয়ান ও আসিরিয়ানেরা ভারতীয় রাশিচক্রের ব্যবহার করিয়াছেন। † ভারতীয় শাস্ত্রে হেলেনিক সভ্যতার প্রভাব দেখাইয়া অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। আশা করি, এখন স্রোত ঘুরিয়া গ্রীক ও রোমক সভ্যতার ইতিহাসে ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা-প্রভাবের পরিচয়সম্বলিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের প্রচার দেখিতে পাইব।

সম্মিলন একটা বর্ষব্যাপী কার্য্যের সূচনা ও পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে না পারিলে ইহা কালে একটা তেরাত্রের বারোয়ারীতে পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। গভীর গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধ পাঠের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সম্মিলন সাহিত্যসেবী সাধারণের জন্য যে একটা আদর আপ্যায়নের সামাজিক মিলনক্ষেত্র তাহা আমরা অস্বীকার করি না। এই আরাম ও আনন্দদায়ক বার্ষিক উৎসব ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে বর্ষব্যাপী সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা হিসাব নিকাশের বন্দোবস্ত রাখিলে বঙ্গভাষার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একটা খতিয়ান দাঁড়াইতে পারে। বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনপক্ষে সম্মিলনের এরূপ বার্ষিক নির্ঘণ্ট আলোচনার স্থান আছে কি না আপনারা যথা সময়ে তাহার মীমাংসা করিবেন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

প্রভাত।

বিশাল উজ্জ্বল ললাটে তোমার অরুণ-নয়নের কনক কিরণে বিশ্বের তিমির রাত্রি তিরোহিত হইতেছে। হে প্রভাত! তোমার চিরন্তন দিব্যদৃষ্টি বিমলিন বিশ্বনিখিলের গাঢ়তম তমোব্যূহ ভেদ করিয়া অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ত্রিলোকবিজয়ী আলোকের প্রতিষ্ঠা করিতেছে—জ্যোতির সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতেছে—জয় হউক্ তোমার।

২

মৃত মূর্চ্ছাতুর জগত মোহনিদ্রায় অভিভূত; সহসা জীবনসুধার অফুরন্ত পাত্র করে লইয়া আবির্ভূত হইলে। অমৃতের সঞ্জীবন পরশে মৃতা বসুন্ধরা পুনর্জন্ম ফিরিয়া পাইল, সুদীর্ঘ সুষুপ্তির পর স্থাবর জঙ্গম জাগিয়া উঠিল। দিকে দিকে বিশ্বপ্রাণ সমীরণ অনন্ত জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিল।

৩

অমরার অশ্রুত সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আজি আসিয়াছে। তোমার ভুবনমোহন ভৈরব-আলাপনে জলস্থল নভস্তল নন্দিত হইতেছে। ধরণীর প্রতি-পরমাণু তাহার মধুর ঝঙ্কারে অনুরণিত হইতেছে। আনন্দ ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে। বিশ্বের বিচিত্র সুর সামঞ্জস্যের সহজ সুষমায় সঙ্গত হইতেছে।

৪

তোমার অমল ধবল কলহাস্য আজি অপার আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে। শিশুর সারল্যে বিকশিত তোমার আনন যুগযুগান্তর এমনি উদ্ভিন্ন, অরবিন্দের মত সুন্দর নবীন। জরার মলীনিমা মৃত্যুর কালিমা তাহাতে একটি ক্ষীণ রেখাও পাত করিতে পারে না—স্বর্গের দেবশিশু তুমি—চিরশুভ্র অজর অমর।

৫

প্রতি প্রত্যূষে বিনিদ্র-নয়নে তোমারি সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিয়াছি। সংসারের শত আবর্ত্তনের মাঝে তোমার শান্ত সুন্দরচ্ছবি মানসে ভাসিয়া উঠিয়াছে। সুখদুঃখের ধূলিবিক্ষেপের মাঝে শান্তির সমীর বহিয়া আনিয়াছে। মোহাচ্ছন্ন নিশীথে, দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় যখন হৃদয় মুহ্যমান, উৎকণ্ঠিত অন্তরাত্মা রুদ্ধশ্বাসে তখন তোমারি প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

৬

কোন্ হিরন্ময় রহস্যে নিহিত অনির্ব্বচনীয় তোমার স্বরূপ। তোমায় কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। তোমারি আভায় বিশ্বনিখিল প্রকাশিত—তোমারি আলোকে ত্রিভুবন আলোকিত।

৭

মলিন আমার হৃদয় তোমার জ্যোতির নির্ঝরে ধৌত শুদ্ধ করিয়া দাও। স্বচ্ছ দীপ্ত অন্তরে তোমার বিমুগ্ধ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠুক্। আনন্দের সান্দ্র-বর্ষণে চিত্তশত দল বিকশিত হউক্।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

† Ancient Calendars and Constellations by E. M. Plunket, pp. 102—5.

রামায়ণে বহু-বিবাহ।

বহু বিবাহ, আদিম অসংস্কৃত সমাজ-রীতির একটী চিহ্ন। সমাজ যখন অপূর্ণ ছিল, তখন বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রয়োজনীয় রীতি দ্বারা প্রয়োজন সাধিত হইয়া গেলে, তাহা অনাবশ্যক হয়; তখন অনাবশ্যক রীতি সমাজের উপদ্রব বিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। বহু বিবাহ দ্বারা যতদিন সমাজে জন বৃদ্ধি প্রয়োজন হইয়াছিল. ততদিন তাহা সমাজে আপত্তির কারণ ছিল না। সমাজ জনবলে বলবান হইলে এবং স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, বহু স্ত্রী পোষণ পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিঘ্ন জনক হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সমাজ বুঝিয়াছিল, এই প্রথা অর্থ ও শান্তি—উভয় বিষয়েরই পরিপন্থি। ঋক্‌বেদের "সপত্নী পীড়ন" ঋক মন্ত্রগুলি [১] হইতে এই ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সপত্নী পীড়ন মন্ত্রগুলি হইতে বৈদিক সমাজে যে বহু বিবাহ ছিল, এবং তাহা যে পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্টের কারণ ছিল, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। ইহার পর বোধ হয় সমাজের সাধারণ স্তর হইতে বহু বিবাহ উঠিয়া যায়, এবং তাহা কেবল ধনী পরিবারের পরিবার-স্বামীর বিলাসের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

রামায়ণের বর্ণনায় আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিতে পাই। রামায়ণের রাজারা সকলেই বহু পত্নীক। রাজা দশরথের পত্নীর সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন শত।[২] মিথিলার রাজা জনকও একাধিক দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।[৩] রাবণ, বালী, সুগ্রীব—ইহারা সকলেই অসংখ্য রমণীগণে বেষ্টিত থাকিতেন।

সপত্নী পীড়নের আভাস রামায়ণেও আছে। রামের বনে গমন কালে কৌশল্যার উক্তিতে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে।[৪]

রামায়ণে রাজাদিগের ব্যতীত রাজ পরিবারের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী ছিল অবগত হওয়া যায় না। অযোধ্যার রাজ পরিবারে রাম-লক্ষ্মণাদির,[৫] লঙ্কার বিভীষণ ইন্দ্রজিত কুম্ভকর্ণাদির বা কিষ্কিন্ধ্যার অঙ্গদ প্রভৃতির একাধিক পত্নী গ্রহণের আভাস রামায়ণের কোথাও নাই। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই—বহু বিবাহ যে তখন রাজাদের বিলাস পরিতৃপ্তির জন্যই প্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা হইয়াছে।

সূত্র যুগে এই প্রথার সংকীর্ণতা সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহার আভাস আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। আপস্তম্ব সূত্র করিয়াছেন—স্ত্রী স্বামী-ধর্ম্মানুরাগিণী হইলে এবং তাহার পুত্র সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে স্বামী দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিতে পারিবে না।[৬] ধর্ম্মসূত্রগুলি পূর্ব্বরীতির ব্যভিচার দর্শনেই রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণে বর্ণসঙ্করের উল্লেখ নাই। সামাজ তখনও অপূর্ণ ছিল, তাই আদান প্রদানে বর্ণভেদ ছিল না। তখন রাজারা তিন শ্রেণীর পত্নী রাখিতেন। উত্তমা স্ত্রী মহিষী, মধ্যমা স্ত্রী বাবাতা ও অধমা স্ত্রী পরিবৃক্তা নামে কথিত হইত। রাজা দশরথের এই তিন শ্রেণীরই পত্নী ছিল।[৭] ব্রাহ্মণ ঋষিরা ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিতেন। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ক্ষত্রিয় রাজা লোমপাদের কন্যা শান্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[৮]

---

১ ঋক্‌বেদ ১০।১৪৫

২ অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪।১৩—১৪ শ্লোক।

৩ আরণ্যকাণ্ড ১১৮।৩৩ শ্লোক।

৪ অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ।

৫ কৈকেয়ীর প্রতি মন্থরার উক্তিতে আছে—

> পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেস্যত্বং হি গমিষ্যতি॥ ১১
> হৃষ্টাঃ খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রীয়ঃ।
> অহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে ।১২।২।৮

কেহ কেহ এই "স্ত্রীয়ঃ" ও "স্নুষা" শব্দদ্বয় দ্বারা রামের ও ভরতের বহু ভার্য্যার নির্দ্দেশ করেন। তাহা ঠিক নহে। এস্থলে "স্ত্রীয়ঃ" ও "স্নুষা" শব্দ দ্বারা রামের ও ভরতের পুর-নারীগণকেই বুঝায়, তাঁহাদের বহু পত্নী ছিল—বুঝায় না। বিশেষ রাম এক-পত্নী ব্রতাবলম্বী ছিলেন।

৬ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২।৫।১১।১২

৭ আদিকাণ্ড ১৪।৩৫ শ্লোক। রামায়ণের টীকাকারগণ মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃক্তা শব্দে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকায় ইন্দ্রের বাবাতা স্ত্রীর উল্লেখ প্রসঙ্গে (ঐঃ ব্রাঃ ৩।১২।১১ খণ্ড) ঐ শব্দত্রয়ের অর্থ—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা—করা হইয়াছে। এই ভেদের মূলে যে সংস্কার বর্ত্তমান, তাহা বলাই বাহুল্য।

৮ আদিকাণ্ড ০ সর্গ।

অনুলোম বিবাহের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও প্রতিলোম বিবাহের উল্লেখ রামায়ণে নাই। বৈদিক যুগে প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল; তখন চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই, যযাতি শুক্রকন্যা দেবযানীকে ও রাজা সম্বরণ সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন প্রসঙ্গে মহাভারতে এই প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। জাতির ভিতর ভেদ-ভাব সৃষ্টি হইলে পর প্রতিলোম ব্যবস্থা তিরোহিত এবং অনুলোম বিবাহ প্রচলিত হয়। তখন সঙ্কর উৎপত্তি ব্যবস্থাও ব্যবস্থিত হয়।[৯] রামায়ণে এই সকল পরবর্ত্তী যুগ-ধর্ম্মের কোন আভাসই দৃষ্ট হয় না।

ভিতরের ডাক।

হারায়ে ফেলেছি মোরে জগতের সৌন্দর্য্য মাঝার!
আলেয়ার পিছে ছুটি' এত দিনে ভাঙ্গিয়াছে ভুল!
অরূপের মাঝে তাই ডুবে যেতে হয়েছি আকুল!
কত ক্ষুদ্র শক্তি লয়ে দিবারাত্রি করি হাহাকার!
আলোকে যা পাই নাই, আঁধারে তা পেয়েছি এবার!
অচঞ্চল রশ্মি-রেখা আনন্দিত করেছে বিপুল
যৌবন মধ্যাহ্নে এসে জীবনের লভিয়াছি মূল!
আঁকড়িয়া র'ব এবে, ছাড়িব না আমারে আমার!

অন্তরের অন্তস্থলে কেবা যেন ডাকিছে নীরবে!
নির্জ্জনে বসিলে তার অতি ক্ষীণ ডাক শোনা যায়!
চাক্ষুস হেরিতে তারে মায়া সহ মেতেছি আহবে!
ছুটিব না ছায়া পিছে, আঁখি কাঁদে কায়া-পিপাসায়!
ফাঁকির ফাঁনুসে তুলি' কে আমারে উড়াইছে নভে!
'কানা মাছি' খেলিব না! এই বার চিনেছি তোমায়!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

হাতী খেদা।

যাত্রা।

১৩ই অগ্রহায়ণ—৺রী মাতা দশভুজার ও ৺লক্ষ্মী নারায়ণের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া ও পূজনীয় পদে বিদায় গ্রহণ করিয়া হস্তীতে আরোহণ করা গেল। "বিনোদ মালা," "আশোয়ারী," "মঙ্গল পিয়ারী," এবং "রতনমাল." চারিটীই ক্ষিপ্রগামিনী হস্তী। ইহারাই আমাদের আজিকার বাহন। আজ আমাদের মনে অদম্য উৎসাহ এবং আনন্দ; এতকাল যাহার বর্ণনা মাত্র শ্রবণ করিয়া সাহসাভিযানের (adventure) কত সুখ স্বপ্ন গঠন করিয়া বিপুল আনন্দ পাইয়াছি, আজ সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যদিও আরণ্য হস্তীযূথ স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে বহুবার দেখিয়াছি, এমন কি আরণ্য হস্তী যূথ পরিবেষ্টিতও হইয়াছি, তথাপি এই বৃহৎ জন্তুকে কি ভাবে মানুষ তাহার করতলগত করে তাহা দেখিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা বহুকাল হইতে পোষণ করিতেছিলাম। আশৈশব হস্তীর গল্প শুনিয়া আসিতেছি, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে! অদ্যাকার উৎসাহ অনুপ্রাণিত ব্যক্তি ভিন্ন ইহা অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। আমরা ৭ টা ২৫ মিনিটের সময় রওনা হইলাম। কুজ্ঝটিকার আবরণ কেবল মাত্র অপসারিত হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতির করুণ মধুর মূর্ত্তির স্নিগ্ধতা সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইতেছিল। দুর্গাপুরের গণ্ডীর বাহিরে আসিতেই উত্তরে পর্ব্বতমালা এবং পূর্ব্বে "মাঠের পর মাঠ ..." হেমন্তের প্রভাতে দেখিয়া, বিমল আনন্দে আত্মহারা হইতেছিলাম। বস্তুতঃ খেতের ধান গুলি পাকিয়া সোণার মত হইয়া গিয়াছে। তখন দেখিয়া মনে হয় মানুষ ইষ্টক নির্ম্মিত, ধূম্র ধূলি সমাকীর্ণ সহরকে, প্রকৃতির লীলা নিকেতন এই পল্লী ভূমি অপেক্ষা কেন উচ্চে স্থান দেয়? "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর"—কবির প্রাণস্পর্শী এই সঙ্গীতগুলি তখন স্বতঃই মনের মধ্যে আসিতেছিল। যদিও প্রায় যুদ্ধ অভিযানেই আমরা চলিয়াছিলাম, তথাপি প্রকৃতির

---

৯ গৌতম-ধর্ম্ম-সূত্রকার ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা বিবাহের সন্তান যবন হয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। গৌঃ ধঃ সূত্র ৪। ২১

বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীতে নিষাদ উৎপত্তির কথা আছে। ১। ৯। ১৭। ৩

কোমলতার প্রতিক্রিয়া মনের উপর হইতে ছিল না ইহা বলা চলে না। প্রাণ ভরিয়া আজ "সোণার বাংলা" কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিলাম। এই মধুর প্রভাতে নানা বিহগকাকলি মুখরিত শ্যামল পর্ব্বতমালা মনোহর প্রভাতের মাধুর্য্য বৃদ্ধিই করিতেছিল। আবার গারো হাজং রমণী পুরুষ নির্ব্বিশেষে কোথাও ধান কাটিতে কাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের সরল সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। প্রকৃতির সহিত তাহারা যেন সমসূত্রে বদ্ধ, দৃষ্টিতে, ব্যবহারে, পরিচ্ছদে তাহাদের কোনও খানে জননী প্রকৃতির সহিত এতটুকু বৈষম্য নাই। কিন্তু বর্ত্তমানের জ্বালাময়ী সভ্যতা বোধ হয় এমন সরল মধুর জীবনেও বিষ ঢালিয়া দিবে! দিবে বলি কেন? দিতেছেও তাহাই! যাহা হউক চিত্রকর, কবি, ও কল্পনা এবং ভাবনা প্রিয় লোকের এই পথটুকুতে যথেষ্ট খোরাক জুটিবে ইহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কিন্তু আমি তাহার মধ্যে কোনওটাই নহি! কাজেই রৌদ্রতাপ বৃদ্ধি পাইয়া যখন বুদ্ধির আধার মস্তকের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার আরম্ভ করিল তখন কল্পনা ভাবনা ছুটিয়া গেল এবং গন্তব্য স্থানে যাইতে অস্থির হইয়া উঠিলাম। ১১ টা ১৫ মিনিটের সময় জগন্নাথপুরে পঁহুছিলাম। জগন্নাথপুরেই আমাদের রসদের কেম্প। এই স্থানটী বড়ই মনোরম। উত্তরে সুনীল পর্ব্বত শ্রেণীর সুস্পষ্ট দৃশ্য এবং তাহার নিম্নে সবুজ পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কলনাদনী স্বচ্ছতোয়া গুণেশ্বরী নদী! পাহাড়ের গায়ে গায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গারো পল্লী মোটা মুটি স্থানটীকে বেশ একটা ছবির মত করিয়া রাখিয়াছিল। এখানে একটী ফরেষ্ট অফিস আছে এবং একটা বাজার আছে; প্রতি মঙ্গলবারে গারোরা পাহাড় জাত দ্রব্যাদি এই হাটে বিক্রয় করিতে আনে। খেদার ডাক্তার বাবু বীরেন্দ্রনাথ রায় এইখানে ছিলেন। তাঁহার নিকট জানিলাম আমাদের কেম্প এখান হইতেও আরও দুই মাইল দূরে! যাহা হউক বীরেন্দ্র বাবু নূতন লোক, কাজেই পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নিকট নিশ্চিত বিবরণ পাওয়ার আশা করা চলে না। নরেন্দ্র আমাদের রসদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। সে আমাদের কেম্পের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার নিকট জানা গেল আমাদের ছাউনীর স্থান খোলপানি ছড়ার উপরের বস্তিতেই হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও আহার্য্য সামগ্রী কিম্বা তাম্বু প্রভৃতি কিছুই তথায় পঁহুছে নাই। এই সংবাদে কতদূর পরিতৃপ্ত হওয়া গেল, তাহা অনুমেয়! বাধ্য হইয়া সঙ্গের দুইটী হস্তী আবশ্যক মালামাল লইয়া যাওয়ার জন্য রাখিয়া যাইতে হইল এবং আমরা কয়েকজন অপর দুই হস্তীতে গন্তব্য স্থানে ১ টা ১০ মিনিটের সময় উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে পিলখানা ছিল, তথায় অপর হস্তীদের মালামাল লইয়া আসিবার হুকুম দিয়া আসা হইয়াছিল; তাহারাও ১ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপেন্দ্র বাবুর তত্ত্বাবধানে তাঁবু খাটান এবং পাকের আয়োজন চলিল। দেখিতে দেখিতে ৫ টার মধ্যেই আমাদের পট্টাবাস রচিত হইয়া গেল! সকলের আহারাদি হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল।

আমরা যে স্থানে ছিলাম তাহার নিকটই 'বিধুনথমার' বাড়ী; সে যথেষ্ট আতিথেয়তা করিল, এবং আমাদিগকে জানাইল যে হস্তী গত রাত্রিতে তাহার বস্তার নিকটই আসিয়াছিল। আমরা কৌতুহল পরবশ হইয়া মলম দেখিয়া আসিলাম এবং তথায় ২ পুঁজির ব্যবস্থা করা হইল। বিধুনথমা আমাদিগকে দৈনিক ॥০ এবং সরকারী খোরাক এই হিসাবে ৮। ১০ জন কুলী দিতে স্বীকৃত হইল। আমাদের কুলীর সংখ্যা কমই ছিল, সুতরাং কুলী কয়েকটীকে আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম।

১৪ই অগ্রহায়ণ। রৌদ্র উঠিলে কেম্পের বাহিরে আসিয়া খোলপানির জলে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া চা পান করা গেল। শীতের শিশিরে প্রায়ই অসুখ হয়, কুয়াসাতেও জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কাজেই একটু রৌদ্র উঠিলেই বাহির হওয়া ভাল। রাত্রিতে বাহির হইতে হইলেও রীতি মত গরম বস্ত্রে মস্তক এবং শরীর আবৃত করা প্রয়োজন হয়। এবিষয়ে চাকরদের সম্বন্ধেও যথাবিধি সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, নতুবা তাহারা প্রায়ই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অসাবধান।

এখানে উল্লেখ করা ভাল যে খেদায় সাধারণতঃ ২৪।২৫টী হাতী প্রয়োজন হয়; তন্মধ্যে আমাদের সর্ব্বসমেত ৯ হাতী মাত্র যোগাড় হইয়াছিল। শ্রীহট্টে হাতী ভাড়ার জন্য লোকে

পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু, এপর্য্যন্ত তথা হইতে হাতী না আসায় আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছিলাম। আজ সংবাদ পাওয়া গেল—দুয়ারা হইতে ৩টী হাতী আসিয়াছে। হাতী তিনটীই উৎকৃষ্ট। ইহাতে কিছু আরাম বোধ করা গেল। আমরা যে স্থানে আছি, তথা হইতে কোঠের স্থান প্রায় তিন মাইল দূরে হইবে। খেদায় আসিয়া যদি খেদার কার্য্যকুশলতাই না দেখা গেল তবে আর খেদায় আসার স্বার্থকথা কি? আমার কিন্তু এখানে থাকা আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। বৃদ্ধগণের মত ব্যবস্থা করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। যাহা হউক অবশেষে স্থির হইল—আমাদের ক্ষুদ্র সংসার পর দিবসই স্থানান্তরিত হইবে।

আজ খেদা কর্ম্মচারী বাবু নগেন্দ্রনাথ সিংহ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিন বলিলেন—চিকিসিম নামক স্থানে কেম্প নিলেই ভাল হইবে; তথায় কিছু জল কষ্ট হইতে পারে কিন্তু কোঠের স্থান নিকটেই হইবে। অবশ্য ৫।৬ জনের পক্ষে সেই স্থান ভালই হইবে, অধিক লোক হইলে জল সরবরাহ করা বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে। এখানে বলা আবশ্যক যে আমরা তথায় একটুক অধিক "তামসগীরের" মতই গিয়াছিলাম; কিন্তু ঠিক কার্য্যের পক্ষে এত লোক যাওয়া সকল সময় বিধেয় নহে; বিশেষতঃ দুর্গমস্থানে বহু লোক লইয়া গেলে বিপদের শেষ থাকে না। যাহা হউক স্থান অপেক্ষাকৃত নিকট এবং সুগম বলিয়াই এত লোক যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমরা অধিকাংশেই এই সকল কার্য্য দেখি নাই এবং যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাও বহুকাল পর এবং সুবিধা জনক স্থানে হইতেছে বলিয়াই এ যাত্রা এ প্রলোভন এড়াইতে না পারায় দর্শক সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল।

জলকষ্ট কিঞ্চিৎ হইলেও অধিকাংশেরই মত হইল পরদিবসই তথায় যাওয়া।

আজ ১১½ টার মধ্যে আহারাদির কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সমস্ত দিন অলসের মত কাটানর চেয়ে একটু বেড়াইয়া আসা ভাল—এই মনে করিয়া আমরা ৮।১০ জনে ১২ টা ১০ মিনিটের সময় পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। একটা ট্রেক দেওয়া রাস্তা আছে, সেইটা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করা গেল। জানা গেল, এই পথেই খাসিয়া, তুরা, সিজু প্রভৃতি—এই পাহাড়ের সর্ব্বত্র যাতায়াত করা চলে; এবং গারোহিলের ডিপুটী কমিশনর এই পথেই মফস্বল পরিভ্রমণ করেন।

একটা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। তথা হইতে কুলিদের গাছ কাটার শব্দ শোনা যাইতেছিল। গাছ কাটার শব্দ অপেক্ষা প্রকৃতির নয়ন মনোহর দৃশ্যই অধিক হৃদয়গ্রাহী হইল। উত্তরে পাহাড়ের পর পাহাড় অনন্ত তরঙ্গরাশির মতন আকাশে মাথা তুলিয়া আছে, পূর্ব্বে খাসিয়া পাহাড়ের শ্রেণী, মোমরাজ, মহিষথলা; পশ্চিমে অসংখ্য উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ—যেন পাহাড় ভিন্ন জগতের এই তিন দিকে অপর কিছুই নাই। কেবল মাত্র দক্ষিণে সমতল ভূমি—মাঠের পর মাঠ ধূধূ করিতে করিতে দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এমন বিরাট দৃশ্য দর্শন করিলে মানবের হৃদয় কোন এক অনির্ব্বচনীয় উদার অনুভূতিতে পূর্ণ হয়। ঊর্দ্ধে, অধেঃ, দূরে, সম্মুখে. নিকটে, পশ্চাতে সর্ব্বত্র অসীম, অনন্ত সৌন্দর্য্য—উদার গাম্ভীর্য্য! এখন বুঝিতে ইচ্ছা হয়—এই সীমাহীন সুন্দর উদার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র "আমি" কোথায়—কতটুকু! বস্তুতঃ এইখানে আসিলে ম্রিয়মান চিন্তা রাশির মধ্যেও আনন্দের সঞ্জীবতার সঞ্চার হয়। কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রামান্তে প্রায় ১ ঘন্টা পাহাড় আরোহণ করিবার পর অবতরণ করা গেল। আমরা ৩ টার পর পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিলাম। কেম্পে আসিতেই গারোরা হাতীর একটা নূতন মলম দেখাইতে চাহিল। কেম্পে বড় কাকা ও মেজ কাকা ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া মলম দেখিয়া আসা গেল কেম্প হইতে ৫ মিনিটের পথ, সত্যই হস্তী এই দিকে আসিয়াছিল। এখানেও এপুঁজি বসান হইল।

১৫ই অগ্রহায়ণ—আজ ছাউনী চিকিসিমে স্থানান্তরিত করার দিন। কাজেই আজ বেশ একটু হৈচৈ লাগিয়া গেল। কেম্পের জীবনে পরিবর্ত্তন না থাকিলে অধিকাংশ আনন্দই নষ্ট হয়। উপেন্দ্র বাবু আমাদের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত পটু ছিলেন, তাঁহার সুব্যবস্থায় অল্পকালেই আহার্য্য প্রস্তুত হইল এবং এবং যাবতীয় মালামাল হাতীতে

বোঝাই হইতে লাগিল। আহারাদি করিয়া রওনা হইতে প্রায় ১১ টা ৪৫ মিনিট হইল। মালামাল এবং আমাদিগকে লইয়া হস্তীর পংক্তি বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল; বিশেষতঃ এই বোঝাই করা অবস্থায় পর্ব্বতারোহণ ব্যাপার বড়ই উপভোগ্য।

যে স্থানে খেদার বাবুরা আমাদের তাঁবুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তথায় ঠিক দুইটার সময় পঁহুছা গেল। পর্ব্বতে আরোহণের পথটা নেহাৎ সোজা এবং সুগম ছিল না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসার সময় আমরা অধিকাংশ প্রায়ই "পুঁজির" পথ দিয়া আসিলাম এবং পথে হাতীর খাওয়ার বহু মলম দেখিলাম। সমুদয় রাস্তাতেই খলের দৃশ্য সুন্দররূপে পাওয়া যায়। হাতী দেখার বহু চেষ্টা করিলাম কিন্তু এত বৃহৎ জন্তু অরণ্যানির ভিতর কোথায় লোকায়িত আছে, তাহার কিছুই নিরূপণ করা গেল না।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখা গেল যে তথা হইতে একটিন জল পাইতে হইলে দুইজন লোক অন্ততঃ ১½ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিলে পর পাওয়া যাইতে পারে; সুতরাং এ হেন স্থানে কেম্প রাখিলে আমাদের জলের সমস্যা কিরূপে পূরণ হইতে পারিত তাহা অনুমেয়। এই স্থান কেম্পের অনুপযোগী বোধে তখনই আর একটা স্থান অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। অনুসন্ধানে দেখা গেল বহু নিম্নে একটা ক্ষুদ্র ঝরণা দেখা যায়, তাহার পার্শ্বেই একটুকু সমতল ভূমি আছে, অথচ সেটাতেও আবার একটা গারোর হাদাং (অর্থাৎ ক্ষেত) আছে। আমাদের নিকট হইতে সেই হাদাংএ স্থিত গারোগুলিকে ঠিক বানরের মত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছিল; ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে জল আমাদের নিকট হইতে কত নিম্নে অবস্থিত! ঐ হাদাংএ স্থান না পাইলে আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না; বস্তুতঃ এই অবস্থায় আমাদের অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছিল এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক; এই সকল ক্ষেত্রে এবং স্থানে বিপদ দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকা মূর্খতা। বড় কাকা বিপদে অস্থির কোনও সময়ই হন না, সুতরাং এক্ষেত্রে যাহা সমীচীন তাহাই করিলেন; নিজেই প্রায় সোজা পাহাড় বাহিয়া কষ্টে অবতরণ করিয়া গেলেন এবং তথায় যাইয়া ক্ষেত্রের মালীকয়ের সহিত জায়গাটা পাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। স্থির হইল ৫৲ দিয়া আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান পাইব। এই বন্দোবস্ত স্থির হইতেও পূর্ণ ১ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। মালিক মালিকানীর সহিত দর কসাকসি একটা বেশ উপভোগ্য বিষয় হইয়াছিল।

পাহাড়ে যাহা কিছু করিতে হয় রাত্রির পূর্ব্বেই করা চাই; নতুবা অসুবিধার সীমা পরিসীমা থাকে না।

যদিও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাই সুস্থির হইয়াছিল তথাপি মালি-কানী গারোপত্নী এবিষয়ে ঘোরতম আপত্তি উত্থাপিত করিল; সে এ ব্যবস্থায় কোনও মতেই সম্মত হয় না। হাদাংএ ছিল লঙ্কা গাছ এবং কার্পাস গাছ। যখন এই সকল গাছগুলি নির্ম্মম ভাবে টানিয়া কেম্পের জন্য স্থান পরিষ্কার করা যাইতে লাগিল—মালিকানীর রাগও যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রত্যেকটা গাছ উৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রোধাগ্নিতে যেন ক্রমশঃ ইন্ধন দেওয়া হইতেছিল। সে তখন রাগিয়া মালিক বেচারাকে হতভম্ব করিয়া দিল এবং সে বেচারি বাড়ী ফিরিলে যে তাহার ইহারচেয়েও দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে সেই ভাবিয়া সে ভয়ে ভাল মানুষের মত টাকা ফিরাইয়া দিতে চাহিল। সেই সময় বুঝাগেল নারীর প্রভাব সর্ব্বত্র সমান। দুনিয়াই যখন এইরূপ গারো বেচারীর আর দোষ কি?

অবশেষে যথা রীতি তোষামদের আয়োজন করিয়া সেই মালিকানীকেও একটী নগদ রৌপ্যের টাকা এবং কিছু তামাক দিয়া বিষয়টীর নিষ্পত্তি করা গেল। বৃদ্ধার ক্রোধেতো আমরা প্রমাদই গণিয়াছিলাম। যাহা হউক স্থানটী পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা গেল।

উপর হইতে নিম্নে অত্যন্ত "খাড়া" রাস্তা, ইহা দিয়া হাতী নামান যায় না; সুতরাং লোক দিয়া মালামাল নামানও এক প্রাণান্তকর ব্যাপার হইল। আমরা নিজেরাই কেম্পের স্থান পরিষ্কার করিলাম এবং সঙ্গীয় লোকেরা মালামাল নামাইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

ময়মনসিংহ গীতিকা।

খনির তিমিরময় গর্ভে কত রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে; উত্তোলিত ও মার্জ্জিত হইয়া তাহা ধনীর অঙ্গভরণ হইলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের নগণ্য পর্ণকুটীরে তৃণাসনে বসিয়া নিরক্ষর গ্রাম্য কবিগণ স্বর্গীয় প্রেমের যে সকল অমৃতময়ী গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন, এতকাল তাহা গ্রাম্যলোকের মধ্যেই গীত হইয়া আসিতেছিল।

আজ "ময়মনসিংহ গীতিকা" লোকলোচনের গোচরে আসায়, এই পল্লী কবিদের রচনা মাধুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি।

"ময়মনসিংহ গীতিকা" ময়মনসিংহের গৌরবের সামগ্রী হইলেও ময়মনসিংহের শিক্ষিত সাধারণের অনেকেই ইহার সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা অবগত নহেন। "ময়মনসিংহ গীতিকা" আলোচনার পূর্ব্বে আমরা দুই একটী কথায় ইহার পরিচয় প্রদান করিব।

সৌরভের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ময়মনসিংহের কেন্দুয়া থানার অধীন আইথর গ্রাম নিবাসী শ্রীমান চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের পল্লী সাহিত্য হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া কুহেলী, দস্যু কেনারাম, চন্দ্রবতীর গীতি, মালীর যোগান, লীলার বারমাসী, কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ঐ গল্প ও প্রবন্ধের মূল উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন, এবং শ্রীমান চন্দ্রকুমারের সাহায্যে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যয়ে তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন।

ডাঃ সেন মহাশয় ঐ গুলির মূল উপাদান সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে তাহার কতক অংশ দ্বারা এই "ময়মনসিংহ গীতিকা" ১ম খণ্ড বাহির করিয়াছেন; লর্ড রোণাণ্ডসে লিখিত ভূমিকা সহিত উহার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা বিশ্বজগতের মনীষীবৃন্দের আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ময়মনসিংহের আরো পল্লীগীতিকা সংগৃহীত হইতেছে এবং তাহাও পূর্ব্বে সংগৃহীত অপ্রকাশিত গীতিকাবলীর সহিত দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার প্রকাশিত খণ্ডে—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, ও দেওয়ান মদিনা এই দশটী পালা-গীত বাহির হইয়াছে। আমরা সৌরভে এই পালাগুলির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহুয়া।

মহুয়ার পালাটি দ্বিজ কানাই নামক কোন গ্রাম্য কবির রচনা। গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত; কবির বর্ণনায় সামান্য এদিক ওদিক হইয়াছে মাত্র। মহুয়া ব্রাহ্মণ কন্যা; ধনু নদীর তীরে কাঞ্চনপুর নামক গ্রাম তাহার পিতৃভবন।

এই কাঞ্চনপুর গ্রাম কোথায় অবস্থিত ছিল, এখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মহুয়ার ছয় মাস বয়সে হুমরা নামক দস্যু তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করে। এই ব্যক্তি জাতিতে বাদিয়া। দলবল সহ নানা স্থানে ভোজবাজী ও ব্যায়াম ক্রীড়া দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। মহুয়া দেখিতে পরমা সুন্দরী। ষোড়শ বর্ষ বয়সে সে ব্যায়াম ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠে। হুমরা তাহাকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ ও ক্রীড়া দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

একদা বাদিয়ার দল বামনকান্দা নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া নদিয়ার চান্দ নামক ব্রাহ্মণ যুবকের বাড়ীতে ক্রীড়া প্রদর্শন করে। মহুয়ার রূপ-লাবণ্য ও তাহার ক্রীড়া দর্শনে ব্রাহ্মণ যুবক মোহিত হয়। সে বাদিয়ার দলকে প্রচুর পারিতোষিক প্রদান এবং নিকটবর্ত্তী উলুয়া-কান্দা গ্রামে বাড়ী জমী দিয়া স্থাপিত করে। বাদিয়ার দল সেখানে কৃষিকার্য্য করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে থাকে। নদিয়ার চান্দ মহুয়ার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রণয় প্রার্থী হয়, বিবাহের প্রস্তাব করে, এবং তাহার জন্য জাতি কুল সমস্ত বিসর্জ্জন করিতেও উদ্যত হয়। মহুয়াও তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া ভর্ৎসনার

সুরে কহিল—গলায় কলসী বান্ধিয়া জলে ডুবিয়া তোমার মরা উচিত। যুবক উত্তর করিল—

"কোথায় পাব কলসী কন্যা, কোথায় পাব দড়ি,
তুমি হও গহিন গাঙ্গ—আমি ডুব্যা মরি।"

অর্থাৎ তোমার গভীর প্রেমসাগরে আমি ডুবিয়া যাই। এই বাক্যটী প্রণয়ের গভীরতার পরিচায়ক। এই উক্তিটি অন্য কোন কোন পালায় এবং গানেও আছে।

বাদিয়ার দলে পালঙ্ সই নামে মহুয়ার এক সখী ছিল। সে তাহাকে এই প্রণয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিতে অনেক উপদেশ দেয়। মহুয়া উত্তর করে—

এই কথা শুনিয়া মহুয়া ধীরে ধীরে বলে,
আগে আমি যাইবাম মর্‌য়া মুর্ত্তেক না দেখিলে।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি,
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামি।
বান্ধার সঙ্গে আমি যে সই যথায় তথায় যাই,
আমার মন বান্ধ্যা রাখে এমন স্থান আর নাই।
বন্ধুরে লইয়া আমি হইবাম দেশান্তরি,
বিষ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিবাম দড়ি।

অন্যত্র নির্জ্জনে,

বাদিয়ার ছেঁড়ী কান্দে ধর্‌য়া নদ্যার ঠাকুরের গলা,
আমি নারী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মালা।
তিলেক মাত্র না দেখিলে হইয়ে পাগলিনী,
পিঞ্জরায় বান্ধিয়া রাখছে পাগলাপঙ্খিনী।
ফুল যদি হইতারে বন্ধু আরে ফুল হইতে তুমি,
কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাড়্যা বান্‌তাম বেণী।
আমি মরি জলে ডুব্যা রে বন্ধু আমার মাথা খাও,
আমার লাগ্যা আমার আশা ঘরে চল্যা যাও।

কি গভীর প্রেম! প্রেমাস্পদকে দেখিয়া ও তাহাকে স্পর্শ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না, তাহাকে খোপার ভিতরে লুকাইয়া রাখিতে চাহে। তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, তাহার বিরহে জলে ডুবিয়া মরিতে যায়; অথচ তাহার জাতি কুল নাশের আশঙ্কায় তাহাকে বিদায় দিতেও ইচ্ছা করে। ইহাকেই প্রকৃত প্রেম বলা যায়; স্বার্থত্যাগ ইহার মূল মন্ত্র।

হুমরা বাদিয়া এই প্রণয়ের সন্ধান পায়, এবং বাড়ী ঘর ও ক্ষেত্রের পক্ক শস্য পরিত্যাগ করিয়া দলবল সহকারে রজনী যোগে পলায়ন করে। অমনি নদিয়ারচান্দও উন্মাদ প্রায় হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়। কবির আপন ভাষায়—

কোথায় আছে জইতার পাহাড় কোথায় গহিন বন,
পাগল হইয়া নদ্যার ঠাকুর ভরমে ত্রিভুবন।
পন্থে যারে দেখে ঠাকুর তারে ডাক দিয়া পুছ করে,
বিদেশী বান্ধার লাগাল পাইবাম কত দূরে?
গরু রাখ রাখুয়াল ভাইরে কর লড়া লড়ি,
এই পথে যাইতে নি দেখ্‌ছ মহুয়া সুন্দরী।
মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি,
এই দেশে নি উড়্যা আইছে আমার তোঁতা পাখী।
বাঁশ বাইয়া বাজী করে সুন্দর বান্ধার নারী,
চাঁচর চিকণ কেশ কন্যার—পরমা সুন্দরী।
আন্ধাইর ঘরে থইলে কন্যা কাঞ্চা সোণা জ্বলে,
বনে ফুটে ফুলরে ভালা পরবতে জ্বলে মণি।
এই ঘাটে ভরিত জল, আরে ভালা, মহুয়া সুন্দরী,
এই ঘাটে কেন আমি ডুব্যা নাইসে মরি।
এই পথে চলিত কন্যা কলসী কাঙ্কে লইয়া,
দূরে থাক্যা আমি রূপ তার দেখ্‌তামরে চাহিয়া।
উড়্যা যাওরে পশু পংখী নজর বহু দূর,
এই না পন্থে বান্ধার দল গেছে কতক দূর?
ঘোড়ার পায়ের খুরার দাগ ছাগলে খাইত ঘাস,
এইখানে আছিল কন্যা ফাল্গুন চৈতের মাস।

কেমন সুন্দর গাথা! সীতার অদর্শনে রাম বনে বনে ভ্রমণ করিয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু নদিয়ারচান্দের প্রেমের গভীরতা অধিক। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর; তাই সে মহুয়াকে ফুল, মণি, কাঁচা সোণা প্রভৃতির সহিত তুলনা দিয়াছে। যে ঘাটে মহুয়া স্নান করিত, সেই ঘাটে ডুবিয়া মরিতে চাহিতেছে। ভালবাসার ইহা অপেক্ষা অধিক নিদর্শন আর কি হইতে পারে? চণ্ডীদাস রাধার প্রেমের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

এদিকে মহুয়া শোকে দুঃখে কৃশ হইয়া যাইতে লাগিল।

পূর্ব্বের মত রন্ধন বা আহার করিতে পারে না, মাথার বেদনা ও বাতের বেদনায় অস্থির, এমন সময়ে নদিয়ার চান্দ হঠাৎ গিয়া অতিথির বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। হুমরা বাদিয়া তাঁহাকে মৌখিক যথেষ্ট সমাদর করিল; মহুয়ার মন প্রফুল্ল হইল।

আজি কেনে অকস্মাতে হইল এমন ধারা,
ছয় মাস্তা রোগী যেমন উঠ্যা হইল খাড়া।
দেল ভরিয়া কন্যা করিল রন্ধন,
জাতি দিয়া নন্দার ঠাকুর করিল ভোজন।

হুমরা বাদিয়া নদিয়ার চান্দকে কপট আদর প্রদর্শন করিয়াছিল। সে দস্যু, নরহত্যায় অভ্যস্ত; এক্ষণে সে তাঁহার বধের সঙ্কল্প করিল। নিশীথ রাত্রে নদিয়ারচান্দ গাছ তলায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময়ে সেই ভীষণ দস্যু মহুয়াকে জাগ্রত করিল, এবং তাহার হস্তে বিষাক্ত ছুরিকা প্রদান করিয়া কহিল—নদিয়ারচান্দ অতিশয় ভণ্ড ও দুর্জ্জন, এই ছুরিকা বুকে বসাইয়া দিয়া তাহাকে বধ কর। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি; আমার একটি কথা রাখ। যুবতী বাস্পাকুল লোচনে নদিয়ারচান্দের নিকট গমন করিল, এবং তাহাকে জাগ্রত করিয়া সকল কথা কহিল:—

হাতেতে আছিল মোর বিষ লক্ষের ছুরী,
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু আমার বুকে মারি।
পলাইয়া মায়ের ধন নিজের দেশে যাও,
সুন্দর নারী বিয়া কইরা সুখে বইসা থাও।
বরাহ্মণের পুত্র তুমি রাজার ছাওয়াল,
তোমার সুখের ঘরে আমি হইলাম কাল!

এখানেও মহুয়ার নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মত্যাগের ভাব অতি সুন্দর ও সম্যক পরিস্ফুট; ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। যুবক কহিল—

মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতি কুল,
ভ্রমর হইলাম আমি তুমি বনের ফুল।
তোমার লাগিয়া কন্যা ফিরি দেশ বিদেশে,
তোমারে ছাড়িয়া কন্যা আর না যাইবাম দেশে।
তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ী,
এই হাতে মারলো কন্যা আমার গলায় ছুরী।

যুবকের প্রবলতর প্রণয়ের নিকট যুবতীর হৃদয় হার মানিল। দুই জন সেই ক্ষণেই দেশান্তর গমনে সঙ্কল্প করিয়া পথ চলিতে লাগিল। পরদিন সম্মুখে বিস্তৃত পার্ব্বত্য নদী ও একখান নৌকা দেখিয়া নদী পার করিয়া দেওয়ার জন্য আরোহীদিগকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল। নৌকার কর্ত্তা একজন সওদাগর। তিনি মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার আদেশে মাল্লারা দুই জনকেই নৌকায় তুলিয়া লইল, কিন্তু তাঁহারই ইঙ্গিতে নৌকা এমন ভাবে ঘুরাইল যে নদিয়ারচান্দ হঠাৎ নৌকা হইতে পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া গেলেন। সওদাগরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া যুবতীও জলে ঝাঁপ দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মাঝি মাল্লারা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল।

প্রেমের শক্তি অসাধারণ। সওদাগরের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন মহুয়াকে বিচলিত করিতে পারিল না; সে আপন মনে আপনি অটল রহিল। বাদিয়ার দলের নিকট মহুয়া নরহত্যার অনেক কৌশল অবগত হইয়াছিল, তাহার মাথার বেণীতেও বিষের কৌটা লুক্কায়িত ছিল। সেই বিষ সে কৌশল ক্রমে চুন ও খয়েরে এমন ভাবে মিশাইল যে পান খাইয়া সকল লোকই অচৈতন্য হইয়া পড়িল। যুবতী তখন কুঠার দ্বারা তরণীর তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া বোঝাই সমেত তাহা ডুবাইয়া দিল, এবং তীরে উঠিয়া আপন প্রণয়ীর উদ্দেশে ছুটিল।

এই খানে মহুয়ার চরিত্রের একটু সমালোচনা করা আবশ্যক। মহুয়া ব্রাহ্মণ কন্যা হইলেও সে আজন্ম দস্যু গৃহে পালিতা। নরহত্যা ইত্যাদি সর্ব্বদা দেখিয়া ২ তৎ প্রতি বিরাগ কমিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদের হত্যা-ব্যতীত পরিত্রাণের কোন উপায়ই নাই। এ অবস্থায় এই কার্য্য করা তাহার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক হয় নাই।

মহুয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া নদিয়ারচান্দকে খুঁজিতে লাগিল। কবির আপন ভাষায়—

কোন গহনে ফটে ফুলরে কোথায় জলে মণি,
বিধাতা করিল কন্যা জনম দুখিনী।
"কও কও পশু পক্ষী, আরে [illegible]
ঢেউয়ের কোলে পড়্যা বন্ধু এখন গেল কোথা?
[illegible] আরে বাঘ ভালুক পরে আমায় খাও,

বন্ধুর উদ্দেশে মোরে পরথাইয়া জানাও।
জলে থাক জলের কুম্ভীর সদা দেখতে পাও,
কোথায় ভাস্তা গেল বন্ধু খবর দিয়া যাও।
ডাসেতে বসিয়া আছ ময়ূরা ময়ূরী,
তোমরা কি জানহ কথা কও সত্য করি।
দরিয়ায় পলিয়া পড়ে আমার গলার হার,
বিধাতা করিল দুঃখী দোষবা দিবাম কার ?"

এই রূপ ছয় মাস বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নির্জ্জনবন মধ্যে কোন ভগ্ন মন্দিরে মৃত প্রায় নদিয়ার চান্দকে দেখিতে পায়। কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য ঔষধে কিছু দিন মধ্যে যুবক সুস্থ হইয়া উঠে। তখন সন্ন্যাসীর সতৃষ্ণ দৃষ্টি মহুয়ার উপর পতিত হয়। যুবতী তখনি নদীয়ার চান্দকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া দূর বনে পলায়ন করে, এবং বন্য ফলাদি ভক্ষণ করিয়া কাল যাপন করিতে থাকে। এই রূপে আরও কয়েক মাস চলিয়া গেলে একদা যুবতী হঠাৎ অতি দূরে বাঁশীর আওয়াজ হইতেছে শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠে।

হুমরার দল তাহাদের অনুসন্ধানে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। পালঙ্গসই বাঁশী বাজাইয়া মহুয়াকে সতর্ক করিয়াছিল। কিন্তু ইহারা পলায়নের সুবিধা বা সাহস পাইল না। বাদিয়ার দলের কুকুরগুলি তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। মহুয়া সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। প্রাতঃকালে হুমরা বাদিয়া ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে তাহার হস্তে বিষাক্ত ছুরিকা প্রদান করিয়া কহিল—এই দণ্ডে এই ব্রাহ্মণ কুমারের প্রাণ বধ কর ; আর একটি সুন্দর যুবকের সহিত তোমার বিবাহ দিব। যুবতী অনেক অনুনয় বিনয় করিল ; কিন্তু হুমরা আরো ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল। মহুয়া তখন অনন্যোপায় হইয়া একবার নদিয়ারচান্দের দিকে একবার পালঙ্গসইয়ের দিকে চাহিল। পর ক্ষণেই সেই ভীষণ ছুরিকা আপন বক্ষস্থলে বসাইয়া দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হুমরার আদেশে নদিয়ারচান্দও নিহত হইলেন।

ইহার পর হুমরার হৃদয়ে সামান্য অনুতাপের উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু পালঙ্গ সইয়ের বিলাপ করুণ রস ব্যঞ্জক।

উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও
আমি পালঙ্গ সই ডাকি একবার কথা কও।
ফিরয়া গেছে বাদিয়ার দল আর না আইবে তারা,
সুখেতে বান্ধিয়া ঘর কর তুমি বাসা।
দুইয়ে সইয়ে কুলা কুলি গাঁথি ফুলের মালা,
দুই জনে সাজাইব এই না নাগর কালা।
পালঙ সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা,
এই খানে সাঙ্গ হইল নদীয়ার চান্দের কথা।

এইরূপে প্রণয়ি যুগলের কষ্টময় পার্থিব জীবনের অবসান হইল! কিন্তু প্রেমের স্বর্গীয় ছবি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। মহুয়ার প্রেমে আত্মবিসর্জ্জনের ভাবই অধিক। সে ভালবাসিয়া আপন মনে আপনিই সুখী ; প্রতিদান কিছু চায় না। প্রণয়ীর বিরহে অতি মাত্র কাতর হইয়াও তাহাকে বার বার ফিরাইবার চেষ্টাই করিয়াছে। সর্ব্বশেষে উপায়ন্তর অভাবে আপন বুকে ছুরী বসাইয়া দিয়া আত্ম-ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। নদিয়ার চান্দ মহুয়াকে পাইবার জন্যই ব্যস্ত। তাহার প্রবলতর ভালবাসার শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া মহুয়া প্রণয়ীর সঙ্গিনী হইতে বাধ্য হয়। উভয়ের প্রণয়ই অবিকৃত ; এই প্রণয়ের বলেই ইহারা সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও বিপদকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নিরঙ্কুশ উদ্দাম ভালবাসার পরিণাম ইংলণ্ডের অমর কবি শেক্সপিয়ার রোমিও জুলিয়েটে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। আমাদের প্রেমিক যুগলের পরিণামও সেইরূপই হইয়াছিল। এইরূপ গভীর অনাবিল প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দুইটি জীবনের স্রোত অনন্তের অন্তহীন ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দুইটি দীপ্তিমান নক্ষত্র উজ্জ্বলতর প্রভায় দশদিক উদ্‌ভাসিত করিয়া, আকাশময় আলোক ছড়াইয়া হঠাৎ আপনারা অদৃশ্য হইল। কিন্তু আকাশে আলোকের ছটা রহিয়া গেল।

পালাগুলি ময়মনসিংহের গ্রাম্য কবির রচিত সুতরাং তাহাতে গ্রাম্য শব্দেরই বাহুল্য লক্ষিত হইবে। প্রকাশক ডাঃ সেন এই গ্রাম্য শব্দগুলির প্রতিশব্দ দিতে অনেক স্থলেই গুরুতর ক্রটী করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সংগ্রাহকের উপদেশ লইলে তাঁহার এত ক্রটী হইত না। একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিব। যথা—

নয়াবাড়ী লইয়ারে বান্ধা বান্ধল জুইতের ঘর
লিলুয়া বয়ারে কন্থার গায়ে উঠল জ্বর।

সেন মহাশয় "লিলুয়া বয়ারে" একটী শব্দ ধরিয়া তাহার অর্থ "বাতাস ... করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শব্দটী হইবে "লিলুয়া বায়ে রে" অর্থাৎ লেলিহান বায়ে বা বায়ুতে; রে শব্দটী ছন্দ মিলের জন্য ব্যবহৃত। "জুইতের ঘর" শব্দের অর্থও ঠিক হয় নাই। ধনুর মত বক্র দুচালা ঘরকে "জুইতের ঘর" কহে। *

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

"ব্রাহ্মণ"।

যে দিন প্রথম অসীম গর্ভে সসীমে প্রকট নবীন বিশ্ব,
অসীম শূন্য হইল পূর্ণ মোহিতা প্রকৃতি দেখি সে দৃশ্য।
সপ্ত ভুবনে উঠিল স্পন্দন শব্দ ব্রহ্ম বর্দ্ধমান—
সে দিন জগতে প্রণবে প্রকট ব্রাহ্মণ তুমি মূর্ত্তিমান।
হে অনন্ত! সান্ত ব্রহ্ম, যে দিন তোমার স্বরিত মন্ত্র
প্রথম ধ্বনিত বিশ্বমঞ্চে ঝঙ্কৃত ধরা অম্র, রন্ধ্র।
স্বপ্রকাশ, সে প্রকাশ তোমার প্রণবে প্রকটা প্রকৃতি সার।
হে দীন, কোথা বা সে দিন তোমার ছিন্ন সে স্মৃতি জীর্ণতার॥

ও গো ঋত্বিক, মহাতাত্বিক সত্বজ্ঞানী কোথায় তুমি
দেব নরাসুর যক্ষ রক্ষ করিত প্রণাম যে পদ চুমি।
প্রতাপে যাঁহার কম্পিতাচলা স্তব্ধ মুগ্ধ জগতবাসী।
আত্মনিষ্ট বিশ্বশিষ্য নিষ্কাম তুমি বিশ্বোদাসী।
নিত্য-জগত বন্দিত-পদ বিষ্ণু বক্ষ ভূষণ সার।
কোথা ব্রাহ্মণ কোথায় তুমি, সে দিন তোমার নাইত আর॥

বশিষ্ঠের মত কোথা বশিষ্ঠ, কোথা বেদজ্ঞ দ্বৈপায়ন,
কোথা সে অঙ্গিরা জগতবন্দ্য বাল্মিকী কোথা মৈত্রায়ন॥
জামদগ্নি কোথা জগৎ অগ্নি ভার্গব শুক পরাশর।
কনাদ, কপিল, গর্গ ঔর্ব্ব কোথা মহর্ষি মহাশর।
দুর্ভাষা ভারী কোথা দুর্ব্বাসা যাজ্ঞ্যবল্ক, কণ্ব আর।
কোথা সে ব্রাহ্মণ ভুবন ভূষণ ভূতলে ভূদেব আখ্যা যার॥

কোথা সাবর্ণি বিশ্ববন্দ্য কশ্যপ কোথা বৃহস্পতি,
কোথা অগস্ত্য মহামহর্ষি সপ্তপর্ণ ঋষি প্রমতি।
কোথা বা জহ্নু লভি পদ রজঃ পূতা যাঁহার অলকানন্দা।
মৈত্রেয়ী, গার্গী বিশ্বজননী দেবহুতি কোথা বিশ্ববন্দ্যা।
পুণ্যা, ধন্যা এভারত ভূমি জ্ঞানে ধ্যানে ও করমে যাঁর।
বিগত ভূদেব বিভূতি বিভব পুনঃ কি ভারত লভিবে আর॥

কোথা চাণক্য, জ্ঞানী কাত্যায়ন পাণিনি বা কোথা বাৎসায়ন,
মহাকাল দাস কালিদাস কোথা জগৎ বন্দ্য ভূদেবগণ।
কোথা শ্রীকণ্ঠ করুণ কণ্ঠ রঘুনাথ কোথা নিত্যানন্দ।
কোথা বা শ্রীবাস শ্রীনিবাস কোথা শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণচন্দ্র॥
কোথা অদ্বৈত দ্বন্দ্বনিষ্ঠ শ্রীপদ্মপাদ শ্রীশঙ্কর।
যমুনাবল্লভ কুমারোদ্ভত বাণ ভট্টি-রাজ কোথা শ্রীধর॥
বিশ্ব মণ্ডন মণ্ডন কোথা পদরজ সেবে ভারতী যার।
অমৃত সেবিন্ হে মর অমর, সেদিন তোমার নাইত আর॥

শ্রবণ মনন জপ, হোম ধ্যান অধ্যায়নও তপঃ সিদ্ধি।
বেদ বেদান্ত দর্শন স্মৃতি ন্যায় পাতঞ্জল বিশ্ব ঋদ্ধি
মুগ্ধে শোভিত বিশ্বরত্ন রত্ন বিহীন রত্নাগার।
জ্ঞান সন্ন্যাসী অর্থ গৃধ্নু হে মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার।
নাইত তোমার ভোগ বিতৃষ্ণা শাস্ত্রে নিষ্ঠা বিশ্ব ভক্তি।
মরীচিকাময়ী বাসনার পথে ব্রহ্মত্ব তব লভিছে মুক্তি॥

পুনঃ কি সে দিন লভিবে ভূদেব আবার ত্যাগি হবে কি ত্যাগী।
ধনজন আর এসব মোহে মুক্ত হওনা হও বিরাগী।
আবার তোমার লুপ্ত প্রভাব দীপ্ত হবে কি ভারতবর্ষে।
পুনঃ কি ব্রহ্ম প্রভাবে জগত হাসিবে, নমিবে, তোমায় হর্ষে।
ধ্বনিত হ'ক না ব্রহ্ম কণ্ঠে পুনঃ সেই পূত দীপ্ত সাম।
জাগাও ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মত্ব তব অথবা লুপ্ত ব্রহ্ম নাম॥

পারত আবার প্রভাব তোমার দেখাও যত জগৎ জনে—
ভিক্ষুক নয় এ ব্রাহ্মণ জাতি—নাই প্রবৃত্তি তাদের ধনে।
নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরি অন্তরুদ্ধ অগ্নি প্রায়।
(হুঙ্কার মাঝে লুপ্ত প্রণব শত ব্রহ্মাণ্ড মিশিয়ে যায়)
ব্রহ্মজ্ঞান মূর্ত্ত ব্রহ্ম ত্যজ ব্রাহ্মণ "কুসংস্কার"।
আবার তোমার শ্রীপদে জগত করিবে ভক্তি নমস্কার।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

* মহুয়ার পালাটী ৪০। ৪২ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পল্লিতে পল্লিতে "বাদ্যানীর গান" নামে গীত হইত। সৌরভের ২য় বর্ষে "কুহেলী" নামে গল্পাকারে তাহা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মেডান্ কোং "প্রেমাঞ্জলি" নাম দিয়া বায়স্কোপ চিত্রে মহুয়ার অভিনয় দেখাইয়া দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করিতেছে।

ক্ষমা।
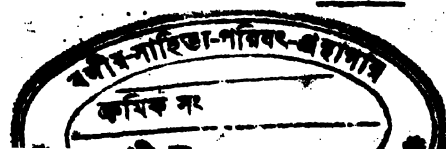
(অ)

সে ছিল এক কৃষাণ, নাম তার নিতাই। সব সময়ই সে দেশের ভাল করতে প্রস্তুত, তাই গ্রামশুদ্ধ সবাই তাকে ভালবাস্ত। এমন যে লোক, তাকেও সেই গ্রামের জমিদার সুরেন্দ্র রায় পছন্দ করতেন্ না, বরঞ্চ তাকে কিসে নাকাল করবেন, তারই চিন্তায় ছিলেন তিনি ব্যস্ত।

জমিদার মশাইর তার উপর বিরূপ থাকার কারণ—একবার এক সরিকের সাথে তাঁর গোল বাধে—একটা জায়গার সীমানা নিয়ে। সেই সম্বন্ধে নিতায়ের সাক্ষ্যের দরকার হয়; কেন না নিতায়ের জমিটা ছিল সেই জমির পাশের জমি। নিতাই সুরেন বাবুর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, মোকদ্দমাটা তিনি জিততে পারেন। নিতাই কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। শোনা যায় জমিদার মশাই নাকি প্রচুর টাকার লোভও দেখিয়ে ছিলেন, তার উত্তরে নিতাইও জোর গলায় বলেছিল, তাকে দিয়ে ওরকম কাজ কখনও সম্ভব হবে না, সে গরীব গরীবই থাক্‌বে, টাকার তার কিছুই দরকার নেই।

এর কিছু দিন পরেই এক নিশুতি রাতে তার ছবির মত বাড়ীখানাতে অগ্নি দেবের লেলিহান জিহ্বা দেখা যেতে লাগলো। এদেখে গ্রামের সবাই তাদের আদরের নিতায়ের সাহায্যে ছুটে এলো। লোকজন এসে অনেক কষ্টে, একখানা ঘর ও সামান্য জিনিস পত্র কিছু বাঁচাতে পারলো।

সবাই কাণাকাণি করতে লাগলো এ সুরেন রায়ের কীর্ত্তি। নিতাইকে উপদেশও দিলো, তাঁর সাথে মিট্ মাট্ ক'রতে। কিন্তু এই পরামর্শ দেওয়া পর্য্যন্তই। এর পর সবাই মিলে যে এর কোন প্রতীকার করা, তা আর কেউ ক'রলে না।

নিতায়ের স্ত্রী গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে চাইলো। নিতাই ব'ললো—"গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে পার, কিন্তু অদেষ্টকে কোথায় রেখে যাবে?" এর উত্তরে সে ব'ললো—"ব'লতে নেই, মনে কর আমাদের মাণিকের যদি অনিষ্ট হয়।" মাণিক,—তাদের একমাত্র ছেলে। নিতাই তার জবাব দিল, "বাপদাদার ভিটেই যদি গেল, তাও যখন সহ্য ক'রলুম. যদি বরাতে তাই থাকে, তাও এমনি করে মাথা পেতে নেব, তাঁর দান মনে করে। তুমি আর আমাকে সবার মত জমিদারের সাথে মিট্ মাট্ ক'রতে বলো না, আমি অন্যায়ের কাছে নিজকে এমন করে বিকিয়ে দেব না।"

(আ)

অনেক দিন কেটে গিয়েছে, সেই মামলা কবে মিটে গিয়েছে, কিন্তু সুরেন্ রায়ের রাগ এখনো যায়নি। তিনি অনেক বার রকমারি ক'রে অত্যাচার কর্‌ছেন্ নিতাই সমস্ত সহ্য করছে, বাধা দিতে বা তার পাল্টা জবাব দিতে আদপেই চেষ্টা করে নি।

এবার বুঝি নিতাই আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারে না। তার মাণিকের ব্যামো, ডাক্তারবাড়ী গেল, তিনি এলেন না—জমিদারের ভয়ে। হতাশ হয়ে সে বাড়ী ফিরে এলো. স্ত্রীর কান্নায় কেবলই তার মনে হচ্ছে, কেন সে তাঁর কথা মত এখান থেকে চ'লে গেল না। সে পাগলের মত হয়ে গেল—তার মাণিকের ভাবনায়।

জমিদারের ওখানে গিয়ে কেঁদে পড়লো। তিনি এবার নিজের সাফল্যের হাসিই হাস্‌লেন; তারপর দারোয়ান তাকে বের করে দিলে।

দুপুরের পর থেকেই রোগটা যেন বাঁকা হয়ে উঠ্‌লো, মৃত্যু তাকে কোলে তুলে নিতে চাইছে। এই রকম বিনা ওষুধে, বেলার শেষ দিকে বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে মাণিক চলে গেল। নিতাই তার শেষ কাজ করে এলো। বাড়ীতে এখন তার টিঁকে থাকা দায় হলো, মনে তার প্রতি মুহূর্ত্তে তীব্র প্রতিহিংসা জেগে উঠ্‌তে লাগল।

(ই)

সেদিন আঁধার রাতে জমিদারের বাড়ীতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সে তার প্রতিহিংসার তাণ্ডব লীলা দেখবার জন্যে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বেশী ক্ষণ আর ওখানে থাকৃতে পারল না, তার প্রতিহিংসা তাকে এগিয়ে নিয়ে চল্‌লো; জমিদারকে সে আজ বুঝিয়ে দেবে যে গরীবও ইচ্ছে করলে ধনীকে তার

প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে দিতে পারে।

নিতাই যখন এই উত্তেজনায় জমিদার বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়ালো, ঠিক সেই সময় জমিদার গৃহিণীর করুণ আর্ত্তনাদ তার কাণে গেলো—"ও গো আমার খোকা রয়েছে ঐ ঘরে গো – বাঁচাও, বাঁচাও—তোমরা—ঐ ঘরে গো—খোকা ঐ ঘরে—"

খোকার কথা শুনে, তার মনে প্রতিহিংসার স্থলে জেগে উঠলো তার মাণিকের কোমল মুখ। তখন তার মনের সমস্ত নীচ বৃত্তি ও সব নীচচিন্তা একেবারে মুছে গেল।

(ঈ)

জমিদার গৃহিণীর, কোলে তাঁহার খোকাকে নিরাপদে রেখে নিতাই সংজ্ঞা শূন্য দেহে আছাড় খেয়ে পড়ল।

নিতাইকে আর তখন চেনা যায় না; শরীরের প্রায় সব জায়গা পুড়ে গেছে, মনে হয় সত্যি যেন অগ্নিদেব তাকে খাঁটি করে দিয়েছেন। মাটিতে তার সংজ্ঞা শূন্য দেহ লুটপুটি করতে লাগলো। সারারাত যমে মানুষে লড়াই চল্'লো, শেষে নিতাই ক্ষমার রাজ্যে চ'লে গেলো। তার মুখ থেকে শেষ কথা বের হয়েছিল—"ক্ষমা"। ওখানে যে সমস্ত লোক ছিল, তারা অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলো—"কে, কাকে করবে—ক্ষমা?"

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য চৌধুরী।

নারী শিক্ষা।

কি পুরুষ কি মহিলা শিক্ষাই সকলের মানবত্ব বিকাশের মূল কারণ। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীব কতকগুলি সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সেই প্রাকৃতিক সংস্কারের বশীভূত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াথাকে। মানুষ সেরূপ নহে, ভগবান ক্ষমা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, দয়া, দাক্ষিণ্য, যুক্তি, চিন্তাশীলতা, ন্যায়দর্শিতা, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি কতকগুলি মানসিকবৃত্তির বীজ সঙ্গে দিয়া মানবাত্মাকে কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। বীজ থাকিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না, তাহাকে রোপন করিতে হয়, ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হয়, ও জল সেচন করিতে হয়; বন জঙ্গল বাছিয়া দিতে হয়, তবেই বীজগুলি কাণ্ড নাল পত্র ফলাদিদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। সেই রূপ মানবীয় বীজগুলিকেও নিজের চেষ্টায় শিক্ষাদ্বারা পরিস্ফুট ও বিকাশোন্মুখ করিয়া তুলিতে হইবে, নচেৎ মানবত্বের বিকাশ হইবে না।"

যিনি যে পরিমাণে শিক্ষালাভে অধিকারী তিনি সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ। পরীক্ষায় দেখা যায়, যদি কোন মানব জন্ম হইতে কোন সঙ্গ, কোন শিক্ষা না পায় তবে তাহাতে ও পশুতে বিন্দু মাত্রও প্রভেদ থাকে না। প্রকৃত মানুষ হইলে, মানবত্ব বজায় রাখিতে হইলে সৎ-শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং মহিলাজাতির শিক্ষার প্রয়োজন ও সর্ব্ববাদিসম্মত। আমাদের দেশে প্রাচীন কালেও আর্য্যনারী দিগের জন্য বহুল পরিমাণে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল; তবে শিক্ষাটা এরূপ যথেচ্ছ ভাবে সকলের পক্ষেই একচেটিয়া ছিল না।

বিলাস পরায়ণ ক্ষত্রিয় জাতির কন্যাগণ নৃত্য গীতে পর্য্যন্ত শিক্ষা নিপুণতা লাভ করিতেন। এদিকে আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভে যত্নবতী ঋষিকন্যা কিংবা ব্রাহ্মণ কন্যাগণ বেদান্ত উপনিষৎ জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। গার্গি মৈত্রেয়ী সাবিত্রী খনা লীলাবতী প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিদুষী ছিলেন। শিক্ষা মানব মাত্রের প্রয়োজনীয় হইলেও তাহার একটা মূর্ত্তিভেদ আছে, সকলের পক্ষে এক প্রকারের শিক্ষা খাটে না।

স্ত্রী পুরুষ জাতিভেদে ও প্রকৃতি বা শক্তি ভেদে শিক্ষার কিছু কিছু মূর্ত্তিভেদ থাকার প্রয়োজন। পূর্ব্বে তাহা ছিল; কিন্তু আজকালকার সমাজে তাহা অগ্রাহ্য।

আমরা নারীজাতি ও পুরুষজাতির দেহ মন ও প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে উভয় জাতি যেন একরূপ নহে। মহিলাদিগের দেহ মন প্রাণ অপেক্ষাকৃত কোমল ও সরল। ইহাদের দয়া মমতা স্নেহ সরলতা পুরুষাপেক্ষা অধিক, ভয় অধিক। সাহস বল বিক্রম কুটিলতা কঠোরতা নৃসংশতা পুরুষজাতির অধিক। তাহাদের দেহ মনও কঠিন।

ভগবান এই উভয় জাতিকেই যেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সৃজন করিয়াছেন। তাই সংসারে সন্তান পালন, অতিথিসেবা, রোগীর শুশ্রূষা, গৃহকার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রভৃতি স্নেহমমতা ও কোমলতার

কার্য্যগুলি কোমল প্রকৃতি নারীজাতীর প্রতি অর্পিত। ব্যসন, বিপদ হইতে উদ্ধার করা, যুদ্ধ বিগ্রহাদি, সমূদ্রে নাবিকতা, দেশ পর্য্যটন, কষ্টকর কার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি কঠোর কার্য্যগুলির ভার চিরদিন হইতে পুরুষের স্কন্ধে অর্পিত। এখন যদি আমরা "উদোর বোঝা বুধোর ঘারে" চাপাই অর্থাৎ পুরুষকে ঘরে রাখিয়া মহিলাগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাই তবে কদাচিৎ তাহারা কিস্তি মাৎ করিয়া আসিতে পারিলেও কাজটা প্রকৃতির উপযোগী বা স্বাভাবিক হয় না, জয়ের আশাও সর্ব্বত্র থাকে না। সুতরাং এক জনের বা এক-বারের কৃতিত্ব দেখিয়া সমষ্টির জাতিগত শক্তি নির্দ্দেশ করা যায় না। জাতীয় প্রকৃতি লঙ্ঘন করিয়া কদাচিৎ দুই একটা পুরুষ স্ত্রী প্রকৃতির ও দুই একটা রমণী পুরুষ প্রকৃতির জন্মগ্রহণ করেন বটে তাই বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকৃতির প্রতিকূলে কার্য্য সাধন হয় না। এই জন্য আমরা স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার কিছু কিছু প্রকার ভেদ অনুমোদন করিয়া থাকি।

কিন্তু আজকাল নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মতই ইহার বিপরীত। কার্য্যও ঘটিতেছে তাই—ক খ হইতে অথবা এ বি সি ডি হইতে আরম্ভ করিয়া যত পাঠ্য পুস্তক আছে, যত প্রকার শিক্ষা আছে, তাহাতে উভয় জাতি-রই এক প্রকার ব্যবস্থা। অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণাদি সকল একমেবাদ্বিতীয়ং। এই একমেবাদ্বিতীয়ং মন্ত্রের উপাসক-গণ বৈদান্তিক নহেন অথচ অদ্বৈত বাদী, সর্ব্বভূতেই সমান দৃষ্টি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি। এই প্রকার শিক্ষায় নারীত্বের মাধুর্য্য থাকে না, প্রকৃতির প্রতিকূলে শিক্ষাগ্রহণ করিলে অনেকের পক্ষে সাফল্য লাভও হয় না। তাই মাতৃজাতির কোমল হৃদয়ে অলঙ্কার কাব্যাদির বিষয় যেরূপ পরিস্ফুট হয় অঙ্ক বিজ্ঞান দর্শনাদির কঠোর বিষয় সেরূপ পরিস্ফুট হয় না।

বিনয় শিষ্টতা মৃদুতা নীতি ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল গুণ মনুষ্যত্ব লাভের উপকরণ, স্কুল কলেজে তাহার বিন্দু বিসর্গেরও আলোচনা হয় না, সকলের দৃষ্টিই একমাত্র পাশের দিকে। এই জন্য আজকাল অনেকেই আবার শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তনের জন্য আলোচনা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণকেও সেই ক্ষেত্রে সেই প্রণালীর শিক্ষার জন্য উপস্থিত করিলে দেশে ও সংসারে কতদূর সুখ শান্তি ঘটিবে তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

আজকাল ভিন্ন দেশের মহিলাগণ মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের ফলে ডাক্তার বিচারক উকিল আমলা সাজিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনুকরণ প্রিয়তার ফলে আমাদের দেশেও পুরুষের সহিত প্রতি-যোগীতা করিয়া এই ভাবে অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে বটে। ইহাতে আপাতঃ যতটুক সুবিধা দেখা যায় অসুবিধা তদপেক্ষা কম নহে।

আর্য্যদিগের দাম্পত্য সুখ ভিন্ন দেশের দাম্পত্য সুখের ন্যায় নহে। আর্য্য রমণী সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী থাকিবেন; সর্ব্বদা সদ্‌ব্যবহারে কার্য্যপটুতায় মধুর আলাপে পতির সুখ শান্তি দান করিবেন। পতি ও স্ত্রীকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন; সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া মনে প্রাণে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখ শান্তি বিধান করিবেন; ইহাই আর্য্যদিগের দাম্পত্য প্রণয় ও দাম্পত্য সুখের লক্ষণ। বৈদেশিক শিক্ষায় দীক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে গেলে কেহরই দাম্পত্য সুখ ঘটে না। কর্ত্তা থাকেন দারজিলিঙ, আর কর্ত্রী থাকিলেন কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুর; কেহর যদি কোন আপদ বিপদ কি প্রাণান্ত রোগ উপস্থিত হয় তবে দেখা সাক্ষাৎ কিংবা পরস্পরের সেবা শুশ্রূষা করিবার সম্ভবনা অতি অল্প। দাসত্ব শৃঙ্খলের বন্ধন এত আটা যে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও ছুটি না পাইলে নড়িবার সাধ্য নাই। এই অবস্থায় কত যে অসুবিধা ও অশান্তি তাহা ভারতীয় প্রকৃতির দম্পতি অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। আর যাহারা ভিন্ন দেশীয় সাহেবী শিক্ষায় কোমল হৃদয়কে কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন তাহাদের পক্ষে অসুবিধা অশান্তি নাও হইতে পারে। তাঁহারা মনে করেন আপদে বিপদে রোগে শোকে টেলিগ্রাম কি পত্র দ্বারা প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেই যথেষ্ট; কাজেও ঘটে তাই। কর্ত্রী কার্য্যক্ষেত্রে না থাকিলে এ অসুবিধা হয় না; কর্ত্তা যে খানেই কেন থাকুন না কর্ত্রী সেখানে অনায়াসে সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করিতে

পারেন; কর্ত্তারও কোন অশান্তি অসুবিধা হয় না।

এই ভাবে আপদে বিপদে সুখে দুঃখে মিলিত থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য দ্বারা সুখ উপভোগ করার নাম প্রকৃত দাম্পত্য সুখ। আর ছয় মাসের পথে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে প্রণয় পত্রে আলাপন ও ২।১ বর্ষ পরে বিদায়ের সৌভাগ্য ঘটিলে দেখা সাক্ষাতের নাম দাম্পত্য সুখ নহে। ইহা সাহেবী স্বাধীনতা হইলেও আমাদের দেশের উপযোগী নহে।

ভারতে প্রায় অর্দ্ধ সমাজ দাসত্বের জ্বালায় অস্থির; অন্তঃপুরের বাকি অর্দ্ধও সেই পথে গেলে কি অবস্থা ঘটিবে তাহা অনায়াসেই অনেকের অনুমেয়। আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ এই ভাবে বি এ, এম, এর পথে অগ্রসর না হইয়া কারুকার্য্য ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলে ঘরে বসিয়াও তাহারা বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। আজ কাল বস্ত্র বয়ন ও সূতা কাটা শিক্ষায় যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে তাহারা স্বাধীন ভাবে সম্মানে দেশের অর্থ রক্ষা, লজ্জা নিবারণ ও অভাব মোচন করিয়া নিজের ও সমাজের বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যে সকল মহিলা উচ্চ শিক্ষায় বা অর্দ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিতা অথচ গৃহ লক্ষ্মীরূপে স্বাধীন ভাবে অন্তঃপুরেই আছেন তাঁহাদের মধ্যেও আমরা অনেক স্থলেই পুরুষ জাতীয় শিক্ষার দোষে সংসারে সুবিধা ও শৃঙ্খলা দেখিতে পাই না।

চাকর চাকরাণীতে সমস্ত কাজ কর্ম্ম করে, পাচক ব্রাহ্মণে পাক করে, কর্ত্রীর পাক কার্য্যে শিক্ষাও নাই অভ্যাসও নাই, তিনি চেয়ারে বসিয়া নাটক নভেল পড়েন, মধ্যে মধ্যে পদ্য রচনাও করেন। কর্ত্তা ইহা দেখিয়াই সুখী, কর্ত্রীও দেখাইতে পশ্চাৎ পদ নহেন।

প্রাচীন কালে এদেশে রাজকন্যা, রাজরাণীগণ স্বহস্তে পাক করিয়া আত্মীয় স্বজন, স্বামী দেবর, পুত্রাদিকে নিজে পরিবেশন করিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করাইতেন। ইহাতে তাঁহারা আত্মসুখ আত্মগৌরব মনে করিতেন। মধ্যবিত্ত লোকের তো পাক করা, পরিবেশন করা, জল তোলা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এখনও গ্রামে বহুগৃহে এই আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নানা প্রকার উপাদেয় বস্তু পাক করা, পরিবেশন করা, গৃহকার্য্যে নিপুণতা, রোগে শুশ্রূষা, গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কন্যার চরিত্র গঠন ও প্রতিপালন, রক্ষণশীলতা, মধুর ভাষিতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি মহিলা জাতির হিরণ্ময় ও হীরকময় ভূষণ। ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষাই নারী জাতির প্রধান শিক্ষা, আর যাহাতে ঐ সকল গুণ অন্তর্হিত হয়, হৃদয়ে শিক্ষাভিমান জন্মে, পুরুষের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, পুরুষের অধিকার কাড়িয়া নেওয়ার জেদ হয়, সে শিক্ষা কখনও নারীজনোচিত শিক্ষা নহে।

আমরাই এই অনর্থের মূল কারণ। শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এখন মনে করেন—কেবল মনে করেন বলি কেন—বলিয়াও থাকেন যে বিবাহ করিয়া পরিবারকে দাসীত্বে নিযুক্ত করা সভ্যতানুমোদিত নহে। এই নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বকালে ছিল, এখন শিক্ষিত সমাজে ক্রমে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য, পুত্র কন্যা দেবর স্বামীকে ও শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা, ভক্তি করা ও মনের সাধে বিবিধ বস্তু পাক করিয়া দেওয়া যদি দাসীর কার্য্য হয়, তবে পুরুষ যে যথার্থ দাসত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়া আজীবন কষ্ট ভোগ করিতেছে, স্ত্রীর সুখ শান্তির জন্য অষ্ট প্রহর গোলামকি করিতেছে, ইহাকে কি স্ত্রীর দাসত্ব বলা যায় না। বস্তুত কেহই কাহার দাস বা দাসী নহে; উভয়েই সংসারে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছে; এই কর্ত্তব্য কার্য্য না করাই মহাপাপ, করাই মানবের মানবত্ব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষা শূন্য মানব মনুষ্যত্ব হীন মানবাকৃতি পুত্তলিকা। পুরুষের যেরূপ শিক্ষা দ্বারা পুরুষোচিত গুণগুলিকে প্রস্ফুটিত ও বিকাশিত করা উচিত, মহিলাগণেরও সেইরূপ মাতৃজাতির গুণরাশিকে শিক্ষাদ্বারা পরিস্ফুট করা উচিত। তারপর যত অধিক শিক্ষা হয় ততই মঙ্গলের বিষয় বটে। মাতৃ জাতির নিজ নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ের শিক্ষা দূরে রাখিয়া পুরুষোচিত শিক্ষা লাভ করা বিড়ম্বনা বিশেষ মাত্র।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

খোঁজে।

বাঁধন হারা
মনটী আমার দূর আকাশে।
ঘুরেই সারা।
ধরার পরে জ্বালিয়ে আগুন
ডাক্‌ছে মোরে রঙ্গিন ফাগুন
রচে ভুবন ফুলের স্বপন
মায়ার কারা,
নীলের দেশে ডাক্‌ছে আবার
গ্রহ তারা।

সবুজ বনে,
গাইছে পাখী করুণ সুরে
আপন মনে।
অসীম পথে সীমার রেখা
কোথাও যে হায় যায় না দেখা
ঘুরছি তবু কিসের খোঁজে
মেঘের সনে,
শেষ হবে মোর এই ভ্রমণের
কোন্‌সে ক্ষণে?

ছুটতে একা
লাগিয়ে ধাঁধাঁ ঘনায় নিবিড়
আঁধার লেখা।
কোন্ দিকে যাই দৃষ্টি হারা
অচিন পথে চলার ধারা
জান্‌লে পরে হয়তো আবার
পাবই দেখা
দিগন্তে সে হারামণির
উজল রেখা।

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী চৌধুরাণী।

পরগাছা।

(কথিকা)

পদ্ম দীঘির পাড়ে রথতলার কাছে ঐ যে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, ওটা কি গাছ কেউ বল্‌তে পার?

ওর কতক পাতা অশথের মতো, কতক বটের মতো, ডাল গুলো আমের মতো, গোড়ার ছিকুটা যেন কিসের মতো কেমন এক রকম!

ওর না ফুটে ফুল, না ফলে ফল, না গজায় নূতন পাতা।

ওতে যে এক কালে পাখীদের বসবাস ছিল তা' বেশ বোঝা যায়, দু' একটা ডালে লেগে থাকা ভাঙা বাসার দু' এক টুক্‌রো কাঠী দেখে। এখন হয়েছে ওটা শেয়াল শকুনীর আড্ডা। তলায় থাকে শেয়াল, আর মাঝে মাঝে শকুনীরা ভাগাড় থেকে ফেরবার পথে ডালে বসে পাখা শুকিয়ে নিয়ে যাবার বেলা চুণকাম করে যায়।

আগ্‌ডালে সুতো ছেঁড়া ছুটো একটা লট্‌কানো ঘুড়ি বাতাসে উড়্‌ছে, যেন উৎসব শেষের ছিন্ন পতাকা।

তলায় পোড়ে সিঁদুর মাথা গোটাকতক নোড়া নুড়ী।

বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো লক্ষীছাড়া ছেলের মতো এ হতোভাগা গাছটা মরেও মরে না। মাঝে মাঝে শীর্ণ পাতা ক'টা নড়ে চড়ে সাড়া দ্যায়—এখনও আছি।

এই সাত তালিআলা বেহায়া গাছটা, শত টুকরো জোড়া আল্‌খিল্লা পরা পথভোলা পাগলা বাউলের মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছে, রুক্ষ কেশে জীর্ণ বেশে, সারা গায়ে পথঘোরা ছেলেদের দেওয়া ধুলো আর কাদা মেখে।

ওটা যে কি, আজও ঠিক হলো না।' কেউ বলে, ছিল বট গাছ, বেতালা বেড়ে খাঁপ ছাড়া হয়ে পড়েছে। কেউ বলে, বট অশ্বত্থ ছুটো জড়িয়ে তাল পাকিয়ে গেছে। কেউ বলে, আম গাছে ভূত আশ্রয় করে অমন করেছে।

ভুতুরে গাছ বলে বড় একটা কেউ ওর তলায় যায় না। কেবল ইস্‌কুল পালানো ছেলেরা দিন দুপুরে ডালে বসে পথ-চলা লোকেদের চোখে জন্তু বিশেষের ভ্রান্তি জন্মায়। আর পাল পার্ব্বণে পাড়ার বুড়িরা সিঁদুর লেপে 'পেন্নাম' করে যায়; ভক্তিতেও নয়, ভয়েও নয়। করে আস্‌ছে বলে।

ওটা যে কি ছিল কেউ জানে না। আমি শুনেছি।

ঐ যে ও পাড়ার বুড়ো দাদাঠাকুর তিন মাথা এক করে উবো হয়ে বসে হুকো টান্‌ছেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম;

"দাদাঠাকুর, রথতলার গাছটা কি ?"

বসাচোখে একটু হেসে, হুঁকোয় একটা শোষ টান্ দিয়ে দাদা বল্লেন, "ওটা যে কি গাছ কেউ জানে না; জানে এই শর্ম্মারাম! সে অনেক দিনের কথা, তোরাত তোরা, তোদের বাবার বাবা, তখনও জন্মায় নি। ছেলে বেলা দেখেছি ওটা ছিল আম গাছ। লুকিয়ে নুন নিয়ে ওর ডালে বসে ঝিনুক দিয়ে কত আম খেয়েছি। ফাগুনে ওর মুকুলের গন্ধে সারা গাঁ আমোদ করতো। কত পাখী ডালে বসে তান্ তুলতো। গরমের দিনে গাঁয়ের লোকের বসবার আড্ডাই ছিল ওর তলায়।

কি কুক্ষণে সে বার কাল বৈশাখের ঝড় এলো, ডাল পালা ভেঙ্গে দিলে; পশ্চিমের হাওয়ায় একটা পরগাছা উড়ে এসে বসলো ওর কাঁধে। এখন মাটি থেকে রস তুলে মর্‌ছে ও, পরগাছা কাঁধে চড়ে বেশ আরামে বাড়্‌ছে। এমন আট্‌পিঠে বাঁধনে বেঁধেছে আর নড়ন্ চড়ন্ নেই।

মেঘের ডাকে যদি ওর কোন পাতাটা কখনো সাড়া দ্যায়, পরগাছার বাওয়া শিকড় তখনই তাকে দাব্‌ড়ে রাখে। ফাগুনে হাওয়ায় যদি মুকুল উঁকি মার্‌তে চায়, পরগাছার পাতার চাপড়ে মুসড়ে পড়ে।

"আচ্ছা গাছটাকে একেবারে মেরে ফেলেনা কেন ?"

"তা'হলে যে পরগাছার চলে না; তা'রত আর নিজের মাটি থেকে রস তোলবার ক্ষমতা নেই! গাছটা তোলে, পর-গাছা দিব্বি কাঁধে চড়ে আরামে খায়।"

"তবে কি গাছটার বাঁচবার কোনো উপায় নাই ?"

"আছে আছে, এক উপায় আছে; তা'কি ও পারবে!"

"কি ?"

"গাছ যদি রস না জোগায়।"

"তা'হলেতো নিজেই মরে যাবে!"

"ওরে, ঐ মরে গিয়েই বাঁচবে!"

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

মলয়ের প্রতি।

(১)

মলয়!

সে আছে কেমন ?

যুগ যুগান্তর প্রায়, তারে না নেহারি হায়!

শশধর সুধায় না—হাসায় গগন!

নিরাশা জলদ দল, গর্জ্জে হৃদে অবিরল

হৃদয় বিশুষ্ক হায় দগ্ধ প্রাণ মন।

সে আছে কেমন ?

(২)

সে আছে কেমন ?

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যত, হইয়াছে বজ্রাহত,

কালের কুটীল গতি হায় রে কেমন ?

হৃদপিণ্ড বিদারিয়া বুকের শোণিত দিয়া

যাহারে করিয়েছিনু নিজের মতন,

সে আছে কেমন ?

(৩)

সে আছে কেমন ?

কি দিব তাহারে আর, কত দিছি উপহার,

কতই দিয়েছি—আরো বাকি কি এখন!

এত যে দিলাম ছাই, তবু না তাহারে পাই—

কে করিল বিদলিত নন্দন কানন ?

সে আছে কেমন ?

(৪)

মলয়! সে আছে কেমন!

ভ্রমিত কাননে বনে, নবফুল্ল ফুল বনে

মিশিয়ে মধুর বাস কর আহরণ,

পশ্চিমে ডুবিলে রবি, হাসিলে চাঁদের ছবি

কয়ে যেও চুপে চুপে সে কেন এমন!

সে আছে কেমন ?

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

বৈদেশিকী।

রবি বাসরিক বিদ্যালয়।

এখন বিলাতে রবি বাসরিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। ১৭৮০ সনে রবার্ট রেইকিস্ (Robert Raikes) নামক এক ব্যক্তি নিতান্ত অপদার্থ ছেলে—যাহারা রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়—এইরূপ কতিপয় বালককে একত্র করিয়া রবিবারে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ইহাতেই প্রথমে রবি বাসরিক বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। এই সংবাদ নানা খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং এইরূপে রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের প্রচার হয়, বর্ত্তমানে রেইকিসের এক প্রস্তর মূর্ত্তি টেম্‌স্ নদীর তীরে স্থাপিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রেটবৃটেন এবং আইরলেণ্ডে ৫১ হাজার বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় ৬ লক্ষ ৯০ হাজার কর্ম্মচারী এবং ৬৬ লক্ষ ৭০ হাজার ছাত্র বর্ত্তমান আছে। দেশের প্রতি ৭ জন লোকের মধ্যে ১ জন এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। আমাদের এই দরিদ্র নিরক্ষর দেশে কি এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে পারে না?

খরগোশ।

বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতে খরগোশ লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইতেও তথাকার লোকে অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা বাহির করিয়াছে। এখন সেখানে বৎসরে ১৮৭৫০০০০ টাকার খরগোশের চামড়া বিক্রয় হয়। ইহা ভিন্ন বহু টাকার মাংস বিক্রয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের খাদ্যের অনুপযুক্ত যাহা কিছু মাংস থাকে তাহা মুরগীর খাদ্যরূপে বিক্রি হইয়া থাকে। উহাও প্রায় ৭৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। এইরূপে শস্যের অপচয়ের কিছু ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে।

একটী অদ্ভুত মুক্তা।

এবার বিলাতের প্রদর্শনীতে একটী অদ্ভুত মুক্তা প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা দেখিতে একটী ক্রুশের মত (+, মত, নয়টী মুক্তার সমাবেশে ইহা গঠিত হইয়াছে। ১৮৭৪ সনে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতে ইহা পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা লণ্ডনের এক বণিকের সম্পত্তি। ইহার মূল্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

বীজ বপন।

এযাবৎ বীজ বপনের কার্য্য আমাদের পূর্ব্বাপর প্রথানুসারেই চলিতেছিল। কিছু দিন হয় আমেরিকায় ৬৪০ একর জমিতে ঘাসের বীজ বপন করিবার জন্য এরোপ্লেনের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। যন্ত্র সাহায্যে এই ভূমিখণ্ড বপন করিতে মাত্র ২০ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। দুই জনের ইহা মামুলী প্রথায় বপন করিতে ৩০ দিন সময় লাগে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

মিলন ও বিরহ।

মিলন বিরহে কহে, "কণ্ঠে তব বিষ!
জর্জ্জরিত করিতেছ প্রেমিক হৃদয়!
বিরহ কহিল, "মূর্খ, তুই কি জানিস্?
বিষে বিষে অতি বিষে সুধাধারা বয়!

শ্রীতারকনাথ ঘোষ

সাহিত্য সংবাদ।

আগামী ১০ই ১১ই জ্যৈষ্ঠ কিশোরগঞ্জ—পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, ডি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

গত ১৮ই বৈশাখ ধলার সাহিত্যসেবী ভূম্যধিকারী, শিক্ষক, ও ছাত্রগণ মিলিত হইয়া ধলা স্কুল গৃহে এক সাহিত্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রতি মাসেই এই সম্মিলনের একটী করিয়া অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

গত ২২শে ও ২৩শে বৈশাখ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন হইয়াগিয়াছে। সম্মিলনে বহু প্রবন্ধও কবিতা পঠিত হইয়াছিল।

গত ২৫শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন।

Shourabh—Reg. No. 745.

ত্রয়োদশ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২ পঞ্চম সংখ্যা।

সৌরভ

সম্পাদক

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী।

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মহাত্মা গান্ধী।

ত্রয়োদশ বর্ষ। মেয়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ পঞ্চম সংখ্যা।

মহাত্মা।

বারেক ভুলিয়া ক্ষণেকের তরে জীবনের শত কাজ,
রাজপথ পানে নয়ন মেলিয়া দেখ সেথা চেয়ে আজ।
গগনে পবনে মুখরিয়া উঠে কার জয় কলরোল,
কার আগমনে পরাণ আজিকে আনন্দে উতরোল।
আপন হতেও আপন যেজন আজিকার এই দিনে,
যে জন এনেছে শান্তির বাণী বেদনা-কাতর প্রাণে;
যাঁহার প্রেমের মৃদু পরশনে টুটিয়া পাষাণ কারা,
ছুটেছে সহসা কোন মায়াবলে নব জীবনের ধারা।
সে তাপস নিজ নীরব সাধন মঙ্গল উপচারে,
মুক্তিমন্ত্র প্রচারিতে আজ এসেছে মোদের দ্বারে।
অহিংস অনলে ভেদাভেদ ভুলি হিংসা আহুতি দিয়া,
ঋত্বিক সেই জাগায়ে তুলেছে অযুত ভারত হিয়া।
ত্যজিয়া জগতে সকল গর্ব্ব ত্যাগের হোমানলে,
ভিখারী সেজেছে আপনা বিকায়ে স্বদেশের পদতলে।
প্রবল পীড়নে চারিদিকে উঠে নিদারুণ হাহাকার,
হাসিমুখে সে যে সহিছে নীরবে শত অপমান ভার।
বিরাট হৃদয় ঝরিয়া পড়িছে করুণায় অবিরল,
তাই আসিয়াছে মুছাইতে বুঝি বেদনার আঁখি জল।
দীনের মলিন শুষ্ক অধরে ফুটাতে মধুর হাসি,
কোন্ জন হেন ঢালিয়া দিয়াছে হৃদয়ের সুধারাশি!
শত লাঞ্ছনা রোধিবার লাগি ঢেলে দিয়ে দেহ মন,
স্বদেশের তরে এমন করিয়া ভাবে নাই কোন জন।
দরদীর মত কাঁদে নাই কভু কাঁদে নাই আর কেহ,
দুনিয়াতে সেই অভাগার লাগি হারায়েছে যারা গেহ।
পূর্ব্ব গগনে নিকষে তরুণ অরুণ-কিরণ-পাতে,
চেয়ে দেখ্ ওই দাঁড়ায়ে সাধক দেউলের আঙ্গিনাতে!
ছি ছি! ফুটিল না নয়ন তোদের তন্দ্রায় ভরপুর,
কাটিল না আজো দুঃখ-যামিনীর কবেকার ঘুম ঘোর।
এখনো কি তোরা আলেয়ার মোহে মিথ্যার দাস হয়ে,
জগতের পিছু পড়িয়া রহিবি ব্যর্থ জীবন বয়ে?
লক্ষকণ্ঠে গাহিয়া আজিকে মিলন-আরতি গান,
সার্থক করো বিফল জীবন—নিরাশায় ম্রিয়মাণ।
কে আছ কোথায় লুকায়ে সভয়ে—বন্দী ঘরের কোণে
এস ত্বরা করে মা'র অভিষেকে পূজারীর আহ্বানে।
কর্ম্মবীরের মুক্তির বাণী মাতায়ে আকুল সুরে,
নবীন চেতনা জাগায়ে তুলিবে তৃষিত পরাণ ভরে।
নিয়ে এস আজ কাজের প্রমাণ, কি করেছ এত দিন,
কোন সাধনায় কাটায়েছ নিশি, কোন মোহে ছিলে লীন্?
ভিখারীর মত শুধু ধার করা কর্ম্মের উপহারে,
ঘুচিবেনা কভু মর্ম্ম যাতনা আজি এই ধরা পরে।
অতীতের ক্ষত ধুয়ে মুছে ফেলে দোষ ত্রুটি সব লাজ,
নির্ম্মল হৃদে যজ্ঞবেদীতে দাঁড়াও পুলকে আজ!
দিকে দিকে শুন বাজিয়া উঠিছে আশার হরষ গান,
বিজয়ীর বেশে বুক বেঁধে এসে হও বেগে আগুয়ান।
উজলি উঠিছে দুখ নিশি ভোরে মুক্তি আলোক ধারা,
ধেয়ে চলো নব সাধনার পথে ব্যাকুল চিত্তহারা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

সত্য ও সংস্কার।

যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবমনেরও ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ? বর্ত্তমান যুগে জগতের সর্ব্বত্র এবং জীবনের সর্ব্ববিভাগেই মানব-চিন্তা ও সংস্কারের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। শুধু পাশ্চাত্যপ্রদেশে নয়, আমাদের দেশেও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এক নূতন আলোড়ন দেখা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশের জনসাধারণ যে সকল সামাজিক পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তাও করিতে পারিত না তাহা এখন সহজেই তাহাদের দ্বারা অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকও নূতন কোনও প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা শুনিলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিহরিয়া উঠিতেন, অন্ততঃ ধীরে চলিবার ওজুহাত দিয়া নূতন আলোককে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এখন আর সাধারণ ভাবে আমাদের দেশের ও জাতির সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই এখন অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে গতিশীলতাতেই জীবন এবং স্থিতিশীলতাতেই মৃত্যু। যাঁহারা সংস্কার বিরোধীর ভান করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন যে এই বিশাল হিন্দুসমাজ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি বলে বাহিরের সকল প্রকার আলোড়ন বিলোড়নের, স্রোতকে অগ্রাহ্য বা প্রতিরোধ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে, তাঁহারা ইতিহাস বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেন। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই হিন্দু সমাজ সংস্কার প্রবণতা ও গ্রহণশীলতা দ্বারাই নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া ক্রমাগত বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। আজ বিশেষ ভাবে চতুর্দ্দিকে নবজীবনের সাড়া পাইয়া ভারতীয় জনসাধারণ বুঝিতে ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে জীবনপথে অগ্রসর হইতে-হইলেই তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে পুরাতনকে ছাড়িতে এবং নূতনকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই জৈবোন্নতির চিরন্তন অমোঘ নিয়ম ; ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে এই নিয়মেই মানুষকে চলিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ইহাদ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় না যে পুরাতন ও অতীতকে সম্পূর্ণরূপেই অগ্রাহ্য করিতে হইবে ; তাহা কখনই ঠিক নয়। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দূতস্বরূপ ; পুরাতন অনেক দিক দিয়াই নূতনকে প্রকাশিত ও পরিচিত করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—আমরা অতীতকে গ্রহণ করিব অতীতের খাতিরে নয়, বর্ত্তমানের খাতিরে। বর্ত্তমানের জন্যই আমাদেরকে অতীতের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্যক্তি এবং সমাজ—উভয়ের জীবনেই দুইটী বিভিন্ন মুখী ধারা আছে ; একটি চায় সংরক্ষণকে এবং আর একটি চায় সংস্কারকে (static and dynamic forces)। এই দুই শক্তির উপযুক্ত সংমিশ্রন ও সামঞ্জস্যের দ্বারাই ব্যক্তি ও সমাজ সঞ্জীবিত থাকে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সংরক্ষণ (conservation) ও স্থিতিশীলতা (conservatism) কখনই এক বস্তু নয়। আমাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে সমাজকে, সমাজের প্রচলিত সকল প্রথা ও সংস্কারকে নয়। সমাজের ভিতরে যে সকল চিরন্তন সত্য ও শক্তি (eternal verities and forces) আছে সেই গুলিকে জাগ্রত ও সতেজ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে সেগুলিকেও সজীব রাখিতে হইলে সময় এবং অবস্থা বিবর্ত্তনের প্রভাবে নূতন সামঞ্জস্যের (readjustment) প্রয়োজন হইবেই হইবে ; এবং সেই নূতন সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলেই নূতন আলোক, নূতন শক্তি এবং নূতন বিধিকে বহুল পরিমাণে গ্রহণ এবং সমাজ প্রতিষ্ঠানের সহিত অনুস্যূত করিতে হইবে। সমাজ সংরক্ষণের এই মূল সূত্র যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে সমাজ রক্ষার ব্যপদেশে যে আমাদের সংস্কার প্রচেষ্টা, তাহা অনেক পরিমাণেই অসত্য ও অলীক হইয়া যাইবে এবং সেরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই সাধিত হইবে। ইংরাজিতে এইরূপ সংস্কারের প্রচারককে বলা হইয়া থাকে "holiday advocates of reform", অর্থাৎ অবসরানুযায়ী সংস্কারান্বেষী। এইরূপ সংস্কার প্রণালীর অনুবর্ত্তনকারী যাঁহারা তাঁহারা প্রায়ই একটা নূতন হুজুকের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজকে একটু সুবিধামত নাড়া চাড়া দিয়া

দেখিতে চান ইহাদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ আত্মতুষ্টি বা বা কতক জনের মনস্তুষ্টি করা চলে কি না? প্রকৃত ও স্থায়ী সংস্কারের জন্য যে অনাবিল সত্যানুরাগ ও দৃঢ় কাঠিন্য বংশের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের নাই। এই জন্যই আমাদের অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহা অগ্রসর হইয়াই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মার্কিণ ঋষি এমার্যণ একটি অতি বড় সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই—God offers to every mind its choice between truth and repose",—অর্থাৎ, ঈশ্বর প্রত্যেক মানবাত্মাকেই সত্য ও আয়াস এই দুইয়ের মধ্যে নির্ব্বাচনের সুযোগ দিয়া থাকেন। যদি তুমি সত্যকে চাও, তাহা হইলে আয়াস তুমি পাইতে পার না, সত্যকে পাইতে হইলে আয়াস ছাড়িতে হইবেই। সত্য লাভের একমাত্র পথই সংগ্রাম। সমাজে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলেই তোমাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে অসত্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেই হইবে। ইহার নামই প্রকৃত সংস্কার। অসত্য ও অন্যায়কে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আমাদের যত দূর যাওয়া প্রয়োজন ততদূর যাইবার সাহস আমাদের থাকাই চাই। নচেৎ দশের মনস্তুষ্টির প্ররোচনায় অথবা বিপ্লব জুজুর অতিরিক্ত ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া যদি আমাদিগকে চলিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের দ্বারা প্রকৃত সংস্কার সাধন কখনই হইতে পারে না। যুগ প্রবর্ত্তক যাঁহারা, সমাজের শ্রেষ্ঠ নেতা যাঁহারা, তাঁহারা কখনই ঐ ভাবে সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন নাই। আমাদের দেশের বুদ্ধ. নানক, কবির, চৈতন্য, রামমোহন, কেশবচন্দ্র—ইঁহারা কেহই সংস্কার কার্য্যে "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ," এই বণিক নীতির অনুসরণ করেন নাই। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, এবং অসত্য ও অন্যায়ের উচ্ছেদসাধন যদি সমাজের পক্ষে হিতকর হয়, তাহা হইলে শুধু বিপ্লবের ভয়ে সংস্কারের স্বাভাবিক গতিকে কখনও কৃত্রিম উপায়ে রুদ্ধ করা চলিতে পারে না। সমাজের হিতার্থে যে সকল মহাপুরুষ যুগে যুগে দেশে দেশে সংস্কার কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিনব চিন্তা ধারা ও কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন ভীষণ বিপ্লবপন্থী ছিলেন। যুগাবতারেরা সর্ব্বদাই প্রণোদিত হইয়াছেন একমাত্র সত্যের প্রেরণায় এবং তাঁহাদের কার্য্যের উপযোগীতা বিবেচনায়; সুবিধাবাদের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া মাঝখানে থামিয়া যান নাই। একজন চিন্তাশীল পাশ্চাত্য লেখক তাই বলিয়াছেন:—"When a new system has been found to be useful to society, one should rather execute it with one blow than go circumlocutorily through inter mediate stages, which have already lost their right to exist,"—অর্থাৎ, যখন কোনও একটি নূতন ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহা তৎক্ষণাৎই গ্রহণ করিতে হইবে; অন্তর্বর্ত্তী স্তর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না; কেন না, সেই সকল স্তরের প্রয়োজনীয়তা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী দেশের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন আনয়নের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেশের অবস্থা বিচারে নিতান্তই বিপ্লবসূচক (revolutionery) এবং দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক সমালোচকই ঐ কারণে তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কার প্রণালীকে অসাময়িক (premature) বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এখন অনেকেই তাহার 'প্রোগ্রাম' কার্য্যতঃ পরখ করিতে গিয়া দেখিয়াছেন জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে নিতান্ত অভিনব বলিয়া থামিয়া গেলে চলিবে না। সত্য ও ন্যায়কে সমগ্র ও অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি এখনও দেশের সাধারণ লোক দেখাইতে পারিতেছে না, তাই তাহাদের গৃহীত বড় বড় প্রোগ্রাম ও প্রচেষ্টা তেমন সফল হইতে পারিতেছে না; অনেকেরই কথায় এবং কার্য্যে অসঙ্গতি প্রকাশ পাইতেছে এবং লোকহিতকর অনেক সদনুষ্ঠান অনেক স্থানে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। সেদিনও তো ভারত পূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতিরূপে দেশবাসীর নানা কার্য্যাবলীর মধ্যে ঘোর কপটতা ও সত্য ভীরুতার কথা উল্লেখ করিয়া এই জাতিকে ধিক্কার দিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান নব জাগরণের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীও কি প্রকাণ্ড ভাবে

তাঁহার অধঃপতিত দেশবাসীকে এই বলিয়া নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই? জাতীয় অভ্যুত্থানের সর্ব্বপ্রধান উপায় সত্যের উপর অটল নির্ভর এবং জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যে অসত্যের প্রতিরোধ। যুগযুগান্ত ধরিয়া অস্পৃশ্যতারূপ যে মহারোগ সমাজদেহকে নির্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহা আমাদের সামাজিক সুসংস্থিতির ভীষণ পরিপন্থি হইয়া রাজত্ব করিতেছে তাহাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য মহাপ্রাণ গান্ধী কি অসাধারণ পরিশ্রমই করিতেছেন! তাঁহার অনুপ্রাণিত জীবনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দেশের কত সহস্র লোকই না ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মহামন্ত্র জীবনে ও কার্য্যে বিশ্বস্তভাবে পালন করিবার সরল প্রবৃত্তি ও সত্য সংকল্প কত জনের মধ্যে দেখা গিয়াছে? অস্পৃশ্যতা দোষ নিবারণের জন্য মানুষের হৃদয়ের যে কলুষভাবকে দূর করিয়া দিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া মনে সম্মান করিতে হইবে—তাহা কি আমরা পারিতেছি? এখন পর্য্যন্ত কি বহুল পরিমাণে এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন সভাসমিতির শূন্য গর্ভ নির্দ্ধারণেই পর্য্যবসিত হইতেছে না? দেশে সত্যনিষ্ঠা ও সত্যাগ্রহ এখন পর্য্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, তাই গান্ধীর কঠোর তপস্যা, অসীম স্বার্থত্যাগ ও আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাই বর্ত্তমান যুগে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রবক্তা ও নায়ক শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া তাঁহার প্রচারনীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একমাত্র 'স্বরাজ' শব্দ ব্যতীত তাঁহার ইদানীন্তন রাষ্ট্রীয় বাণীর (political gospel) ভিতরে রাজনীতি জ্ঞাপক কোনও ভাব বা উক্তি বড় স্থান পাইতেছে না, কেন না তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন যে মানুষ যে পর্য্যন্ত না ব্যক্তিগত ভাবে অথবা জাতিগত ভাবে সত্যের সহিত দৃঢ়রূপে সংসৃষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান পণ্ড হইয়া যায়।

যে পর্য্যন্ত আমরা সত্য ও ন্যায়কে সকলপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে বুক দিয়া ধরিতে না পারিব, যে পর্য্যন্ত অসত্য ও অন্যায়কে সকলপ্রকার সুবিধা ও স্বস্তির প্রলোভন সত্ত্বেও আমাদের হৃদগত আলোক ও ভগবৎপ্রদত্ত শক্তি দ্বারা অপসারিত করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প না হইব, সে পর্য্যন্ত আমাদের সকল প্রকার সংস্কার প্রচেষ্টা শুধু একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা প্রসূত অভিনয়ের ব্যাপার হইবে মাত্র এবং আমাদের বাহিরের আড়ম্বর ও কোলাহল যতই থাক না কেন এইরূপ সংস্কার কখনও স্থায়ী ও সুফল প্রসূ হইতে পারিবে না। বরং তাহা দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় অন্তর্জীবনের শক্তি একটু একটু করিয়া অদৃশ্যভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আমাদের বাহিরের সকল আয়োজন, সকল অনুষ্ঠান, সকল প্রতিশ্রুতিকে উপহসিত করিয়া আমাদেরকে নিজেদের কাছে, জগতের কাছে ও বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার কাছে দায়ী ও অপরাধী করিবে। আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সংস্কার সাধন করিতে হইলে আমাদের সকল কর্ম্মের, সকল আকাঙ্ক্ষার সকল সাধনার ভিতরেই স্মরণ রাখিতে হইবে ঋষি প্রচারিত সেই অমোঘ বিধি—"সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্"।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাতী খেদা।

(৫)

১৬ই অগ্রহায়ণ— আজ আমরা সকাল সকাল আহারান্তে কোঠের স্থান দেখিতে গেলাম। তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। অসংখ্য কাঠ স্তূপীকৃত রহিয়াছে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড কাঠের কারবার এখানে চলিতেছে, কতক কুলী গর্ত্তে কাঠ ফেলাইতেছে; কেহ বা ফেলাইয়াছে কেহ বা তাহার পাট বাঁধা শেষ করিয়া কষ্টার্জ্জিত সুখের সদ্ব্যবহার করিতেছে। বস্তুতঃ এই বিরাট ব্যাপার পূর্ব্বে যে না দেখিয়াছে সে বিস্মিত হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বড় কাকাই এই দলের মধ্যে খেদা কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ, তাঁহার মতে এই কোঠের স্থান উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কোঠের মুখটা ঠিক এক খল হইতে অন্য খলে যাওয়ার গড় মলমে হইয়াছিল। খলের মধ্যে বোধ হয় দুই দলের হস্তী আছে—দুই দিক হইতে মলম আসিয়া এই এক স্থানে মিলিত

হইয়াছে। অসুবিধার মধ্যে এই ছিল যে হস্তীকে নিম্ন হইতে প্রথমে অনেকটা উচ্চে উঠাইতে হইবে; এই উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত উঠিলে হাতী গড় দাখিল হওয়ার ষোল আনা আশা করা যায়। আজ এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই কেম্পে ফিরা গেল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শরীর স্বভাবতঃই ক্লান্ত হইয়া থাকে, ডাকের পত্র এবং সংবাদ পত্রাদি পাঠ ও চা পান করিয়া কিছুকাল গল্পগুজ ও বিশ্রামে কাটিল। আমাদের একটা অভাব অত্যন্ত রকমের এই ছিল যে আমাদের মধ্যে কেহ তেমন সুগায়ক অথবা সুরসিক ছিলেন না; সুতরাং আমাদের সান্ধ্য বিশ্রাম যে বড় জমিয়া উঠিত, তাহা মোটেই নহে। এই সমুদয় স্থানে প্রাণখোলা আনন্দ না হইলে এইরূপ কেম্প জীবন উপভোগের ব্যাপার মোটেই হইয়া উঠে না। কর্ত্তব্য কার্য্যের সময়টুকু বাদ দিয়া অবশিষ্ট সময় আনন্দে না কাটাইয়া শান্ত ছেলের মত কাটাইতে গেলে জংলী জীবনের আনন্দই মাটী হইয়া যায়।

১৭ই অগ্রহায়ণ—যথারীতি প্রাতঃকৃত্য ও চা পানের পর আহারাদি শেষ করিয়া আজও কোঠ পরিদর্শন করিতে যাওয়া গেলে। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম দরজা বাঁধার কার্য্য হইতেছে। দুই ঘণ্টার মধ্যেই এই কার্য্য শেষ হইল। আগ্নি প্রভৃতির কার্য্যও আজ শেষ হইয়াছে। বাগান প্রস্তুতের কিছু কিছু কার্য্য করিয়া বাকি কাজ কল্য প্রাতেই হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল। গাছের পাতা নূতন থাকিলে অনেক পরিমাণে স্বাভাবিকত্ব বজায় থাকিবে, এই জন্যই এই কার্য্যটা খেদার দিনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁবুতে ফিরিয়া পর দিনকার জন্য বন্দুক, গুলি, বারুদ প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া রাখা গেল। স্থির হইল—কাল আহারান্তে প্রাতে ৮টায় রওনা হইব। সন্ধ্যার সময় বড় সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের মত অজ্ঞরা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য লইয়া বড় কাকা যেখানে তাহাকে আবশ্যক উপদেশ দিতেছিলেন সেইখানে গিয়া ভিড় করিয়া বসিলাম। আজকার রাত্রি নানা সুখ স্বপ্ন, উৎসাহ উৎকণ্ঠা এবং খেদার গল্পে কাটিয়া গেল।

১৮ই অগ্রহায়ণ—সকালেই উঠিয়া তাড়াতাড়ি মস্তকাদি ধৌত করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আহারের কার্য্য সমাধা করা গেল। আজ বড় উৎসাহ। আজ কেম্পে একজন মাত্র পাহারা রাখিয়া আর সকলেই খেদা দেখিতে রওনা হইলাম।

বড় সর্দ্দার পূর্ব্বে না দেখায় আজ আর একটু আগ্নি বাড়াইয়া দিল। ইহাতে খেদা আরম্ভ করিতে কিছু সময় গিয়াছিল। আমাদের স্থান কোঠ হইতে কিয়দ্দূরে একটা প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে আসিয়া দেখা গেল সুসঙ্গ হইতে বহুলোক খেদা দেখিতে আসিয়াছে—দর্শক সংখ্যা অন্যূন ১০০ জন হইবে। এখানে পাহাড়টা খুব উচ্চ—ঠিক আমাদের নীচ দিয়াই গড়মলম। এখান হইতে হস্তী তাড়ান প্রভৃতি সমস্তই পরিষ্কার দেখা যাওয়ার কথা। গুলানেওয়ালা তুরীওয়ালা প্রভৃতি ১১½ টার সময় রওনা হইয়া গেল—ঠিক একটার সময় প্রথম তাড়নাকারীদের শব্দ শোনা গেল। প্রথম শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এবং উৎকণ্ঠা মনে সঞ্চারিত হইল। মধ্যে মধ্যে শব্দ আসে—দুর হইতে এক সর্দ্দার অপর সর্দ্দারকে ডাকিতেছে, মধ্যে মধ্যে শিঙ্গার নিনাদে পর্ব্বত মালা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সময়ে অত্যন্ত উত্তেজনা হয়। সকল সময়ই কেবল মনে হয়—কি জানি কি হয়! ক্রমশঃ মানুষের শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। প্রায় ২ টার সময় সহসা দেখা গেল—একদল হস্তী আমাদের সম্মুখবর্ত্তী নিম্নস্থিত একটা পাশের মধ্যে দিয়া আসিতেছে। প্রথমে একটা তাহার পর একটা এইরূপে একের পর আরেক—ঠিক মালার মত হস্তী আসিতেছে। দেখিয়া এমন উৎসাহ হইল যে তাহা বলা যায় না। হস্তী আসিতেছে দেখিয়াই বড় কাকা সঙ্কেত করিলেন "তোমরা এখন সকলে চুপ করিয়া থাকিও।" আমাদের মধ্যে যাহাদের জংলী জন্তুর স্বভাবের সহিত মোটামোটি পরিচয় ছিল তাহাদের পক্ষে এই আদেশ বাক্য অলঙ্ঘনীয় ছিল; কিন্তু ১০০ লোকের পক্ষে এক হুকুমে চলা বাঙ্গালীর স্বভাবে বোধ হয় খাপ খায় না। সুতরাং দর্শক সঙ্ঘের মধ্যে এ আদেশ সহজে কার্য্যকারী হয় নাই।

খেদার প্রত্যেকটা বিষয়ই এবং কার্য্যই এত উৎসাহে

এখনে উৎসাহাতিশয্যে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু ইহার ফল বড়ই খারাপ হইতে পারে; এই কারণেই দর্শক সংখ্যা তিনের উর্দ্ধে হইলেই কোটের স্থানের বিপরীত দিকে কোনও সুবিধাজনক স্থান নির্ব্বাচিত করা সমীচীন। যাহা হউক্ প্রায় ½ ঘণ্টা পরিমিতকাল ঠিক এই ভাবে কাটিয়া গেল। আমরা একটা ভীষণ উৎকণ্ঠায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। আমাদিগকে বড় সর্দ্দার বলিয়াছিল আমাদের নীচে দিয়া হাতী চলিয়া গেলেই—শব্দ করা এবং ২।৪টা ফাঁকা আওয়াজ (Blank shot) করা। হাতী যেখানে আসিয়াছে সেটা প্রায় দক্ষিণের তুরীর মাথায়—কিন্তু বহুদূর এবং দুরারোহ স্থান দিয়া আসিতে হয় বলিয়া গুলানেওয়ালারা হাতীর পশ্চাতে আসিতে পারে নাই এবং তুরীওয়ালাগণও আশ্রয় অভাবে অগ্রসর হইয়া নামিয়া যাইতে পারে নাই; এই কারণে ক্রমশঃ বিলম্ব হইতে লাগিল। হঠাৎ প্রবেশ দরজার মুখে ২।৩ বার বন্দুকের ভীষণ শব্দ হইল, এবং এক সঙ্গে লোকের চীৎকার ও খট্‌খটিয়ার শব্দ শ্রবণ করা গেল—এই শব্দ হওয়া মাত্র সমুদয় হস্তীই বেশ জোড়ে আমাদের সীমানা পার হইয়া গেল। পার হওয়া মাত্র বড়কাকার ইঙ্গিতে আমরা প্রায় ১০।১২টা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিলাম। তখন তুমুল শব্দ করিতে আরম্ভ করা গেল। হাতী ইহাতে আরও সবেগে অগ্রসর হইল। আমরা ভাবিলাম হাতী বুঝি গড়দাখিলই হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় আগ্নির মুখ হইতে সমস্ত হাতী ফিরিয়া আসিল! বামের তুরী অগ্রসর হইয়া শব্দ করিলেই বোধ হয় হাতী এ ভাবে ফিরিত না; দক্ষিণের তুরীর লোকগুলি সোজা পাহাড় বাহিয়া অবতরণ করার সাহস পাইল না—গুলানেওয়ালারা দুই তুরীর সহিত মিলিতে পারিল না, কাজেই হাতী সুবিধাজনক স্থান সত্বেও অনায়াসে ফিরিয়া গেল! তথাপি হস্তী একেবারে চলিয়া গেলনা; কারণ গুলানেওয়ালারা দূরে পশ্চাৎ হইতে কেবল বন্দুকের সাহায্যে হাতী ফিরাইতেছিল। ইহাই কিন্তু কার্য্য পণ্ডহওয়ার প্রধান কারণ হইয়াছিল। হাতী কিন্তু তুরীর ভিতর হইতে এক পদও পশ্চাৎপদ হইল না কোঠের দিকেও অগ্রসর হইল না। অধিকন্তু শেষে দেখা গেল হাতীর বন্দুকের ভীতিই চলিয়াগিয়াছে! হাতীর তখন এমন হইল যে, যে দিক হইতে বন্দুকের শব্দ হয় ঠিক সেই দিকেই দলের প্রধান হস্তী ছুটিয়া যাইয়া গাছ-পালা যাহা কিছু সম্মুখে পায় তাহাই ভাঙ্গিতে থাকে। এই দলের চালক ছিল একটী সুবৃহৎ কুমকী; তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সে যেন মানুষের রীতি-নীতির সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত।

হস্তী এই ভাবেই আছে দেখিয়া আমি ও ছোটকাকা ধীরে ধীরে গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় কিছু দূরেই মট্‌ মট্‌ করিয়া গাছ ভাঙ্গার শব্দ পাওয়া গেল। প্রথম এ শব্দ আমি শুনি নাই; ছোটকাকাই ডাকিয়া বলিলেন, বোধ হয় হাতী শব্দ করিতেছে; পরমুহূর্ত্তেই দেখি একেবারে রাস্তার উপরেই প্রকাণ্ড তিনটা হস্তী আমাদের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বোধ হয় যেন আক্রমণ করিবে কিনা ইহাই চিন্তা করিতেছে! আমার কিংবা ছোটকাকার নিকট তখন বন্দুক ছিল না, কাজেই আমরা দৌড়িয়া পার্শ্বের বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম, বৃক্ষের কাণ্ডটাই ছিল একটা আশ্রয়স্থল। বৃক্ষের আশ্রয়ে আসিয়াই বন্দুক কয়টা ভরিয়া রাখা হইল। বড় কাকার হুকুম না পাইলে আওয়াজ করা যাইবে না, কাজেই তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এই স্থান হইতে আওয়াজ হইলে হাতী ফিরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কি না, আর যদি দল ছাড়া ২।৩ টা মাত্রই বাহির হইয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে এই ২।৩টাকে অনায়াসে যাইতে দেওয়াই সঙ্গত; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ২৫।৩০টা হাতী ইহাদের পশ্চাতেছিল—তাহা তখনও বুঝা যায় নাই। যাহাই হৌক্ আমরা সকল অবস্থা ভাবিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই বড় সর্দ্দার কোথা হইতে প্রকৃত সংবাদ লইয়া বিদ্যুৎবেগে আসিয়া একটা Blank shot করিল; তাহাতে হস্তীগুলি নড়িল না দেখিয়া পুনঃরায় আর ১টা এবং তাহারপর ১নং গুলি ছুড়িলে হাতীগুলি ফিরিয়া খলে নামিয়া পূর্ব্ব স্থানে আসিল। বড় সর্দ্দার আর ১মিনিটকাল বিলম্ব করিলে হয়ত সমস্ত হাতীই বাহির হইয়া যাইত। এখন বুঝিলাম, পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া একটা অতি দুরারোহ পথ ছিল, সেই পথ দিয়াই এই দল বাহির হইয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতগুলি হস্তী কিরূপে প্রায় শতাধিক লোকচক্ষুর অন্তরালে এ ভাবে আসিল! যাহা হউক্ হস্তী ফিরিল বটে
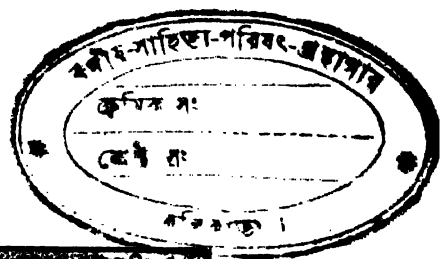
খোকা-লেখক—শ্রীমান অমিতাভ আচার্য্য চৌধুরী।

কিন্তু আজ আর হস্তী কোঠের দিকে মোটেই অগ্রসর হইল না। বেলা ৫টা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হওয়ায় আজ খেদা বন্ধ রাখা গেল। জীবনের প্রথম দিনের ফল দেখিয়া মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ উৎসাহ শূন্য হইলাম না। খেদায় সুফল লাভ করিতেই হইবে। কাজেই হস্তীগুলি যাহাতে রাত্রিতে পলায়ন না করে সে বিষয়ে পুঁজির লোকদিগকে হুঁসিয়ার থাকিতে আদেশ করিয়া ফিরিয়া কেম্পে আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

খোকা লেখক।

খোকা দ্যাখে তাঁ'দের ত্রয়োদশী সম্মিলনে রচনা লিখে সবাই তা'র জ্যেঠা মশায়কে দ্যায়। তা'র সখ হ'ল সেও রচনা লিখ্‌বে। জ্যেঠা মশায়ের কাছ থেকে পেন্‌সিল আর কাগজ চেয়ে নিয়ে গেল। খানিক পরে হিজিবিজি লেখা কাগজখানা এনে জ্যেঠা মশায়কে দিল। তিনি কাগজ হাতে নিয়ে দেখেন সত্যিই তা'তে একটা ছোট্ট গল্প লেখা আছে। তিনি খুব খুসী হলেন, খোকাকে দিয়ে সেটা সেই সম্মিলনে পাঠ করালেন।

খোকা কখনো বাঘ দেখে নি। আর বাঘ যে নগরে এসে কুকুর ছানা খায় না এটাও ঠিক। এটি খোকার কল্পনা। আর কুকুরের ভাল ছেলেরা জ্যেঠা মশায়ের কথা শোনে কি না জানি না কিন্তু ভাল ছেলে হ'তে হ'লে যে কেবল মাত্র সকলের কথা শুন্‌লেই হয় না, জ্যেঠা মশায়ের কথাও শুন্‌তে হয় এটা খোকার নিজের মত। এই রূপকের ভিতর দিয়ে একটি নীতি প্রচার করা হয়েছে। এতে খোকা লেখকের পরিকল্পনার অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। খোকা লেখক যখন আর খোকা থাক্‌বে না তখন সত্যই একজন সুলেখক হবে বলে মনে হয়। খোকা লেখকের লেখাটি অবিকল ছাপিয়া দেওয়া হল।

এই লেখকটি হচ্ছেন, ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত তপোনাথ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। এঁর জ্যেঠা মশায় সুকবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মশায় খোকা লেখকের নাম—শ্রীমান্ অমিতাভ। বয়স পাঁচ বছর।

শ্রীসুরজিৎ দাস গুপ্ত।

খোকার গল্প।
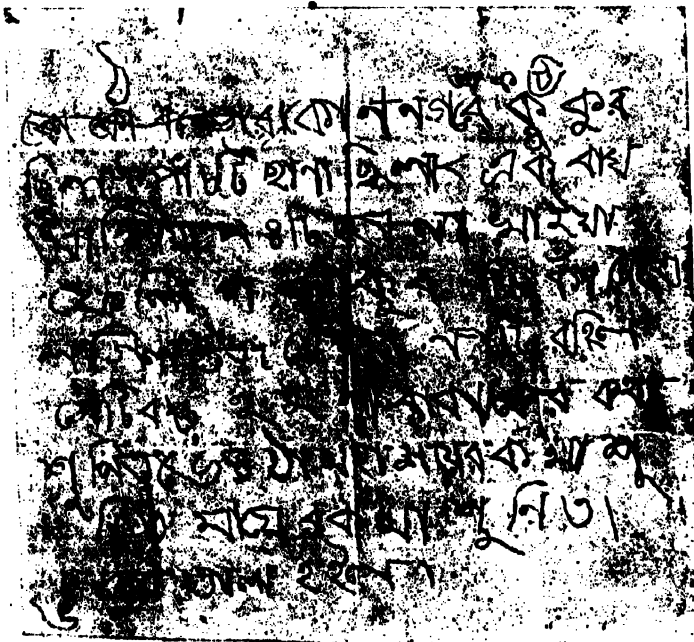
কোন নগরে একটি কুকুর ছিল তাহার পাঁচটি ছানা ছিল। এক বাঘ আসিয়া ৪টি ছানা খাইয়া ফেলিল কুকুরটি কাঁদিতে লাগিল যে ছানাটি রহিল সেটি বড় হইল বাবার কথা শুনিত জ্যেঠা মহাশয়ের কথা শুনিত মায়ের কথা শুনিত। ও খুব ভাল হইল।

ঝি।

বড় দুঃখের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়া সুকুমার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাস করিল। পাস করিয়াই যেন সে ভাবনা বিড়ম্বনার হাতে পড়িল বেশী। পাস না করিলে সে তাহার পৈত্রিক যজমান যে কয় ঘর ছিল, তাহাই সম্বল করিয়া পিতার ন্যায় দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করিয়া কোন মতে বিধবা মাতার আধ পেট ও নিজের একপেট প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতে পারিত।

এখন এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াও কি সে তাহাই করিবে? সে যে ইতিমধ্যে আরও নূতন অনেক কিছু ভাবিয়া রাখিয়াছে তাহার জীবনের দুঃখদৈন্যের অবসানের জন্য; সে কি আজ সেই রঙ্গিন নেসার স্বপ্ন ছাড়িয়া রৌদ্র বর্ষা মাথায় লইয়া এক হাটু কাদা পায়ে আগলাইয়া, অর্দ্ধ আনা ভোজন দক্ষিণা ও এক আনা পূজার দক্ষিণা, দেড় হাত গামছা ও অর্দ্ধ সের আতব চাউল এবং কাঁচা কলার ভোজ্য কুড়াইয়া চিরদিন পিতার ন্যায় দুঃসহ জীবন যাপন করিতে থাকিবে?

না করিয়াই বা তাহার অন্য উপায় কি? দক্ষিণাজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিঃস্ব উপায়হীন পুত্রকে কে কলেজের ব্যয় দিয়া তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়তা করিবে? এ চিন্তা যে গরীবের ঘোড়া রোগের লক্ষণ!

মাতা পুত্র ঘরের মেঝে চাটাইর উপর জীর্ণ পাটির বিছানায় শুইয়া আজ ভাবিতেছিল। ঘরের চালের ছানির ভিতর দিয়া আকাশের নক্ষত্ররাশি চুপি দিয়া থাকিয়া আজ বিধবা মাতা ও পুত্রের ভাবনাকে শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল।

মা বলিলেন—'সুকু, বাবা, আর পড়া হইবে না; পেটে এক বেলার দুটা যে সাকায়, তাহাই জুটে না, তোমাকে কলেজে পড়িবার খরচ কে দিবে' বাবা? এই বর্ষাকাল যে দিন বৃষ্টি হয়, বসিয়া বসিয়া সারা রাত ভিজিয়া কাটাইতে হয়; দুইটা আড়াইটা টাকা হইলেই ঘরের দুইটা ছানি দেওয়া যাইত, পুড়া পেট পালিব না মাথা রাখিবার যোগাড় করিব?'

মায়ের কথা শেষ না হইতেই ছেলে বলিল—"যে ভগবান এতদিন চালাইয়াছেন মা. আজও তিনিই চালাইবেন। যে কষ্টে স্কুলে পড়িয়াছি, ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট কি আর আছে মা? এরূপ কষ্ট করিবারও কি ভগবান আমাকে অধিকার দিবেন না—শক্তি দিবেন না। নিশ্চয়ই দিবেন; নতুবা পাস করাইতেন না। পাস যখন করাইয়াছেন, তখন পথও তিনিই দেখাইবেন। না দেখান শেষের সম্বল যজমান যাজন—সেতো আছেই।"

মা—"এখন না রাখিলে যজমান থাকিবে কেন? যে দুই চার ঘর অবশিষ্ট আছে—এখনও যদি ডাক দিলে পায়, তবে তারা থাকিবে নতুবা তারাও যে তাদের পথই দেখিবে। আর তেমন করিয়া জেলার সহরে পড়িয়া এইরূপ গাধার খাটুনি খাটিয়া আমি তোমাকে বিদেশে থাকিতে দিব না সুকু; কাজ নাই আমার এমন বিদ্যার। তোমাকে লইয়া দিনান্তে এক বেলা আধপেট খাইতে পারি সেও আমার সুখ—আমি ইহা অপেক্ষা বেশী সুখ চাই না।"

পুত্র আব্দার করিয়া বলিল—"যা বল মা, না পড়িতে পারিলে আমি কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিব না, তাহাতে আমার হিত অপেক্ষা অহিতই হইবে অধিক। অন্তত একবার চেষ্টা করিতে অনুমতি দাও। তোমার অসম্মতিকে আমি যে বড় ভয় করি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভগবান আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। এত বড় জগৎটা মা তিনি চালাইতেছেন আর আমাদের দুইটা প্রাণীর জন্য তিনি কোন চিন্তাই করিবেন না, এ আমার কিছুইতেই বিশ্বাস হয় না। নরেন বাবু কাল যাত্রা করিয়া থাকিয়া পরশ্ব কলিকাতা যাইবেন, আমি তাঁহার সঙ্গেই যাইব। চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি কোন যোগাড় না করিতে পারি তবেতো বাধ্য হইয়াই ফিরিব। একটী পয়সাও আমার এখন প্রয়োজন হইবে না। তিনিই গাড়ীভাড়া চালাইবেন। আমি চাই কেবল তোমার আশীর্ব্বাদ মা— নিষেধ করিও না! ঘরের চালের অবস্থা দেখাইয়া আর আমাকে অধীর করিও না; তোমার দুঃখের অবস্থা ভাবিলে যে আমার জ্ঞান থাকে না মা! তাহা আমাকে না দেখাইয়া ভগবানকে দেখাও! আমাকে আশীর্ব্বাদ কর কেবল আশীর্ব্বাদ..."

ছেলের কথায় মা চুপ করিয়া রহিলেন; বাধা দিতে বা অস্বীকার করিতে তাঁহার আর সাহস হইল না।

ছেলে মায়ের নিস্তব্ধতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে মা—যাব মা ?"

মা ছেলের মনের ভাবের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেন। তিনি আর কোন বিষয়ের কোন কথা না বলিয়া একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, যাইও।"

ছেলে প্রফুল্ল মনে বলিল—"ভগবান মঙ্গলময়, তিনি কি আমাদিগকে উপবাসে মারিতে পারেন মা, তাঁহার শুভ ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। দুঃখকে মা চির আত্মীয় করিয়া তুলিতে পারিলে সে আত্মীয় কখনও দুঃখ দিতে পারে না; পরিণামে সুখই সে দিয়া থাকে। তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা, কেবল আশীর্ব্বাদ কর। ভগবানের করুণা মায়ের আশীর্ব্বাদে মূর্ত্ত্য লইয়া উঠে।

ছেলের কথায় মার প্রাণে সাহস হইল; ছেলেও মার আশীর্ব্বাদ ও সম্মতি পাইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল।

(২)

বিষ্ণুপুরের রমানাথ ভট্টাচার্য্য অতি সামান্য দুই চার বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও ২।৪ ঘর দরিদ্র যজমানের ধর্ম্মভীরুতার আশ্রয়ে অতি দীন ভাবে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটী এতদিন আগুলিয়া রহিয়াছিলেন। কার্ত্তিকের টানে হটাৎ এক দিন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের নাভিশ্বাস দেখা দিল। ভট্টাচার্য্যের একমাত্র বংশধর সুকুমার তখন নিজের চেষ্টায় জেলার সদরে স্কুলে পাঠ করিতে ছিল। পিতার অবস্থা শুনিয়া পুত্র উর্দ্ধশ্বাসে গৃহ পানে দৌড়িল বটে কিন্তু বিপদের সময় দৌড়াইলে পথ ফুরায় না। সুকুমারেরও দৌড়াইয়া পথ ফুরাইল না। যখন ফুরাইল, তখন পিতা তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিত্য ধামে আশ্রয় লইয়াছেন।

সুকুমার ছেলেটী ছিল বড়ই সুন্দর; তাহার টুল্ টুল্ মুখখানার দিকে চাহিলে অতি বড় পাষণ্ডের মনও একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে বাধ্য হইত। সেই সুকুমার কায়ার ভিতর যে প্রাণ গড়িয়া উঠাইয়াছিল তাহা ছিল আরও মধুর। সেই মধুর প্রাণের যে অভিব্যক্তি—সে ছিল অতি উচ্চ। দরিদ্র পুরোহিতের ছেলে হইলেও তাহার সেই উচ্চ অভিব্যক্তি তাহাকে তাঁহার পৈত্রিক পৌরোহিত্যের চিন্তার গণ্ডী হইতে অল্পে অল্পে সরাইয়া নিয়াছিল; তাই সে পিতা মাতার দরিদ্র্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এক দিন বিষ্ণুপুরের বাটী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।

বালক নিঃসঙ্গ একা জেলার সদরে আসিয়া জনৈক একাহারী আত্মপাকী সাধুচরিত্র ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার কৃপা ও স্নেহ দৃষ্টি লাভ করিয়া নিজের পাঠের সুযোগ করিয়া লইয়াছিল।

একাহারী আত্মপাকী ভদ্রলোকটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। সুকুমারের চেহারা ও চরিত্র তাঁহাকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে তিনি শেষটায় সেই দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের হাতে তাঁহার রান্নার ভারটা চাপাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ বালকের অন্নগ্রহণে যে পুণ্য আছে—এই সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং সেই অবসর সময়টা গীতা পাঠে নিযুক্ত করিলেন।

তখন সেই দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালককে প্রাতে উঠিয়া স্নান করিতে হইত; দস্তুর মত সন্ধ্যা করিতে হইত। তারপর কুশাসনে বসিয়া দৈনিক পাঠ শিক্ষা; পাঠের পর বাজার, তারপর রান্না; নিজ হাতে মসল্লা প্রস্তুত, এমন কি সময় সময় ইহা অপেক্ষা কঠোর কার্য্যও তাহাকে করিয়া সেই প্রভুর সেবা এবং নিজের জীবনোপায় সমাধান করিতে হইত। সুকুমার এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধনায় জীবন পরিচালিত করিয়া সেই সাধু চরিত্র ব্যক্তির আশীর্ব্বাদ প্রভাবে ৪ বৎসর কাটাইয়া এবার এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছে।

এমন ছেলেকে যে মা সম্মতি না দিয়া পৈত্রিক চাউল কলার লোভ দেখাইয়া ঘরে বসাইয়া রাখিতে পারিবেন, সে ভরসা তিনি করিতেন না।

তবে তিনি অনুমতি না দিলে সুকুমার যে এখন চার বৎসর পূর্ব্বের আচরণ পুনরায় অনুসরণ করিয়া মায়ের মনে আঘাত দিবে—এ সন্দেহও তাঁহার মনে ছিল না।

তিনি তাঁহার সাধুপুত্রের অনুরোধে সরলভাবে সম্মতি দিয়া ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

সুকুমার মায়ের চরণ ধূলা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মস্তকে লইয়া এবং তাঁহার অতি যত্নে সঞ্চিত দুইটী টাকা সম্বল

স্বরূপ পরিহিত বস্ত্রের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া গ্রামবাসী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সহিত কলিকাতা যাত্রা করিল।

(৩)

সৌন্দর্য্য যে মানুষের অনুগ্রহদৃষ্টি লাভের একটী পরম সাহায্যক তাহা বলাই বাহুল্য! সুকুমার নরেনের সহিত কলিকাতার মেসে আসিয়া তাহার গেষ্ট রূপে স্থান লইলে মেসের সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি এই ষোড়শ বর্ষীয় ফুট ফুটে বালকটীর উপর অযাচিত ভাবে আকৃষ্ট হইল। এইরূপ একটা অনুগ্রহ চাহনির তাড়নায় সুকুমারের সলজ্জ ভাব তাহাকে আরও আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, ফলে সেই সরলচিত্ত বাক্‌হীন বালক মেসের সকলেরই স্নেহের এবং আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া দাড়াইয়াছিল; ইহার মধ্যে সুকুমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের পাত্র হইল মেসের অষ্টাদশ বর্ষীয়া ঝি সুন্দরীর।

মেসের ঝি সুন্দরী প্রকৃতই ছিল সুন্দরী। কলিকাতার অনেক বড় বড় মেস সমূহের ছাত্রদিগেরও এই সংকীর্ণ চিপা গলির মেসটীর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি ছিল এবং অনেকেই সিট্ খুজিতে সদাসর্ব্বদা এই গলিতে পদ রজ ব্যয় করিতে কাতর হইত না। ইহার একমাত্র কারণই ছিল সুন্দরী ঝির চাঁদ মুখের প্রীতিপূর্ণ চটুল চাহনি।

মেসের বি, এ, ক্লাশের ছাত্র কেতকী বাবু সুন্দরীকে দুই বৎসর পূর্ব্বে আনিয়া প্রথম তাহাদের মেচে ভর্ত্তি করেন। সেই হইতে ইহারা সকলেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই ম্যেচ জুড়াইয়া সুন্দরী ঝির মুখ নাড়া ও হাত নাড়া সহ্য করিয়া ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করিতেছেন।

সুকুমারকে দেখিয়া সুন্দরী ঝির দৃষ্টিও তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। সুকুমারের নিকট কিন্তু ছিল সকলের দৃষ্টিই সমান। সে কাহারও মুখ পানে চাহিয়া—কাহারো দৃষ্টির বাধা না জন্মাইয়া সর্ব্বদা নিজ দৃষ্টি নত করিয়াই চলিত!

নরেন সুকুমারের স্বভাবে এমনই মুগ্ধছিল, যে নিজ খাবারের জন্ত প্রাপ্ত অর্থ হইতে সুকুমারের সাহায্য করিয়া সে নিজের বাহুল্য ব্যয় অনেকটা হ্রাস করিয়া ফেলিল। সে নিজে সুকুমারকে লইয়া কলেজ কমিটির মেম্বারদিগের নিকট যাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে কলেজে ফ্রি ষ্টুডেণ্টসিপ করাইয়া দিয়াছে, এবং মেসেও নিজের সাথে সাথে রাখিয়া, নিজের জল খাবারের ভাগ দিয়া কনিষ্ঠ সহোদর ভাইটীর মত আপন পক্ষপুটে ঢাকিয়া চালাইতেছে।

সুন্দরী ঝির রসিকতায় মেসের সকলেই আপ্যায়িত; এই রসিকতার আপ্যায়নের বিনিময়ের সুযোগে তাহার উপার্জ্জনও ছিল যথেষ্ট। নরেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির ছিল; সে সুন্দরীর হাবভাব ও রসিকতাকে এতদিন আমলে আনিত না, কিন্তু সুকুমারের দিকে চাহিয়া এখন তাহা তাহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িল। নরেন সুকুমারকে সাবধান করিয়া দিল—"দেখ সুকু, সাবধান, ঝির সহিত তুমি কোন বিষয়ে—কোন প্রয়োজনেও মিশিও না। গরীব মানুষ, নিজের সামান্ত কাজ নিজেই করিয়া লইবে। তাহাকে ফরমাইস দিবার কি ডাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

স্বভাব-নির্ব্বাক সুকুমার তাহার নরেনদার এই উপদেশ নত মস্তকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়া অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। সে ঝি কেন, নরেন ব্যতীত মেসের আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিতই কোন কথা বলিত না।

সুকুমার শব্দ না করিলেও মেসের অন্যান্য সমবয়স্ক ও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রেরা সময় সময় তাহাকে দু একটী কথা জিজ্ঞাসা করিত। ইহা মানব জাতির একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং সুকুমারও যথা সম্ভব সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিত। ঝিও সুযোগ মত ২। ১ টী কথা বলিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই। সে ক্ষেত্রে সুকুমার খুব সাবধানতাই অবলম্বন করিয়া চলিত।

ঝি যে দুই একদিন দুই একটী কথা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহা রসিকতার ছলে নহে। সুকুমারেরই প্রয়োজনে। সুকুমার তাহাতে উত্তর দেয় নাই, ঝিও তাহাতে দুঃখিত হয় নাই; কেন না, সে দেখিয়া বুঝিয়াছিল সুকুমারের স্বভাবই—সে নিতান্ত অল্প ভাষী।

সুকুমার পায়খানায় যাইতে ছিল; ঝি সুযোগ বুঝিয়া বলিল "সুকুমার বাবু, তোমার কাপড়টা রোজ তুমি নিজ হাতে কেচে দাও কেন? আমি দশ গণ্ডা কাপড় কাঁচ্‌তে পারি, আর তোমার কাপড় খানা কাঁচতে পারি না! আর দেখ, ও

যে বড়ই নোংড়া হয়েছে; আজ রেখে যেও আমি সাবান মেখে কেচে দেব।"

সদা প্রফুল্ল মুখে লজ্জাসুলভ হাসির স্বাভাবিক টুল টানিয়া সুকুমার পায়খানায় চলিয়া গেল। পায়খানা হইতে আসিয়া সে নরেনকে ঝির বক্তব্য জানাইল। নরেন বলিল —"দিতে চায় দিক না।"

সুকুমার স্নান করিয়া ঝিকে দেখিতে পাইল না। সে ঝিকে সেখানে না দেখিতে পাইয়া কাপড়খানা রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিল না; কি জানি পাছে কাপড়খান গোলে মালে হারাণো যায়; সে নিজ হাতেই জল ছাড়াইয়া শুকাইতে দিল। তার পর আহারে বসিল।

ঝি রাবড়ি আনিতে দোকানে গিয়াছিল, আসিয়া দেখে সুকুমার খাইতে বসিয়াছে। অন্যান্য বাবুরাও খাইতে বসিয়াছেন—ঝি সুকুমারের কাপড় সম্বন্ধে তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

সুকুমার আহার করিয়া উপরে যাইতেছে দেখিয়া ঝি বলিল—"কোথায় রেখেছ তোমার কাপড়খানা, দাও দেখি! চুপটী করে দাও; আজ আমার নিজের কাপড় ক খানাও সিদ্ধকরে কেচে নিব, এই সঙ্গে তোমার খানাও দেব'খন। জানা জানিতে 'নাপিত দেখে কেনে নখ বাড়ার' দশা হবে। আমি অত আব্দার সইতে পারব না।"

সুকুমার তাহার ঝুলানো ভিজা কাপড় খানা দেখাইয়া দিয়া নীরবে আপন প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল।

কলেজ হইতে আসিলে ঝি আনিয়া তাহার কাপড় খানা তাহার হাতে দিয়া বলিল—"এই নাও তোমার কাপড়।"

ঝি কাপড় খানা খুব ধুপ-দুরস্ত করিয়াই দিয়াছিল। নরেন বাবু দেখিয়া বলিলেন 'বাঃ ঝি তুমিতো বেশ্ ধুয়েছ, আমার কাপড় খানা দিবে কেচে?"

ঝি মুচকি হাসিয়া বলিল—"আর এক দিন দব; কাউকে বলো না, বললে আর রক্ষে নেই। সময় কোথায়? সুকুমার বাবুর মুখে কথাটী নেই; অথচ গরীব ভদ্রলোক; ইচ্ছে করেই আমি তার কাপড় খানা ধুয়ে দিয়েছি—" বলিয়া ঝি যেন কাঁদ কাঁদ ভাব দেখাইয়া ক্রমে কাঁদিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিল।

সুকুমার মাথা নত করিয়া বসিয়াছিল, ঝির রুদ্ধ স্বরে কান্না শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

নরেন বাবু বিস্মিত ভাবে ইষৎ হাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁদলে কেন ঝি?"

ঝি চৌকাটা ধরিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িল, তারপর বলিল—"অনেক কথা স্মরণ হয়ে পড়ে মনটা বড় মুসড়ে গেল নরেন বাবু; অমন তর ফুট্ ফুটে আমার একটী মার পেটের ভাই ছিল— সুকুমার বাবুকে দেখে অবধি আমার কেবলি পাঁচুর কথা মনে পড়ছে—ভাইটী আমার···অমন ধারা মুখে কথাটী নাই···এক দিন···"

নরেন সহানুভূতির সুরে বলিল—"কি হয়েছিল তোমার ভাইর?"

সুকুমার নিবিষ্ট চিত্তে ঝির মুখের কথা শুনিতে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। ঝি চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে সংক্ষেপে তাহার ভ্রাতার উলাওঠার কথা বলিয়া কি প্রকারে ৬ ঘণ্টার মধ্যে সে ভগ্নীর সকল স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল— তাহা বিবৃত করিয়া সুকুমারের দক্ষিণ হস্ত খানা টানিয়া ধরিয়া তাহা নিজ মাথায় স্পর্শ করাইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—

"দাদা তুই যদি এই অভাগী ঝিকে ঝি না বলে দিদি বলে ডাকিস, ভাই হারা এই উত্তপ্ত প্রাণটা শীতল হয়; তোর মুখের দিকে চেয়ে ভাইর শোক ভুলতে পারি।

সুকুমার ঝির এরূপ অচিন্তনীয় আচরণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সে নরেনের দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ঝির মর্ম্ম ব্যথা তাহার করুণ প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল. তাই সে তাহার হাতখানা টানিয়া লইবার শক্তি হারাইয়াছিল।

নরেন বলিল, "তা বেশতো ঝি সে আজ থেকে তোমাকে দিদিই ডাকবে। তুমি ভাইর মত তাকে স্নেহ করো। ভগিনীর আসন কত দায়িত্বের জানতো?"

ঝি যেন তাহার যুগ সঞ্চিত পিপাসা এক চমুকে তৃপ্ত করিয়া লইয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাসে শরীর ও মনের সকল অবসাদ ঠেলিয়া মুক্ত হইয়া পড়িল।

সেই দিন হইতে সুকুমারের প্রতি ঝির অগাধ স্নেহ। নরেন সেই স্নেহের দৃষ্টিতে আশঙ্কার ছায়া দেখিতে পাইল না, তথাপি সুকুমারকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে উপদেশ দিতে ত্রুটী করিত না।

(৪)

শনিবার কলেজ হইতে আসিয়া সুকুমার সারকুলার রোডে তাহার এক গ্রামবাসী একটী ছাত্রের নিকট গিয়াছিল। ছাত্রটী কলেজে তাহাকে বলিয়াছিল—তাহার খুড়া মহাশয় অদ্য বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট নাকি সুকুমারের মা কি কি বলিয়া দিয়াছেন—সে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

ভদ্র লোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মায়ের অভাব অভিযোগের কথা শুনিয়া বিষণ্ণ মনে সুকুমার মেসে ফিরিতেছিল। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মন অন্য দিকে ফিরাইবার অবসর নাই—সে আপন মনে পথ চলিতেছিল—হঠাৎ কতকগুলি খোলার ঘরের দিক হইতে শুনিল, তাহাকে যেন কে ডাকিতেছে, সুকুমার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—সুন্দরী হাতে ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সুকুমার ফিরিয়া ঝির নিকট আসিতেই ঝি বলিল—"কোথায় গিয়েছিলে দাদা এই টন টনে রোদে? পায়ে জুতো নেই, এক খানা ছাতাও কি নিতে হয় না! গায়ে নয় গরমে সাট নাই দিলে! এস আমার ঘরে এস, দিদির ঘরটা দেখে যাও। আহা, মুখ খানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছেগো। অমন করে কি কোল্‌কাতার পথে চল্‌তে হয়! পায়ে ফুস্কা পড়ে যাবে যে?

সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল "এই বাড়ী কি তোমার দিদি?"

'বাড়ী কিসের দাদা, এই কুড়ে খানা আটকে আছি—কোথা গিয়েছিলে বল দেখিনি—এই ঝন ঝনা রোদটায়?"

সুকুমার সুন্দরী ঝির স্নেহ-আপ্যায়নে ও ব্যবহারে এই কয় দিনের ভিতরই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সে সুন্দরীর সঙ্গে আসিয়া তাহার নিবিড় অন্ধকার পূর্ণ ঘরের মেঝের চৌকীতে উপবেশন করিল।

সুন্দরী বলিল—"বড্ড গরম দাদা, একটা ডাব খাবে! দেখ দেখি মুখ খানা কেমন শুকনো দেখায়?"

সুকুমার নিষেধ করিয়া বলিল—'না দিদি ডাব খেয়ে তোমার পয়সা নষ্ট করব না। তুমি রোজ যে দৈ, রাবড়ি দাও, তাই আমার খেতে লজ্জা হয়। আমার মত গরীবের কি এ গুলি সাজে? দিদি দোহাই তোমার, তুমি আমার জন্ত আর এ রকম ভাবে পয়সা ফেলিও না। তুমি গরীব মানুষ, এ পয়সা গুলি তোমার থাকিলে অনেক কাজে—"

কথায় বাধা দিয়া সুন্দরী বলিল—"দেখ দেখি, দাদা আমার বলে কি? তুমি কি আমায় এখনও পর ভাব; আমার আপন ভাইটী থাকলে কি আমায় তার জন্য এইরূপ পয়সা ফেলতে হতোনা?"……

সুন্দরী দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল এবং সত্বরই একটা কাটা ডাব আনিয়া বলিল—"খাও দাদা—গরমটায় একটু ঠাণ্ডা হবে ভেতরটা।"

সুন্দরী সুকুমারের মুখের উপর ডাবটা কাত করিয়া ধরিয়াছে দেখিয়া সুকুমার অনিচ্ছায় তাহা নিজ হাতে লইয়া ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিল।

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গিয়েছিলে এদিকটায়?"

সুকুমার বলিল—"বাড়ীর চিঠি আসিয়াছিল, আমাদেরি একজন আত্মীয়ের সঙ্গে, তাই আনিতে গিয়াছিলাম।"

সুন্দরী একান্ত দরদীর মত জিজ্ঞাসা করিল "মা কেমন আছেন?"

সুন্দরীর প্রশ্নে সরলতা ও সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সুকুমারের মন সে সহানুভূতির অমিয়া স্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে এমন দরদীর নিকট কপট ভাব রাখিতে পারিল না। সরল ভাবে বলিল—'মা বড় কষ্টে আছেন দিদি, শুনিয়া অবধি প্রাণটায় বল পাইতেছি না। তুমি ডাবটা দিলে, কি করি, কিন্তু বলিব কি দিদি—আমি যেন বিষের মত তাহা পান করিলাম—মা আমার হয়ত এখনও কিছু খাইতেই পান নাই। এক খানা ভাঙ্গা ঘর সম্বল ছিল—বৃষ্টিতে তাহার ভিতর বসিয়া থাকিবারও স্থানটী ছিলনা—সে দিনের সামান্য বাতাসেই নাকি সে ঘরের ছানিটা উড়াইয়া নিয়াছে—বাড়ীর খবরতো এই………'

বলিতে বলিতে সুকুমারের চক্ষে জল দেখা দিল।

"এমনি তোমার অবস্থা দাদা—সেতো জানি না! তুমিতো দিদিকে এক দিনও এমন কথা বল নাই।"

বলিয়া সুন্দরী নিজ বস্ত্রাঞ্চলে সুকুমারের চক্ষু জল মুছিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া তারপর তার অন্যান্য অবস্থার কথা,—পড়ার খবর, মেসের ব্যয়, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সংবাদ লইল। মার পেটের বোনের কাছে যেমন ভাই অকপটে আত্ম দৈন্য নিবেদন করে তেমনি সুকুমার তাহার নিজের

অবস্থা বিবৃত করিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

সকল কথা গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া সুন্দরী বলিল—"নগেন বাবু পর হইয়াও তোমাকে এতখানি সাহায্য কত্তে পারেন, আর তোমার দিদি তোমাকে কিছুই করবে না? তোমার কোন চিন্তা নাই দাদা, মা কালী তোমার মঙ্গল করবেন। তুমি বসো একটু, চল একেবারেই যাই।" বলিয়া সুন্দরী বাহির হইয়া গেল।

পনর মিনিটের মধ্যে সুন্দরী ফিরিয়া আসিয়া দশ টাকার একখানা নোট সুকুমারের হাতে দিয়া বলিল—"দাদা মাকে পাঠিয়ে দাও—ঘরের ছানি ধরাতে ···"

সুকুমার হাতের নোটখানা সুন্দরীর দিকে ধরিয়া বিস্ময় সহকারে বলিল—"একি দিলে দিদি, তুমি দুঃখিনীকে দুঃখ দিয়ে আমি এরূপ কাজ করিব—তা হবে না তোমার উপার্জ্জনের খাটুনি কি আমি দেখি না দিদি—ভগবানই আমার ব্যবস্থা করিবেন— ···"

সুকুমারের কথায় বাধা দিয়া সুন্দরী বলিল—"এ ব্যবস্থাও বিধাতারই দান। এ তোমাকে নিতেই হবে, তবে তুমি শোধ করতে চাও—তা যে দিন পার শোধ দিও। আজ তোমার বিপদ—টাকাতো চাই—আমার হাতে আছে—এতদিন এটর্ণী খগেন বাবুর স্ত্রীর নিকট রেখেছিলাম—না হয় কিছু দিন তোমার হাতেই হেওলাত থাকুক। দিদির অনুরোধ উপেক্ষা করো না দাদা—আমার মাথার দিব্বি।" বলিয়া সুন্দরী সুকুমারের হাতখানা ধরিয়া নিজ মাথায় স্পর্শ করাইল, তারপর তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘরে কুলুপ লাগাইল।

সুন্দরী বলিল "চল যাই—তিনটে বাজে বাজে হয়েছে।"

সুকুমার বাজিকরের হস্তধৃত পুত্তলিকার মত সুন্দরীর অনুসরণ করিল।

(৫)

ঝির চেষ্টায় এটর্ণী খগেন বাবুর বাড়ীতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইবার জন্য সুকুমারের প্রাইভেট টিউসন জুটিয়াছে। সুকুমার খগেন বাবুর বাড়ীতে খায় ও থাকে; এই সুযোগের উপরেও ছয়টী টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য পায়।

ঝি সুকুমারকে বলিয়া দিয়াছে—"এ ছ টাকার এক কপর্দ্দকও তুমি ভেঙ্গো না—মাসে মাসে মার নিকট পাঠিয়ে দিও। তোমার নিজের জন্য যাহা লাগবে আমাকে জানিও আমি যেমন করেই হয় চালাব।"

আজ সুকুমারের সমস্ত মৌন-হৃদয় এই যুবতীর নিকট কৃতজ্ঞতায় নত। সে নীরবে থাকিয়া তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

এইরূপে দুইটী মাস কাটাইয়া পূজার বন্ধে সুকুমার বাড়ী চলিল।

কলেজ বন্ধের দিন সুকুমার দ্বিপ্রহরে যাইয়া ঝিকে তাহার বাড়ী যাইবার কথা বলিল।

ঝি বলিল—"বর্ষাটাতো খালি পায়ে খালি মাথায়ই কাটালে দাদা, শীতে বড় কষ্ট পাবে, জুতা ছাড়া, এক যোড়া চটি জুতাই কিনে দেই এখন।"

সুকুমার বলিল"—না দিদি, আমার জুতা পায়ে দিবার অভ্যাস নাই। সে দুটা টাকা থাকিলে অনেক কাজ হইবে।"

ঝি হাসিয়া বলিল—"সে উপদেশ আর তোমায় দিতে হইবে না দাদা। রাত্রি ৯টায় তো গাড়ী, যাবার বেলায় মেস এসো, আমিও সকাল সকাল কাজ সেরে ফেলবো।"

তাহাই হইল। সুকুমার আহারান্তে তাহার সামান্য ক খানা পুস্তক ও কাপড় বাঁধিয়া লইয়া মেসে চলিয়া আসিয়াছিল; নগেন বাবুও প্রস্তুত ছিল। ঝি সুকুমারের মার জন্য এক যোড় সাদা কাপড় ও দশটী টাকা নরেনের হাতে দিয়া বলিল—'মাকে দিও নরেন বাবু! দাদার হাতে আমি আর দিলুম না। যাত্রার বেলায় একটা হট্টগোল বাঁধাবে।'

ঝির ব্যবহার দেখিয়া নরেন সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল, সুকুমারও ঝির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সুকুমার ঝির বুকের নিকট মাথা নত করিয়া নিয়া বলিল—"দিদি যাই তবে?"

সুন্দরী বলিল—"পূজার পরেই চলে এসো দাদা; ছেলেটার পড়া কামাই হবে বলে গিন্নি বারংবার আমায় শাসিয়ে দিয়েছেন। আর বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি?"

সুকুমার নত মস্তকে বলিল 'আসিব।'

(৬)

বাঙ্গলায় পূজা আসিয়া চলিয়া গেল। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন দ্বিপ্রহরে সুকুমার খগেন বাবুর নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাইয়া অস্থির হইয়া পড়িল। নিম্নবঙ্গে লক্ষ্মীপূজা একটী আমোদ ও আনন্দপ্রদ উৎসব। ধনি দরিদ্র—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই পক্ষে ইহা সমান আনন্দ ও উৎসাহদায়ক। এমন দিনে সুকুমারের মনে শান্তি নাই। কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে—

'সুন্দরী ঝি কর্ণেরা হইয়া ভয়ানক বিপন্ন, তোমাকে দেখিতে চায়, অবিলম্বে আইস।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর মাকে টেলিগ্রামের সংবাদ দিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সুকুমার শিশুর মত কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল; সুকুমারের মাও কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি লক্ষ্মীব্রতের উদ্যো: করিয়াছিলেন। যাহার অর্থে এই পূজার আয়োজন, সেই অজ্ঞাত কুলশীলা লক্ষ্মীরই আজ শঙ্কট কাল উপস্থিত। —মাও কাঁদিল ছেলেও কাঁদিল। তার পর ঘরের মৃন্ময়ী লক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া সুকুমার কলিকাতা উদ্দেশে যাত্রা করিল। লক্ষ্মী পূজার বাহ্যিক আনন্দ কিছুতেই তাহার মনকে ফিরাইতে পারিল না; মাতা তাঁহার একমাত্র পুত্রকে এই অদিনে অক্ষণেও যাত্রায় বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন না।

প্রকৃত কৃতজ্ঞ-হৃদয় এমনি প্রাণবান, এমনি শঙ্কটজয়ী।

(৭)

গোয়ালন্দ মেইল ভোরে আসিয়া শিয়ালদহ পঁহুছিল। সুকুমার ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই খোলার ঘরের উদ্দেশে পাগল হইয়া ছুটিল। সারারাত সুকুমারের চখে অশ্রু ঝড়িয়াছে; এখন আর তাহা [illegible] আশঙ্কা থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়কে বেপথুমান করিয়া তুলিতেছে—"হায়, না জানি গিয়া কি দেখি।"

সুকুমার আশঙ্কা শঙ্কিত প্রাণে আঙ্গিনায় ঢুকিয়া বুঝিল—এখনও আশার দীপ নিভিয়া যায় নাই?

সে ত্রস্ত পদে ঘরে প্রবেশ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ডাকিল 'দিদি'! তার পরই দেখিল—নিঃসহায় অবস্থায় চৌকির উপড় পড়িয়া আছে—তাহার দিদি—সংজ্ঞাহীন—আশ্রয়হীন ..."

সে দিদির বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—"দিদি, আমি যে আসিয়াছি।"

সংজ্ঞাহীন দিদি কোন উত্তর করিল না। সুকুমারের ঝাকুনিতে তাহার সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল মাত্র।

সুকুমারের শব্দ শুনিয়া অপর ঘর হইতে আর একটী মেয়ে মানুষ আসিয়া বলিল—"সারারাত বাবা, কেবল তোমার নামই জপ করেছে; রাত্ত আর কেহ আসে নাই। খগেন বাবু দিনে এসেছিলেন—সকলেই সুদিনের কুটুম্ব। তোমাকে যা কিছু ছিল—লিখে পড়ে দিয়েছে—শুনে বাড়ীর লোকটাও ভেগে গেছে। এখন এসেছ যা হয় কর।" আমাদের গতি এমনই হয় বাবা।

সুকুমার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"তবে কি দিদি আমার নাই?"

বিষাণ ধ্বনি।

ঘন ঘোর অন্ধকারে সূচীভেদ্য তমিস্রা রজনী!
নিভেছে নক্ষত্ররাজি, চরাচর সভয়ে অচল!
কাহারে বন্দিছে উচ্চে কোটিকণ্ঠে দর্দ্দুরের দল?
নিঃশব্দ মানবজাতি, স্তব্ধ আজি অম্বর অবনী!
এ নিশীথে কারে দেখি! শুনি কার বিষাণের ধ্বনি?
কর্ণের পটহ যেন ফেটে যায়, হৃদয় বিহ্বল!
কে গো পান করিতেছ জগতের সকল গরল?
মনশ্চক্ষে হেরি তাঁরে আমাদের সর্ব্বনাশ গণি'!

বাণাহত পক্ষীসম ফিরে এস, মনরে আমার!
এভাবে যাবে না দিন, জেনে কেন কর আস্ফালন!
অমৃতের সোজা পথ এইবার কর আবিষ্কার!
মায়া-মোহ ঘুচিল না? কতকাল ছুটিবে এমন!
শান্তির সন্ধান কর, ভাবো কিসে ভেঙ্গেছে সংসার!
তবে যদি ঘোচে দুঃখ, মহানন্দে ফুরায় জীবন!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মাছরাঙা।

(কথিকা)

জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা রোদে জল শুকিয়ে তলায় পোড়ে পুকুর, দীঘি গুলো দেখ্‌তে হয়েছে এক একটা ঘায়ের মতো।

অল্প জল বেজায় তেতে উঠেছে!

মাছ গুলো তলায় টিক্‌তে না পেরে ভেসে উঠে উপরে আরো গরম দেখে তলিয়ে যাচ্ছে।

সারা পুকুর যেন খাবি খাচ্ছে!

ঘাটের পাশে পোতা বাঁশের ডাণ্ডায় বসে আছে ছোট্ট একটী মাছরাঙা।

পাখীদের লুট্‌তরাজ লেগে গ্যাছে।

লাল কুর্ত্তিপরা চিল-তুরুক্‌সোয়ার "চিঁ—হিঁ"--করে ছুটে এসে ছোঁ মেরে মাছ নে পালাচ্ছেন।

কাক-কর্ম্মচারীরা কাজে যত পারুন্ না পারুন, একটা ঘোর গোল কোরে নিজেদের বাহাদুরী জাহির কর্‌চেন।

বাজ-মহারাজ বসে আছেন উঁচু তাল গাছের ডগায়।

যখন দেখ্‌ছেন তাঁর লোক জনেরা বড় বেশী জুৎ কোরতে পারছে না, তখন নিজেই একবার ঝাঁ কোরে নেমে এসে তৎপরতা শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

বক ঠাকুর বসে আছেন, সাদা ধুতি পোড়ে পাটের চাদর গায় দিয়ে, ধ্যানে।

মাঝে মাঝে "কালী কুলাও, কালী কুলাও" কোরে উঠ্‌ছেন।'

মাছেরা তাঁকে ভাল মানুষ দেখে, কাছে গিয়ে বিপদ জানাচ্ছে।

"তাইতো, বড় অন্যায়! আহা, এসো এসো!" এই বলে, লম্বা গলা বাড়িয়ে ধরে' ধরে' তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিচ্ছেন।

ছোট মাছরাঙা বসে বসে দেখে, আর ভাবে—আমার নাম মাছরাঙা হলো কেন?

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

নূতন পথের যাত্রী।

সেদিন যখন আকাশ থেকে আস্‌ছে মুছে রাত্রি
ঘর ছেড়ে ত' বেড়িয়ে পড়লাম নূতন পথের যাত্রী।
অন্ধকারের অন্ধতা আর বন্ধ হাওয়া থেকে
যাচ্ছি ছুটে নয়ন দুটি পূবের পানেই রেখে;
পাগল করা আলোর নেশা বসল পেয়ে মোরে,
জড়িয়ে গেল চোকের পাতা রঙিন স্বপন ঘোরে;
হালকা হাওয়ার পলকা পরশ পুলক জাগায় প্রাণে,
কী এ জ্বালা!—পথের মাটী আমায় কেন টানে?
নূতন পথের যাত্রী আমি, যাচ্ছি আলোর দেশে,
গন্ধে, গানে, স্পর্শে কেন বাঁধন জোটে এসে?
হাতছানি দে ডাক্‌ছে পাতা, পাখীর কণ্ঠে সুর,—
সবুজ ঘাসের সরস পরশ আবেশ ভরপুর।
বনের পথে জড়ায় লতা, ফুলে নয়ন ভোলে,
আলো ছায়ার লুকোচুরী ফেল্লে বড়ই গোলে!
দম্‌কা হাওয়া হুম্‌কি দিয়ে থাম্‌কা করে বলে—
আলোর দেশটা দেখবি যদি আয়না ত্বরা চলে?
না—না তোরা থাক্‌বে পড়ে যাবই আমি একা
পূবের তীরে ফুটছে যেথা অরুণ আলোর রেখা।
অনেক পড়া পুঁথির মত তোরা তরু লতা,
পাখীর গান আর ফুলের গন্ধ—আদ্দিকালের কথা,
মরুর বালি, পথের ধুলি, কঠিন কালো মাটী,
পুরুণো যে বড্ড তোরা, তাই ত'রে নয় খাঁটি?
হিমালয় আর গঙ্গাধারা—সত্যি কালের বুড়ী—
এই ধরণী—তোদের ছেড়ে যাবই আমি উড়ি!
থাক্‌রে পড়ে পুরাতন আর থাক্‌রে পড়ে বাসি,
চট্ করে এই আলোর দেশটা দেখেই আমি আসি।
হায়রে কবি যতই কেন খুঁজে বেড়াও আলো,
অন্ধকারের নিকষেতেই ফুটবে জেনো ভালো;
কালোর বুকেই জন্মে আলো—আলোর বুকেই ছায়া,
এটা খাঁটি সত্যি—নয়কো পুরাতনের মায়া!

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।
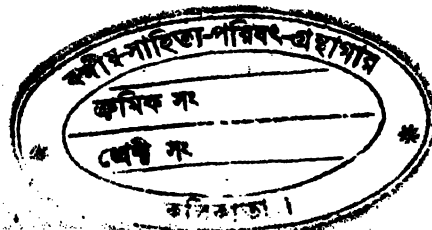
কালিদাস।

যে মহামানবের জীবনী ও সৃজনী-শক্তির বিস্ময়াবহ বৈচিত্র্য ও প্রগাঢ়তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার উপক্রম করিয়াছি, মাদৃশ অকিঞ্চনের পক্ষে সেই জগদ্‌বরেণ্য মহাকবি কালিদাসের কাব্য-নাটকাদির বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা যেমনি দুরধিগম্য তেমনি "উদ্বাহুরিব" বামনোচিত হাস্যোদ্দীপক হইতে পারে বলিয়া সহজেই আশঙ্কা করি। বিশেষতঃ প্রাচ্যগৌরবরবি রবীন্দ্রনাথ যে স্থলে ছন্দে—কাব্যে—সমালোচনায় নানা ভাবে অতি পরিপাটিরূপে তদীয় রচনার সর্ব্বতোমুখী গুণপনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, সেই স্থলে অপর কেহ এতৎসম্পর্কে, নূতন-কিছু শুনাইবার স্পর্দ্ধা করিবে তাহা কখনো সম্ভাব্য নহে। তাই, আমি শুধু মহাকবির কাব্যাদিতে আপাততঃ—অনধিগতরস কিশোর সাহিত্যিকবৃন্দের কৌতুহল উদ্দীপিত করণ মানসে—ভরতীয়ের তো কথাই নাই—Macdonell, Ryder, Sylvian Levi প্রমুখ মার্কিন ও ফরাসিস্ মনীষীগণের চক্ষে আজ সার্দ্ধসহস্র বর্ষশেষে, কালিদাস পাশ্চাত্য খণ্ডে কিরূপ আলোকে প্রতিভাত হইয়াছেন—তাহারই আলোচনার প্রয়াস পাইব।

অনুমিত হয় খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকে কালিদাস ভারতে আবির্ভূত হন। তথাপি এই শতাব্দীরূপ সুবিস্তৃত গণ্ডীর ভিতর তাঁহার আবির্ভাবকাল অনুমান করিয়াও— Jones, Maxmuller, Cowley, ও Goldstucker হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন উল্লিখিত মার্কিন ও ফরাসী পণ্ডিতনিচয় আজ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কালিদাস বাস্তবিকই এই পঞ্চমশতকেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা। ভারতের পক্ষে ইহা যথোচিত পরিতাপ ও অগৌরবের বিষয় তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। তবে আপাততঃ ইহার দুইটি কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। এক—ভারতের প্রকৃতিগত ঐতিহাসিক উদাসীনতা; অপর—কবির স্বকীয় ও তদীয় টিকাকারগণের স্বভাবসিদ্ধ বিনম্র আত্মপ্রকাশ-বিমুখতা। অথচ স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি উদগ্র স্পৃহাশীল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমালোচনা টিকা-টিপ্পণী পাঠান্তর সম্বলিত পুস্তিকপ্রণয়কারী এমন সব ভাষ্যকারগণ কালিদাসের পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হইয়াছেন যাঁহাদের সাহায্যে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে তিনি জীবিত কালেই যথোপযুক্ত সাহিত্যিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি সেই ভাষ্যকারগণের লেখা হইতে তদীয় জীবনচরিত্রের উপযোগী সামান্যতম উপাদানটুকু খুঁজিতে গেলেও নিরাশ অন্তরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। চরিতোপাদানের পরিবর্ত্তে পাই আমরা কতকগুলি উপাখ্যান, উপন্যাস; প্রবাদ প্রবচন—যাহার ভিতর ইতিহাস অন্বেষণ করা মরিচীকায় পানীয় আহরণের চেষ্টার ন্যায় তুল্য বিড়ম্বনাদায়ক।

এবম্বিধ কিম্বদন্তীনিচয়ের একটিতে দেখিতে পাই, কালিদাস প্রথমতঃ গোপালক প্রতিপালিত হস্তিমূর্খ; কালান্তরে শাস্ত্র বিচার পরাভূত, পাণিগ্রহণব্যর্থকাম, বৈরনির্যাতন কৃতসঙ্কল্প পণ্ডিতমণ্ডলীর চক্রান্তফলে বারাণসীর বিদুষী রাজকন্যার দারুণ মনঃকষ্টের হেতুভূত তদীয় পতিরূপে পরিগৃহীত; এবং পরিশেষে সেই রাজকন্যারই শাপবিপাকে কালিদাস জনৈক নীচমনা রমণীহস্তে নিধন প্রাপ্ত। এইরূপ, অন্য একটিতে পাওয়া যায়—কালিদাস দক্ষিণাপথে বিষ্ণু মন্দির তীর্থ প্রয়াণাভিলাসী মহাকবি ভবভূতি ও দণ্ডীর সহযাত্রী; এবং কালিদাস ভবভূতির অপেক্ষাকৃত ম্লান গৌরবে অসূয়াপরবশ ও ঈর্ষাযুক্ত।

ইত্যাকার উপাখ্যানাবলী যতই চিত্তাকর্ষক হউক না, ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে ইহাদের কোন প্রকার মূল্য নাই; কেননা, ইহা প্রমাণ করা কষ্টকর নহে যে উল্লিখিত কবিদ্বয়ের কেহই কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়া নির্ণিত হইতে পারেন না।

কেবল যাহা কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর আমরা দণ্ডায়মান হইতে পারি—তাহা সর্ব্বজনবিদিত বিক্রমাদিত্য কালিদাস সম্পর্কিত উপাখ্যান সমূহে; যদিও উপাখ্যান উপাখ্যানই। কালিদাসের কাব্যানুরাগী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্মানার্থই তদীয় নাটক বিক্রমোর্ব্বশী। কালিদাসের কাব্যেবর্ণিত উজ্জয়িনীই বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী একথা কতকটা সাহস করিয়া বলা অসমীচীন হইবে না। তাঁহারই নবরত্নসভার উজ্জ্বলতম রত্ন কালিদাস তদানীন্তন সংস্কৃত সাহিত্যের Renaissance বা পুনরভ্যুদয়যুগের মুখ-

পাত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথারও প্রতিবাদ আজ পর্য্যন্ত জোর করিয়া বলা সম্ভাবপর হয় নাই; যদিও ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের Heptarchy বা সপ্তরাষ্ট্রমণ্ডল কিংবা বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের পরস্পর সমসাময়িকত্ব যে প্রকার ভ্রমাত্মক—নবরত্নের এককালীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং পণ্ডিত-প্রবর Max-Muller এর সযত্নপোষিত, কালিদাস যাহার অগ্রদূত বলিয়া কল্পিত সেই Renaissance বা সংস্কৃত সাহিত্যের নবজাগরণবাদের সত্যতা তেমনি ভ্রমাত্মক বলিয়া যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াগিয়াছে। কেন না, কালিদাস ব্যতীত তদীয় সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী অপর কোনো কবিরই নিদর্শন আমরা পাই না—যাঁহাদের রচনা তাহারই কাব্যের অনুরূপ অথবা কিঞ্চিন্ন্যূন উচ্চশ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং একা কালিদাসের অভ্যুদয়ে যদি সাহিত্যের নবজাগরণ যুগ কল্পনাকরা চলে তবে ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে Homer, Virgil, Shakespeare এর যুগ নিচয়কেও তদনুরূপ আখ্যা প্রদানকরা অসঙ্গত হইবে না। সে যাহাই হোক্ প্রকৃত কথা কালিদাস—'সকল কলাবিদ্' মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর রাজসভা একক হইলেও সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন ইহা অতি সত্য কথা। আমরা তাঁহার রচনা হইতে উজ্জয়িনীর যে শোভাসম্পদ ও গৌরব শ্রীমণ্ডিত চিত্রখানি মানসপটে সুস্পষ্ট অঙ্কিতবৎ অনুভব করি তাহা অপর কোন উজ্জয়িনী নহে—তাহা Athens, Rome, Florence এর গৌরবস্পর্দ্ধিনী সেই বিক্রমাদিত্যেরই উজ্জয়িনী।

মোটের উপর, উল্লিখিত প্রকার উপাখ্যানাদি মাত্র সম্বল করিয়া আমরা কালিদাসের জীবনচরিত সম্পর্কে কোন প্রকৃত তথ্য পাওয়ারই আশা করিতে পারি না। শুদ্ধ তাঁহার স্বরচিত কাব্যাদি হইতে তথ্য হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ আহরণ করা সম্ভব কিনা সেইরূপ চেষ্টাই আমাদের দেখিতে হইবে। তবে আমাদের নিতান্তই অসৌভাগ্য যে কবি তাঁহার কাব্যাদির ভিতরেও সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিয়া চলিয়াছেন। স্বীয় নামটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন তদীয় নাটক ত্রয়ের মঙ্গলাচরণে; তাহাও আবার এমনই নম্রতা ও দীনতা সহকারে যে তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। উত্তমপুরুষে একবার মাত্র নিজকে উল্লেখ করিয়াছেন—তাহা রঘুবংশের প্রারম্ভিক শ্লোকগুলিতে। কিন্তু ইহার অধিক পরিচয় আর কখনো কোথাও তিনি প্রদান করেন নাই। আত্মপরিচয় প্রদানে এতাদৃশ কুণ্ঠা ও বিনয় শুচিতা, কেবল কালিদাস কেন সাধারণতঃ ভারতীয় কবিগণের যেমন নিজস্ব ও স্বভাবসিদ্ধ গুণ—ইয়ুরোপীয় কবিগণের মধ্যে অধ্যাপক Ryderও স্বীকার করিয়াছেন তদ্রূপ অনেকাংশে বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতীয় কবির মনোগত ভাব অনেকটা এই ধারণের ছিল—"রচনাটুকু জনসমাজে স্থায়ী হোক; নাম তুচ্ছ পদার্থ, উহা না-ই বা থাকিল।" ইয়ুরোপের ভাব নাম বজায় থাকিলেই হইল, আর কিছু না-ই থাকুক। ভারতীয় কবি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বিনয়-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তদীয় টীকাকার শ্লোকার্থ প্রতিপাদক যাবতীয় ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিলেও ভুলক্রমে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় প্রসঙ্গে কোনরূপ টিপ্পনী যোজনা করা সঙ্গত বোধ করেন নাই।

অতএব কালিদাসের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে তাঁহারই রচনাবলীর ভিতর প্রবেশ করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই; দেখা যাউক কোনরূপ উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় কিনা। তাঁহার রচনা হইতে বিশেষতঃ মেঘদূত পাঠ করিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে যে কালিদাস তদীয় জীবনের অধিকাংশ না হোক অন্ততঃ কিয়দংশ কাল উজ্জয়িনী নগরীতে যাপন করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষা এমনি কল্পনামুখর হইয়া উঠিয়াছে যে চির আবেষ্টন-সম্বদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষভোগী ভিন্ন অপর কেহ সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়া যুগযুগান্ত ভরিয়া পাঠকের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে উজ্জয়িনীর সেই স্বপ্ন পুরিতে প্রয়াণ করাইতে সক্ষম হইত না। সেই "সিপ্রাতটবর্ত্তিণী উজ্জয়িনী, তাহার বিপুলাশ্রী, বহুল ঐশ্বর্য্য; তাহার হর্ম্ম্যাবলীপরিশোভিত রাজপথ; হর্ম্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশসংস্কার ধূপ-বিনির্গত সৌরভ, ভবন শিখরস্থিত পারাবতমালার" কাকুলি, কৃষ্ণাগুরু-মকরিকাঙ্কিত-গাত্রা হংসমিথুন-লাঞ্ছিত চেলাঞ্চল-বিভূষিতা মঞ্জুলিকা নাম্নী 'পিয় সহিয়' সুবর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধা

সারিকা সহ আলাপন; আর সেই "রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ-রাজধানীর" নির্জ্জন পথের অন্ধকার বহিয়া কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুল চরণক্ষেপে অভিসারিণীর পথ নির্গমন—সমস্তই একে একে চলচ্চিত্র প্রতিফলিতবৎ স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া আমাদিগকে, এক বিরাট কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া, মুহূর্ত্তে কালিদাসের সমকালবর্ত্তী করিয়া ফেলে!

আর একটি কথা সহজেই উপলব্ধি হয় যে কালিদাস—গোটা ভারতবর্ষটার উল্লেখযোগ্য এমন অল্পস্থানই ছিল—যথায় পর্য্যটন করেন নাই। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে নৃপতি রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কবি যে নিখুঁত ভৌগলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষদর্শী-সুলভ বর্ণনাবৈচিত্র্য পাঠকের চক্ষুতে স্বতঃই পরিস্ফুট হয়। শরৎ-সমাগমে স্বকীয় রাজধানী কোশল হইতে চতুরঙ্গবল কোষাদি পরিবৃত হইয়া রঘু পূর্ব্বদিকে অভিযান করিয়া প্রথমতঃ রণতরী-বলান্বিত নৌযুদ্ধ বিশারদ বঙ্গ-সুহ্মাদি নৃপতিবর্গের আশ্রয়স্থল গাঙ্গেয় দ্বীপসমূহে স্বীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডিন করেন। তৎপর তমালতালিবনরাজিনীলা ভারতের পূর্ব্বোপকূলভাগস্থিত তাম্বুল-পর্ণ-বিলাসী উৎকল-কলিঙ্গাদি জনপদদ্বয়কে পদানত করিয়া, অগস্ত্যাচরিত, কাবেরী-নদ্যঙ্কিত, এলাচন্দন-সুবাসিত, মলয়াঞ্চলের নৃপতি-বর্গকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তদীয় ভুজবলের পরিচয় প্রদান করেন। পুনরায় মৌক্তিক-শুক্তিগর্ভা, তাম্রপর্ণীপ্রবাহস্নিগ্ধ দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী পাণ্ড্যাদি জনপদনিচয়কে করভারে প্রপীড়িত করিয়া হস্ত্যশ্ব-রথ পদাতি-সমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা প্রতীচ্যবাহিনী সহ্যাদ্রিগরবিনী কেরলকামিনীগণের অলকা-বলীস্থ কুঙ্কুমাদি-চূর্ণের অভাব দূরিভূত করিলেন। অনন্তর ত্রিকূটাদি-পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শ্মশ্রুল-বদন পারসিকাদি যবনজাতির দ্রাক্ষালতাপরিকীর্ণ রাজ্যভাগে পরিতৃপ্ত না হইয়া নগেন্দ্র-সন্নিহিত, কুঙ্কুমরজোরঞ্জিত কাশ্মীর-হুনাদি দেশে স্বকীয় নাম ভয়াবহ করিয়া তুলিলেন। অবশেষে হিমাচল আরোহণ করিয়া অক্ষোট পাদপ সমাকীর্ণ, কস্তুরী মৃগঘর্ষণ সুবাসিত নমেরু বৃক্ষাচ্ছাদিত কাম্বোজ-কিরাতাদি পার্ব্বত্য রাজ্য সমূহ স্ববশে আনয়ন করিয়া উত্তর, পূর্ব্ব, দিক্‌পাল প্রাগজ্যোতিষাধিপতিকে অবহেলায় পরাজিত করিলেন। রঘুর দিগ্বিজয়ের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটুকুর মধ্যে বিভিন্নপ্রদেশের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বিশেষণাবলীর ভিতর দিয়া শ্রোতৃবর্গ লক্ষ্য করিবেন কালিদাস তত্তদ্দেশপ্রকৃতির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে পুষ্পক বিমানারূঢ় শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-প্রয়াণ অথবা মেঘদূতের "কান্তাবিরহবিধুর" যক্ষের দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত পূর্ব্বমেঘের রামগিরি হইতে অলকাপুরী প্রয়াণ বর্ণনা ব্যপদেশেও কবি তাঁহার পর্য্যটনলব্ধ ভৌগলিক অভিজ্ঞতারই সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরো দুইটি কথা সহজেই আমাদিগের মনে উদিত হইতে পারে। প্রথম কথা—পর্ব্বত ও পার্ব্বত্য প্রকৃতিই—বিশেষ করিয়া হিমাচলই—যেন কবিকে কি এক অভাবনীয় অকর্ষণে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে দেখিতে পাই। অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর দুইএকটি কাব্য-নাটক বাদ দিলে তাঁহার এমন কোন রচনাই নাই, যাহার ভিতর তিনি উৎসাহ সহকারে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার কুমারসম্ভব খানি তো আদ্যো-পান্তই হিমালয় বর্ণনা। কেবল তাহার বিরাট গাম্ভীর্য্যই তাঁহাকে আকর্ষণ করে নাই, উহার ক্ষুদ্রতম পত্র-পুষ্প-ঝরণাটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথা—ভারতবাসীর (তথা কালিদাসেরও) স্বভাবসিদ্ধ কূপমণ্ডুকতা বশতঃ—সমুদ্র তাহার চক্ষে ভীষণ সুন্দর সুমহান, এমনকি দেশ ও দেশ, জাতি ও জাতির মাঝখানে বিরাট দুস্তর প্রাকৃতিক ব্যবধান বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, তথাপি ইয়ুরোপীয় জাতির চক্ষে যেমন উহা কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারের প্রসস্ত রাজবর্ত্মস্বরূপ তদ্রূপ কখনো পরিকল্পিত হয় নাই। তবে 'সমুদ্র মেখলা পৃথ্বী' বলিতে গিয়া (যেমন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন) কালিদাস কেবল ভারতবর্ষকেই মনে করিয়াছেন—বলিলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। কেন না, তদীয় রচনায় পারসিক বহ্লীক, চীনাদি দেশ ও তদ্দেশজাত শিল্পাদির উল্লেখ দৃষ্টে তিনি যে অন্ততঃ এশিয়াভূমণ্ডের সহিত পরিচিত ছিলেন—তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু তখনকার দিনে ইয়ুরোপ বলিলে ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী যে রোমক-সাম্রাজ্যই মুখ্যতঃ কল্পিত হইয়া থাকে—সেই

রোমক সাম্রাজ্যও বর্ব্বর হূণ, গথ, ভেণ্ডাল প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত, বিধ্বস্ত হইতেছিল বলিয়া—নিষ্প্রভ কীর্ত্তি, ধ্বংসাবশেষ সাম্রাজ্যের কোনরূপ উল্লেখ না থাকার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কালিদাসের রচনা পাঠে আমাদের স্বভাবতঃ আর একটি ধারণা জন্মে যে তিনি এতদ্দেশে ভবভূতি বা ইংলণ্ডে Milton, Tennyson এর ন্যায় অধ্যাপকের প্রিয়তম কৃতি ও প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত না হইলেও অলঙ্কার ও নাট্যশাস্ত্র, এমনকি দ্বাদশ বর্ষকাল অধ্যয়ন না করিলে যে শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ ঘটে না বলিয়া প্রবচন প্রচলিত আছে,—সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে যথোচিত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তদীয় নির্দ্দোষ রচনা পদ্ধতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু ষড়দর্শনরূপ দুস্তর বারিধিরও কতকাংশ যে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করা কষ্টসাধ্য নহে। অন্য সব দূরে থাক্—ব্যবহার ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল—রঘুর জন্ম বৃত্তান্তে তদীয় জাতচক্রের বর্ণনায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

কিন্তু কালিদাসের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক, যাহার বলে অপর যে কোনো কবি অপেক্ষা তিনি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র তাঁহার সেই বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ পরিকল্পনা এমনই সহজ সরল স্বভাব নিয়মে আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন যাহা সম্পূর্ণ করুণ ও অনির্ব্বচনীয়। "শকুন্তলা কর্ত্তৃক কবি তাঁহার হৃদয়লতিকা"—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিত বেষ্টনে" এমনই সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছেন যাহা ভাবিলে বিস্ময়-পুলকে আত্মহারা হইতে হয়। "সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদর স্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে; নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; পুনরায় যখন তপোবন পরিত্যাগ করিয়া পতি গৃহে যাইতেছে, তখন পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্ম্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কেই দেখা যায়। এই কাব্যে কবি স্বভাব ও ধর্ম্ম নিয়মের যেমন মিলন, মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না। * * * অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অনুসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশিষ্ট নাটকীয় পাত্র পাত্রী মধ্যে পরিগণিত। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতর যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধ করি আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্ত্তা বসাইয়া রূপক-নাট্য রচিত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া, তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা—তাহা দ্বারা নাটকের এত কার্য্য সাধন করাইয়া লওয়া,—ইহাতো অন্যত্র দেখি নাই।"

কালিদাসের জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মমত নিরূপণ করিবার প্রয়াস না পাইলে একটা অতি বড় গুরুতর দিক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কারণ মানুষ মাত্রেরই নিজস্ব একটি ধর্ম্ম আছে—যাহা ছাড়া সে কখনো বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। প্রেতপূজক অর্দ্ধসভ্য লোকের যেমন একটি ধর্ম্ম আছে—আধুনিক সভ্যতাসুলভ ঘোরতর নাস্তিক্যবাদীরও তেমনি একটি ধর্ম্ম আছে; প্রকৃতিবাদই তাহার ধর্ম্ম, প্রকৃতিবাদই তাহার উপাস্য দেবতা। এই হেতু একজন কবির, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিকতা প্রবণ একজন ভারতীয় কবির ধর্ম্মমত বিজ্ঞপ্তি—অন্ততঃ বিদেশীয়ের কাছে—বাস্তবিক অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। কালিদাসের রচনাবলীর ভিতর দিয়া তাঁহার ধর্ম্মগত উদারতার,—অধ্যাপক Ryder যাহাকে "Moving among jarring sects with sympathy for all and fanaticism for none অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শিতা সংরক্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে মতবিশেষের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত উন্মত্ততা পরিবর্জ্জন বলিয়া যাহা অভিহিত করিয়াছেন—সেইরূপ উদারতারই সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্য বটে

তাঁহার যাবতীয় নাটকাবলীর মঙ্গলাচরণে দেবাদিদেব মহাদেবেরই অর্চ্চনা করিয়াছেন, কেন না মহাদেব সাহিত্যের তথা জ্ঞানমাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু একদিকে যেমন কুমারসম্ভব শিব-মাহাত্ম্যের, অন্যদিকে রঘুবংশ, বিষ্ণুমাহাত্ম্যের গৌরবধ্বজা বলিয়া অনায়াসে কল্পিত হইতে পারে। রঘুবংশে বিষ্ণুপ্রশস্তি যেমন বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের পোষকতা করে বলিয়া অনুমিত হয়, তেমনি কুমারসম্ভবে সাংখ্য দ্বৈতবাদের অভিব্যক্তি সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

এতদ্ব্যতীত পাতঞ্জলদর্শনের তো কথাই নাই, তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া দেখা যায়—বৌদ্ধমতও নিতান্ত উপেক্ষিত হয় নাই। সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কালিদাস ধর্ম্মমত হিসাবে Sir William Jones এর মতে "healthy minded and not a sick soul" অর্থাৎ রুগ্ন মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তে সুস্থ-সবল মনোবৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত কালিদাসের কাব্যামোদী পাঠক যতই তাঁহার কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন ততই এমন কতকগুলি অভিনব ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইবে যে তৎসমুদয়ের উল্লেখ এইস্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উহাদের কোনটিই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত না হইলেও মনে হয় কালিদাস আকৃতিগত সুশ্রী, সুগঠন, সদাপ্রফুল্ল এবং মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শে সুগঠিত; স্ত্রীজাতি তাঁহার চক্ষে বিধাতার এক অপূর্ব্ব মনোহারিণী সৃষ্টি; তিনি ধর্ম্মোন্মত্ততা-জনিত-রাগ-দ্বেষ বিবর্জ্জিত; তিনি ব্যর্থ প্রেমিকের রিক্ততা-বোধ বিহীন; এমন কি একদিকে যেমন সৌন্দর্য্যরসাস্বাদ-বিমুখ যোগী না হইয়াও এবং অন্যদিকে তেমনি লালসা-পঙ্কিল পাশবতায় আত্মসমর্পন না করিয়াও তিনি নরনারী-সমাজে অবাধ সচ্ছন্দ বিচরণশীল, সুসামঞ্জস্য সৌম্য-সুন্দর, পুরুষমূর্ত্তি। আর যদিও তিনি স্বকীয় জীবদ্দশায়ই সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন তথাপি মনে হয় না তাঁহার প্রকৃত বিরাটত্বের স্বরূপ তখনই কেহ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতাদৃশ গুণ-সমাবেশে বৈভবশালী পুরুষপ্রবর মাত্রেই উত্তরকালে কালক্রমে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধার নৈবেদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র রায়।

সভ্যতার আদর্শ।

মনুষ্য জাতির উন্নতির যাহা প্রাণ স্বরূপ, আমাদের শরীর, মন ও আত্মার পার্থিব অস্তিত্বের যাহাতে সার্থকতা, সেই মহতী প্রচেষ্টা যুক্তি বুদ্ধির নেতৃত্বে কখনও অগ্রসর হইতে পারেনা। যুক্তি বুদ্ধির ক্ষমতা অপ্রচুর, ইহা প্রায়ই নিস্ফল ও ভ্রান্তিপূর্ণ, যুক্তি বুদ্ধি অতি খণ্ডিত আলোকেই আলোকিত।

মানব জাতির বরেণ্য সেই প্রয়াস শুধু পশুদের মত জীবনধারা বজায় রাখিয়া পৃথিবীতে একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র অধিকার করিয়া, ব্যক্তিগত কৌলিক ও জাতিগত অহঙ্কারের চূড়ান্ত তুষ্টি পুষ্টিতেই কৃতার্থ নহে। যুক্তি বুদ্ধির বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় বিকাশের মধ্য দিয়া পশু জীবনটিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াই তাহা সার্থক নহে। বস্তুতঃ সে চেষ্টার উদ্দেশ্য অন্তর বাহিরের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্ণতায় উপনয়ন আর তাহা সম্ভব হইতে পারে আমাদের দিব্য অস্তিত্বের আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণ আদর্শ পুরুষেরই আবিষ্কারে এবং তাঁহারই বিগ্রহরূপে জীবন প্রতিমার সংগঠনে।

তাই প্রাচীন হেলেনিক অথবা নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ কখনও মানুষের পরম লক্ষ্য স্থান অধিকার করিতে পারে না। হেলেনের আদর্শছিল স্বাধীন সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষদের পরিচালনায় শিক্ষিত যুক্তি বুদ্ধির শাসনানুসারে, দর্শন, কলাবিদ্যা নীতি ও শরীর উন্নতির এক সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন। আর এখনকার আদর্শ মানব-মণ্ডলীর সমবায়জাত যুক্তি বুদ্ধি ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর ফল প্রসবের সামর্থ্য অর্জ্জন।

প্রাচীন একটি রোমক সূত্রে হেলেনের আদর্শটি সহজ কথায় বর্ণিত হইয়াছে—তাহা হইতেছে—

"Sound mind in a sound body"

সুস্থ দেহে সুস্থ অন্তঃকরণ। সুস্থ দেহ মানে প্রাচীনেরা বুঝিতেন—স্বাস্থ্যপূর্ণ সুঠাম সুন্দর দেহ যাহা জীবনের যুক্তিসঙ্গত কর্ম্ম ও ভোগের উপযোগী, আর সুস্থ মন মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ মার্জ্জিত বুদ্ধি ও শিক্ষালোকে আলোকিত অন্তঃকরণ। শিক্ষা বলিতে আজ কাল যাহা বুঝি, তাঁহারা

তাহা বুঝিতেন না।

সামাজিক ও নাগরিক যাবতীয় প্রয়োজন নির্ব্বাহরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধে, জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী ব্যবসায়ের খাতিরে অথবা শুধু মানসিক উৎকর্ষেরই উদ্দেশ্যে ফলবান তথ্য ও চিন্তাসমূহ যথা সম্ভব সংগ্রহ করিয়া সে গুলিকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই করাকেই আমরা শিক্ষা নাম দিয়া থাকি।

হেলেনিকেরা কিন্তু—শিক্ষা মানে বুঝিতেন, মানবের নিখিল শক্তির, তাহার মনোবৃত্তি, নীতিজ্ঞান, সৌন্দর্য্য বোধ এ সকলেরই উপযুক্ত ব্যবহার—সুকৌশলে সকল সমস্যা ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার অবাধ সামর্থ্য এবং সামাজিক জীবনের সকল ব্যবহারিক বিষয়েই সুচারু অধিকার অর্জ্জন। প্রাচীন গ্রীক অন্তঃকরণ, দার্শনিক, শিল্পকলাত্মক ও রাজনৈতিক উপাদানে গঠিত—আর নব্যমন বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও ফলবাদী। প্রাচীন আদর্শের সমধিক দৃষ্টি ছিল বিশুদ্ধি ও সুষমার প্রতি—একটি সুন্দর সুযুক্তিযুক্ত জীবন গঠন করিতে সে চাহিয়াছিল, সৌন্দর্য্যের প্রতি আধুনিক সভ্যতার লক্ষ্য যৎসামান্য।

সে চাহে ভ্রান্তিহীনতা ও কার্য্যকরী উপযোগিতা। সে চাহে সুশৃঙ্খলাপূর্ণ, সংবাদ কুশল ও কর্ম্মক্ষম জীবন সংগঠন।

উভয় সভ্যতাই কিন্তু মানুষকে আংশিক অন্নময় ও আংশিক মনোময় সত্তারূপে দেখিতেছে। মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত ইহজীবনই যাহার কর্ম্মক্ষেত্র—যুক্তি বুদ্ধিই যাহার শ্রেষ্ঠ অধিকার এবং এই বিচার বুদ্ধিরই বিকাশে যাহার উন্নতির চরম সম্ভাবনা নিহিত।

সভ্যতার এ আদর্শ অপেক্ষাও প্রাচীনতর, উন্নততর ও সভ্যতর অপর এক আদর্শ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি। পৃথিবীর সুপ্রাচীন সে আদর্শে ফিরিয়া গেলে আমরা ইহাই অবধারণ করি, যে মানুষ এক ক্রমবিকাশশীল আত্মা—সে তার অন্তঃকরণ, তার প্রাণ ও তার শরীরের বিচিত্র আকারের মধ্যে আপনাকে খুঁজিয়া পাইতে চাহিতেছে; আপনারি সত্তায় এই সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে।

শুধু সুস্থ দেহে সুস্থ মন পাইয়াই মানবাত্মা পরিতৃপ্ত নহে। সে চাহে এক নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ও দেহে জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত স্বভাববান্ তাহার নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বরস্বরূপটিকেই লাভ করিতে।

বুদ্ধির নিয়ন্ত্রিত মানুষের সংস্কারপুঞ্জ পরিপূর্ণ স্বভাব তাহাকে কখনই এই পরমাগতিতে উপনীত করিতে পারেনা এবং আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে এই সুমহান আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে যুক্তি বুদ্ধির আলোক ও শক্তি নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যুক্তি-বুদ্ধির সাধ্য নাই, এই দিব্য-পথে মানুষকে তুলিয়া লইতে পারে।

কিন্তু আত্মাকেই যদি ঈশ্বর বলিয়া মানি এবং তাহার অখণ্ড উপলব্ধি ও অখণ্ড পূর্ণতাই যদি আমাদের উন্নতির উত্তম রহস্য বলিয়া স্বীকার করি, তবে ইহাও নিশ্চিত যে সত্তার এক ঊর্দ্ধস্তরে জীবের প্রকৃত সামর্থ্য তাহার বিমুক্ত গুণরাজি, যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচারবতী ইচ্ছা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তাহার অধ্যাত্ম জ্ঞান ও তপঃশক্তি চিরবিরাজিত। আর এই শক্তি সংঘেরই সহায়তায় তাহার সন্তান পরিপূর্ণতা সম্ভব।

মানবতার বিকাশ মনোবৃত্তি পরিচালিত ইহজীবন লইয়াই প্রারব্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার আদর্শ অধ্যাত্ম জীবন। সে জীবনে অন্তরের পরিপূর্ণতাই বাহিরে এক অক্ষত অব্রণ মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিবে। সুযুক্তি নিয়ন্ত্রিত সমাজ ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার জন্য মানব বুদ্ধির সুদীর্ঘ প্রয়াস যখন অবসন্নপ্রায় তখন কালের যবনিকা উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রাচীন অধ্যাত্ম আদর্শ ছবি উন্মুক্ত হইয়া যায়। অন্তরে স্বর্গ-রাজ্য ও পৃথিবীতে ভগবানের মন্দির—নগরীর চিত্র আশার সুবর্ণপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

অরবিন্দের একটী ইংরেজী প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

গোপনে।

অন্ধ নয়নে বন্ধ দরশ হীনপ্রাণ
কণ্টক বনে গন্ধ বিজনে লীন!
গভীর গুহায় নিবিড় তিমির রাতি!
গুপ্ত রতন রহিল লুপ্ত ভাতি!
ছন্দ বাজিল মন্দ বেসুরো তালে!
মুক্তি মলিন শক্ত বাঁধন—জালে!
চিত্ত-চেতনা সুপ্ত—অবলুপ্ত!
জীবন, মরণ, অভেদ—চিরগুপ্ত!

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

"নূতন রোগ।"

(কৈফিয়ৎ)

গত চৈত্র মাসে "সৌরভ" পত্রিকায় আমি "নূতন রোগ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, ঐ প্রবন্ধ আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক সভায় পঠিত হইলে সে দিন কেহই কোন আপত্তি উপস্থিত করেন নাই; এক মাস পরে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক সভায় ঐ প্রবন্ধের কোন অংশ নিয়া কেহ কেহ আপত্তি উপস্থিত করেন। সেই অংশটী নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

আমি লিখিয়াছিলাম—বর্ত্তমান গণোরিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমেহ রোগ নহে, উহাতে প্রমেহের লক্ষণ ও কারণ নাই, গণোরিয়ার কারণ ও লক্ষণ পৃথক। সুতরাং রোগ যখন এক নহে তখন চিকিৎসাও তাহার এক হইতে পারে না। গণোরিয়ার উদ্যম অবস্থায় প্রমেহের ঔষধে কিছু মাত্র ফল হয় না, ইহা আমরা শত শত স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়গণ কেন যে এ রোগে প্রমেহের ঔষধ দেন এবং তাহাতে কি ফল পান তাহা তাঁহারাই জানেন।

এই কথাটা নাকি একেবারই ঠিক হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রমেহের ঔষধ দিয়া ফল পাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

যাঁহারা আপত্তি করেন তাঁহারা যদি আমার প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত আগা-গোড়া পাঠ করিতেন এবং আমার অভিপ্রায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন তবে কখনও এরূপ আপত্তি উপস্থিত করিতেন না, এ বিষয় আমার লেখার তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া ভাবিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে আমার লেখা কোন দোষের বিষয় হয় নাই।

গণোরিয়ার উদ্যম অবস্থায় অর্থাৎ যখন জ্বালা-যন্ত্রণা ও টন টনী থাকে জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থিত ক্ষত হইতে অজস্র-পূঁজ নির্গত হইতে থাকে তখন আমি বৃহৎবঙ্গেশ্বর প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ দিয়া কোন ফল পাই নাই।

আমার স্বব্যবসায়ী আরও অনেকের নিকট শুনিয়াছি তাঁহারাও নাকি এই অবস্থায় ফল পান নাই, তাই আমি সরল ভাবে লিখিয়াছি যে গণোরিয়ার উদ্যমে প্রমেহের ঔষধে ফল হয় না, ইহাতে দেশীয় কোন ঔষধেই যে গণোরিয়ার ফল হয় না—একথা কিছুতেই বুঝায় না; আমি যে কয়েকটায় ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে ফল পাই নাই এবং আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও অনেকে ফল পান নাই। কেহ যদি উহা ছাড়া প্রমেহের অন্য প্রকার ঔষধে ফল পাইয়া থাকেন ভালই, তাহাতে আমার এ লেখার সহিত কিছুই বিরোধ দেখিতে পাই না।

অনন্তমূল নিশাদল গন্ধক সীমূলমূল কবাবচিনি প্রভৃতি যে সকল ঔষধে আমি ফল পাইয়াছি বলিয়া লিখিয়াছি তাহাও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই বটে এবং আমার মত আরও অনেকে দেশীয় অন্য ঔষধ দ্বারা ফল পাইয়া থাকিবেন; তাহাও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই বটে।

গণোরিয়া এদেশে আসার পরে দেশীয় বস্তু দ্বারা বহুতর নূতন নূতন ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে, সে সকল ঔষধ দ্বারা কবিরাজগণ গণোরিয়ার চিকিৎসা করিয়া ফল পাইয়া থাকেন। ক্ষত স্থানের ঘা পরিষ্কারের জন্য কবিরাজী মতেও অনেক রকম পিচকারী ব্যবহার হইয়া থাকে. সুতরাং কবিরাজগণ যে গণোরিয়ার চিকিৎসা করিতে জানেন না, ইহা আমার লেখায় কিছুতেই বুঝায় না।

আমার লেখার অভিপ্রায় এই যে গণোরিয়া এদেশে আসার বহু পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের ও তান্ত্রিক ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে। তখনকার আবিষ্কৃত প্রমেহের ঔষধে গণোরিয়ার ফল হয় না। আমিও বহু স্থানে গণোরিয়ার উদ্যমে প্রমেহের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাই নাই; তবে কবিরাজ মহাশয়গণ কেন দেন এবং তাহাতে কি ফল পান তাহা আমি জানি না। আমি ফল পাই নাই, অন্যে কি ঔষধ দিয়া কি ফল পাইয়াছেন তাহা যে আমি জানি না, ইহাও আমার সরল ভাবার কথাই বটে, ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত করার ভাব পরিলক্ষিত হয় না।

আমি একথাও বলিনাই যে গণোরিয়ার কোন অবস্থাতেই প্রমেহের ঔষধে ফল হয় না, কেবল এইমাত্র বলিয়াছি যে উদ্যম অবস্থায় প্রমেহের ঔষধে ফল হয় না। শেষ অবস্থায় যখন জ্বালা-যন্ত্রণা থাকেনা, পূজ পরেনা, প্রস্রাবে সুতার

নালের মত বাহির হয় তখন প্রমেহের ঔষধে বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে। এই সত্য কথার আবিষ্কার করিতে গিয়া যদি ব্যক্তি বিশেষের অপ্রিয় হইতে হয় তবে বড়ই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

আমার এই প্রবন্ধেরই আর এক স্থানে আছে যে দেশ বিশেষে আর এক প্রকার ক্রিমির কথা আছে; ইহারাও আজ কাল আমাদের দেশে পৌছিয়াছে। ইহাদের নাম গিনিওয়ার্ম। ইহারা দীর্ঘ সূত্রের ন্যায় মাংসের মধ্যে জন্মে; বাহির করিতে গেলে যে স্থানে ছিন্ন হয় সেই স্থানে আবার ক্ষত উৎপাদন করে।

আমি প্রবন্ধের মুখবন্ধে জানাইয়াছি যে জগতে নূতন [illegible] নাই। আমরা প্রথম যাহা দেখি তাহাকেই নূতন [illegible] মনে করি। এই রোগ পূর্ব্বে বাঙ্গলায় ছিল না, হিন্দুস্থানে ছিল, আজ কাল বাঙ্গলায় উপস্থিত হইতেছে, তাই বাঙ্গলার নূতন রোগ বটে।

এই রোগ আয়ুর্ব্বেদেও আছে, কোন্ গ্রন্থে দেখিয়াছি তাহা স্মরণ না থাকাতে এবং অনাবশ্যক বোধে তখন তাহার বচন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। তৎপর আমার একটী সুশিক্ষিত ছাত্র সেই গ্রন্থ দেখাইয়া দেওয়ায় সমস্ত কথা মনে পড়িয়াছে। এই উপলক্ষে সে বিষয়ও দুই একটী কথা বলিতেছি নচেৎ আবার কেহর কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

বৃন্দের সংগ্রহে এই রোগ উক্ত হইয়াছে; যথা—

শাখাসু কুপিতো বায়ুঃ শোথং কৃত্বা বিসর্পবৎ।
ভিত্বৈবতৎ ক্ষতে তত্র সোষ্মামাংসং বিশোষ্য চ॥
কুর্য্যাৎ তন্তু নিভং সূত্রং তৎপিষ্টৈ যবক্রশক্তুজৈঃ।
লিপ্তং শনৈঃ ক্ষতাদেতি চ্ছেদাৎ তৎ কোপমাবহেৎ॥
তৎপাতা চ্ছোথশান্তি স্যাৎ পুনঃ স্থানান্তরে ভবেৎ
রোগঃস্যাং স্নায়ুকো নাম্না তন্তুকশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থ—হস্ত পদাদিতে বায়ু কুপিত হইয়া শোথ জন্মায় তৎপর কোন স্থানে ক্ষত হয়, বায়ু মাংসকে শোষন করিয়া সূক্ষ্ম সূত্রাকারে পরিণত করে। যবের ছাতু মাঠায় গুলিয়া ঐ ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে বা বার বার ঘর্ষণ করিলে ঐ সূত্র আপনা হইতে বাহির হইয়া যায়। দৈবাৎ যদি মধ্যখানে ছিড়িয়া বাহির হয় তবে সেই ছিন্ন স্থানে আবার প্রকুপিত হইয়া ক্ষত উৎপাদন করে। সমস্ত বাহির হইয়া গেলেই রোগের শান্তি হয়। এই রোগের নাম স্নায়ুক বা তন্তুক। অর্থাৎ স্নায়ু কি তন্তুর ন্যায় আকৃতি বলিয়া ঐ নামে কথিত হইয়াছে।

কলার বাকল দ্বারা প্রলেপ দিলেও এই সূত্র আপনা হইতে বাহির হইয়া আসে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে ইহার কোন ঔষধই নাই। কেবল টানিয়া বাহির করিতে হয় কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ইহার ঔষধও আবিস্কৃত হইয়াছিল। গব্য ঘৃত ও নিশিন্দা পাতার রস ৩ দিন ব্যবহার করিলেও এই সূত্র বাহির হইয়া যায়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

শতঘ্নী।

(প্রতিবাদ)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী D.Sc. মহোদয় রাধানগরের সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ স্বরূপে যাহা বলিয়াছেন, গত বৈশাখ মাসের সৌরভে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই অভিভাষণে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সমীচীন; এবং প্রায় সকল কথারই গভীর অভিনিবেশ পূর্ণ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবন্ধের শেষ ভাগে বারুদ ও শতঘ্নী সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তেমন গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সংস্কৃত সাহিত্যের নানা গ্রন্থেই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অনেক আছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন; তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহোদয়ও তাহা অস্বীকার করেন না। সুতরাং বারুদ সম্বন্ধে তিনি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, তৎকালে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনায় গাছ, পাথর, তীর ও গদার এত প্রাধান্য দেখা যাইত না, এবং রঘুবংশের দ্বাদশ সর্গের যুদ্ধ বর্ণনায়,

পাদপাবিদ্ধ পরিঘং শিলানিষ্পিষ্ট মুদ্গরং,
অতি শস্ত্র নখন্যাসং শৈলরুগ্ন মতঙ্গজং,

প্রভৃতি পদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইত না।

এখন শতঘ্নীর কথা। হরিবংশের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শতঘ্নী শব্দে কামানই বুঝাইবে, অন্য কোন অস্ত্র বুঝাইবে না, এমন কোন কথা নাই। মহাভারতের কোন স্থানে শতঘ্নীর উল্লেখ আছে কি না, তাহা আমার চক্ষে পড়ে নাই। কোন্ পর্ব্বের কোন্ স্থানে উহার উল্লেখ আছে, চৌধুরী মহাশয়ও তাহা বলেন নাই। রামায়ণ ও রঘুবংশে শতঘ্নীর উল্লেখ আছে। তাহা পাঠ করিলেই জানা যায় যে শতঘ্নী শব্দে কামান বা অন্য কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র বুঝাইতে পারে না। রামায়ণের অনেক স্থানেই শতঘ্নীর উল্লেখ আছে; কিন্তু উহা কিরূপ আকারের অস্ত্র, তাহার বর্ণনা কোথাও নাই। শূল মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রের নামের সহিত উহার নামের উল্লেখ থাকায়, বিশেষতঃ একস্থানে শতঘ্নীর বিশেষণ স্বরূপে শিত (তীক্ষ্ণ) শব্দের ব্যবহার থাকায় শতঘ্নী যে কামান নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তৎপর, লঙ্কাকাণ্ডে আছে, রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টায় তাঁহার অঙ্গে নানাপ্রকার অস্ত্রের আঘাত করিয়াছিল। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরে বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। তন্মধ্যে শতঘ্নীরও নাম আছে। যথা:—

রজ্জুবন্ধন বদ্ধাভি শতঘ্নীভি চ সর্ব্বশঃ।
বধ্যমান মহাকায় নাপ্রবুধ্যত রাক্ষস॥ ৫৪। ৬। ৬০

রজ্জুবদ্ধা শতঘ্নীসমূহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করা সত্ত্বেও সেই মহাকায় রাক্ষসের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

রঘুবংশের দ্বাদশ সর্গে আছে—

অয় সঙ্কুচিতাং রক্ষ শতঘ্নীমথ শত্রবে।
হৃতাবৈবস্বতস্যেব কূট শাল্মলীমক্ষিবৎ॥ ৯৫
রাঘব রথমপ্রাপ্তাং তামাশঙ্ক সুরদ্বিষাম্।
অর্দ্ধচন্দ্র মুখৈর্ব্বাণৈশ্চিচ্ছেদ কদলী সুখম্॥ ৯৬

রাক্ষস (রাবণ) যমের নিকট হইতে অপহৃত লৌহ কীলবৃত কূটশাল্মলীবৎ শতঘ্নী নামক অস্ত্র শত্রুর প্রতি ক্ষেপন করিলেন। সেই অস্ত্র রথ পর্য্যন্ত না পৌছিতেই রাঘব অর্দ্ধচন্দ্র মুখ বাণসমূহ দ্বারা তাহা কদলীর ন্যায় অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই সঙ্গে সুরবৈরীগণের জয়াশাও ছেদন করিলেন।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ভারত পথিক সহায়—শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, টি, ডি; এম, আর, এ, এস্; এম, ই, আই, ই; তত্ত্বনিধি, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য-সরস্বতী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। উত্তর ভারতে—কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত—হিন্দুদের যে সকল তীর্থ স্থান আছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে এই সকল স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ও বহু গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া আড়াই শত পৃষ্ঠা ব্যাপী এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক স্থানেরই বহু চিত্র দ্বারা গ্রন্থখানাকে বেশ চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সরল সুন্দর। এই গ্রন্থ নবীন ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের সহায়তা করিবে বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানা পাঠ করিলে উত্তর ভারতের তীর্থক্ষেত্র সমূহের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। গ্রন্থকার পুস্তকখানাকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করিয়াছেন। পুস্তকে প্রায় ৩০। ৩৫ খানা পৃষ্ঠাব্যাপী হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

সাহিত্য সংবাদ।

গত ১০ই ১১ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কিশোরগঞ্জ টাউনে ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিশেষ কোন কারণে বৈশাখের সংখ্যা সৌরভ বৈশাখের ১ম সপ্তাহে ছাপা হইয়াও মফস্বলে রীতি মত সময়ে পাঠান যাইতে পারে নাই—এবং ঠিক সেই অলঙ্ঘনীয় কারণেই জ্যৈষ্ঠমাসের সংখ্যাও মুদ্রিত হইতে অযথা বিলম্ব হইয়াছে। অতঃপর আর এরূপ বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। আষাঢ়ের সৌরভ শ্রাবণের ১ম ভাগে ও শ্রাবণের সৌরভ শ্রাবণের মধ্য ভাগে বাহির হইবে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ। আষাঢ়—১৩৩২ ষষ্ঠ সংখ্যা।

সৌরভ

সম্পাদক
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিন্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সৌরভ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ত্রয়োদশ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩৩২ } ষষ্ঠ সংখ্যা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

১

সত্যই কি চলে গেছে স্বরাজ্য-ভাস্কর!
দেহ তাঁর পুণ্য-পূত, চিতানলে ভস্মীভূত
পঞ্চভূতে মিশে গেছে দেব কলেবর!
বঙ্গের অঞ্চল নিধি, সত্য কি হরিল বিধি
সত্যই শুকায়ে গেল করুণা নির্ঝর!
নির্ভীক অটল ধীর, তেজোময় কর্ম্মবীর
সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী গেল লোকান্তর!
পৌরুষ প্রতিভা দীপ্ত, দেশ-হিত-কামে ক্ষিপ্ত
ত্যজিল বঙ্গের ভীম স্বরাজ্য-সমর!
ভেঙ্গে দিয়ে ভবখেলা জীবন মধ্যাহ্ন বেলা
জাতীয় যজ্ঞের হোতা নিল অবসর!
সত্য কি গিয়েছে অস্ত স্বরাজ্য ভাস্কর!

২

সত্যই কি চলে গেলে হে চিত্তরঞ্জন!
তব দেশহিত যাগে, কে তেমন অনুরাগে
যোগাইবে হব্য আর যোগাবে ইন্ধন;
এ বাঙ্গালা ব্রজভূমি, পুণ্যাত্মা গোবিন্দ তুমি
কে আর ধরিবে বল গিরি গোবর্দ্ধন;
বিষাদ-যমুনা কূলে, স্বরাজ্য-কদম্ব মূলে
কে বংশীধ্বনিতে দিবে নব জাগরণ;
চৌদিকে অনল শিখা, প্রাণঘাতী বিভীষিকা
কে যোগী বসিবে যোগে ক্লেশের কারণ;
ভিখারী ভিক্ষুক বেশে, ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে
কে দিবে মৃতের কাণে মন্ত্র সঞ্জীবন;
কে করিবে পরহিতে আত্ম নিবেদন।

৩

কেমনে ভুলিলে সবে হে চিত্তরঞ্জন!
অই যে বঙ্গের নারী, ফেলিছে নয়ন বারি
ভূমে বিলুণ্ঠিত তাঁর কোলের নন্দন;
কৃষক কাঁদিছে মাঠে, পথিক চলিতে বাটে
সারি গেয়ে দাঁড়ী মাঝি করিছে ক্রন্দন;
ধনীর প্রাসাদ ফোটে, কি শোক সংগীত ওঠে
দীন দুখী ডাকে কোথা বিপদভঞ্জন;
সমগ্র বাঙ্গালা ভরে, কি সিন্ধু উথলি পড়ে
বহিছে শোকের উষ্ণ ভীম প্রভঞ্জন;
স্বরাজ্য তরণী হায়, বায়ু বেগে ভেসে যায়
বিরুদ্ধ তরঙ্গ হায় কে করে খণ্ডন;
কোথা গেলে দেশবন্ধু হে চিত্তরঞ্জন!

৪

সে গিয়েছে দেব দেশে স্বরগ ভুবন;
নাহি যথা দুঃখ খেদ, জিত জেতা ভেদাভেদ
সাদা কালা এক সাথে করে বিচরণ;
নাহি রাজ-প্রতিনিধি, বর্ণভেদে কর্ম্মবিধি
যাচিতে হয় না যথা স্বায়ত্ত শাসন;
নাহি যথা কূট মন্ত্রী, শাসন আমলাতন্ত্রী
সবার উপর মাত্র এক নারায়ণ;
স্বৈরাচারী স্বার্থ-অন্ধ, নাহি দ্বেষ ঘৃণা দ্বন্দ
অবিচারে নাহি যথা গুপ্ত নির্ব্বাসন;
সে দেবতা পুণ্য গেহে, করুণা মমতা স্নেহে

চির শান্তি লভিয়াছে সে চিত্তরঞ্জন।
সে গিয়াছে দেব দেশে অমর ভুবন।

৫

কেঁদোনা বাঙ্গালী কর অশ্রু সম্বরণ;
জননী জনম ভুমি, মুছে ফেল আঁখি তুমি
অকৃতজ্ঞ পুত্র পেটে করনি ধারণ;
সে গিয়েছে দেবপুরে, অতি ঊর্দ্ধে অতি দূরে
মোদেরি দুঃখের নিবে দীন আবেদন;
মানুষ জানেনি কথা বুঝে নাই মর্ম্মব্যথা
দেবতার দয়া তাই যাচিছে এখন;
পূর্ণ হলে মনস্কাম, আসিবে সে মর্ত্ত্যধাম
গ্রহে উপগ্রহে পদ করিয়া স্থাপন;
সূক্ষ্ম দেহধারী চিত্ত অলক্ষ্যে বসিয়া নিত্য
বিজয়ী স্বরাজ সৈন্য করিবে গঠন।
দৈব বলে হবে শান্তি ঘুচিবে বন্ধন।

৬

বাঙ্গালীর মন্ত্রগুরু সে চিত্তরঞ্জন;
যে যেখানে থাক ভাই, এস না ছুটিয়া যাই
মিলে মিশে করি তাঁর শ্রাদ্ধ তরপণ;
রয়েছে চিতার ছাই, অঙ্গেতে মাখিব তাই
করিব ধারণা ধ্যানে তাঁরে আবাহন;
হৃদি শতদলোপরে, বসাইয়া সমাদরে
নয়নের নীরে তাঁর ধুইব চরণ
শ্রদ্ধা ভক্তি এক করে, অশ্রুতে মাখিলে পরে
হইবে অপূর্ব্ব পিণ্ড করিব অর্পণ;
তাঁর আচরিত ধর্ম্ম, তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম
স্মৃতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব তখন;
ইহাতেই হবে শান্তি, বিবর্দ্ধিত পুষ্টি কান্তি
সে মুক্ত আত্মার অন্য নাহি প্রয়োজন।
এস ভাই করি তাঁর শ্রাদ্ধ তরপণ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

দেশবন্ধু।

বঙ্গ জননীর স্নেহ-ক্রোড় শূন্য করিয়া তাঁহার বরপুত্র চিত্তরঞ্জন কোন্ অজ্ঞাত লোকের অভিমুখে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মর্ম্মান্তিক দুঃখের এই আকস্মিক অভিঘাতে দেশমাতৃকা মূর্চ্ছিতা—হায় কে তাঁহাকে আজ সচেতন করিবে? কাহার সান্ত্বনায় মাতৃ-হৃদয় প্রবোধ মানিবে? অঞ্চলের নিধি, হৃদয়ের দুলাল হারাইয়া জননী জন্মভূমির যে অব্যক্ত গভীর বেদনা, তাহা আজ কাহার আশ্বাসে জুড়াইবে? মমতার সহস্র পাশ ছিন্ন করিয়া চিত্তরঞ্জন যে সুদূরের পথে যাত্রা করিয়াছেন, পরলোকের সেই চিরন্তন গতি-পথ অবরুদ্ধ করিয়া কে তাঁহাকে বিরহকাতর মাতৃবক্ষে ফিরাইয়া আনিবে?

অনন্তের পথিক আজ তিনি,—নীড়ের মায়াডোর কাটিয়া মুক্ত বিহঙ্গম আজ সীমাহারা আকাশের অভিসারে ছুটিয়াছে।

মর্ত্ত্যের ক্রন্দন কলরবে তাঁহার শ্রবণ আজি বধির—আলোর অধিবাসীরা মঙ্গলশঙ্খনিনাদে জ্যোতির রাজ্যে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন। আজ তাঁহার সুদীর্ঘ তপস্যার সিদ্ধিদিবস সমাসন্ন—অধরে কপোলে নয়নযুগলে তাঁহার উল্লাসের সহাস্য ছবি সমুদ্ভাসিত। কিন্তু হায়, কি অরুন্তুদ যন্ত্রণায় তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃভূমি, তাঁহার প্রাণের প্রিয় স্বজন ও দেশবাসিগণ অধীর বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে,—তাহা কি তিনি সুদূর স্বর্গ হইতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন?

বিধাতা অজ্ঞানের ঘন যবনিকায় সৃষ্টির উভয় খণ্ড বিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। একটিতে আজ আনন্দের উজ্জ্বল উন্মেষ, অপরটিতে বিষাদের মোহান্ধ নিমেষ—একটিতে হর্ষের উদ্বেল হিল্লোল, অপরটিতে ক্রন্দনের উন্মত্ত কল্লোল—একটিতে অফুরন্ত প্রসাদ, অপরটিতে দিগন্তব্যাপী অবসাদ। অঘটন ঘটন পটীয়সী প্রকৃতির ইচ্ছায় একই মুহূর্ত্তে একই চরিত্র অবলম্বন করিয়া জগতের দুই প্রান্তে দুই বিপরীত নাট্য অভিনীত হইতেছে। মৃত্যুর দ্বার উদঘাটন করিয়া অমরাপুরে সুরসুন্দরীর অঙ্কে চিত্তরঞ্জন যে দুর্লভ অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর,—কিন্তু চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত

হইতেছে অপর এক অগ্নিময়ী ভীষণা শ্মশানচ্ছবি। ঐ দেখ, দেখিতে দেখিতে দেশবন্ধুর বরতনু ভাগীরথীতীরে চিতাভস্মে বিলীন হইয়া গেল। পুত্রশোকাতুরা দেশমাতা মুহ্যমানা—বিষাদের ঘনকাদম্বিনী কোটিসন্তান-নয়নে অশ্রু-ধারে বর্ষিত হইল—আকুল বিলাপে গগন পবন মুখরিত হইল—কোটি বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শোণিতের খরস্রোত উদ্বেল উচ্ছ্বাসে প্রয়াত-দেশবন্ধুর চরণতল অভিষিক্ত করিতে চাহিল। দেশের এ অভূতপূর্ব্ব দুর্দ্দিন, কি অভাবনীয় ও কি ভয়ঙ্কর!

শুধু জন্ম সম্বন্ধে নয়, অন্তরের অন্তরঙ্গ প্রীতিসম্বন্ধে দেশবন্ধু দেশবাসীর কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন, আর্ত্তনাদনিরত নরনারীর এই শোকবিহ্বলতা আজ জগতে তাহাই প্রমাণিত করিতেছে।

দেশের নেতৃস্থানীয় কত মনীষী ইতিপূর্ব্বে জনবৃন্দের অন্তর দারুণ অভাবময় করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আজিকার ন্যায় অভাবের এই সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি আর তাহারা কখনও নিরীক্ষণ করে নাই—আজ তাহারা যুগপৎ তাহাদের স্নেহময় সহোদর ও প্রিয়তম সুহৃদ্ হারাইয়াছে—হৃদয় তাহাদের হৃতসার ও শূন্যময়।

বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী—সকলকে জিজ্ঞাসা কর কে এই দেশবন্ধু? কাহার অভাব এত মর্ম্মান্তিকরূপে অনুভব করিতেছ? দেখিবে অশিক্ষিত সাধারণ—যাহারা রাজনীতিশাস্ত্রের বর্ণপরিচয়ও প্রাপ্ত হয় নাই—তাহারাও বলিবে দেশবন্ধুকে তাহারা অন্তরের সহিত ভালবাসিত, কেন না দেশবন্ধু তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন।

তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা তাহাদের ধারণারও অগম্য, কিন্তু তাহারা জানে যে চিত্তরঞ্জন দীনের বন্ধু অনাথবৎসল ছিলেন, দরিদ্র দেশের সেবায় সংসারের সকল সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

নিঃস্বার্থ প্রেমের আহ্বানে মূক অচেতন অন্তরও জাগরণকলস্বরে মুখরিত হইয়া উঠে। চিত্তরঞ্জন স্বদেশের নিকট কামগন্ধবিহীন প্রেম উৎসর্গ করিয়াছিলেন—সেই অহেতুকী প্রীতির স্পর্শে দেশাত্মা তাই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। দেশ-হৃদয়ের শাশ্বত পূজাবেদীতে অচলা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তাই চিরন্তন শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন।

শুধু স্বদেশ নহে,—চিত্তরঞ্জন সর্ব্বত্র সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছেন। মাননীয় ভারত-সচিব, বড়লাট বাহাদুর ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ আজ চিত্তরঞ্জনের তিরোভাবের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজনৈতিক রণাঙ্গনে দৈববশে তাঁহারা চিত্তরঞ্জনের বিরোধী বলিয়া পরিচিত হইলেও আজ তাঁহার মহান ত্যাগ, গভীর স্বদেশপ্রীতি ও উদার চরিত্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাতর্পণ করিয়া দেশের ও দশের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন সহৃদয়তার মূর্ত্তিমতী পরাকাষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহারে বিদেশীগণও তাঁহাকে বন্ধু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার দেশ-প্রেম সংকীর্ণ বিজাতিবিদ্বেষের ক্ষণিক উদ্গার মাত্র ছিল না। স্বজাতিকে তিনি সত্য সত্য ভালবাসিতেন, তাই সর্ব্বজাতিই তাঁহার প্রিয় ছিল। ভাবের প্রসারিত দৃষ্টিতে স্বজাতির মাঝে বিশ্বমানব ও বিশ্বমানবের মাঝে স্বজাতির সত্য স্বরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যে স্বদেশ বিশ্বেরই এক বিশিষ্ট বিভূতি সেই স্বদেশই তাঁহার আরাধ্য ছিল। আর তাঁহার স্বদেশ ভারতের ভৌগলিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভুবনময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

দেশপ্রেমের এই উদারতম আদর্শ লইয়া তিনি নিষ্কাম কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বিচার-বুদ্ধি ও নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার আধার ছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হইত—বিঘ্ন বিপদের মহীরুহ তাঁহার অদম্য উৎসাহের সম্মুখে বিচলিত হইয়া পড়িত—তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ প্রভুশক্তি অবাধ শাসনে বিলুপ কর্ম্মপ্রবাহ স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করিত—কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলতার অবসর ছিল না। মহাপ্রভাবসম্পন্ন চিত্তরঞ্জন জয়ের রাজমুকুটেই চিরশোভিত হইয়াছেন—পরাজয়ের গ্লানিভার তাঁহাকে কখনও বহিতে হয় নাই। বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন বিপুল বীর্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—কিন্তু ইহার পশ্চাতে, তাঁহার অসাধারণ চরিত্রের মর্ম্মমূলে অবস্থিত ছিল এক গভীর সহৃদয়তা। তাঁহার অপর সকল শক্তিও সকলের বৃত্তি এই সহৃদয়তারই সরল উচ্ছ্বাস।

ভাবই তাঁহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ছিল—এই অতুল

ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে বিতরণ করিয়া প্রার্থিবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টিতে তাঁহার জাতিবর্ণের, ধনী নির্ধনের ও পাত্রাপাত্রের বিচার ছিল না। সেদিন মহাত্মাজী তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলেন "আপনি দান বিষয়ে আর একটু বিচারের প্রয়োগ করিলেও পারিতেন," তদুত্তরে দেশবন্ধু বলিলেন, "দানে আমার কোনও ক্ষতি হইয়াছে এরূপ কখনও মনে হয় না।" চিত্তরঞ্জন প্রেমিক ছিলেন—তাই তাঁহার সহানুভূতি প্রভাত-সূর্য্যের কনক রশ্মির মত সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল—অবাধে সকলকে আলিঙ্গন করিয়াছিল—উচ্চ নীচের বিচারে সন্দিগ্ধ বিবেচনায় আপনাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখেন নাই।

প্রেমের বলে মানব স্বার্থত্যাগের কি মহনীয় চূড়ায় অধিরোহণ করিতে পারে তাঁহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেশবন্ধুর আইনব্যবসায় ত্যাগ। ভারতের অদ্বিতীয় ব্যারিষ্টার তিনি—বৎসরে বহু লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন—রাজার ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকিতেন। শ্রেষ্ঠ অশন, বসন, যান, বিপুল প্রাসাদ ও অগাধ সমৃদ্ধির তিনি অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এশ্বর্য্য বৈভব তিনি ত্যাগ করিলেন, দেশানুরাগের এক অদম্য প্রেরণায়। কাহারও পরামর্শের অপেক্ষা রাখিলেন না—চিন্তা, বিচার ও বিবেচনায় কালক্ষয় না করিয়া মুক্তহৃদয়ে চিরোপার্জ্জিত বিত্ত দেশমাতৃকার চরণে অঞ্জলি দিলেন। ভোগবিলাসের কমনীয় ক্রোড়ে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত চিত্তরঞ্জন স্বেচ্ছায় দারিদ্রের কঠোর দুঃখ বরণ করিয়া লইলেন। রাজসুখের পরিবর্ত্তে সর্ব্বহারা ফকিরের ব্রতগ্রহণ করিলেন।

ভাবসাধক চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের আদর্শচ্ছবি চিরদীপ্ত ছিল। কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বত্যাগের আদর্শ অন্তরে চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।—চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট ছিলেন। ধর্ম্মের নিগূঢ় অনুশীলনের অবসর লাভ না করিলেও তাঁহার সকল কর্ম্ম ভগবচ্চরণেই উৎসৃষ্ট হইয়াছে। কর্ম্মযোগী তিনি দেশসেবার মধ্য দিয়া প্রেমাধিষ্ঠাত্রী বিরাট চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণেরই তিনি সেবা করিয়া গেলেন বাসুদেবের অপার করুণা তাঁহাকে বঞ্চিত করে নাই।

দেশবন্ধুর সাধন প্রতিভা অন্তরে অন্তরে ফল্গুর ধারায় বসিয়াছিল—বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে নাই। তিনি যে ভগবানের অকপট ভক্ত ছিলেন তাঁহার কবিতায় সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আশা ছিল, দেশের কার্য্যের পরিসমাপ্তির পর অবশিষ্ট জীবন নীরব সাধনায় অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় অন্যরূপ। জীবন-যাত্রার মধ্যপথে, সাফল্য ও বৈফল্যের পূর্ব্বক্ষণে, পূর্ণ কর্ম্মোদ্যমের মাঝে, ভগবান্ তাঁর প্রিয় ভক্তকে দেশ ও দেশবাসীর বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গেলেন। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দের আশারাশি বিচূর্ণ হইল।

হয়ত আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এমন শুভদিন আসিবে, যে দিন শ্রীভগবান্ অমৃতধাম হইতে চিত্তরঞ্জনকে পুনরায় মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করিবেন।

তখন আমরা আমাদের পরিচিত দেশবন্ধুকে ফিরিয়া পাইব না কিন্তু পাইব জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের অপর এক অভিনব বিভূতি—যাহা সত্যতর দৃষ্টিতে ভগবদভিপ্রেত কর্ম্মের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে। প্রেমের মন্দাকিনীর প্রবাহে জগতের বিদ্বেষমালিন্য প্রক্ষালিত করিয়া দিবে।

সে সুমহৎ দিন আসিবার পূর্ব্বে, ভাইসব, এস আমরা সম্মিলিত হৃদয়ে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি দেশবন্ধুর আত্মার কল্যাণ হৌক; তিনি অক্ষয়া তৃপ্তি ও পরমা শান্তি লাভ করুন। আজ তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসর। তাঁহার শ্রাদ্ধ আজ ঘরে ঘরে প্রতি স্বদেশীর অবশ্য কর্ত্তব্য; তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনের উপর এভার অর্পণ করিয়াও ত আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। পরলোকগত দেশবন্ধুর উদ্দেশে—দেশবাসি! আজ তোমার যাহাতে অন্তর পরিতৃপ্ত হয় তাহাই শ্রদ্ধার সহিত দান কর। যিনি তোমাদের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, প্রতিদানে তোমরা তাঁহাকে কি দিতে পার? আর কিছু না পার হৃদয়ের ঐকান্তিকী ভক্তি দিয়া তাঁহার পুণ্যময়ী স্মৃতির তর্পণ কর। স্বর্গ হইতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধ করিবেন।

১৫ই আষাঢ়, ১৩৩২। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

রামায়ণে বিবাহ রীতি।

রামায়ণের বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতিটী বেশ সরল। ইহাতে সূত্রযুগের স্মৃত্যন্তর আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামলক্ষ্মণাদির বিবাহ শ্বশুরালয়ে, জনক গৃহে হইয়াছিল। রাজা দশরথ বিবাহের সংবাদ পাইয়া বর যাত্রিক সহ মিথিলায় পঁহুছিলে রাজা জনক তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃকার্য্যাদি সম্পাদন করিতে বলিয়াছিলেন। মিথিলাধিপতি জনক বলিয়াছিলেন—

রাম লক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।
পিতৃকার্য্যঞ্চ ভদ্রংতে ততো বৈবাহিকং কুরু॥ ২৩।১।৭১

অর্থ—রাম লক্ষ্মণের (কল্যাণার্থ) গোদান ও বিবাহের জন্য পিতৃকার্য্য (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ) সম্পন্ন করুন।

রাজা দশরথ যথাবিধি পিতৃকার্য্য করিয়াছিলেন। এবং পুত্রদিগের কল্যাণার্থ ব্রাহ্মণদিগকে গোধন ও অন্য প্রকারের ধনাদি দান করিয়াছিলেন।[১]

রাম লক্ষ্মণের বিবাহের সম্বন্ধ রাজা দশরথ নিজে স্থির করেন নাই; অথচ রামায়ণে "সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। বাস্তবিক-পক্ষেই সীতা যে "পিতৃকৃতা পত্নী" পরন্তু 'স্বয়ম্বরা' নহেন—তাহা প্রদর্শন জন্য এস্থলেও দু একটী কথার আলোচনা প্রয়োজন।

রাম ধনুর্ভঙ্গ করিলেই জনক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কন্যা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি নিজ হইতেই বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন—

"আমি আমার সুতা সীতাকে রামের করে প্রদান করিব। আপনি অনুমতি করিলেই রাজা দশরথকে আমার মন্ত্রীগণ দ্বারা সংবাদ দিয়া এখানে আনয়ন করিতে পারি।"

বিশ্বামিত্র সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে অযোধ্যায় লোক প্রেরিত হয়। সেই লোকের সহিত প্রস্তাবটী ছিল এইরূপঃ—

'আমি আমার বীর্য্যশুল্কা কন্যাকে প্রতিজ্ঞা পালনার্থ আপনার পুত্রের করে সমর্পণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন—

প্রতিজ্ঞাং তর্ত্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ১০।১।৬৮

এই প্রস্তাবের সহিত লক্ষ্মণের করে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সম্প্রদানেরও প্রস্তাব ছিল।

রাজা দশরথ এই প্রস্তাব পাইয়া নিজ পাত্র-মিত্রের সহিত বসিয়া প্রস্তাবটীর ভালমন্দ বিচার করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ তাহার পাত্র মিত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন আপনারা দেখুন, মহাত্মা জনকের সহিত যদি আমাদের যৌন সম্বন্ধ চলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে চলুন শীঘ্রই যাইয়া কার্য্য সম্পাদন করি।

যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ॥ ১৭।১।৬৮

কর্ত্তব্য স্থির হইলে রাজা দশরথ পর দিনই রাজকীয় আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের সহিত মিথিলায় যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহ পিতার সম্মতিতেই ধার্য্য হইয়াছিল।

বরানুগমন প্রথাটী প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল। রাজা দশরথ বরযাত্রী লইয়া মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। মহাভারতেও বরানুগমন রীতির উল্লেখ আছে। কোন কোন সূত্র গ্রন্থে স্ত্রীবরযাত্রীর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়; রামায়ণে সেরূপ উল্লেখ নাই।

রামায়ণে বিবাহের পূর্ব্বে উভয় পক্ষেরই বংশাবলী কীর্ত্তন করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে বর পক্ষে কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ সূর্য্যবংশের বংশাবলী ও বংশ গৌরব কীর্ত্তন করেন। তৎপর কন্যা পক্ষে কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং মিথিলা রাজই স্বীয় পিতৃ পিতামহের নামও বংশ গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।[২] সীতাকে অয়োনিজা—অর্থাৎ অজ্ঞাত কুলশীলা বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে প্রতিপালক পিতা জনকের পিতৃপিতামহের নাম ও গৌরব কীর্ত্তনের অনুষ্ঠানটী অনাবশ্যক ও অর্থ হীন হইয়া দাঁড়ায়। সীতা যে অযোনিজা তাহার উল্লেখ রামায়ণের মাঝে মাঝে অতি অনাবশ্যক দুই চারিটী স্থানে দৃষ্ট হয়। ঐ উল্লেখগুলি আদি কবির কল্পনা না পরবর্ত্তী সংস্কারক অথবা প্রক্ষিপ্তকারের কল্পনা, বলিবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষেই মিথিলা রাজের এই রূপই এ সরল ব্যবহার, "অযোনিজা" শব্দটীকে সন্দেহজনক করিয়া তুলিয়াছে।

সীতার বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।—জনকের যজ্ঞাগারে এক বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বেদীর চারিদিকে গন্ধ, পুষ্প, যবাঙ্কুর যুক্ত বিচিত্র কুম্ভ. শরাব, ধূপ পূর্ণ পাত্র, শঙ্খ যুক্ত শঙ্খাধার, অর্ঘভাজন, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুব, স্রুক, কুশ প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছিল। অপর বেদী মধ্যে রাজা জনক স্বীয় কন্যাদ্বয়—সীতা ও উর্ম্মিলা সহ, উপবিষ্ট হইয়া পাত্র পক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

রাজা দশরথ পুরোহিত ও পুত্রগণ সহ উপস্থিত হইলে জনকের আদেশে বৈবাহিক কার্য্য আরম্ভ হইল। বর পক্ষের কুল পুরোহিত মহর্ষি বসিষ্ঠ ঐ বেদীর উপর সম প্রমাণ দর্ভ (কুশ) মন্ত্র পূত করিয়া আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন; অতঃপর বিধি অনুসারে বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণ ভূষিতা সীতাকে আনিয়া অগ্নির সম্মুখে রামের অভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ইয়ং সীতা মমসুতাসহধর্ম্মচরী তব ॥ ২৬

প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ পাণিনা।

পতিব্রতা মহাভাগা চ্ছায়েবানুগতা সদা ॥ ২৭। ১। ৭৩

অর্থ—আমার তনয়া এই সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হউক। তুমি তোমার পাণি দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগ্যবতী সীতা অতিশয় পতিব্রতা হইবেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার অনুগতা থাকিবেন।

কন্যাদাতা জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বর, কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া তিন বার অগ্নি, বেদী, রাজা জনক ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বৈবাহিক কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

এইরূপ নিয়মে চারি ভ্রাতারই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহারা ভার্য্যাদিগের সহিত স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

এই সহজ, সরল ও আড়ম্বর হীন রীতি, সেই সমাজের প্রাচীনতারই পরিচয় প্রদান করে। পরবর্ত্তী মহাভারতের সমাজের কোন কোন বিবাহ ব্যাপারে এই রীতিরই ক্রমবিকাশের ভাব প্রকাশ পাইবে।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহ যে কোন মাসে হইয়াছিল তাহার কোন ইঙ্গিত রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুলসীদাসের প্রাদেশিক রামায়ণে—অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে রোহিণী নক্ষত্রে সীতার বিবাহ হইয়াছিল বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণী যুগে বার গণনা প্রচলিত ছিল না; (রামায়ণের সভ্যতা—জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্রষ্টব্য) সুতরাং তুলসীদাসের নির্দ্দেশ নিরাপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অগ্রহায়ণে বিবাহ হওয়া অসম্ভব নহে। বিবাহ দিবা ভাগে হইয়াছিল, তাহা আদিকাণ্ডের ৭৩ ম সর্গের ৮ম শ্লোক "প্রভাতে পুনরুত্থায়" হইতে ১৪ শ ১৫ শ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই অনুমান করা যায়। পরবর্ত্তী যুগের সূত্রকারগণও দিবা ভাগেই বিবাহ ব্যবস্থা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচার করিয়া যেন হয় নাই; বোধ হয় কন্যাদিগের বয়সের বিচারেই হইয়াছে। অগ্রে রামের সহিত সীতার, তৎপর লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার; শেষ ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত যথাক্রমে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হইয়াছিল। বয়সের মর্য্যাদায় হইলে রামের পরেই ভরতের বিবাহ হওয়া উচিত ছিল; কেন না, জন্ম নক্ষত্রের গণনায় ভরত লক্ষ্মণের অগ্রজ। (রামায়ণের সভ্যতা দ্রষ্টব্য)

একস্থানে জনককে লক্ষ্য করিয়া রাজা দশরথ বলিয়াছেন—

প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা ॥ ১৪। ১। ৬৯

অর্থ—প্রতিগ্রহ দাতার আয়ত্ত। দান বিষয়ে দাতার ইচ্ছা অনুসারেই কার্য্য হইবে। এখানেও কি সেই রীতিই অনুসৃত হইয়াছিল?

সূত্র ও স্মৃতিতে এই অগ্রজ লঙ্ঘন বিবাহ-ব্যাপারকে প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া নিন্দিত করা হইয়াছে। অথচ রামায়ণে এসম্বন্ধে কোন পক্ষ হইতেই অনুমাত্রও আপত্তির আভাস উত্থিত হয় নাই। সূত্র ও স্মৃতির ব্যবস্থার প্রতি এইরূপ উদাসীনতা—রামায়ণের সমাজের প্রাচীনতারই পরিচায়ক। রামায়ণী যুগে সূত্র ও স্মৃতির ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে এ স্থলে এরূপ অসঙ্গত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে কখন ও দেওয়া হইত না।

রামায়ণে বর্ণিত সীতার বিবাহের চিত্র এমন সরল ও মধুর যে এই অনাবিলতার জন্যই এই চিত্রটীকে

কেহ কেহ খুব প্রাচীন সামাজিক চিত্র বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন। তাঁহাদের এইরূপ দ্বিধা বোধ করিবার কারণ—রামায়ণের যুগ যদি বৈদিক যুগের অবসানের ও মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হয় তবে এ চিত্র সেই সময়কার চিত্র হইতেই পারে না। তাঁহাদের বিশ্বাস প্রাচীন যুগের সমাজ-ধর্ম্ম আবিলতাপূর্ণ ছিল—তাঁহাদের মতে মহাভারতের সমাজ তাহার প্রমাণ।

বাস্তবিক পক্ষেই মহাভারতে এমনই কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে যে স্থূল ভাবে চিন্তা করিলে এই রূপ দ্বিধাবোধ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ঋক্ বেদোক্ত 'সুন্দরী রমণীর সহজে পুরুষ লভ্যের' ঋকটী আলোচনা করিয়া যদি মহাভারতের অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, সুভদ্রা, দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহের ব্যাপার মনে অঙ্কিত করিয়া লইয়া বিচার করা যায়, তবে সীতার বিবাহ চিত্রকে গৃহ্য-সূত্র যুগের ব্রাহ্ম অথবা প্রজাপত্য বিবাহ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিবাহ ব্যাপারের এই রূপ অনাবিলতা খুব প্রাচীন নহে—এই এক শ্রেণীর মত। এই মতের ভিতর যেমন যুক্তি আছে, তেমনি অন্ধতাও আছে।

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ মত—জনক রাজা যখন বিবাহের মন্ত্র ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত নিজেই উচ্চারণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন তখন নাকি ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে রামায়ণ বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রাহ্মণ্য শক্তি পতনের পরে এবং সেই শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সীতার বিবাহ চিত্রটীও সুতরাং এই সময়ের সামাজিক আচরণের একটী চিত্র।

এই দ্বিতীয় মত একদেশদর্শী এবং অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।

এই উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রামায়ণী সমাজের প্রাচীনতা দেখাইতে হইলে—সমাজে বিবাহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস—আলোচনা দরকার। বাস্তবিক পক্ষেই মহাভারতে এমন কতকগুলি রীতি প্রথার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা সাধারণ বিচারে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অসংস্কৃত সমাজের আচার বলিয়াই মনে হয়; ঐ সকল হীন পদ্ধতির সহিত তুলনায় রামায়ণের এই সীতার বিবাহ অতি সহজেই সুসংস্কৃত পদ্ধতির বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

হারাণো স্বপন।

স্বপন আমার গিয়াছে হারায়ে
কি দেখিনু তাহা পড়ে না মনে,
ছুটেছিনু কোন্ সাগরের বুকে
গিয়েছিনু কোন্ ফুলের বনে ?
ফুটেছিনু বুঝি তারা হয়ে ওই
নীল গগনের বিশাল দেহে;
রামধনু হয়ে উঠেছিনু হাসি
নীরদের পাশে আলোর স্নেহে!
ছায়াপথ হয়ে করিনু সরল
অমরীগণের গমন পথ,
ছিনু তরু ছায়া! পাখীর কণ্ঠে
ফুটিনু প্রভাত কাকলীবৎ!
ঢেউ হয়ে আমি সুদূরের পানে
ছুটে যাই গেয়ে কতুই গান,
ফিরে আসি কভু সিকতার 'পরে
মূরছিয়া পড়ি হতাশ প্রাণ!
বরষার বিলে ফুটিনু কমল
উষার প্রথম আলোক লেখা,
ছিনু বারি ধারা! মেঘের কণ্ঠে
হীরকের মালা বিজলী রেখা!
কি ছিনু স্বপনে? মাঠে মাঠে বুঝি
রমার হরিৎ আঁচল খানি!
জ্যোছনা স্বপনে হাসে ধরা যার
আমি সে চাঁদিমা নিশার রাণী!
আমি সেই বাঁশী অভিসার পথে
যাহার মধুর মুরলী বাজে,
কোজাগরী সাঁঝে আলিপনা ছবি
আঁকে মোরে বধু আঙ্গিনা মাঝে!
ভুলে গেছি হায়—কোথা ছিনু আমি
ছিলাম কোথায়—লতা কি ফুল?
জাগিরণ মিছা অথবা স্বপন
কোন্‌টী আমার মনের ভুল?

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী চৌধুরাণী।
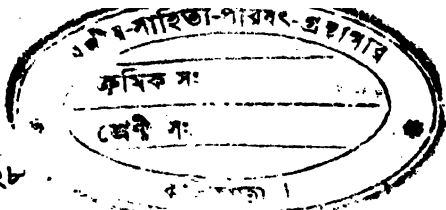
রসের দশা।

সাহিত্য সখার শাসন সমাচার প্রচারিত হইল, "প্রবন্ধে বা কবন্ধে আমাকে কিছু না কিছু লিখিতেই হইবে।" শুনিয়াই চিত্ত চমকিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম,—এ—কি! বোবার ত জগতে শত্রু নাই! তবে কি ইহা সজ্জন সঙ্গম জনিত মহাপুণ্যের অনাহত দৈববাণী, না, এই ত্রিপুটী সম্পাদকের আমন্ত্রন গ্রহণ করায় "আত্মাপরাধ বৃক্ষস্য ফলান্তেতানি!" ইহা কি অযাচিত আশীর্ব্বাদ; না বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! এ যে অদ্ভুত রস! তখন মনে হইল সেই চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া পী—রি—তি আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা মর্ম্ম জ্বালায় বলিয়াছিলেন "সুধা বলে হায় ছিনিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে।" সাহিত্য সখা শ্রীকৃষ্ণের সেই পরকীয়া পী—রি—তির অনুসরণ করিয়া এই পরের উপর যে—রীতি—প্রচার করিলেন তাহাতে আমার অন্তরের অন্তঃপুরে আতঙ্ক সিহরিয়া বলিল,—"বধুয়া, কি আর কহিব আমি!"

যে সম্মিলনে নব রসের নবরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, নাম মাহাত্মের হাস্যরসে দশদিক মুখরিত, বাদলের স্নিগ্ধ ধারায় মন প্রাণ বিমোহিত, সেখানে কাকের কাকলি কি সুশোভিত হইবে? যেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্যোতিরাশি রসে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, বিশ্ব সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা-আবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছে, বিশ্বছন্দ কবিতার তালে তালে ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে, "সেথা আমি কি গাহিব গান!"

সাহিত্যের মন্দিরে মায়ের পূজার পঞ্চউপচার কোথায়? রচনার বিষয়ই ত আমার নাই। সংসার-বিষ-বৃক্ষের বিষের আশ্রয়ই ত বিষয়, তাহা ত নীলকণ্ঠে সুশোভিত। দ্বিতীয়, ভাবের গভীরতা; এ যে ভয়ানক রসের অন্তর্গত! শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়, আমি যে "গণ্ডুষ জল মাত্রেন শফরী ফরফরায়তে।" তৃতীয়—ভাষার লহরী; কুপোদকে কি কখনও লীলা লহরী খেলে! চতুর্থ,—রস মাধুর্য্য; ইহা স্থুল ষড়রস, না, সূক্ষ্ম নবরস? পূর্ণিমা সম্মিলনের চিরাচরিত স্থুল রস ত নব্য যুগে নিশি পালনে পরিণত হইয়াছে, আর এই অরসিকের পক্ষে, সূক্ষ্ম রস, তাহা অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। পঞ্চম—মৌলিকতা; উহার মূল অঙ্কুরেই উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছি, আর অঙ্কুরিত হইবার আশা নাই! মনে হইল, উপচারহীন উপাসনা কি—কখন হয় না? তবে—

পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে—
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে

এমনই সময় বরষার ঘন বারি ধারা চলিতে চলিতে যেন অর্দ্ধ পথে স্তব্ধ হইয়া গেল। জলদ যবনিকা উন্মোচন করিয়া চাঁদের হাসি পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িল। আর বায়ু সঞ্চালিত বেণু বনের মত হেলিতে দুলিতে রসরাজ সুরজিৎ আসিয়া দীন ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকস্মিক আগমনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসময়ে বঁধুয়া কেন হে প্রকাশ?" ললিত ছন্দে উত্তর হইল,—অরসিকে রসোচ্ছ্বাস করিতে বিকাশ। আয়ুর্ব্বেদে রসাঞ্জন, রসরাজ, রসসিন্দুর প্রভৃতি রসবটিকা; যোগেন্দ্র রস, সোমনাথ রস, চন্দ্রামৃত রস প্রভৃতি রসাত্মক বটিকা; ইহার উপর রসায়নের ও ব্যবস্থা আছে, আপনি তাহা শুক্লা প্রতিপদ হইতে ব্যবহার করুন।"

বন্ধুবরের বাক্য অবহেলা না করিয়া অবহিত চিত্তে গ্রহণ করিয়া দেখিলাম, চন্দ্রমার আকর্ষণে ও সুরজিৎ রসায়ণে অরসিকে রসসঞ্চার হইতে লাগিল। মূলাধারে অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বে মৌলিকতা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। স্বাধিষ্ঠানে অর্থাৎ জলতত্ত্বে, চারিধার হইতে রস মাধুর্য্য ঘনীভূত হইয়া আনন্দৈক রসের সম্বোধন অনুভূত হইতে লাগিল। মণিময়পুরে অর্থাৎ তেজতত্ত্বে জগৎ যেমন সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অভিনয় করিয়া যায় তেমনি আমার ভাষার লহরি সজ্জন সহ আলাপে সৃষ্ট হইয়া সম্মিলনে প্রলাপে স্থিতি লাভ করিল, এবং পরিণাম চিন্তায় বিলাপের অভিমুখে সকরুণ কুল্ কুল্ রবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনহত অর্থাৎ বায়ুতত্ত্বে আর আহত হইবার আশঙ্কা না থাকায় ভাবের গভীরতা অতল সিন্ধু নিন্দিত করিয়া রসাতলে যাইবার উপক্রম করিল। জগৎ রসময় হইয়া উঠিল, বাঁশীর সুরে রসেরগীতি কাণে আসিয়া পৌছিল, যমুনা উজান বহিল। বিশুদ্ধ চক্রে অর্থাৎ শব্দ, শূন্য বা ব্যোম তত্ত্বে নীলকণ্ঠ যেন বিষয়ের নীলিমা আকাশের গায় মাখাইয়া দিলেন। কাণের ভিতর শব্দ বোঁ বোঁ করিয়া ধ্বনিয়া উঠিল, অন্তরে

বাহিরে শূন্য বোধ হইতে লাগিল। অজ্ঞান চক্রে আমার রসের দশা হইল। আর আমি, মূর্ত্তিমান ব্যোম হইয়া উঠিলাম।

রসায়ণের গুণে কত লোক অন্তিম দশায় শায়িত হয় বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন দশায় ধুসরিত হন, বিরহী অনঙ্গ দশায় মূর্চ্ছিত হন, আমার রসের দশা হইবে না কেন? দশগ্রস্ত হইয়া দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলাম,—দশাত অজ্ঞানতা নয়! এ যে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা; দশা যে দশম সংখ্যারই পট পরিবর্ত্তন মাত্র! রসশাস্ত্রে নবরসের নবরঙ্গ নব বিশেষণে বিশেষিত হইলেও নির্বিশেষে সেই—"রসোবৈসঃ" বা দর্শনের "আনন্দৈকরস" দশারই দৃষ্টান্ত! রস শাস্ত্রের "নব" শব্দ এক দিকে যেমন সংখ্যা বাচকতাকে নির্দ্দেশ করিতেছে অন্য দিকে তেমনই নবীনতাকেও কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছে। মানবের মানস পট নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায়,—নবীনতাই নবরসের উদ্বোধক, বা নবরসই নবীনতার প্রবর্ত্তক। ইহার নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ একের অস্তিত্বে শূন্যের মহাসম্মিলন,—ইহাত দশারই দৃষ্টান্ত! তাই মা আমার বোধ হয় সপ্তাষ্ট-নবমী পিত্রালয়ে বাস করিয়া এই বিজয়া দশমীতেই শিবালয়ে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। এই দশাতেই বৈষ্ণবের বিষ্ণু প্রাপ্তি এবং শাক্তের শিবত্বলাভ সম্ভবপর।

এইবার আমার দিব্য দৃষ্টি দশার সাংখ্য যোগ অতিক্রম করিয়া রসের বিশ্বরূপ দর্শনে আকুলিত হইল।

প্রাণ আমার ফুকারিয়া উঠিল,—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া জুরণ না গেল॥

শুনিলাম,—মহাকাশে প্রণবের মত আমার রসাকাশে আমারই রস ধ্বনিয়া উঠিতেছে,—"সর—সর—সর।" একি! তবে কি সে রূপের মাঝে ধরা দিতে চায় না? রূপের ব্যবধান কি সে সহিতে পারে না। ধরিতে গেলেই সে স্বরূপ হারাইয়া যায়, বিরূপ হইয়া বিপরীতাক্ষরে বলিতে থাকে "সর—সর—সর!" তাই কি রসময়ী রাই কৃষ্ণময় জগতে কৃষ্ণকেই বলিয়াছিলেন "সর—সর—সর।" আমি কেমন করিয়া সরিব, আমি যে বিশ্বরূপের পিয়াসী। তখন সেই রসাকাশ হইতে রসসিক্ত সমীরণ সুর সুর করিয়া আমার প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিল, আর আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দেখিলাম বিশ্বব্যাপী পাংশু বর্ণের রসজ্যোতি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং বাসনায় ও রসনায় পাংশু রস অপভ্রংশ হইয়া পানসে রসের মৌলিক আস্বাদন সৃষ্টি করিয়াছে।

এই পাংশু রসই রসশাস্ত্রের "রসোবৈসঃ" বা দর্শনের "আনন্দৈক রস।" ইহার বর্ণও পাংশু, হংস ইহার দেবতা, সমতা ইহার স্থায়ী ভাব, অপূর্ণতা ইহার আলম্বন, বৈরাগ্য ইহার উদ্দীপন, স্থিরতা ইহার অনুভাব, আকাঙ্ক্ষা ইহার ব্যভিচার।

ইহাকে নীরস বা বিরস বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে যে স্রষ্টার মানস সরোবর রসহীন হইয়া যায়! অরসিক স্রষ্টার সৃষ্টিতে কি কখনও রস-বৈচিত্র সম্ভবপর? বিশেষত মন ও রস চন্দ্র কিরণের একই সূত্রে গ্রথিত, ছিন্ন হইলে উভয়ই পতিত হইবে। জীবন প্রবাহে কর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতে, সুখের সংসারে নিয়তির মর্ম্মন্তুদ বজ্রপাতে, আশার বিতানে প্রকৃতির বিরাট ঝঞ্ঝাবাতে বীর রসের বীরত্ব-গরিমা যখন ভয়ানক রসের নীলিমায় আবৃত হয়, রৌদ্রের ক্রোধ দীপ্তি যখন করুণার অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে থাকে, সুখের অট্ট হাস্য যখন বিরাট শক্তির অদ্ভুত লীলা দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পরে; অনিত্য শৃঙ্গারের বীভৎস চিত্র দেখিয়া প্রাণ যখন ঘৃণায় আকুলিত হয়, মন তখন, শোকে সান্ত্বনার মত, অবসাদে শান্ত হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র তখন ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়, আর এই দেহরূপী সুরথে শান্ত রসের দেবতা নারায়ণ তখন সারথ্য স্বীকার করিয়া স্বহস্তে অশ্ব চালনা করিতে থাকেন। ইহাই নবরসের নবরঙ্গ।

লোক জগতে "মূল" বলিয়া যাহা অভিহিত হয় তাহা পদার্থ মাত্রেই যে সত্ত্বা সামান্য ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা যুক্তি শাস্ত্রের ও জগতের একটী স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যেমন বেদান্তে জগৎ কারণ ব্রহ্ম বলায়, জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নয় বা ব্রহ্মময় বলা হইয়াছে; অর্থাৎ মূলেরই অভিব্যক্তি স্বীকার করা হইয়াছে। আবার যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মকে

জগৎ কারণ না বলায়, কারণাভাব হেতু ইহার অনস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বস্তুর বস্তুত্ব স্বীকার করিলে উহার কারণ বা মূলের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়; আর কারণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, বস্তুর বস্তুত্বও লুপ্ত হয়। তাই দর্শন বলিয়াছেন কার্য্য কারণ অভেদ সম্বন্ধ। রস জগতেও সেই পুরাতন প্রথাই প্রচলিত। নবরসের বৈচিত্র দেখিলেই একটী মূল রসের অর্থাৎ পাংশু রসের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়; এবং ব্রহ্মময় জগতের মত নবরসও পাংশুময় বলিয়া মন কোনও রসেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, বিরক্ত হইয়া কেবল নবীনতায় ভ্রমণ করে মাত্র। উপভোগের উপশান্তি লাভ করে কিন্তু সম্ভোগের সমতা প্রাপ্ত হয় না। পাংশু রস যেমন প্রতিরসে সত্ত্বা সামান্য ভাবে অবস্থিত, এই নবরসের কোন রসই সেরূপ সত্ত্বা সামান্য ভাবে বর্ত্তমান নাই। যদি থাকিত; কর্ম্ম যেমন সুষুপ্তিতে বিশ্রাম লাভ করিয়া নবশক্তি সঞ্চয় করে, জন্ম যেমন মৃত্যুতে বিশ্রাম লাভ করিয়া নবদেহ ধারণ করে, জগৎ যেমন প্রলয়ে বিশ্রাম লাভ করিয়া নবকল্প আরম্ভ করে, মনও তেমনি যে কোন রসের উপভোগের পর সেই রসে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিত। কিন্তু তাহা করে কি? রসের রঙ্গালয়ে শান্তরস শেষ অঙ্ক মাত্র। তাই নারায়ণ ইহার দেবতা, উপাস্য উপাসক ইহার ধর্ম্ম, বৈচিত্র্য, এখানে দ্বৈতরূপে পরিণত। এই অভিনয়ের যবনিকা পতনের পর আনন্দরূপ এক রস।

শান্তরস পরিপাক না হইলে পাংশুরসের সম্বেদন হয় না। কিন্তু তাহাকে শূন্যবাদ বলাও যায় না। শূন্যবাদ অর্থত নাস্তিত্ব! নাস্তিত্বের কি কখনও কল্পনা হয়? কল্পনা করিলেই যে সে অস্তি স্বরূপ হইয়া পড়ে! তাই শূন্য শব্দকে শাস্ত্র কোন কোনও স্থলে পূর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা অজ্ঞনতা কিম্বা জড়তাও নয়। শান্তির পরিপাক অবস্থা যদি অজ্ঞানতা হয় তাহা হইলে ত জগতে অশান্তিই আদর্শ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা কি সত্যবাদের সরল স্বীকার উক্তি? আর জড়তাত অজ্ঞানতার প্রতিচ্ছবি মাত্র। শান্তির পরিপাক অবস্থাই পরিপূর্ণতা।

এখানে জগতের সত্ত্বা আছে, কিন্তু লিপ্ততা নাই। শক্তির বিকাশ আছে; কিন্তু আসক্তি নাই। অহংকারের মহিমা আছে, কিন্তু গরিমা নাই। এখানে সমর সমতায় সুষুপ্তি লাভ করে, চিত্ত সত্ত্বরূপে পরিণত হয়, সৃষ্টির ধারা, ভাবের বাঁশরীতে রাধা নামে বাজিতে থাকে। ইহাই রসশাস্ত্রের "রসোবৈসঃ" বা দর্শনের "আনন্দৈকরস।"

স্থূলের নবীনতায় ভাবের সৌন্দর্য্য বিকশিত, কিন্তু মূলের নিত্যতায় সনাতন প্রথা প্রচলিত। পাংশুরস সনাতন বলিয়াই স্থূল রসেও সে সমান অধিকার লাভ করিয়াছে। পূর্ণিমা সম্মিলনীর চিরাচরিত প্রথার অনুকরণে "রসের সপ্তপদী গমন" পরিবেশন করিতেছি। বাসনা ও রসনা পরিতৃপ্ত হইবে কিনা তাহা রসময়রাই বলিতে পারেন।

রসের সপ্তপদী গমন।

আয়ুর্ব্বেদে বা রসশাস্ত্রে কষায়, তিক্ত, কটু, লবণ, অম্ল ও মধুর এই যে ষড়রসের উল্লেখ আছে, ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার ছয়টীই মিশ্রিত রস। যেমন, ক্ষিতির অনিল, গুণ আধিক্যে,—কষায়। বায়ুর আকাশ গুণ আধিক্যে,—তিক্ত। বায়ুর অগ্নি গুণ আধিক্যে,—কটু। ক্ষিতির অগ্নি গুণ আধিক্যে,—লবণ। জলের অগ্নি গুণ আধিক্যে—অম্ল। ক্ষিতির অম্বু গুণ আধিক্যে,—মধুররস উৎপন্ন হইয়াছে। মূলরস ইহার একটীও নয়। তবে কি এই ষড়রস নির্ম্মূল? সৃষ্টিত কখনও নির্ম্মূল হইতে পারে না! উহা ত চার্ব্বাকের লোকায়ত দর্শন, অপ্রামাণ্য। তবে নিশ্চয়ই ইহার একটী মূল রস আছে। দেখা যাউক রসের প্রথম বিকাশ কোথায়?

সৃষ্টির ক্রম বিকাশ বর্ণনায় দর্শন বলিতেছেন:—পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান, তিনিই প্রকৃতি। গুণ না থাকিলে আদরিণী হওয়া যায় না বলিয়া তাঁহার তিনটী গুণ; সত্ত্ব, রজ ও তম। যে প্রকৃতির ধর্ম্ম,—বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ, তাহাই মায়া, আর যে প্রকৃতির ধর্ম্ম রজস্তমো মলিনীকৃত সত্ত্বগুণ, তাহাই অবিদ্যা। এই দুই ভগ্নিই সহোদরা। ঐ মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিদানন্দ ব্রহ্ম,—ঈশ্বর। ইনি যোগী, সুতরাং মায়া তাঁর গৃহিণী আর অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম,—জীব। ইনি ভোগী

সুতরাং অবিদ্যা তাঁর জননী। এই জীব—ভোগের জন্য তমঃ প্রধানা প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী এই পাঁচটী ভূতের সৃষ্টি হইল। এই ভূত পঞ্চকও নিগুর্ণ নহে। যথাক্রমে ইহাদের গুণ হইল:— শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আবার এই গুণাবলী গ্রহণ করিবার জন্য পঞ্চ ভূতের পৃথক সাত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক, চক্ষু রসনা ও নাসিকার উদ্ভব হইল। এবং সমষ্টীভূত সাত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার বিকশিত হইল। গ্রহণান্তে পরিপাকের পর ত্যাগের প্রাকৃতিক নিয়ম.নুসারে ঐ ভূত পঞ্চকের পৃথক রাজসিক অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু জন্মগ্রহণ করিল। এবং সম্মিলিত রাজসিকাংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইল। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ কলাবিশিষ্ট হইয়া জীব সূক্ষ্ম দেহে বা লিঙ্গদেহে পুষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

এই সৃষ্টি ধারায় ভূত পঞ্চকের অন্তর্গত জলের গুণ স্বরূপে রসের প্রথম অভিব্যক্তি হইয়াছে। রসই যে জলের একমাত্র গুণ, তাহা নয়। ইহার গুণ চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে রস ইহার স্বকীয় সম্পদ, এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ পৈত্রিক বিভব। বিভব গর্ব্বিত গভীর জলরাশি যেমন আকুল প্রাণে কুল কুল শব্দ করিয়া শীতল স্নেহ স্পর্শে দুই কুল প্লাবিত করিয়া রূপের নীলিমায় আকাশ নিন্দিত করিয়া অকুলে প্রবাহিত হয়, তেমনি তাহার স্বকীয় সম্পদ রসাস্বাদও রসনায় উপলব্ধি হয়; ইহা ত স্বভাব সিদ্ধ। এই মূল রসের মৌলিক আস্বাদ আয়ুর্ব্বেদে বা রসশাস্ত্রে উল্লিখিত না হইলেও তাহা যে পাংশু ভাবাপন্ন, রসনাই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। যদি মূল রসের আস্বাদ অস্বীকার করা হয় তবে রূপের নীলিমা, স্নেহের শিহরণ এবং শব্দের কুল কুল নাদও তিরোহিত হয়। কিন্তু এই ব্যবহার বিরোধ সম্ভবপর কি?

বৈদ্যক গ্রন্থে তবে ষড়রসের উল্লেখ হইল কেন? ইহা একটী রহস্যময় প্রশ্ন। শাস্ত্রে যে এই রহস্য ভেদের ইঙ্গিত নাই, এমন নয়; তবে সরল ভাষায় ইহার উল্লেখ নাই। কূটস্থ চৈতন্য যখন জীব জগতে প্রকাশিত, তখন কৌটিল্য যে শাস্ত্রের ধারা হইবে ইহাও সুনিশ্চিত। শাস্ত্র ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়া দেন—চিন্তার মৌলিকতা ধর, মুখস্থ করিও না। প্রাণের প্রতিষ্ঠা কর, প্রাণান্ত পরিশ্রম করিও না। সুতরাং ইঙ্গিত লইয়াই রহস্য ভেদ করিতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন—"ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে নয় তোমার ঐ দেহভাণ্ডে; তোমারই অন্তরে।" সমস্ত দেহভাণ্ড অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম—সপ্তলোক সূক্ষ্মরূপ আমারই অন্তরে সপ্তচক্রে প্রতিষ্ঠিত। সপ্তসমুদ্র তাহাতে সপ্তরসে উচ্ছ্বসিত। সপ্তবর্ণ সপ্তরাগে রঞ্জিত এবং সপ্তস্বরে ঝঙ্কৃত। প্রতি লোকে বায়ু সপ্তস্তরে প্রবাহিত হইতেছে আর তাহাতে সপ্তরাগিণী তালে তালে নৃত্য করিতেছে। ভাবিলাম তবে ষট্‌চক্র ষড়রসে সিক্ত কেন? ষড় রাগেই বা ষট্‌ত্রিংশ রাগিণী পরিণিত কেন? বুঝিলাম—জগতের ষট্‌বিকারে বিকৃত হইয়া ষটের শঠতা প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সপ্তপদী গমন না করিলে পরিণয় বা পরিণাম অসম্ভব। *

---

* ষড়রাগ ও ষট্‌ত্রিংশ রাগিণীর বিরুদ্ধ উপমা কেন লিপিবদ্ধ করিলাম তাহার উত্তর দিতে আমি বাধ্য। আমার যুক্তি সমূহ সঙ্গত মনে করিলে সঙ্গীতজ্ঞ ইহার অনুসন্ধান করিতে পারেন। আকাশের গুণ,—শব্দ; এবং বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ব্যোমমণ্ডলে অবিশ্রান্ত প্রণব নাদ ধ্বনিত হইতেছে বটে কিন্তু অতি সূক্ষ্ম বিধায় সাধারণতঃ তাহা কর্ণগোচর হয় না। সেই নাদ যখন ঘনীভূত হইয়া বায়ুতে স্পর্শ গুণাত্মক হয় তখনই স্বররূপে শ্রুতি স্পর্শ করে। সপ্তলোকে এই বায়ু মণ্ডল সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত, এবং প্রতি বায়ু খণ্ড আবার প্রতিলোকে সপ্তস্তরে বিভক্ত। এই সপ্তস্তরের অনুসরণ করিয়া সপ্তস্বরের যে শ্রুতি গোচর হয় ইহাত প্রত্যক্ষ। বায়ুর গুণ যখন শব্দ ও স্পর্শ তখন বায়ুমণ্ডল যত খণ্ড বিখণ্ড হোক না কেন এই গুণদ্বয় তাহাতে থাকিবেই এবং শ্রুতি গোচরও হইবে। সুতরাং সপ্তলোকের সপ্ত বায়ু খণ্ডেই সপ্তরাগ, এবং ঊনপঞ্চাশৎ স্তরে ঊনপঞ্চাশৎ রাগিণী ধ্বনিত না হইয়া পারে না। ইহাই আমার নিকট যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে উপমা ধৃষ্টতা জনক, বলিলে, আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য এই মাত্র বলিতে পারি,—পাতঞ্জল দর্শনে ষট্‌-চক্র লিখিত থাকিলেও শ্রুতিতে সপ্তচক্রেরও উল্লেখ আছে। এবং ইহাই যুক্তি-সঙ্গত। কারণ চক্রমাত্রেই ভেদ করিতে হয়, সহস্রারও ভেদান্তর্গত। বিশেষত সপ্তলোক বলিলে সপ্তচক্রও বলিতে হয়, তাহা না হইলে ভাণ্ডেও ব্রহ্মাণ্ডে ব্যতিক্রম ঘটে। সুতরাং

শাস্ত্রের ইঙ্গিতকে আরও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক রসনায় রসোদ্গার হয় কি না। জগতের যাবতীয় দৃশ্যই হোক বা, যাবতীয় পদার্থই হোক, কিম্বা যাবতীয় কর্ম্মই হোক, মনই তাহার দ্রষ্টা, ভোক্তা ও কর্ত্তা। এই মনের স্বরাজ্য, আজ্ঞা চক্র বা অজ্ঞান চক্র। সামন্ত রাজ্য, মূলাধার হইতে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত পঞ্চচক্র বা পঞ্চ ভূতের তত্ত্ব। আর পররাজ্য, সহস্রার চক্র। মন যখন স্বরাজ্যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এক রস পান করিতে করিতে কষায় ভাব অর্থাৎ সমাধি সম্ভোগ করিতে গিয়া বাসনার কষ্ট কল্পনা অনুভব করেন, তখন সামন্ত রাজ্য উপভোগ করিবার জন্য বিশুদ্ধ চক্র বা আকাশ তত্ত্বে নামিয়া আসেন। রাজ্য পরিত্যক্ত হইয়া মনের মানসিক অবস্থা তিক্ত রসে সিক্ত হইয়া যায়। অমনি তিনি অনাহত চক্র বা বায়ুতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানেও দেখেন যে সেই স্বরাজ্যের কুটস্থ চৈতন্য জগতের ষট্ বিকারে বিকৃত হইয়া কটু রসে পরিণত হইয়াছে। তখন মণিপুর বা তেজ তত্ত্বের রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া দেখিতে পান,—রূপ লাবণ্যময় হইলেও, রস লবণাক্ত, রসনা ও দেহ জর্জ্জরিত। সুতরাং স্বাধিষ্ঠানে বা জল তত্ত্বে সিনান্ করিবার বৃত্তি জাগিয়া উঠে; কিন্তু হায় হায়, যে জল তত্ত্বে রসের প্রথম অভিব্যক্তি তাহাও যে মিশ্রণ দোষে বর্ণশঙ্করতা সৃষ্টি করিয়াছে! বর্ণের অমলতা,—রসের অম্লতায় আচ্ছন্ন। অজীর্ণতায় অম্লশূল হইতে পারে মনে করিয়া মূলাধার বা ক্ষিতি তত্ত্বের মধুর আস্বাদে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করেন। ইহাই মনের বিলোম গতি বা সামন্ত রাজ্য উপভোগ।

এই বিলোম গতি অনুসারেই আহার বিধিও অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ প্রথমেই কষায় রস, তারপর ক্রমশঃ তিক্ত, কটু, লবণ ও অম্লরস গ্রহণ করিয়া সর্ব্বশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ।" কিন্তু জল পান না করা পর্য্যন্ত কি বাস্তবিকই সমাপ্ত ক্রিয়া হয়? এই যে প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য; ইহা সত্ত্বেও কেহ যেন বুঝিয়াও বুঝেন না ইহারও একটী রস আছে। লোক জগতের তৃষিত পান্থ জল পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, অথচ বুঝিয়াও বুঝেন না যে ইহার আদিও পাংশু শেষও পাংশু। আধ নিদ্রা, আধ জাগরণে স্বপ্ন যখন সিদ্ধ সঙ্কল্প হইয়া উঠে, তখন যেমন কেহ বুঝিয়াও বুঝেন না যে ইহা তাঁহার আয়ত্বের অতীত; লোক জগতেও তেমনি, এই পাংশু রসের অনুভূতি হয় সত্য, ইহার ব্যবহারও হয় সত্য কিন্তু কেহ বুঝিয়াও বুঝেন না যে ইহাতে একটা বিরাট সত্য নিহিত আছে। এ ব্রতের যেন ইহাই কথা।

মন কিন্তু এই সংসার সাজাইয়াও সুখের সন্ধান পায় না। মন চায় তার স্বভাব সিদ্ধ নিত্য সম্ভোগ, পায় সে সংসারের ক্ষণভঙ্গুর উপভোগ। মন চায় ব্যবধানহীন প্রাণে প্রাণে আতিবাহিক মিলন, পায় সে ব্যবধানযুক্ত দৈহিক আলিঙ্গন। মন চায় নিত্য মুক্ত স্বাধীনতা, পায় সে বিধি বদ্ধ পরাধীনতা,। সংসার তাহার নিকট তখন বোধ হয়, সং সাজাই ইহার একমাত্র সার।

প্রাণের মাঝে তখন মনের কথা কাণে কাণে ধ্বনিয়া উঠে,—এ নয়—এ নয়—এ নয়। প্রকৃতির লতা পাদপ সমীর সঞ্চালিত হইয়া যেন বলিতে থাকে, নহি—নহি—নহি। অন্তরে বাহিরে বেদনার রুদ্র বীণা যেন বাজিয়া উঠে, নেতি—নেনি—নেতি। মাধুর্য্যের মাদকতা নিশ্বাসে নিশ্বেসিত হইয়া যায়; বিষয়ের বিষ পান করিয়া মন বিষাদ গ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন বুঝিতে পারে ষটের শঠতায় আজ সে সর্ব্বস্বান্ত। এই বিষাদ যোগই ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায়, ও অনুলোম গতির প্রথম সোপান। সর্ব্বের অন্ত না হইলে অনন্তের বারতা আসিয়া পেঁ।ছে না। আত্মশক্তি চূর্ণ না হইলে পরা শক্তির পূর্ণতা উপলব্ধি হয় না। মূলের মৌলিক রসে রসিক না হইলে স্থূলের পল্লব গ্রহিতা সুখের সন্ধান দিতে পারে না॥ তাই মন যখন বিষাদ গ্রস্ত হয়, আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত বলিয়া মনে করে, তখনই সে পরাশক্তিতে নির্ভর করিয়া পর রাজ্য আক্রমণ করে। এই পর রাজ্যই—সহস্রার; ইহাই পাংশু রসের স্থিতি স্থান। আর ইহার অধিকরণই,—রসের সপ্তপর্দী গমন। এই এক রসই "একোহং বহুস্যাম" বলিয়া বিলোম গতির সহস্র ধারায় বিশ্বে বিকশিত হয়, আবার অনুলোম গতিতে সেই রস ধারাই বিশ্বের

চক্র লইয়া যদি এত চক্রান্ত হয় তবে আমার বিরুদ্ধ বাদ কি ধৃষ্টতার দৃষ্টান্ত?

বৃন্দাবনে রাধারূপে বিরাজিত হয়। আর এই বিপরীত বিহার দর্শন করিয়া রসময় আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান, বিহ্বল চিত্তে বলিয়া থাকেন, "ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং ; প্রিয়ে! চারুশীলে! দেহি পদপল্লব মুদারং।" তখন আকাশে বাতাসে আনন্দ ; রূপে, রসে, গন্ধে, আনন্দ ; সৃষ্টিস্থিতিলয়ে আনন্দ। এই আনন্দ বাজার,—আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়। সর্ব্বস্বান্ত মন এইখানে—সর্ব্বনামে অভিহিত হয়। আর মনের মর্ম্মে মর্ম্মে আনন্দে ধ্বনিয়া উঠে :—

১। মনোবুদ্ধ্যহংকার শ্চিত্তাদি নাহং।
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রং॥
নচ ব্যোম ভূমির্ণ তেজোন বায়ু।
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

২। অহং প্রাণ সংজ্ঞো নচ পঞ্চ বায়ু।
র্ণবা সপ্ত ধাতু র্ণবা পঞ্চ কোষা॥
ন বাক্যানি পাদো নচো পস্থঃপায়ু।
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

৩। ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুখং।
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদান যজ্ঞা॥
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা।
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

৪। নমে দ্বেষ রাগৌ নমে লোভ মোহৌ।
মদোনৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবঃ॥
ন ধর্ম্মো ন চার্থোনকামো ন মোক্ষ।
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

৫। ন মৃত্যু র্ণশঙ্কা নমে জাতি ভেদাঃ।
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম॥
ন বন্ধুর্ণামিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য।
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

৬। অহং নির্ব্বিকারো নিরাকার রূপঃ।
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং॥
নবা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ণ ভীতি।
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥ *

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

* গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

সাহিত্য ও জাতি।

(কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।)

প্রত্যেক জাতির যেমন এক একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনই আবার প্রত্যেক জাতির সাহিত্যও আত্ম প্রতিষ্ঠায় সমুজ্জ্বল। সেই জাতি এবং সাহিত্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করাকেই জাতীয়তা বলা যাইতে পারে। সেই বিশিষ্টতার মধ্যে—সেই স্বতন্ত্রতার মধ্যে দেশ দেশান্তরের শক্তি ও সাধনা আহরিত হউক—আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাকে যেন সম্পূর্ণরূপে আমার জাতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদায় দীক্ষিত করিয়া আমার জাতির আদর্শে গড়িয়া লইয়া অর্থাৎ "আমার" করিয়া গ্রহণ করিতে পারি ; নহিলে আমার অস্পৃশ্যতা আমাকে মানিয়াই লইতে হইবে। ইহাই যে আমার জাতির গৌরব, সম্ভবতঃ এই গৌরবের সহিত আমার সাহিত্য সংস্রব একচুল পরিমাণেও কম নহে।

সাহিত্য জাতির সাক্ষী। যে জাতি যতখানি উন্নত তাহার জলন্ত সাক্ষ্য রূপে তাহার সাহিত্য তত উন্নত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর্য্যের গৌরব বৈজয়ন্তি উড়াইয়া আজ বেদ দণ্ডায়মান। পৌরাণিক সভ্যতা সাহিত্যের সাক্ষ্যে জগতে নমস্য হইয়া আছে! সুতরাং আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সাহিত্যের দিকে। এমন সাহিত্য আমাদের আবশ্যক যাহা ভবিষ্যতে আমাদের লজ্জার কারণ না হয়। বিদ্যাসুন্দরের রচনাকে যেমন অশ্লীল বলি, তদানিন্তন সমাজকেও সেই গ্রন্থের অনুযায়ী রুচিবাগীশ বলিতে ত্রুটী করি না। কুমার সম্ভবের অষ্টম সর্গের রচনায় কালিদাসকে নিন্দা করি। আর দুর্গা পুরাণ "অজ্ঞগণের" জন্য বলিলে, জাতির সভ্যতাকে ঘৃণা করি। এই সকল আত্মম্ভরিতার গৌরব রক্ষা হয়—যদি আমরা আমাদের সাহিত্যে এমন আদর্শ রক্ষা করিতে পারি—যাহা ভবিষ্যতে আমাদিগকে কলঙ্ক লাঞ্ছিত করিতে পারিবে না।

এদেশে দুই শ্রেণীর সাহিত্যসেবা আমরা দেখিয়া থাকি, এক শ্রেণীর লোক ত্যাগী অসহযোগী ও অহিংস। ইহারা কায়মনোবাক্যে সাহিত্যের উন্নতির জন্য সাহিত্যকে আবর্জ্জনা হীন—সত্য, শিব ও সুন্দর করিতে আগ্রহবান। ইঁহারা সাহিত্য বেচিয়া অর্থের কামনা করেন না ; নাম

চাহেন না। ইঁহাদের উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবা—দেশের ও জাতির গৌরব বর্দ্ধন। ইঁহারা এই আদর্শের মধ্যে দর্শন ও লেখেন, উপন্যাস ও লেখেন; ইঁহারা জাতির পথ প্রদর্শক গুরু।

আর একদল লেখক হিংস্রক। সাহিত্যে ইঁহারা বিপ্লব বাদের সৃষ্টি করেন। ইঁহারা চাহেন অর্থ। চটকদার রং কথার মধ্যে মাদকতার নেশা চড়াইয়া কুৎসিত ও আপাত মধুর ভাষা ফেনাইয়া এই সকল কালাপাহাড় সরস্বতীর পবিত্র মূর্ত্তির নাসিকা ছেদন করিয়া ফেলেন। ইঁহারা একদল তরুণের বাহবা লইয়া তাহাদের কোমল মতির উপর লালসার রঙ্গিন চিত্র ধরিয়া দিয়া ঘৃণিত উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল লেখকগণের মোসাহেবের দল এত পুরু যে ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে, আত্ম রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাদের সাহিত্যে "পাপের ছাপ' অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহারা যত বড় লেখকই হউনা কেন সুধু নামের জন্য সুধু সবুজ পত্রের অন্তড়ালে নিজকে বসন্ত সখার মত ঢাকিয়া রাখিয়া "ঘরে বাহিরের" কুৎসিত গান গাহিয়া যাওয়াই ইহাদের ব্যবসায়। মনের সকল কথা খুলিয়া বলিলেই সৎসাহিত্য হয় না এবং অচলায়তনের আলোচনাও সমাজে স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারে না। মেঘনাদের মত মেঘের অন্তড়ালে থাকিয়া যাঁহারা সমাজের "সংস্কার" করিতে অগ্রসর হন, পল্লী সমাজের একটা দুষ্ট ক্ষত যাঁহাদের চক্ষে আদর্শরূপে গৃহীত হয়, তাঁহারা বড় লেখক হইতে পারেন কিন্তু দেশের হিন্দুসাহিত্যিক বলিয়া তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে আমরা কুণ্ঠিত। মনকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেওয়া কি "মনঃস্তত্বের" বিকাশ? মানবের মানবত্বের বিকাশ কি? মনকে সংযম সাধনায় সিদ্ধ করিয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় পথ নির্দ্দেশ করিয়া চলিতে দেওয়াই আর্য্যের মাহাত্ম্য?

সাহিত্যে নারী চিত্র লইয়া নাড়াচাড়া করাই ইহাদের একমাত্র ব্যবসায়! নারীর নগ্ন ছবিতে আর নারীব তথা কথিত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বিকাশে নাকি আর্ট বিরাজিত। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতে আরম্ভ করিয়া কল্যকার নবীন লেখক পর্য্যন্ত সকলেই চান বৈদেশিক রীতিতে নারী জাতির বৈশিষ্ট্যের উপর আক্রমণ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে কলাশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতে। সিংহের চর্ম্মে আচ্ছাদিত জন্তু যেমন শব্দ করা মাত্রই ধরাপড়ে এই শ্রেণীর বিদেশী আর্টও তেমনই আত্ম গোপন করিতে সমর্থ হয় না। সম্প্রতি একদল লেখক ও তাঁহাদেরই হাতের মানুষ জনৈক ছাত্রী লেখিকা নারীর যথাসর্ব্বস্ব সতীত্বের উপর তীব্র বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের কথার পুনরুক্তি পাপজনক মনে করি। তথাপি আমরা এই শ্রেণীর পূতি গন্ধময় দুষ্ট আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া সাহিত্য মন্দির পবিত্র রাখিবার পক্ষপাতী; নহিলে সাহিত্য দূষিত হইবে, জাতির সর্ব্বনাশ হইবে। আর্ট থাকে থাকুক, আমরা এই সর্ব্বনাশকর আর্টকে দূর হইতে নমস্কার করিব। রূপবতী হইলেও অলক্ষ্মীকে ঘরে আনিব না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মায়াবিনী রাক্ষসীকে জানিয়া শুনিয়া আশ্রয় দিব না। পাপের ছাপ যাহার গায়ে থাকে—তাহার শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমা ভদ্রতার প্রশংসা করিব কিন্তু তিনি যে আমাদের জাতির শত্রু দেশের সর্ব্বনাশকারী বিভীষণ একথা বিস্মৃত হইব না। ভগবান যেন আমাদের তরুণ দলের গায়ে চরিত্রহীনের পাপের ছাপ খোদিয়া না দেন—এই প্রার্থনা।

এই দলের জনৈক অগ্রণী গল্প লেখক এইবার এক প্রবন্ধে তাঁহার গায়ের জ্বালা মিটাইয়াছেন; তাঁহারই রুচির অনুরূপ একখানি কাগজে এই নির্জ্জলা গালি এবং আত্মপ্রশংসার দুন্দুভিনাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সভাপতির পদ গ্রহণের সময় ছদ্ম বিনয়ের আবরণে তরুণগণের গায় মাথায় সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়া বলিতেছেন—"এই অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয় যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সবুজ পতাকার আহ্বান আমাকে মান্‌তেই হবে।" এই উক্তির বিন্দুমাত্রও অসত্য নহে। এই নবীনদের মাথা বিগড়াইবার যে প্রবল লিপ্সা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে, তাহা এড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি গর্ব্বের সহিত পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিতে আনন্দিত হইতে পারেন, এরূপ জঘন্য আনন্দে দেশের লোক যখন মাতিয়া উঠে তখন যাঁহারা নেতাগিরী করেন তাহাদের অর্থ ও কাম প্রাপ্তি ঘটে। আমরা অতীতের দিকে চাহিয়া ইহাই দেখি যে তরুণের দলকে

নাচাইতে না পারিলে কোন আনন্দেই সুবিধা করা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনে তরুণ, অসহযোগ আন্দোলনে তরুণ, জেল খাটিতে তরুণ, আর মরিতেও তাহারা। আর নিন্দা গ্লানি ইত্যাদিও তাহাদেরই প্রাপ্য। প্রদর্শকেরা সুবিধা বাদী, সহসা সরিয়া দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারেন। সিগারেট, চা, রেষ্টরেণ্ট তরুণের করতল গত, আবার খদ্দরও তাহাদেরই হাতে উঠিয়াছে। তাহারা যখন নীচে নামিয়া যায় বিদ্যুৎ গতিতে নামে; যখন উঠিয়া যায়, সেই গতিতে আর পারে না। আজ গল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটা কুৎসিত ভাব সমাজের সবুজ দলকে তড়িৎ গতিতে নীচে লইয়া যাইতেছে—একথা বলিলে তরুণরাতো চটেনই ইহাদের নেতারা মেসিন গানের ব্যবস্থা করেন। বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই যখন এই সকল লেখায় দেখিতে পাই—"তাই সতীত্বের মহিমা প্রচার হয়ে উঠেছে—বিশুদ্ধ সাহিত্য।" "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়" "একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক এক বস্তু নয় একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি না স্থান পায়, তবে এ সত্য বোধ থাকবে কোথায়?" বাংলা অক্ষরে এসকল তথ্য প্রচার যাহারা করেন, তাহাদিগকে দুটী কথা বলিতেও ভয় হয়। কারণ তাহাদের দল আজ পুরু, তাহারা মাদকতায় মস্‌গুল। কিন্তু নারী জাতির তরফ হইতে আমি সামান্যা অবলা এই সকল প্রচারকের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। এই অদূরদর্শী চরিত্র হীনের দল দেশে যে বিষাক্ত বায়ু ছড়াইয়া দিতেছেন তাহা পরিণামে কি ভীষণ আকার ধারণ করিবে তাহা কি তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন?

আজ তরুণ দলের জয় জয়কার। তাই নবীন সাহিত্যিক দলের গড্ডলিকা প্রবাহকে প্রবীণগণ পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। হায় সাহিত্য! তুমিও তবে বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়া চলিলে? কিন্তু আবার তোমাকে আসিতে হইবে। চরিত্র হীনের সাম্রাজ্য বেশী দিন থাকে না; সত্যের মহিমা একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে।

কতকাল জলের তিলক থাকে ভালে,
কতকাল রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে।
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়,
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়।

শ্রীপূর্ণিমাপ্রভা রায়।

কাঁচ্‌পোকার ক্যাঁচ্‌কেঁচি।

(কথিকা)

আরসুলাদের বৈঠক বসে গেছে, ঘরের কোণে, সিন্দুকের আড়ালে দেওয়ালের গায়।

মন্তরাম এক আরসুলাকে ঘিরে বসে সকলে শুঁড় নাড়ছে।

তাদের মৎলব হ'ল ঐ কোণটাকে এক্‌চেটে করে নেওয়া; যা'তে করে মাকড়শারা জাল না পাততে পারে ওখানে।

ছোক্‌রার দল বল্‌ছে "আসুক্‌ দেখি কোন বেটা আস্‌বে, টুঁটি টিপে ধর্‌বো।"

মোড়ল আরসুলা বল্‌ল, "না হে ছোক্‌রা, মারামারি করে কাজ নাই! ওদের জাল ছিড়তে থাকো তা' হলেই পালাবে।"

"ভোঁ—ওঁ—ওঁ—ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ।"

ছটফটে কাঁচ্‌পোকা একটা চট্‌পট ছুটে এসে "হট্‌ যাও" বলে বসে পড়ে তাদের সাম্‌নে তড়বড় করতে লাগল।

'ওরা যত বড়ই হো'ক, আমার কিছু করতে পারবে না' তা'র এই দৃঢ়তাই ওদের দমিয়ে দিল।

সে বড় তেলাপোকাটার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে চল্‌লো। সবাই ম্যাট্‌মেটিয়ে চেয়ে রইল।

কাঁচপোকা টান্‌ছে, আরসোলা সুড়সুড় করে ত'ার সাথে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে একবার এধার ওধার ঘুরে আস্‌ছে—তবু তেলাপোকার পালাতে পা সরছে না। কাঁচ পোকার ক্যাঁচ্‌কেঁচির চটক্‌ ওকে দাবড়ে রেখেছে।

ছেঁচ্‌ড়াতে ছেঁচ্‌ড়াতে নিয়ে শেষে এক অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখলো।

কিছু দিন পরে দোর খুলে একটা কাঁচ পোকা যখন বেরিয়ে এল, তখন তেলাপোকারা গিয়ে দেখে, তাদের মোড়লটি দেখতে ঠিক তেমনটিই আছে, তবে তা'র ভিতরটা ভুয়ো!

শ্রীসুরজিৎ দাসগুপ্ত।

হাতী খেদা।

(৬)

১৯শে অগ্রহায়ণ। অদ্য যদিও আশা ভরসা লইয়াই কার্য্যস্থানে গিয়াছিলাম তথাপি অদ্যকার ফলও কল্যকার মতই নিরাশাব্যঞ্জক হইয়া পড়িল। সমস্তই কল্যকার মত, কেবল মাত্র হাতীর ভীতি কিছু কমিয়া গিয়াছিল।

আজিকার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মেজকাকা একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন এবং ঠিক করিলেন—তিনিও সুধাংশুদাদা পর দিবসই চলিয়া যাইবেন।

আমার সন্দেহ আসিয়া থাকিলেও একেবারে হতাশ হই নাই। ঠাকুর কাকারও তাহাই; ছোটকাকার এতদিন খুবই আশা ছিল, আজ একেবারে নিরাশ হইলেন; তথাপি কল্যকার জন্যও চেষ্টা করা উচিত—বলিলেন। ছোটদাদা, যতীনদাদা প্রভৃতি আমার মত নব্যদের কিন্তু উৎসাহের হ্রাস হয় নাই; এটা বোধহয় বয়সের জন্যই।

কল্যকার এবং অদ্যকার খেদা একই কারণে ভাল হয় নাই—সুতরাং ইহার প্রতিবিধান করিতে না পারিলে ভবিষ্যতেও এই প্রকারই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বের ক্রটীর প্রতিবিধান করিতে তৎপর হওয়া গেল। আলোচনায় দেখা গেল—দক্ষিণের লোক নামিয়া হাতীর পশ্চাদ্ধাবন করিবার সাহস পায় না—কোনও আশ্রয়ের অভাবে। কোনও মোটা গাছ সেদিকে ছিল না। মোটামুটি স্থির হইল—দুই তুরীর মাথা মিলাইয়া একটা পথ পরিস্কার করিয়া রাখা এবং এই খানে প্রয়োজন হইলে হাতী pass করিলে আগুন দেওয়া। গুলানেওয়ালারা যে পর্য্যন্ত আসিতে পারে তাহার পরই কয়েকটা মোটা উচ্চ বৃক্ষ ছিল, সেখানে ৪।৫জন লোক বন্দুক সহ রাখা; হাতী এই গাছ pass করিলেই তাহারা অবিরত ফাঁকা আওয়াজ করিবে এবং তুরীর লাইনে আগুন ধরাইয়া দিবে। এই অনুসারেই বড় সর্দ্দার এবং খেদা কর্ম্মচারীদিগকে বলা হইল। তাহারাও তাহাতেই সম্মত হইল।

২০শে অগ্রহায়ণ—যথাপূর্ব্ব আহারাদি যাবতীয় ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল। মেজকাকা ও সুধাংশুদাদা সুসঙ্গ রওনা হইয়া গেলেন এবং আমরা খেদার স্থানে গেলাম। পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই drive হওয়ার সমুদয় স্থির হইল, এবং তদনুযায়ী আমরাও ফল দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

পূর্ব্বে দুই দিনই দেখা গিয়াছে একদল হস্তী (৩০।৪০টা) সামান্য drive এই ডাইনের গড়মলম ধরিয়া চলিয়া আসে—অপর একটা দলকে drive করিয়া ইহাদের সঙ্গে মিলাইতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ দুই দল মিলাইয়া একত্রে ধরার বাসনাতেই এই প্রকারের ফল এযাবত হইয়াছে। সুতরাং আজ বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যে প্রথম driveএ যে দল হাতী অনায়াসে আসে—পশ্চাতের দল কাটিয়া হইলেও—তাহাদিগকেই ধরিবার চেষ্টা করা হয়।

আজও drive আরম্ভ হওয়া মাত্রেই প্রথম দল হাতী মালার মত আসিতেছে দেখা গেল। আজ হাতী নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করা মাত্র ডাইনের তুরীওয়ালাগণ "কাহার" (Steep Hill side) বাহিয়া নামিয়া পশ্চাৎ হইতে হাতী তাড়াইতেছে। নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ হইতে অবিরত বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হইতে লাগিল এবং হস্তীযূথ সবেগে অগ্নির দিকে ছুটিল—তুরীর শেষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেখিয়া বোধ হইল যে হাতী আর ফিরিতে পারিবে না। কিন্তু চক্ষের নিমেষে পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—হঠাৎ দেখা গেল, প্রায় হাতীই অগ্নিরেখা ভেদ করিয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। দূর হইতে আমাদের মনে হইয়াছিল যেন কতক হাতী ঠেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া-গিয়াছে। অগ্নিরেখায় অগ্নি সংযোগ হওয়ায় আমরা অনেকটা উৎসাহিত হইয়াছিলাম; কিন্তু এমন ভাবে অগ্নি এবং গুলি বর্ষণ উপেক্ষা করিয়াও হাতী চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কিছু অধিক মাত্রায় নিরুৎসাহ হইলাম। হাতী অগ্নি রেখা পার হইয়া যাওয়ার পরই যে ভাবে গুলির শব্দ হইল ও ধূমরাশি উৎগীর্ণ হইতে লাগিল তাহাতে মনে হইল যেন আমাদের সম্মুখে একটা তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে। কয়েকটা হাতী যে চলিয়া গিয়াছে, আমরা স্পষ্ট দেখিলাম; কিন্তু ইহার পরও দুইটা ফায়ার লাইন জ্বলিতে লাগিল এবং গুলি বৃষ্টি সমভাবেই চলিতে লাগিল; ইহাতে আমরা বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলাম, এবং কি কারণে এরূপ হইতেছে, অনুসন্ধান লইতে লোক

পাঠাইলাম। সে আসিয়া বলিল ৬টা হাতী এখনো আগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, ভীষণ অগ্নি সংযোগেও নড়িতেছে না—ছড়রা মারিলেও অগ্রসর হয় না। সে এই সংবাদ দেওয়ার পরই তুমুল হরিধ্বনি শ্রবণে আমরা আশ্বস্ত হইলাম। পুনরায় সংবাদ জানা গেল হাতী ঐ ভাবে আছে। উহা দেখিয়া উদয়চাঁদ সর্দ্দার আগ্নির ভিতর যাইয়া একটা তুবড়ী জ্বালাইয়া দিতেই হাতী ছুটিয়া কোঠে প্রবেশ করিল। এই সংবাদে আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। আমি উৎসাহাতিসয্যে তখনই ছুটিয়া যাইতেছিলাম কিন্তু বড়কাকার কথায় অতি কষ্টে উৎসাহ কিঞ্চিৎ রুদ্ধ করিয়াছিলাম। আজ গারো হিলের দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জার আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে "পয়া" আখ্যায় ভূষিত করা গেল। এই সময়ই শ্রীহট্টে প্রেরিত লোক আসিয়া জানাইল—আরো ৫ টী হাতী লাংলা হইতে আসিয়াছে। আজ মনে হইল "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

হাতী জঙ্গল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যখন সদলবলে অমিত বিক্রমে আসিতে থাকে তখন ভীতির চেয়ে আনন্দ বোধই অধিক পরিমাণে হয়; কিন্তু কোঠে আবদ্ধ হাতী দেখিলে সত্যই ভীতির উদ্রেক হয়।

হস্তী আবদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পরই কোঠের নিকট যাওয়া গেল; কিন্তু যাইয়া শুনি, তথায় এক নূতন বিপদ উপস্থিত! ২। ৩ জন ব্যক্তি গুরুতর ভাবে বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়াছে। বড় কাকা আহত ব্যক্তিদিগকে কেম্পে ডাক্তারের নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন। আমি তদনুযায়ী আহত ব্যক্তিদিগকে কেম্পে পাঠাইয়াদিলাম। ড্রাইভারদিগকে ড্রাইভিংএর সময় ১½ ড্রামের অধিক বারুদ দিয়া বন্দুক ভরিতে দিতে নাই।

এই সকল কারণে ধৃত হস্তী দেখিতে আমার কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যাহা হউক কোঠের গাত্র সংলগ্ন মাচাংএ যে খানে খুল্লতাত মহাশয়গণ ও যতীন দাদা Camera লইয়া দাঁড়াইয়া সকৌতুকে হস্তী দেখিতেছিলেন, মৈ বাহিয়া আমিও তথায় উঠিয়া হস্তী দেখিয়া বড়ই কৌতুক এবং আনন্দ অনুভব করিলাম। প্রথমে যাইয়া দেখা গেল হস্তীগুলি ভয় বিহ্বল ভাবে পরস্পর গাত্র সংলগ্ন এবং কর্ণ বিস্তার করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে সম্মুখের পদ দ্বারা ধূলি খুঁড়িয়া শুণ্ডদ্বারা গাত্রে ছিটাইয়া দিতেছে! হস্তী যখন কর্ণ যুগল বিস্ফারিত করিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক শুণ্ড কুঞ্চিত করিয়া দণ্ডায়মান হয় তখন সত্যই তাহাদিগকে খুব উদার এবং মহান্ মনে হয়। বস্তুতঃ হস্তীর চরিত্রের অনেকথানেই আকারোপযোগী সম্ভ্রমতা দেখা যায়। কিন্তু হঠাৎ যখন ভয়ে লাঙ্গুল উত্তোলন পূর্ব্বক পলায়ন পর হয় তখন আকারের অনুপযোগী ভীরুতা দেখিয়া নেহাৎই তাহাকে অত্যন্ত ভীরু আখ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়। প্রথমে কেবল মাত্র চারিটী হস্তী দেখা গেল। ইহারা ভয়ে পরস্পর পরস্পরের গাত্রে মুখ লুকাইতে চাহিতেছে। দুইটী ছোট হাতী বড় হস্তিনীর পেটের নীচেই ঢুকিয়াছিল। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই বড় একটা হস্তিনী প্রবল বেগে কোঠ আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রত্যেক ধাক্কায় মনে হইতে লাগিল—এইবার বুঝি গড় ভাঙ্গে! প্রত্যাক বারই কোঠ কাঁপিয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে হাংড়া বাহিয়া হস্তী একেবারে উপরে উঠিয়া হাংড়া ভাঙ্গিবার উপক্রম করে। এমন সময় গড়ের পশ্চাৎ হইতে "রুখি" গণ হস্তীটীকে তীক্ষাগ্র বংশ দ্বারা খোঁচা না মারিলে কোঠ টিকিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই হস্তিনী ক্রমাগত এইরূপ আক্রমণ করিতেছে, আর রুখিগণ বাহির হইতে জাঠা কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকার বংশাগ্র দ্বারা ক্রমান্বয়ে খোঁচা মারিয়া তাহাকে ফিরাইতেছে। কখন কখন অত্যন্ত জোর করিলে ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে।

এইরূপে কিয়ৎ সময় অতিবাহিত হইলে হাতী বাঁধিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। রুম ঘরের পাট প্রস্তুত হইতে লাগিল, ইত্যবসরে পালিত কুম্কীর জন্য লোক পাঠান হইল। পালিত হস্তী আসিলে রুমঘরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তাহাদিগকে দাঁড়া করান হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ট দুইটী হস্তিনী প্রথমে, তাহার পর তিনটী—এইরূপে দ্বাদশ হস্তিনী দণ্ডায়মান হইলে রুম ঘরের অবশিষ্ট কার্য্যটুকু শেষ করান হইল; অর্থাৎ এক্ষণে দুই আগ্নি সংলগ্ন করিয়া অপর একটী পাট নির্ম্মিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য এই যে দরজা তোলা হইলেও যাহাতে হাতী ঠেলিয়া বাহির হইয়া না যায়।

৫০। ৬০ জন কুলি দরজাটা টানিয়া তুলিল। দরজাটা তোলার সময় হস্তিগুলি এক নূতন বিপদ মনে করিয়া কর্ণদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া ভয়-ত্রস্ত ভাবে চাহিয়া শুণ্ড কুঞ্চিত করিয়া রহিল। অতঃপর দুইটা দুইটা করিয়া সমস্তগুলি কুম্‌কী প্রবেশ করিলে কোঠের দরজা ফেলাইয়া দেওয়া হইল। বড় হস্তিনীটা মধ্যে মধ্যে কুম্‌কীকে আক্রমণের প্রয়াস করিল কিন্তু মাহুতের হস্তস্থিত জাঠার খোঁচা খাইয়া ফিরিয়া গেল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

দেশবন্ধু-প্রয়াণে।

জোছনা ধারায় হাস্যময়ী নীরব নীল ভুবনে
চমকি হৃদি পড়িল যেন বাজ।
পূরব গগনে শুক তারাটী সহসা বুঝি গোপনে
পলক মাঝে খসিয়া গেল আজ।
দীপক রাগে পরাণ বীণা আকুল তানে ঝঙ্কারি
এক নিমিষে ছিঁড়িয়া গেল তার,
মন মাতানো গানের রেশে সুপ্ত হৃদয় সঞ্চারি
সুর লহরী উঠিবে না কো আর।
ছুটিবে না কো অনল শিখা দীপ্ত নয়ন বিদারি
নেহারি দেশে দারুণ অনাচার,
বুক বেঁধে আজ কে দাঁড়াবে বীর দাপটে হুঙ্কারী
সব ফুরাল! উঠিল হাহাকার।
ডুবিয়া গেল জীবনবারি না যেতে বেলা ফুরায়ে
গভীর শোকে কাঁদায়ে সারা দেশ,
কোন সুদূরে চলিলে গুণী মায়ার জাল গুটায়ে
সাধন তব হয়নি যে গো শেষ।
মাতিয়া হৃদি জাগিছে যবে নবীন সাড়া গড়িতে
পাগল ঢেউয়ে পরাণ টলমল,
উদ্‌যাপিতে স্বরাজ-যজ্ঞ হৃদয় চিরা শোণিতে
জালিবে কে দেব—মুক্তি হোমানল?
সত্যনিষ্ঠার উজল শিখা চলিয়াছিলে জ্বালায়ে
পড়িছে মনে জীবন যশোময়,
ন্যায়ের পথে বীরের মত বিপদে একা দাঁড়ায়ে
যুঝিতে রণে করনি কভু ভয়।
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেখালে যাহা জীবনে
বিশ্বে তাহার নাইক সমতুল,
উদার হৃদি ছাপিয়া ছুটি করুণা ধারা প্লাবনে
ভাই বলিয়া দিয়েছ সবে কোল।
বজ্র সম ভীষণ কঠোর বিপুল ব্যথা পীড়নে
শুকায়ে যবে গিয়াছে হাসি মুখ,
গরব ছাড়ি সব সয়েছ অশ্রুসজল নয়নে
দুখীর সাথে পাতিয়া দিয়া বুক।
নাই কোন জন আজকে ওরে বঙ্গভূমি জাগাতে
পরের লাগি নিজের স্বার্থ দলি,
কে চাহিবে ঝড়ো হাওয়ায় জীবনতরী চালাতে
"দেশের বন্ধু" আজ যে গেছে চলি!
বিজলী সম লুকালে কোথা বিতরি জ্যোতি চকিতে
তিমিরে ঢাকি নিমিষে হাসি মুখ
নিবিয়া গেল দমকা বায়ে দুখের কাল-নিশিতে
বাংলা দেশের উজল দীপালোক।
অলকাপুরী হইতে বুঝি সহসা পথ হারায়ে
পথিক এল করিয়া কি গো ভুল!
দু'দিন তরে ভুবন ভরে সুবাস যেন ছড়ায়ে
ঝরিয়া গেল একটা ফোটা ফুল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

কালিদাস।

(দ্বিতীয় অংশ)

কোন কবির প্রকৃত শক্তিমত্তার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, তাঁহাকে নিজের দেশের গণ্ডীর বাহিরে সার্ব্বভৌম পদবীতে সমারূঢ় দেখিতে চাহিলে, অগ্রে বিচার কর কর্ত্তব্য—তদীয় দেশ বা জাতির পক্ষে তাঁহার আবির্ভাব বস্তুতঃ অন্ন-পানাদির মতই সেই দেশ বা জাতির বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়াছিল কি না। কালিদাসের তাদৃশ শক্তির পরিমাপ করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবের আবর্ত্তে পড়িয়া কতবার ভাঙ্গিয়াছে, গড়িয়াছে,

কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী—যাঁহারা কত অশেষবিধ টিকা-টিপ্পনিমূলক সমালোচনার কষ্টিপাথরে তদীয় রচনার অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—সেই ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুক্ত কণ্ঠে ভাব ও কাব্যরাজ্যে তাঁহারই সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আজ সার্দ্ধৈকসহস্রবৎসরাতীতেও কালিদাস ভারতের মনোমন্দিরে যেরূপ সবহুমানে পূজিত হইতেছেন—তেমন পূজা অপর কোন কবি, কোন দেশে, কোন কালে প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কাদম্বরী ও হর্ষচরিত প্রণেতা বাণভট্ট প্রমুখ পরবর্ত্তী কবিকুল তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ নিষ্কলঙ্ক ও অননুকরণীয় বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতে অথবা "ভাসো হাসঃ কালিদাসো বিলাসঃ"—ইত্যাকার স্বল্পভাষ প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই।

কিন্তু কালিদাসের গৌরব যদিচ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তদীয় কাব্যের উৎকর্ষতার জন্যই পরিকল্পিত হইয়া থাকে তথাপি যদি তাঁহার রচনাবলী অবয়বে ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যে হীন হইত তবে আমরা হয়তঃ তাঁহার তাদৃশ গৌরব করিতাম না। ইয়োরোপের তো কথাই নাই, এমন কি ভারতবর্ষেও তাঁহার রচনার প্রাচুর্য্য ও আয়তনই তাঁহাকে সমধিক মৌলিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ তখনকার দিনে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যরীত্যাদির কঠোর ও কৃত্রিম শাসন-শিক্ষিত বিদ্বন্মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে যাইয়া কবি মাত্রেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সাহিত্যিক রুচি ও শুচিতার পরিচয় দিতে বাধ্য হইতেন। ফলে কালিদাসের অনুরূপ অসাধারণ কবিত্ব শক্তি না থাকিলে 'মন্দঃ কবি মাত্রেই যশঃ প্রাপ্তির' পূর্ব্বেই সাহিত্যচর্চ্চা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইতেন এবং বহু কষ্টকল্পনার ভিতর দিয়া কদাচিৎ দু'টি একটি কাব্য বা নাটকের অধিক সারাজীবনে প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভবভূতি—অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রকৃত কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়াও সমগ্রজীবনে তিনটি মাত্র নাটক প্রণয়ন করিয়াই নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস এবম্বিধ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও নিজস্ব কবিত্ব-শক্তি—হারাইয়া ফেলেন নাই—ইহা তাঁহার সামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

রচনা শক্তির বৈচিত্র্যের কথা এইমাত্র যাহা উল্লেখ করা হইল এবং যাহার বলে কালিদাস অনন্যসাধারণ গৌরবে গৌরবান্বিত—সেই বৈচিত্র্যের জন্য তাঁহার কাব্য অপেক্ষা নাটকশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান শকুন্তলের কাছেই কবি সমধিক ঋণী। একমাত্র অভিজ্ঞান শকুন্তলই তাঁহাকে—তাঁহার আবির্ভাবের প্রায় তেরশত বৎসর পরে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত-সমাজ পরিচিত করিয়া দিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন না, উহা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া উহাতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলের, তথা ভারতীয় নাটকের এমন একটি স্বাতন্ত্র্য বিদেশীয়ের চক্ষে প্রতিভাত হয় যাহার ফলে প্রাচীন গ্রীসের নাটক অপেক্ষা আধুনিক ইয়োরোপীয় নাটকই ইহার অনেকটা অনুরূপ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেন না সংস্কৃত নাটক ইয়োরোপীয় নাটকের ন্যায় নরনারীর প্রেমবৈচিত্র্য ব্যতীত কদাচিৎ সম্প্রদায়গত উদ্দেশ্য নিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে বিয়োগ বিষয়ক—উপাদান সংস্কৃত নাটকে থাকা সম্ভবপর হইলেও ইয়োরোপীয় নাটকের মত উহা কিছুতেই বিয়োগান্তক হইতে পারে না। আর যাহা কিছু সহজশ্লীলতার ও মার্জ্জিত রুচির পরিপন্থি এমন কোন বস্তু বা ক্রিয়া— যথা যুদ্ধ, চুম্বন, আলিঙ্গনাদি) রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যোগ্য বলিয়া কিছুতেই বিবেচিত হইতে পারে না। ইয়োরোপীয় নাটককার সংস্কৃত নাটককারের নিকট এই বিষয়ে সুরুচি জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারেন এই কথা সুপণ্ডিত Rydero স্বীকার করিয়াছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলের কবি—উক্ত নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শ্লীলতা ব্যাহত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই কেমন কৌশল ও নিপুণতার সহিত অনুসূয়াকর্ত্তৃক নেপথ্য হইতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলারূপী চক্রবাকমিথুনকে সম্বোধন করিয়া—গৌতমীরূপিণী যামিনীর আগমন বার্ত্তা জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইয়োরোপীয় নাট্যকার এস্থলে আরো কিছু অগ্রসর না হইয়া যবনিকা নিক্ষেপ করিতেন না—ইহা সুনিশ্চিত। সংস্কৃত নাটকের আরো একটি বিশেষত্ব ইহার রঙ্গমঞ্চের উপকরণাদি

যৎসামান্য ও সাধারণ রকম কিন্তু গীতবাদিত্রাদির সম্যক আয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখা হইত। ভরত মুনি নাট্য-শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বা আদিগুরু হইতে পারেন কিন্তু ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের পূর্ণতম আদর্শ কালিদাসই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

Sir William Jones ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম অভিজ্ঞান শকুন্তলের ইংরেজী অনুবাদ ইয়োরোপে প্রচার করিলে পর তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বিশেষতঃ মহাকবি Goethe কর্ত্তৃক উহা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত ও বিশ্বসাহিত্য-আসরে অতি উচ্চ আসন প্রদত্ত হয়। ফলে তত্রত্য শিক্ষিত জনসমাজে উহা পাঠ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ বর্দ্ধিত হইলেও সংস্কৃত ভাষা রূপী দুর্লঙ্ঘ্য হিমাচল সেই আগ্রহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। অনন্যোপায় শিক্ষিত সাধারণকে অনুবাদ পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল বলিয়া প্রতীচ্য মহাদেশে কালিদাস আশানুরূপ প্রচারিত হইতে পারেন নাই। তথাপি ইতিমধ্যেই কতক নব নব অনুবাদের ভিতর দিয়া, কতক ইয়োরোপ ও আমেরিকার রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া সহস্র সহস্র নরনারী সমক্ষে তিনি প্রতি নিয়তই প্রচারিত হইতেছেন।

অনন্তর এই সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কোন কারণ পরম্পরা হেতু কালিদাস সহস্রাধিক-বর্ষাবশেষে দুইটি আত্মগরিমা দৃপ্ত, অত্যুন্নত, সমৃদ্ধ ও সুসভ্য মহাদেশের (ইয়োরোপ ও আমেরিকা) মনোরাজ্যে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন? উত্তর স্বরূপ প্রথমতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নরনারীর মধ্যে যে প্রেম আত্মসর্ব্বস্ব উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা হইতে পরিশেষে ধর্ম্ম নিয়মের অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়া সমস্ত প্রেয় ও শ্রেয়কে বরণ করিতে সক্ষম হয়—সেই প্রেম 'তপঃকৃশাঙ্গী' পার্ব্বতী অথবা 'নিয়মক্ষামমুখী' শকুন্তলার ভিতর দিয়া কালিদাস ব্যতীত অপর কেহ এমন নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। "যাহা ফুল হইতে ফলে, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে, স্বভাব হইতে ধর্ম্মে পরিণতি", সেই প্রেমকে "স্বভাব সৌন্দর্য্যের দেশ হইতে মঙ্গল সৌন্দর্য্যের অক্ষয় স্বর্গধামে" উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া এবং নাটকের ভিতর অবলীলাক্রমে তাহা সজীব করিয়া তোলা একা কবি কালিদাসেই সম্ভব হইয়াছিল। কালিদাসের বর্ণিত প্রেম তাই অনাদি ও অনন্ত, যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একাকার; সেই শাশ্বত প্রেম পঞ্চদশশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বদেশবাসীর কর্ণে যেরূপ মধুর ঝঙ্কার দিয়া ধ্বনিত হইয়াছিল, আজ বিংশশতাব্দীতেও ভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন আচারপরায়ণ, ভিন্ন ভাষা ভাষীর কর্ণে তেমনি মধুর ঝঙ্কার সহকারে বাজিয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ কালিদাসের কাব্য নাটকের উপকরণ নির্ব্বাচনে এমন একটা বিশিষ্টতা আছে যাহার ফলে তদীয় নায়ক অপেক্ষা নায়িকাগণ পাশ্চাত্য পাঠককে সমাধিক আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। দেশকাল-পাত্র-ভেদে নায়কের আদর্শ সম্বন্ধে মতভেদ ও রুচিভেদ জন্মিতে পারে—কিন্তু প্রকৃত গুণশালিনী নায়িকার আদর্শ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে একই প্রকার; তাহা দেশ-কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া অপরিবর্ত্তনশীল। এই হিসাবে একা Shakespeare ব্যতীত বোধ হয় আর কোন কবিই পার্ব্বতী, শকুন্তলা, সীতা, ইন্দুমতী ও যক্ষ পত্নীর সমকক্ষ, পরস্পর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, অথচ সার্ব্বজনীন নায়িকার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

তৃতীয়তঃ কালিদাস শকুন্তলায় বহিঃ প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যে নিবিড় ও করুণ সম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং ইতঃপূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে, রসসৃষ্টি হিসাবে তাহার অপূর্ব্বতা ও চমৎকারিতায় বিমুগ্ধ হইয়াই পাশ্চাত্য-জগৎ অকপট চিত্তে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত হিন্দু কবি বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের মূলসূত্র সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী উদ্ভিদাদি পর্য্যন্ত, সমস্ত চরাচরই অন্তঃসংজ্ঞা সমন্বিত, সকলেরই ভিতর একই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বলিয়া যে দার্শনিক সত্য কাব্যের আবেষ্টনে প্রতীচ্যপণ্ডিত-গণের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন সেই সত্যের দার্শনিক যুক্তিমত্তা ও পাশ্চাত্য জগতে কালিদাসের এবম্বিধ প্রভাব বিস্তারে অল্প সহায়তা করে নাই। এই প্রসঙ্গে আরো একটু বলা চলে যে—কবি যে কেবল মূক প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এমন নহে, পরন্তু উক্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান প্রায় নিখুঁত ছিল—বলা যাইতে পারে।

হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গকিরীটোপম রজত শুভ্র তুষাররাশি, মর্ম্মর মুখর বনস্পতি সেবিত মলয়ানিল, অথবা কুলুকুলু-নাদিনী জাহ্নবীর শোভা-সম্পদই যে কবির চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত রাখিয়াছে এমন নহে,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পত্র-কিসলয়টি, দুর্গম অরণ্যসুলভ পুষ্পকোরকটি অথবা চিহ্নমাত্র পর্য্যবসিতা নির্ঝরিণীটিও তাঁহার চিত্রণকুশল দৃষ্টি অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। এই স্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রবর Evolution বা বিবর্ত্তনবাদ প্রবর্ত্তক Darwinএর সহিত কালিদাসের সুসঙ্গত মিলন কল্পনা করিলে মনে হয় উভয়ে উভয়কে যতদূর ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে সক্ষম হইতেন, তেমন অন্তরঙ্গতার সহিত বুঝি কেউ কাহাকে কখনো বোঝে নাই।

প্রতীচ্যখণ্ডে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের কৃতকার্য্যতার মূলে চতুর্থ নম্বরে, আর একটি কথা বলা যায় যে কি বনে, কি রাজপ্রাসাদে,—সর্ব্বত্র তাঁহার গতি অত্যন্ত লঘু, সহজ ও অব্যাহত। তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন অংশের ভিতর এমন একটা সুসঙ্গতির ভাব, পরস্পরাপেক্ষী পরিপূরকতা দেখিতে পাওয়া যায় যাহা অন্যত্র সম্ভব নহে। মহাকবি Shakespeare পর্য্যন্ত প্রাকৃত-সৌন্দর্য্যজ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়াও তিনি প্রধানতঃ মানবপ্রকৃতি জ্ঞানেরই কবি বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে ঐরূপ বলা চলে না। তিনি মূলতঃ প্রাকৃত সৌন্দর্য্য জ্ঞানের কবি হইয়াও বস্তুতঃ উভয় বিধ অভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ পরিকল্পনায় তাঁহার দক্ষতা কতদূর আমরা দেখিয়াছি; পুনরায় মেঘদূতেও তাহা অতি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 'পূর্ব্বমেঘে' যেমন আমরা বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার সহিত বিরহী যক্ষের অন্তরেন্দ্রিয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখিতে পাই,—তেমনি 'উত্তর মেঘে' অন্তরেন্দ্রিয়ের ভাব নিচয়ের সহিত অলকাপুরীর জড় সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হই। এমনি সুকৌশলে কবি তাঁহার কাব্যখানিকে উপাদেয় ও উপভোগ্য করিয়া পরিকল্পনা করিয়াছেন যে তুলনা করিয়া বুঝিতেই পারি না—তিনি কোন্ অংশটিকে অপরটী অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা সহকারে চিত্রিত করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে, কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকে যে একটি মহাসত্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইয়োরোপে উনবিংশ শতকের পূর্ব্বে কেহই তাহা কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই, এমন কি অধুনাতন কালেও মাত্র আংশিক উপলব্ধ হইয়াছে। সেই মহাসত্যটি এই যে—মানুষের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্ট হয় নাই। মানুষ যে দিন মানুষেতর সৃষ্টির ষোল আনা মূল্য অবধারণে সমর্থ হইবে সেই দিনই তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হইবে। তাঁহার অন্যান্য শক্তির কথা দূরে থাকুক্, কেবল এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ও তাহার আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াই কালিদাস মহাকবি, কালিদাস আজ জগৎবরেণ্য। কবিত্ব শক্তির সহজ ও অবাধ স্মরণ জগতে নূতন কিছু নয়. তীক্ষ্ণপর্য্যবেক্ষণ শক্তিও জগতে নিতান্ত অভাবনীয় নহে—কিন্তু এতদুভয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ বোধহয় জগতে আজ পর্য্যন্ত দুই চারিটির অধিক দেখা যায় নাই।

প্রারম্ভেই বলিয়াছি কালিদাসের রচনা বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শুধু কবির জীবন ধারার স্বরূপ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন ততটুকুই করিয়াছি। কেন না subjective বা পাত্রগত আলোচনাই চরিত্রের প্রকৃত উপাদান; objective বা বস্তুগত আলোচনা দ্বারা সেই অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। অধিকন্তু মহাকবির জন্মের সন তারিখ, কবে, কোথায় তিনি কি করিয়াছিলেন বা লিখিয়াছিলেন; তাঁহার গার্হস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য ছিল কি না—ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য আমাদিগের জানিতে কৌতূহল জন্মিলেও ঐ সমস্ত খুঁটিনাটি আমাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অপরিহার্য্য, অত্যাবশ্যক সামগ্রী নহে। তাই উপসংহারে চরিত্রের উপাদান হিসাবে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাদ্বারা এই টুকু বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল যে কালিদাস জগতের কবি,—তাঁহাকে বাদ দিয়া জগৎ ভাবসম্পদে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারে নাই।

শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র রায়।

মর্ম্মবাণী।

মৃত্যুগিরির মুক্তি শিখরে চিত্ত অকালে অস্ত আজ।
আঁধারে মগ্ন সারাটী বঙ্গ, ভারতের একি বিষাদ সাজ।
পৌর্ণমাসিতে স্বরাজ সূর্য্য মহারাহু গ্রাসে হয়েছে লীন।
নির্ম্মেঘ নভে দামিনী দীপ্তি, বঙ্গ মায়ের কি মহাদিন।
আষাঢ়ে আজি গো নয়ন আসারে তিতিছে মায়ের শ্যামল অঙ্গ।
মৃত্যু বজ্র প্রহারে সহসা চিত্ত-সৌধ অকালে ভঙ্গ॥
ভারতবর্ষ উদ্দাম শোক প্রবাহে সহসা মুহ্যমান।
ক্রন্দন আজ ক্রন্দনহারা চিরনীরবতা লভেছে গান॥

(২)

দেশের বন্ধু নহ শুধু তুমি বন্ধু তোমার এ মহাবিশ্ব।
চিত্ত হারিয়ে তাইত আজি এ বিশ্ব চিত্ত হয়েছে নিঃস্ব।
বক্তা তোমায় পেয়েছে বাগ্মী কবিকুল মাঝে ছিলে গো গর্ব্ব।
তোমার শৌর্য্য দীপ্ত বীর্য্য জীবনে কখনও হয়নি খর্ব্ব।
সত্য সেবিন্ হে মর-অমর, বিশ্বব্যাপিনী সুযশ রাশি।
বঙ্গবাসীর মর্ম্ম প্রবাহে চির জাগরূক রহিবে ভাসি॥
চিত্ত তোমার চিত্ত প্রতিভা অম্বোধি ভেদি গেছে তরঙ্গ।
প্রতীচি দেখেছে বিস্ময় মানি মানুষ আছে এ শ্যামল বঙ্গে॥

(৩)

হে ত্যাগি, তোমার ত্যাগের চিত্রে জগৎবাসী লভেছে শিক্ষা।
বিপুল বিলাস বিভবের চেয়ে বিবেকের দ্বারে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা॥
হে ঋষি, তোমার আর্ষ প্রকৃতি মাতৃ যজ্ঞে হয়েছে লিপ্ত।
মৃত্যু বিজয়ী তোমার আত্মা মৃত্যুঞ্জয় কীর্ত্তি দীপ্ত॥
স্বার্থ তোমার শত মুখী হয়ে দেশাত্ম বোধে হয়েছে লীন।
হে দেশবন্ধো চিত্তরঞ্জন তোমা হারা' আজ বাঙ্গালী দীন॥
স্বাস্থ্য স্বার্থ আপনার সব দেশের সেবায় করেছ মগ্ন।
মুক্তি সিদ্ধি জননী বঙ্গ এ ধ্যান জীবনে হয়নি ভগ্ন॥

(৪)

অনাচারের জলৎ অগ্নি আত্মবোধের শান্তি বৃষ্টি।
তুমিই বরষি দেশের জন্যে হরেছ দৃপ্ত দ্বৈত সৃষ্টি॥
সত্যগ্রহের শ্রেষ্ঠ গ্রাহক সত্যসন্ধ হে মহাপ্রাণ।
বঙ্গবাসীর হৃৎ ত্রিতন্ত্রে তুমিই তুলেছ এ মহাগান॥
বঙ্গশাসক স্তব্ধ ক্ষুব্ধ দেখেছে তোমার অসীম বীর্য্য।
সত্যের মহামহিমা পুরিত ত্যাগ-উজ্জ্বল তোমার শৌর্য্য॥
বন্ধন তোমা পারেনি বাঁধিতে হে বীর তুমি মুক্ত প্রাণ।
সত্য তোমার অস্থি মজ্জা সত্য পুরীতে লভেছ স্থান॥

(৫)

কোন সুদূরের "সাগর সঙ্গীত" আজিকে তোমায় দিয়েছে মুক্তি।
দর্শন জ্ঞান বিজ্ঞান মূক বাক্য অতীতে সে যে সুষুপ্তি।
এ পারের কাজ আজি সব শেষ জীবাত্মা আজ বন্ধহীন।
ভূমায় আজিগো এ মহামিলন শোক নয় আজ কি মহাদিন॥
তোমার মুক্ত প্রাণের সাড়া দীর্ণ দেশের অন্ধ্রে রন্ধ্রে।
ঝঙ্কৃত রবে যুগযুগান্তে অব্যক্ত এক মধুর মন্ত্রে।
তোমার প্রেরণা-অম্বর হ'তে করিবে বঙ্গে আশীষ বৃষ্টি।
বঙ্গ ভূমির শত শত প্রাণে "দেশবন্ধু দাস" হইবে সৃষ্টি॥
আঁধার আঁধার যদিও বঙ্গ আসিছে চিত্ত আলোক রেখা
নব প্রকৃতির মাঝে গো আবার চিত্তরঞ্জন মিলিবে দেখা॥

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শাঁখা।

(ক্ষুদ্র গল্প)

রাত্রি ৭ টা কি ৮ টা হইবে; ছোট্ট গলির মুখেই বাড়ীখানা। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় তাহা টলমল করিতেছিল বটে কিন্তু ইহার মধ্যে লোক মাসের সাড়া শব্দ যেন পাওয়া যাইতেছিল না; অথচ বাড়ীর প্রবেশ-দ্বার তখনও মুক্ত ছিল এবং দোতালার একটী জানালার ফাঁক দিয়া সামান্য একটু আলো ঠিকৃড়িয়া বাহির হইতেছিল।

ঘরের মেঝে একটী ২১।২২ বৎসরের যুবতী বসিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টি ভূমিতলে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আবেগ রাশি ছড়াইয়া দিয়া যেন মনকে আশ্বস্ত করিতেছিলেন। তাঁহার নিকটই একটী শিশু বসিয়া একটা বাটিতে করিয়া মুড়ি মুড়কী খাইতেছিল। এবং মাঝে মাঝে শিশু সুলভ কোমলকণ্ঠে গুণ গুণ করিয়া কি বলিতেছিল।

হঠাৎ শিশু—মা মা বলিয়া ডাকিয়া যাইয়া যুবতীকে জড়াইয়া ধরিল। যুবতী প্রথমে যেন কিছুই শুনিতে পান নাই। তারপর ছেলের পুনঃ পুনঃ আব্দারে উন্মনস্ক ভাব ত্যাগ করিয়া সাদরে তাহাকে কোল দিয়া বলিলেন—"কি

বাবা, কি ?" শিশু মায়ের কোলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"মুলি খাবে মা ?"

মা বলিলেন "না বাবা, তুমি খাও।"

মা ছেলের কপোলে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

মায়ের কোল ছাড়িয়া শিশু পুনরায় মুড়ি মুড়কীর বাটী লইয়া বসিল। ছেলের দিকে চাহিয়া মায়ের চোক ছল ছল করিয়া উঠিল; তিনি কি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময় সিড়ি পথে চটি জুতার চটুপট্ শব্দ শোনা গেল। যুবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলোটা আর একটু উস্কাইয়া দিয়া এক দিকে দাঁড়াইলেন। একটী ৩০। ৩২ বৎসরের যুবক আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

যুবককে দেখিয়া শিশু—বাবা—বাবা বলিয়া যাইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া দাঁড়াইল। শিশুর আব্দারের দিকে যুবকের লক্ষ্য নাই। শিশু অর্দ্ধ উচ্চারিত কণ্ঠে পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—"বাবা মুলি খাবে"···

পিতা বিরক্তির সহিত শিশুর হস্ত হইতে নিজ হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন। শিশু মুখ কাল করিয়া মায়ের নিকট চলিয়া গেল। মা ছেলের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া নীরবে রহিল।

স্বামী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ওগো শুনছ কি—কি বলছি!"

যুবতী স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইলেন—"কি বলছ ?"

স্বামী বলিলেন—"তোমার হাতের চুড়ী কগাছা দাও দেখি—এ না দিলে হচ্ছে না—দাও শীগির···"

রমণী একবার জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; নিঃশব্দে চুড়ী কগাছা খুলিয়া স্বামীর হাতে দিলেন।

চুড়ী কগাছা লইয়া ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়াই যুবক চলিয়া গেলেন। যুবতী জানালার পাশে আসিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা যায়—চাহিয়া রহিলেন। তারপর সেই স্থানেই বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন—সমস্তই তো গিয়াছে—অবশিষ্ট ছিল এই দু গাছা চুড়ী—তাহাও আজ গেল···

রমণী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া যুক্ত করে বলিলেন—"একে একে তো আমার সমস্তই লইলে প্রভো—শাঁখা দু গাছা যেন শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে।"

রমণী হাত দুখানি কপালে ঠেকাইলেন।

শ্রীকমলা দেবী।

"দেশবন্ধু।"

চেয়েছে যে যাহা তাই দিয়েছ তাহারে;
কর নাই কভু তুমি বিমুখ কাহারে।
মরণ সুযোগ হেরি ভৃত্য সম এসে—
মাগিল যুগল করে তোমারেই শেষে।
মানুষেরে দেখাইলে মানুষ প্রধান;
সর্ব্বভাবে আপনারে করিয়া প্রদান।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নব্য হিন্দু।

১

আমরা নব্য হিন্দু জাতি, নব্য হিন্দু মুসলমান;
বাদ যাবে না ব্রাহ্মেরাও, বাদ পড়েনি ক্রিশ্চিয়ান!
সর্ব্বগ্রাসী হিন্দু মোরা, আমরা যে সেই হিন্দু জাতি!
প্রাণের টানে চল্‌ছি এখন, মান্‌ছি না কো পুঁথির পাতি!
বর্ণ জাতি নির্ব্বিচারে আমরা সবার সেবাকারী;
লোকাচারকে নিষ্পেষিয়া সপ্ত সাগর দিচ্ছি পাড়ি
মোদের জাতি যায় না তা'তে, সবকে মোরা আপন জানি;
যারা যতই রইবে দূরে, আমরা তাদের আন্‌বো টানি'!
সবকে বুকে আঁকড়ে ধরি, সবার দুখে হৃদয় ফাটে!
দুঃখে সুখে মান্‌ছি শুধুই রাজার রাজা বিশ্বরাটে!

২

ধনী মানী কাঙাল ফকির মোদের কাছে সব সমান!
দেখতে মোরা চাই না মোটেই কার কতটা জবর মান!
হৃদয় দিয়ে হৃদয় বুঝি, প্রাণের খাঁটি চাই পরিচয়!
প্রাণের এখন চল্‌ছে পূজা, ফাঁকা কথার ফাঁকি নয়!

বেদ বাইবেল কোরাণ সবি নির্ব্বিরোধে পড়তে পারি!
সবার এখন সমান আদর, নাইকো তফাৎ পুরুষ নারী!
পৈতেধারীর যেমন কদর, চাঁড়াল শুঁড়ির তেম্নী ধারা;
উদার রাজা ভেঙে দেছেন অন্ধকূপের অন্ধকারা!
প্রাচীন যুগের ঋষির কথা তাঁরা যেচে শেখান্ আজ!
বামুন আছেন গণ্ডী বেঁধে জগৎ ছেড়ে জগৎ মাঝ!

৩

রাজার হুকুম তামিল করতে, বাহাল রাখ্‌তে জাতির মান,—
নব্য হিন্দু যুদ্ধে গেছে—এই তো খাঁটি হিন্দু প্রাণ!
অহঙ্কতের শিক্ষা দিয়ে, দেশে ওদের ফির্‌বার আগে,
নব্য পুরুষ নারীর প্রাণ নাচ্‌লো গভীর অনুরাগে!
তাঁদের হৃদয়-হিন্দোলাতে নব্য 'স্মৃতি' উঠ্‌লো গড়ে'!
তাহার শাসন মান্‌বে মানুষ, সবাই নেব আদর করে!
হাওয়ায় সে দিন উড়ে যাবে হৃদয় বিহীন লোকাচার!
নতুন বামুন ক্ষত্রিয় দাস উঠ্‌ছে জেগে চমৎকার!
ট্রাম্-টেলিফোঁ-বিজ্‌লি বাতি বাষ্পীয়পোত যানের যুগে,
চলার বেগে চল্‌বে মানুষ, না চলে তো মরবে ভুগে!

৪

বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলে খোসা নিয়েই বামুন মরে!
কে কোথা কাল কি খেয়েছে কোমর বেঁধে বিচার করে!
তর্করত্ন দান নিয়েছেন বিলাত-ফের্ত্তা দাশের বাড়ী,
অমনি তাঁদের লেগে গেল ঝগ্‌ড়া ঝাঁটি মারামারি!
শুচিবেয়ে রোগীর মতো নিজকে সামাল কর্‌তে গিয়ে!
সকল জাতির ঘৃণ্য হয়ে আছেন পোড়া কপাল নিয়ে!
বিকিয়ে দিয়ে প্রাচীন খ্যাতি রেখেছেন এক নির্ম্মমতা!
জাৎ প্রকৃতিতে ভুলে গেছেন, জাৎ নাশিতে বর্ব্বরতা!
এঁরা কি সেই উদার প্রাচীন মুনি ঋষির বংশধর?
কে কোথা ভাই বামুন আছিস্ এঁদেরে আজ মানুষ কর!!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

শোক সংবাদ।

হেমনগরের স্বধর্ম্মনিরত জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ২৪শে আষাঢ় বুধবার রাত্রিতে ৬৪ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-পরায়ণ চরিত্রবান ও সৎকর্ম্মশীল জমিদার বিরল। তাঁহার মৃত্যুতে ময়মনসিংহের একজন আদর্শ চরিত্রের লোকের অভাব হইল। আমরা সময়ে তাঁহার পুণ্যময় জীবনের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক। ভগবান এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

একতা।

এ টী শিবা বনের মাঝে
ডাক্‌লে হুকা হোয়া!
শত শত শৃগাল জুটে
যায়না লাঙ্গুল ছোঁয়া?
বনে বনে মিলন ধ্বনি
বন-তরঙ্গ ময়।
একতার বিজয়-বিষাণ
বাজ্‌ল মনে হয়!
তোম্‌রা মানুষ! কই তোমাদের
প্রাণের বাঁধন আছে?
একের যদি বিপদ ঘটে
যাও না অন্যে কাছে!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সাহিত্য সংবাদ।

২০শে ও ২১শে আষাঢ় মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্য হেতু সম্মিলন দুই দিন হইয়াছিল।

২২শে আষাঢ় গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

ইতি মধ্যে ধলা সাহিত্য সম্মিলনেরও এক অধিবেশন হইয়াছিল। সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Shourabh—Reg. No. 745.

ত্রয়োদশ বর্ষ। শ্রাবণ—১৩৩২ সপ্তম সংখ্যা।

সৌরভ

সম্পাদক
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

হাতী খেদা—পরতালাভরা।

সৌরভ

ত্রয়োদশ বর্ষ। { ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩৩২ } সপ্তম সংখ্যা।

ধূম-বিজ্ঞান।

"কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি সমুৎগারিণী" "সর্ব্বসন্তাপ হারিণী" আল্‌বোলা টানিতে টানিতে মনে হইল—আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া এখন মনে মনে কোন শান্তি পাইতেছি না—উপায় দেখিতেছি না—লক্ষ্মীছাড়া জীবনে আমার কোন ভবিষ্যৎ আশা ভরসা পাইতেছি না—কিন্তু আমার চোখের সম্মুখে আমারই নিষ্কাশিত ধূম কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া "কুণ্ডল" পাকাইয়া ক্রমশঃ শূন্যে মিশাইয়া যাইতেছে। তাহার জীবনের অনন্দ উল্লাস আমি কি কিছুই পাইতে পারি না? অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিয়া খেয়াল চাপিল "ধূম" নিশ্চয় এই জড় জগতের একটী জিনিষ, প্রাণী জগতের কেহ নয়; এবং জড় জগতের অন্যান্য জিনিষের ন্যায় তাহারও কতকগুলি নিয়ম প্রণালী আইন কানুন আছে। রেলে চড়িয়া যাইতে যাইতে টেলিগ্রাফ পোষ্টের উপরে এঞ্জিন হইতে ওঠা ধূমগুলি কেমন ঘুরিতে ফিরিতে থাকে তাহা অনেকদিন অনিমেষ লোচনে দেখতে দেখতে গিয়াছি। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে অন্য মনস্ক ভাবে সিগারেট টানিতে হঠাৎ লক্ষ্য করিয়াছি—গল্পের স্রোত যেমন শতধা হইয়া যায় সিগারেটের ধূমও তেমনই শতধা শত ধারায় আমাদের আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া শূন্যে মিশাইয়া যাইতেছে। দু' একটী সংবাদ পত্রেও মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি—"ইজি চেয়ারে" শুইয়া সিগার অথবা সিগারেট খাইতে খাইতে উদ্‌গারিত ধূমের মধ্যে নিজের "মানস সুন্দরীর" প্রতিমার আকৃতি অনেকে দেখিতে পান অথবা কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার দূরে ধূম দেখিয়া অনেকে ঘর বাড়ী ভস্মসাৎ হইতেছে কল্পনা করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হন। অনেকে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই দুই কথার অর্থ লইয়া অনেক অদৃশ্য ধূম আকাশে বিতরণ করেন এবং ন্যায় তর্কের "ধূমের" আবছায়াতে নিজদের মস্তিষ্ক "ধূমায়মান" করিয়া তোলেন। আলবোলা টানিতে টানিতে ভাবিতেছি সামান্য একটুখানি ক্ষুদ্র "কলিকার" মধ্যে এত ধূম কি করিয়া আবদ্ধ ছিল, এযেন আরব্যোপন্যাসের "হাঁড়ী" বদ্ধ দৈত্য "আমি-হেন" ধীবরের সম্মুখে ক্রমশঃ স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। ক্ষুদ্র পাত্রে আবদ্ধ ধূম নিজের স্বরূপ দেখাইয়া শূন্যে মিশাইয়া যাইতেছে; পরক্ষণে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। আমার এক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মনকে কেহ কি এরূপ ভাবে টানিয়া বাহির করিয়া বিব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া মিশাইয়া দিতে পারে না?

সাধারণতঃ ধূম বলিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহা স্থান কাল পাত্র ভেদে অনেক প্রকার। দৃশ্যমান্ ধূম ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। কতকগুলি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দৃশ্যমান্ থাকে, আবার কতকগুলি অল্পক্ষণ মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—রেলগাড়ী-ষ্টীমার-"চিম্‌নী"-উৎগারিত ধূম এবং শরৎ কালের সন্ধ্যা-শিশির-সিক্ত "সাঁজাল" দেওয়া ধূম—এগুলি প্রথম প্রকারের, আর তামাকের, সিগারেটের এবং জলীয় বাষ্প প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকারের। আয়তন হিসাবে দ্বিতীয় প্রকারের ধূম প্রথম প্রকারের হইতে পারে এবং এমন কতকগুলি ধূম (gas) আছে, যেমন বাতাস—রাসায়নিক বাষ্প—যাহা সাধারণতঃ চোখে ধরা পড়েনা, এগুলিও আবার উপযুক্ত চাপ ও শীততার গুণে দৃশ্য করিয়া নেওয়া যায়—যেমন liquid

carbonic Acid, liquid Air প্রভৃতি। ধূমকে ইংরাজীতে smoke বলে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও অর্থ বুঝিতে গেলে সাধারণতঃ যাহাকে Gas, vapour প্রভৃতি বলা হয়, ইহা তাহারই একটা আকৃতি ও প্রকার মাত্র। কাজেই ধূমের কথা আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ জিনিষ Gas এর কথা ভাবিতে হয়—তাহা দৃশ্যমানই হউক আর অদৃশ্যই থাকুক। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই সাধারণ বস্তুর (Gas) যে সব দ্রব্য-গুণ আছে ও থাকিতে পারে দৃশ্যমান্ ধূমের মধ্যে অল্প বিস্তর সেগুলি আছেই। চোকে যাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় অদৃশ্যমান্ ধূমের মধ্যে সেগুলি আরোপ করা অন্যায় হবে না এবং মনে মনে কল্পনা করিলে তাহা বাস্তব হইতে বেশী তফাৎও হবে না আশা করা যায়; কারণ এরূপ Analogy আমরা অনেক সময়ে করিয়াই থাকি এবং বাস্তব জগতে এই Analogy ও উপমার ফলাফল খুব কমই প্রত্যবায় হয়। প্রকৃতির নানা রকম লীলা খেলার মধ্যে আমরা কতকগুলি সাধারণ নিয়ম কানুন ধরিয়া লই; আমরা বলিতে পারি না কেন তাহা অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তবে একই কারণ গুণে একই ঘটনা হইয়া থাকে এবং প্রকৃতির এই একটা অক্ষুণ্ণ ও অবিসংবাদী নিয়মের বলে আমরা Analogy অথবা উপমা দ্বারা অনেক জিনিষ বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি। ধূম সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ দ্রব্য-জ্ঞান নিম্নে লিখিলাম।

(১) সঙ্কুচন (condensation)—অল্প পরিসরের মধ্যে বেশী গ্যাস্ সীমাবদ্ধ থাকার ক্ষমতা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—সোডাওয়াটারের বোতল, ফুট বলের ব্লাডার, বাইসিকেলের টাইয়ার প্রভৃতিতে বেশী পরিমাণের গ্যাস অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। একটী ছোট ঘরে বেশী লোক আবদ্ধ করিলে সে ঘরটী অল্পক্ষণ মধ্যেই অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে, সেটা অবশ্য প্রত্যেকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও দেহের উত্তাপ হইতে হয়, ছোট ঘর না ধরিয়া যদি খোলা মাঠ ধরি, তখনও এরূপ একটা গরম অনুভব হয় এবং দুই এক সময় মাথার গরম ও দুই একজনের হইয়া থাকে; যেমন ষ্টেশনে প্যাসেঞ্জারদের গাড়ী আরোহণ করার সময় বচসা এবং পরে প্রবেশ করিয়া বসিবার, দাঁড়াইবার অথবা শুইবার স্থান লইয়া যে ঝগড়া হয় দেখা যায় তাহাও এরূপ একটা উত্তাপের ফল। গ্যাস্কে হঠাৎ সঙ্কুচিত করিতে গেলেও এমনই একটা উত্তাপ তাদের মধ্যে দেখা যায়; যেমন পাম্প করার সময় ইনফ্লেটারটা গরম হইয়া ওঠে এবং সোডাওয়াটার করার সময় গ্যাসের টিউব গরম হয়। গ্যাসের বিন্দু ও অনুগুলির মধ্যে এরূপ একটা শারীরিক উত্তাপ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় কিনা তাহা কে জানে?

(২) সম্প্রসারণ—"Expansion," "Diffusion". বাইওস্কোপ, থিয়েটার প্রভৃতি ভাঙ্গার পর দর্শক মণ্ডলী ঘরের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া যেমন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন সীমাবদ্ধ স্থানে গ্যাস নির্গত হইয়া তেমনই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ফুটবলের ব্লাডারের মুখ খুলিয়া দিলে বা সোডাওয়াটারের বোতল খুলিলে যেরূপ ক্রিয়া কলাপ হয় তাহা স্বচক্ষে সকলেই দেখিয়াছেন। এক গ্লাশ জলের মধ্যে (কাচের গ্লাশে) এক ফোটা লাল কালি অথবা ভাইওলেট কালি ফেলিয়া দেখিবেন, কেমন সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। কালির ফোটা ধীরে ধীরে নিচে নামিতে থাকে এবং কালির বিন্দুগুলি ক্রমশঃ ছড়িয়া পড়ে; শেষে দেখা যাবে—সমস্ত গ্লাশের জল সেই কালির রং ধারণ করিয়াছে। এটা কিছু সময় সাপেক্ষ; কিন্তু এই ধীর সম্প্রসারণ ক্রিয়া ধূম ও গ্যাসের মধ্যেও হইতে থাকে। রেলের এঞ্জিন ও চিমনী হইতে উদ্গারিত ধূমের মধ্যে এটা দেখা যায়।

(৩) আকার প্রকরণ (adaptability to shape)—গ্যাসের নিজের কোন সীমাবদ্ধ আকৃতি নাই; যে পাত্রে তাহা যখন থাকে সেই পাত্রের আকারই ধারণ করে। তরল পদার্থের সঙ্গে তাহার এবিষয়ে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই যে তরল পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ গুণে উপরিভাগকে সমান্তরাল (Horizental) রাখে কিন্তু গ্যাস্ যেন অনেক সময় মাধ্যাকর্ষণ মানে না এবং তাহার উপরি ভাগ সমান্তরাল না থাকিলেও থাকিতে পারে। তরল পদার্থের ন্যায় গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) আছে এবং তাহা এক পাত্র হইতে অন্যপাত্রে "ঢালা" যায়, "ছড়িয়ে" ফেলা যায় ইত্যাদি।

(৪) Viscocity স্তর সংঘর্ষ। একটী পাত্র হইতে অপর পাত্রে জল যেমন সহজে গড়াইয়া যায়—ঘৃত, মধু, তৈল, গুড় প্রভৃতি তেমন সহজে যাইতে পারে না ও যায় না। এই গুলির প্রত্যেকের "গড়াইয়া" যাওয়ার গতি বিভিন্ন প্রকারের অর্থাৎ একটী স্তর অন্য স্তরের উপর প্রবাহমান হইয়া যাওয়ার সংঘর্ষ বিভিন্ন প্রকারের। বাতাস, ধূম, ও গ্যাসের মধ্যেও এরূপ viscocity র তারতম্য আছে। উপরে এবং নীচের বাতাসের মধ্যে viscocity র কি প্রভেদ তাহা পাখীরা অনুভব করে এবং যাঁহারা আকাশ ভ্রমণ করিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারা জানেন। বাতাসের যে গতিতে গোলাগুলি যাইয়া থাকে জলের মধ্যে তার গতি অনেক কম হইয়া যায়। এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। বলা বাহুল্য viscocity, density ও আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) প্রভৃতির মধ্যে পরস্পরের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে।

(৫) বাহির হইতে চাপ দ্বারা (Pressure) গ্যাস্‌কে আয়তনে ছোট করা যায়। (condensation) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—চাপ যত বেশী হইবে সেই অনুপাতে আয়তনও কম হইবে। অর্থাৎ চাপ দ্বিগুণ হইলে আয়তন অর্দ্ধেক হইবে; তিনগুণ হইলে আয়তনও ৩ ভাগের এক ভাগ হইবে ইত্যাদি। (Boyle's law) আবার বাস্তবিক দেখা যায় যে চাপ যত বেশীই করা যাউক না কেন এমন একটা সীমাতে আনিয়া পৌছায় যাহার পর আর সঙ্কুচন করা মানুষের সাধ্য হয় না এবং উপরে যে অনুপাতের কথা বলিয়াছি সে অনুপাত শেষে আর খাটে না। সাধারণ কাজ কর্ম্মের জন্য এই অনুপাত কে "অকাট্য" ধরিলেও চলিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি চাপের জন্য গ্যাসের শরীরে উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে।

(৬) উত্তাপ সংযোগে জিনিষ আয়তনে বাড়ে। উত্তাপ কমিলে আয়তনে ছোট হয়। গ্যাস সম্বন্ধে সে নিয়ম সমান খাটে। চাপ ও উত্তাপ সংযোগে গ্যাসকে তরল পদার্থ করা যাইতে পারে। বাতাসকে যে তরল পদার্থ করা হইয়াছে—একথা অনেকেই শুনিয়াছেন।

(৭) তরল পদার্থ সম্বন্ধে একটী নিয়ম দেখা যায় (Pascal's law) যে কোন সীমাবদ্ধ স্থানে রাখিয়া একস্থানে চাপ প্রয়োগ করিলে সে পাত্রের চতুর্দ্দিকে সমান ভাবে সে চাপ পরিব্যাপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে তরল পদার্থকে চাপ দ্বারা সঙ্কুচিত অবস্থা করা যায় না। গ্যাস সম্বন্ধে এই Pascal's law সমান প্রযুজ্য না হইলেও তাহাতে যে চাপ পরিব্যাপ্ত হওয়ার একটা শক্তি আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং চাপের গুণে আয়তন যেমন ছোট হয় তেমনই পাত্রের চতুর্দ্দিকেও চাপ সমান হয়; নচেৎ পাত্রটী হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইবে। চাপ বিকীরণ করার ক্ষমতা—যাহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Inertia বলে, যেমন গ্যাসের শরীরে আছে তরঙ্গ ব্যাপক ক্ষমতাও তেমন আছে। তরল পদার্থে যেমন তরঙ্গ প্রত্যক্ষ হয় গ্যাসের মধ্যে সেরূপ তরঙ্গ খেলা হইতে থাকে, তবে শারীরিক নানা দ্রব্যগুণের জন্য তরঙ্গ অন্য প্রকারের হইতে পারে।

উপরে যে সব দ্রব্যগুণের কথা বলিলাম তাহা ধূম ও গ্যাস সম্বন্ধে সমান প্রযুজ্য। এখন প্রভেদের কথা দু চারিটী দেখাইতেছি। আমরা গ্যাস বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সাধারণতঃ স্বচ্ছ বাষ্পীয় পদার্থ বিশেষ; অস্বচ্ছ গ্যাস যে দু চারিটী আছে যেমন Bromine, chlorine প্রভৃতি তাহা অত্যধিক না হইলে অনেকটা রং করা জলের মত স্বচ্ছ দেখা যায় অর্থাৎ তাহার ভিতর দিয়া অন্য দিকের জিনিষ দেখা যায়। কিন্তু ধূম বলিতে আমরা যাহা দেখি বা বুঝি তাহা প্রায়ই অস্বচ্ছ এবং চোখে সহজেই ধরা পড়ে। কোন এক বাড়ীতে আগুন লাগিলে অধিক পরিমাণে ধূম বাহির হইতে থাকে কিন্তু ইহা অনেক সময় দেখা যায় যে আগুন নিভিয়া যাওয়ার পর আশে পাশে এবং গ্রামের প্রায় বাড়ীতেই ঘরে দ্বারে উঠানে পাতলা ছাই এর একটা ক্ষীণ আবরণ জমিয়া থাকে। রান্নাঘরের ধূম যে আশে পাশের ঘর ও বাড়ীকে কাল করে দেয় তাহা অনেকেই জানেন। এঞ্জিনের ধূম হইতে খুব উৎকৃষ্ট Lamp black চিম্‌নিতে পাওয়া যায়। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই মনে হইবে ধূম যদিও গ্যাসের মত দেখিতে শুনিতে ত তবু তাহা যেন জলে "গুলে" রাখা ধূলা বালির মত। ঘোলা জল যেমন কিছুক্ষণ স্থির রাখিলে তাহার ময়লা সব নীচে জমিতে থাকে ধূম ও তেমনই

ধূলি কণার ন্যায় নীচে পড়িয়া যায়। যদি অনুমান করা যায় যে ধূম এরূপ ধূলিকণার সমষ্টি তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। কুয়াশার সময় দেখা যায় যে ধূমাকৃতি জিনিষ কেমন ভাবে কণা সমষ্টি হইয়া আকাশে ভাসিয়া ভাসিয়া নীচে পড়ে। ঘরের জানালা দিয়া যে রৌদ্র আসে তাহাতে তামাকের ধূম এবং ধূলি-কণা কেমন নৃত্য করিতে থাকে তাহাও দেখিবার জিনিষ। এই দ্রব্যগুণের সাপক্ষে আর একটী কথা বলিবার আছে। ধূম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা বিশেষ জিনিষের সমষ্টি বলিয়া বিদ্যুৎ সংযোগে তাহার ধূলিকণা অদৃশ্য করিয়া ফেলা যায়। এই জন্য—যখন ধূম আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় তখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না—তাহা যে কোন বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য, তাহা নহে। শরতের সন্ধ্যা-সাঁজালের শিশির সিক্ত ধূম গাছপালার আশে পাশে ঝুলিয়া আছে দেখা যায়। সাধারণতঃ গ্যাস বলিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহা যে এইরূপ ধূলিকণার সমষ্টি নয়, তাহা নহে। তবে ধূমের শরীরে যেরূপ কণা আছে তাহা গ্যাসের শরীরে নাই, ইহা সহজেই অনুমান হইবে।

তরল পদার্থের আর একটী দ্রব্যগুণ আছে, অনেকেই তাহা জানেন। অনেক তরল পদার্থ নিজের শরীরে অন্য কোন জিনিষ দ্রবীভূত অবস্থায় রাখিতে পারে; যেমন মিছরীর সরবৎ, লবণের জল ইত্যাদি। বাতাস অথবা গ্যাসও তেমনই নিজের শরীরে অন্য গ্যাস অথবা পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় রাখিতে পারে। প্রখর রৌদ্র তাপে বালতীর জল বাষ্পাকারে বাতাসে মিশিয়া থাকে। দূর হইতে কর্পূর অথবা ন্যাপথ্যালিনের গন্ধ বাতাসে পাওয়া যায়। দুই তিন প্রকার ধূম সেরূপ একত্রে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিতে পারে। এগুলি এত সাধারণ প্রত্যক্ষ ঘটনা যে কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় না এবং উল্লেখ করাও অনেকে নিরর্থক মনে করিবেন। তবে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা ও 'ভাসিয়া' 'ভাসিয়া একত্রে থাকার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা দেখাইবার জন্য একথার অবতারণা করিলাম। মিছরীর সরবৎকে দুদিন অথবা অধিক কাল গ্লাসে রাখিলে তাহা শরবৎই থাকিবে কিন্তু চূন গোলা জল অথবা চক্-খড়ি গোলা জল দুদিন স্থির রাখিলে চূন অথবা চকখড়ির গুড়া নীচে পড়িবে এবং জল উপরিভাগে পরিষ্কার থাকিবে। গ্যাস ও বাতাসের মধ্যেও এইরূপ দেখা যায়। বাষ্প সমেত বাতাস চাপ ও উত্তাপ সমান থাকিলে সমঅবস্থাতেই থাকিবে কিন্তু মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে দেখা যায়।

বরফকে গরম করিলে তাহা জল হয়, আবার জলকে গরম করিলে তাহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। তেমনই আবার বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে জল হয়; জলকে ঠাণ্ডা করিলে বরফ হয়। এই বিষয়টী যে গ্যাস ও ধূম সম্বন্ধে সমান প্রযুজ্য—তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। বরফ ও বাষ্পের দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই অনুমান হইবে যে প্রত্যেক পদার্থের অনু পরমানু গুলির মধ্যে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে; একটী পরস্পরের আকর্ষণ ও আর একটী উত্তাপ বৈগুণ্যে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হওয়ার ক্ষমতা। যেখানে আকর্ষণ বেশী ও ছড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কম সেখানে পদার্থটী কঠিন 'জড়' ও শক্ত (Solid) থাকে; যেমন বরফ ইঁট, কাঠ প্রভৃতি। যেখানে এই দুইটি সমান সেখানে অনু পরমাণুর অবাধগতি; যেমন জল, তেল প্রভৃতি তরল পদার্থ। যেখানে আকর্ষণ হইতে উত্তাপ-বিচ্ছেদ বেশী সেখানে অনু পরমাণু চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে থাকিবে এবং তাহা গ্যাস অবস্থায় থাকিবে যেমন বাষ্প, বাতাস প্রভৃতি। কাঠ অথবা কয়লাকে আগুন দিলে যে ধূম নির্গত হয় তাহা এই কারণে। উত্তাপ সংযোগে রাসায়ণিক প্রক্রিয়া হইতে থাকে বটে কিন্তু উত্তাপ-বিচ্ছেদ শক্তিগুণে সব জিনিষ ও পদার্থ শরীরে রাখিতে পারে না। তাহাই উদ্‌গারীত হয়। আলবোলার নল টানিতে টানিতে যে ধূম উদ্‌গীরণ করা হয় তাহাও এই প্রকারের। ক্ষুদ্র একটি কলিকায় অথবা সিগারেটের মধ্যে এত ধূম কি ভাবে আবদ্ধ থাকে আশা করি তাহা আর বিশদ ভাবে বলিতে হইবে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ধূমের কয়েকটী দ্রব্যগুণ আছে যাহাকে "সঙ্কুচন" ও "সম্প্রসারণ" নাম দিয়াছি। মনে করুণ একটী পাত্রে কিছু ধূম সঙ্কুচিত অবস্থায় রহিয়াছে এখন যদি সে পাত্রটীকে নষ্ট করিয়া দেই অথবা সেই অবস্থাতে পাত্রটীর অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেই তবে সে

সঙ্কুচিত গ্যাসের অবস্থা কি হইবে? চতুর্দ্দিকে সমান ভাবে তাহার বিন্দুগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে; আয়তনে বর্দ্ধিত হইবে; চাপ কমিয়া যাইবে; ইত্যাদি। আকাশে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ কেমন ভাবে মুহূর্ত্তে তাহার অবয়ব বদ্‌লাইয়া ফেলে তাহা একটী লক্ষ্য করিবার জিনিষ। অবশ্য মেঘটী অবস্থানুসারে বাড়িতে থাকে, তাহা সব সময় গ্যাসের দৃষ্টান্তে প্রযুজ্য নয়। এখন মনে করুণ—গ্যাস সমেত পাত্রটী নষ্ট না করিয়া তাহার এক দিক খুলিয়া দিলাম, আর তিন দিক বন্ধ থাকিল। পাত্রের ভিতরে গ্যাসের চাপ বাহিরের বাতাসের চাপ অপেক্ষা অধিক এবং মুখটী বন্ধ ছিল, হঠাৎ খুলিয়া দিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিতে পারেন—ফুটবলের ব্ল্যাডারের মুখ, টাইয়ারের পাম্প করা স্থান, ইত্যাদি। এই সব দৃষ্টান্তের সহিত বড় টাব অথবা ট্যাঙ্ক হইতে পাইপ দ্বারা জল পড়ার দৃষ্টান্তের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। পাইপের কথা ছাড়িয়া দিয়া সচ্ছিদ্র টাব অথবা ট্যাঙ্ক হইতে জল ধারা ধরিলে অনেকটা মিলিবে। আবার জলটা বাতাসে না পড়িয়া অন্য একটী জলাধারের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এরূপ ধরিয়া লওয়াও যাইতে পারে। মনে করুণ—চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত এক স্থানে খুব জনতা হইয়াছে, কোন বক্তৃতা হইয়াছে, অথবা থিয়েটার বায়োস্কোপ "যাত্রা" হইতেছে সেই বেষ্টিত স্থানটীর একদিকে দরজা আছে, তাহা দিয়া সকলে প্রবেশ করিয়াছিল। কোন কারণে সেই স্থানে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা হইলো—মারামারি, ভূমিকম্প অগ্নিকাণ্ড—এইরূপ যেকোন একটা। তখন সেই জনতার মধ্যে সকলেরই ঝোঁক হইবে দরজার দিকে যাইতে। সেই দরজার কাছে অত্যন্ত ভিড় ঠেলাঠেলি মারামারি পর্য্যন্ত হইবে। দরজার সংলগ্ন ছোট গলিতে অত্যন্ত ভিড় হইবে এবং গলি হইতে বাহির হইয়া সকলেই হাঁফ ছাড়িবে। কেহ হয়ত সোজা রাস্তায় উঠিয়া চলিয়া যাইবে, কেহ বা পাশ কাটিয়া অপেক্ষা করিবে, কেহ বা অন্যের জন্য দূরে দাঁড়াইবে, ইত্যাদি হইতে থাকিবে। এখন মনে করুণ—সেই জনতার মধ্যে একজন লোক—যেরূপ গ্যাসের একটী বিন্দু যাহাকে "ভিড়" এবং হাঁপ ছাড়ার কথা বলিয়াছি—তাহা চাপ অথবা Pressureএর অন্যনাম এবং এই জনতার মধ্যে যেমন চাঞ্চল্য, ইতস্ততঃগতি প্রভৃতি হয় টাবের ছিদ্র হইতে উদ্‌গারিত জল অথবা বদ্ধ গ্যাসের গতিও ঠিক ইহার অনুরূপই হইয়া থাকে। অঙ্ক শাস্ত্রের পরিভাষা সম্বলিত প্রমাণের মধ্যে যাইতে চাহি না। ব্যাপারটা কি হয়, অথবা হইতে পারে—তাহারই আভাস দিয়াছি। বলা বাহুল্য জনতার মধ্যে প্রত্যেকেরই একটা ইচ্ছা ও অবাধগতি-প্রবণতা আছে। গ্যাসের বিন্দুর মধ্যে সে ইচ্ছা ও প্রবণতা ততটা নাই, যতটা মানুষের আছে। এখানে আর কয়েকটা ছোট দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়টী আর একটু অনুসন্ধান করিতেছি। মনে করুণ, একটী কুকুর উত্তর ধারে একটী গাছতলায় শুইয়া আছে, তাহার প্রভু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে একটী রাস্তা দিয়া যাইতেছেন; রাস্তাটী গাছ হইতে কিছু দূরে। কুকুর যে বেগে আসিতেছে তাহার প্রভু তাহা অপেক্ষা অনেক কম অথবা বেশী বেগে যাইতেছেন; অথবা ধরিলাম যে তাহাদের গতি সমানই। এখন সে কুকুরটী তাহার প্রভুর নিকট আসিতে মাটিতে কি পথে আসিবে? এই পথটীর নামকরণ করার প্রয়োজন নাই। অঙ্কশাস্ত্রের একটী "মজার" Curve এবং তাহা অনেক প্রকারের হইতে পারে। আর একটী দৃষ্টান্ত অঙ্কশাস্ত্রীয় জটিল তত্ত্ব সংযোক্ত হইলেও এখানে উল্লেখ যোগ্য মনে করি। সেলাই করার সুতার রিলে Reel এর এক প্রান্তে একটি ছোট ভারী বল বাঁধিয়া দিয়াছি এই বলটিকে যদি একধারে নিক্ষেপ করি তবে Reel হইতে সুতা ক্রমশঃ খুলিয়া আসিবে ও বলটি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবে। বল যে পথে বাতাসে বেড়াইবে তাহা যদি কাগজে অঙ্কিত করি তবে দেখা যাইবে তাহার আকৃতি অনেকটা ঘড়ির Hair spring এর মতন। আবার মনে করুন, একটি টাব জলে বোঝাই করিয়াছি কিন্তু তাহার তলদেশে একটি ছিদ্র আছে। জলের উপড়ে কিছু Cork এর গুঁড়া অথবা Lycopodium ছড়াইয়া দিয়াছি; ছিদ্র দিয়া যখন জল নির্গত হইতে থাকিবে তখন দেখা যাইবে—এই কর্কের গুঁড়া অথবা Lycopodium এর ধূলিকণা সেই ছিদ্রের আশে পাশে ঘুরিতে থাকিবে। ইহার গতিও একটা Spiral আকৃতির হইবে। কেন এরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে গেলে অঙ্কশাস্ত্রের জটিল তথ্যের আশ্রয় লইতে হইবে। সে তথ্য ব্যাখ্যা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আবদ্ধ—

গ্যাসের পাত্রটীর যদি এক স্থানে ছিদ্র করিয়া দেই তবে তাহার বিন্দুর গতি উপর্য্যুক্ত প্রকারের পথগুলি অঙ্কিত করিবে। আল্‌বোলা টানিতে মুখে যে ধূম উদ্‌গীরণ করি তাহার বিন্দুগুলি এরূপ spiral এর মত আঁকিয়া বঁকিয়া হইতে থাকে এবং টেলিগ্রাফ্‌ পোষ্টের ওপর এঞ্জিন নির্গত ধূম যে কুণ্ডলাকারে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে ও ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তাহাও অনেকটা এ প্রকারেরই। বিষয়টী আমি যত সহজ সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চাহিতেছি ততটা সহজ ও সাধারণ নয়। আমি তাহার স্বরূপের একটা সামান্য আভাস দিলাম মাত্র। বাতাসের গতি, ট্রেণের গতি, অল্‌বোলার টানা ধূম উদ্‌গীরণ করার সময় ঠোঁটের কম্পন ও বক্রগতি—এরূপ আরও অনেক জিনিষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে যাহার কল্পনা জিনিষটাকে ক্রমশঃ বেশী জটিল করিয়া তোলে। সিগারেট টানিয়া ধূম জোরে নির্গত করিয়া দিবার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন কত রকম জটিলতা আসিয়া পড়ে ও দেখা দেয়। নির্গত ধূম কেন ও কি ভাবে কুণ্ডলাকার হইয়া যায় তাহা উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে এবং ষ্টীমারের steam pressure বেশী হইলে অথবা Engine এ যখন whistle দেয় তখন জলের বাষ্প কি আকার ধারণ করে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। সে আকার ও cigarette টানিয়া যে ভাবে ধূম ফুঁ দিয়া নির্গত করা হয় তাহার আকারের প্রভেদ বড় বেশী নাই।

ধূমের ক্রিয়া কলাপ মনে করিতে গেলে আরও কয়েকটী বিষয় চোখে ধরা পড়ে' যাহার বিবরণ প্রদান আশা করি এখানে অন্যায় হইবে না। একটী cigaretteএর টিনের ঢাকনির মধ্যখানে এক ইঞ্চি পরিমাণ ছিদ্র করিয়াছি। সেই টিনের মধ্যে কিছু কাগজ ও কাপড় পোড়াইয়া ধূম করিয়া ঢাকনি দিয়া আবদ্ধ করিয়াছি। টিনের তলদেশে যদি ছোট একটী হাতুড়ী দিয়া আঘাত করি তবে দেখিতে পাইবেন একটী গোলাকৃতি ধূমের আংটী (Ring) হঠাৎ তাহা হইতে বাহির হইয়া যাইবে। সে Ringএর আকৃতি অনেকটা ষ্টীমারের life buoyএর মতন দেখিতে। এরূপ দুই বা ততোধিক আংটী সৃষ্টি করিয়া দেখা যাইবে যে তাহা সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিবে না। সামনে যদি একটি candle জ্বালা থাকে তাহা সেই Ring এর আঘাতে নিবিয়া যাইবে এবং দুই বা ততোধিক Ring পরস্পর একত্র হইলেও একটা আর একটার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবেই বাহির হইয়া যাইবে। এই ঘূর্ণ্যমান্ Ring (vortex) এর আরও অনেক গুণ আছে যাহা পরীক্ষা করিয়া সকলেই দেখিতে পারেন (যদি অবশ্য ইচ্ছা ও সুযোগ হয়)। বাতাসের মধ্যে এরূপ Ring সময় সময় তৈয়ারী হয়। ঘূর্ণীবায়ু, জলস্তম্ভ প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার এরূপ নানাপ্রকার Ringএর ক্রিয়া কলাপ বিশেষ। পাত্র বিশেষে এই আংটিগুলি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন প্রকারের করা যাইতে পারে। ইহাদের অক্ষুণ্ণ অবয়ব ও অবাধ গতি প্রভৃতি দেখিয়া Lord Kelvin কল্পনা করিয়াছিলেন যে জড় জগতে দ্রব্যগুলির মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই এবং তাহার প্রত্যকটি আকাশময় ব্যাপ্ত Ether নামক অশরীরী পদার্থের এরূপ নানাপ্রকারের আংটী বিশেষ।(vortex)

ধূম সম্বন্ধে যতই বিশেষ পর্য্যালোচনা করা যাইবে ততই বিষয়টির জটিলতা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। আমি উদাহরণ ও উপমা দ্বারা তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছি। অঙ্কশাস্ত্রের জটিলতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের পরিভাষা সংযুক্ত আলোচনা সকলে হয়ত বুঝিতে পারিবেন না; আমি ইচ্ছা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করি নাই। ধূম বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর কয়েকটি বিশেষ কথা লেখা প্রয়োজন মনে করি। মনে করুন পূজা অন্তে ফুলের নির্ম্মাল্য নদীর ধার হইতে জলে নিক্ষেপ করিতেছি। ডালি হইতে নির্ম্মাল্য যখন আকাশে নিক্ষেপ করি তখন সব ফুল সমান গতিতে সমান ভাবে যাবে না, কতকগুলি সম্মুখে বেশী দূরে ও কতকগুলি অল্প দূরে পরস্পর একটা ব্যাবধান রাখিয়া জলে পড়িবে। জলে পড়িয়া পুনরায় স্রোত ও বাতাসের জন্য তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বিভিন্ন গতি হইবে। মনে হইবে যেন প্রত্যেক ফুলটি নিজের ইচ্ছামত চলিতেছে এবং অন্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যতখানি সম্পর্কহীন ভাবিতেছি তাহা নহে—প্রত্যেকটা ফুলেরই গতির যেন একটা নিয়ম আছে, যদিও সহজে আমরা তাহা ধরিতে

পারিতেছে না। একটী লম্বা দড়ীকে একত্র "দলা" করিয়া উর্দ্ধে ও দূরে নিক্ষেপ করিলাম, ইহাতেও দেখা যাইবে যে দড়টি ক্রমশঃ তাহার "দলা" করা ভাব নষ্ট করিয়া যেমন একটা বিস্তৃত ভাবে দূরে যাইয়া পড়িবে; এখানেও এরূপ ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ার ভাবের মধ্যে একটা নিয়ম ও একটা প্রণালী আছে—যাহা চোখে সহজে ধরা পড়িবে, হয়ত বিজ্ঞান সঙ্গত তথ্য অনুসারে তাহা প্রকৃত ভাবে আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আর একটী দৃষ্টান্তের কথা বলিতেছি। মনে করুন—আপনি পাখী শিকার করিতে গিয়াছেন; আপনার সম্মুখে ও মাথার ওপরে এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া যাইতেছে; তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। তখন পাখীদের পরস্পরের মধ্যে একটা ভীতি ও চাঞ্চল্য দেখা দিবে এবং পরস্পরের গতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে থাকিবে। এখানেও আপাততঃ দেখা যাইবে কোন পাখীর সঙ্গে অন্য কোন পাখীর কোনই সম্পর্ক নাই কিন্তু অধিক্ষণ তাহাদের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাহারা বাস্তবিকই ততটা সম্পর্ক হীন নহে। ধূম সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্ত গুলি সম্পূর্ণ প্রযুজ্য। ফুল, অথবা দড়ীর অংশ, অথবা পাখী—একটী যেরূপ করিতেছে—স্থান বিশেষে ধূমের কণা ও বিন্দুও তদনুরূপই চলিতে থাকিবে; প্রকৃত নিয়ম ও প্রণালী আমরা সম্যক প্রকাশ করিতে না পারিলেও তাহাদের মধ্যে যে একটা অমোঘ নিয়ম আছে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিব। নদীর জলের উপরি ভাগে ইতস্ততঃ ভ্রমামান জলরেখা এরূপ অনেক দেখা যায় এবং নানা কারণে এসব রেখার পরস্পর অবস্থা ও গতি ধূমের মধ্যে ও সমধিক হইয়া থাকে। কোন প্রদেশে ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে দেখা যায় কোন একটী স্থানে বাতাসের চাপ কমিয়া গিয়াছে। এরূপ কম চাপবিশিষ্ট স্থানগুলি ম্যাপের ওপর রেখা দ্বারা সংযোগ করিলে আমরা একটী সম চাপ রেখা পাই। এই চাপ রেখা সময় অনুসারে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং বাতাসের গতি ও বাধা অনুসারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ধূম বিজ্ঞানের মধ্যে আলোচনা করিতে এই জটিল বিষয় আসিয়া পড়ে এবং এই চাপ রেখা ঝড় ও বৃষ্টির সময় কখন কোথায় কি ভাবে থাকে তাহা পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়। আবহাওয়া বিজ্ঞান (meteorology) এখনও এতদূর উন্নত হয় নাই যাহাতে এই রেখার ভবিষ্যৎ অবস্থিতি ও আকৃতি আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিতে ও জানিতে পারি। তবে আশা করা যায় এই ধূম বিজ্ঞানের বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে ভবিষ্যতে আমরা আরও জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিব। যিনি বিষয়টী মনোরম মনে করেন আশা করি তিনি এ সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। আলবোলা নিসৃত কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি চিন্তা করিতে গিয়া অনেক বিষয়ের অবতারণা করিলাম। "কলিকা" নিবদ্ধ ধূম যেমন মুখ নিসৃত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়, আমরাও সেরূপ ক্ষুদ্র জিনিষ ভাবিতে ভাবিতে শূন্যে অসীমতার আভাস পাই এবং ক্রম অনুসন্ধানে নিজেদের চিন্তা সূত্র হারাইয়া ফেলি। সিগারেট তামাক বিড়ি অনেকেই খান কিন্তু সে "সর্ব্বসন্তাপহারী" উদ্গারিত ধূমের উল্লম্ফনের মধ্যে যে এক বিশাল রাজ্য আছে তাহা অতি সামান্য ভাবেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আশা করি এই ধূমপুঞ্জের লীলা খেলা ভবিষ্যতে পৃথিবীর অনেক উপকারে আসিবে।

শ্রীকালিদাস বাগচী।

নিশীথে সরিৎপ্রতি।

নীরব নিশীথ, নিঝুম নিথর!
নয়ন-নিঝর ঝরে ঝর্ ঝর্!
নিবিড় আঁধারে নদী তর্ তর্ বহিছ কাহার পানে?
নাহিক বিরতি, নিদের আলস!
আকুল আরতি, লোলুপ লালস!
মহা সন্ধানে মাতাল মানস—ছুটিছ উদাস গানে!

সুদূর অসীমে মিশাতে স্বসীমা,
বাঁধন টুটিতে, নাশিতে লঘিমা,
মহা-গৌরবে ঢালিতে গরিমা, ধাইছ পাগলপারা!
কালের গতির মহাপ্রতিযোগী!
ধ্যানরতা যথা, ঋষি মহাযোগী!
সুর-পুরে যেন সুধা সম্ভোগী বাহির-ভিতর-হারা!
তটিনি! আমার নয়নের ধার লভুক তোমারি ধারা!

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

রামায়ণে বিবাহ-রীতি।

(২)

ঋক্ বেদে আর্য্য সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা সমাজের প্রাথমিক সভ্যতার চিত্র। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস কোন জাতিরই নাই। না থাকিলেও বেদ-বাইবেল-আবেস্তা প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মানব জাতির আদিম অবস্থার অর্থাৎ প্রাকৃবৈদিক যুগেরও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রাচীন ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে আদিম মানব সমাজে কোন দাম্পত্য বিধি ছিল না। স্ত্রী পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় পশু পক্ষীর ন্যায় অবিচারে সঙ্গত হইত।

এই স্বেচ্ছাচার সঙ্গকে মরগেন, ডেনিকার, ওয়েষ্টারমার্ক, প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Promiscuous-marriage বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতে প্রাচীন কালের প্রসঙ্গে এই চিত্রের উল্লেখ আছে।

এই স্বেচ্ছাচার সঙ্গ-যুগের পর দ্বিতীয় অবস্থায় রক্ত সম্বন্ধীয় পারিবারিক জন বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আদিম সমাজে পারিবারিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। তখন ভ্রাতা-ভগিনী-সঙ্গ অথবা ঐ রূপ রক্ত সম্পর্কীত সঙ্গই যৌন মিলনের পক্ষে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই হীন প্রথাটীর যুক্তি তর্কের আভাস ঋক্ বেদের যম যমীর কথোপকথনে এবং প্রচলিত রীতির আভাস খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শাক্য সমাজে ও তৎপরবর্ত্তী কালের কোন কোন ভারতীয় সমাজের আলোচনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রথার কুফল লক্ষ্য করিয়া আদিম সমাজ—এইরূপ রক্ত-সম্বন্ধ-প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

ইহার পর সঙ্ঘ-সঙ্গ বা Group marriage প্রথা প্রচলিত হয়। এই অবস্থা সমাজের তৃতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় এক স্ত্রী বহু ভর্ত্তা গ্রহণ করিতে পারিত। মহাভারতের কবি আদিম মানব সমাজের এই তৃতীয় অবস্থার দৃষ্টান্তই দ্রৌপদীর বিবাহে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে বেদমন্ত্রটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত (রাঃ সঃ ২২৬ পৃঃ) হইয়াছে ঐ মন্ত্র এই রীতির বিরোধী সুতরাং এই রীতি যে প্রাক্ বৈদিক যুগের, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আদিম সমাজের চতুর্থ অবস্থায় যুগ্ম সঙ্গ (Pairing family system) প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথার স্থায়িত্ব স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। এই অবস্থায় স্ত্রী ইচ্ছা করিলে অন্য পুরুষেরও সঙ্গ করিতে পারিত।

মহাভারতের কবি এই অবস্থার কথাই শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে বর্ণন করিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—শ্বেতকেতুই সমাজের এই হীন ভাব দর্শন করিয়া এই প্রথার সংস্কার করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত চারি অবস্থাতেই পরিবারে স্ত্রীর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত এবং পুত্র কন্যা প্রভৃতি মাতার নামে পরিচিত হইত; ধন সম্পত্তিও স্ত্রীর হইত। এই পরিবারিক প্রথার নাম পণ্ডিতেরা Matriarchate family রাখিয়াছেন, আমরা 'মাতৃবাচ্য পরিবার'—নির্দ্দেশ করিলাম।

এই অবস্থার পরের অবস্থাই ঋক্ বেদে বর্ণিত সুসংস্কৃত অবস্থা। পূর্ব্বে ছিল মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত পরিবার, ঋক্ বেদের সমাজ হইল পিতৃ পরিচয়ে পরিচিত Patriarchate family বা "পিতৃবাচ্য পরিবার।"

এইরূপে ক্রমে অসভ্যতার উপর সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সংস্কার প্রভাবে সুসংস্কৃত হইলেই যে প্রাচীন সমাজের দূষিত ভাবগুলি সেই সুসংস্কৃত সমাজ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়—তাহা নহে। সমাজের উচ্চস্তর হইতে তাহা পরিত্যক্ত হইলেও নিম্নস্তরে তাহা লুপ্ত ভাবে আশ্রয় লাভ করিয়া সঞ্চিত থাকে এবং অবসর পাইলেই আপন প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। ইহা সমাজ শরীরের প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম। "সমাজ ধর্ম্ম" প্রসঙ্গের প্রারম্ভে এই কথারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। (১৯৪—১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সমাজ ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে ঋক্‌বেদের বিবাহ সম্বন্ধীয় তিনটী মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্ত্র তিনটীর ভাব এইরূপ—

১। পিতা নিজে কন্যা সম্প্রদান করিতেন; পিতার অভাবে কন্যার ভ্রাতাও তাহাকে সম্প্রদান করিতে পারিত। (২০০ পৃষ্ঠা)

২। দেবরকে সন্তান উৎপাদনে নিয়োগ করা যাইত। (২২৩—২২৪ পৃঃ)

৩। তখনকার সমাজে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। (২২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই ঋক্ কয়টী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে—

(১) বৈদিক যুগেই স্মৃতিতে উক্ত ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহ রীতি প্রচলিত হইয়াছিল।

(২) প্রয়োজনাধীন দেবর দ্বারাও সন্তান উৎপাদন করান্ হইত।

(৩) এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বৈদিক সমাজের বিবাহ রীতির আভাস ঋক্ বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে সূর্য্যার বিবাহ বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক সমাজের সেই বিবাহ রীতি অপেক্ষা রামায়ণে বর্ণিত বিবাহ রীতি উন্নত; ইহা ক্রমবিকাশের ও ক্রমোন্নতির হিসাবে খুব স্বাভাবিক। বেদে দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদনের যে রীতির উল্লেখ আছে, রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না; মহাভারতে কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয়। বেদে এক স্ত্রীর বহু ভর্ত্তৃত্বের নিষেধ বিধান আছে, রামায়ণে সেরূপ রীতির কোন উল্লেখই নাই, অথচ মহাভারতে তাহা আছে। এইরূপ অবস্থায় সমাজের পূর্ব্বাপর্য্য বিচারে যে মত ভেদ থাকিবে, তাহা খুব বিচিত্র নহে।

বিবাহ রীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; এস্থলে রামায়ণ ও মহাভারতের কতিপয় সমাজ রীতি সম্বন্ধে সামান্য ভাবে আলোচনা করিয়া প্রথম বিরুদ্ধ মতটীর বিচার করিতে চেষ্টা করা গেল।

সমাজ ক্রমে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয় বটে কিন্তু অবস্থা বিপরীতে সমাজ অবনতির দিকেও যাইতে পারে। উন্নতি যেমন দ্রুত হইতে পারে, অবনতিও দ্রুত হইতে পারে।

মহাভারতে বিভিন্ন বিষয়ে সমাজের যে চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সমস্তই যে মহাভারতকারের সমসাময়িক যুগের সমাজ চিত্র—তাহা নহে; বহু চিত্রই প্রাচীন কিম্বদন্তী হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী লাভের প্রথাটীরই আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা যে প্রাক্‌বৈদিক যুগের আদিম মানব সমাজের একটী রীতি, তাহা "সঙ্ঘ-সঙ্গ" বিবাহ রীতি বর্ণনায় উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতে দ্রুপদ রাজার আপত্তিতেও তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। দ্রুপদ এই রীতিকে বেদ বিরুদ্ধ রীতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। সুতরাং এই বিবাহ রীতিকে মহাভারতের সমাজরীতি কখনই বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়—দেবর কর্ত্তৃক সন্তান উৎপাদনের কথা। রামায়ণে বর্ণসঙ্করের আভাস নাই। মহাভারতে পৃথিবী (?) নিঃক্ষত্রিয় হইবার গল্প আছে। পরশুরাম নাকি সাতবার ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধে যে ক্ষাত্র শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহার বর্ণনাতো মহাভারতের প্রধান বিষয়ই। কোন জাতি পুরুষ শূন্য হইয়া গেলে সেই জাতির শক্তি পূরণ জন্য সমাজে হীন নীতি প্রবর্ত্তন প্রয়োজন মনে হইলে, তাহা প্রবর্ত্তন করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে। এইরূপ নীতি-বিরুদ্ধ-রীতি প্রবর্ত্তনকে ধর্ম্মশাস্ত্রে "আপদ ধর্ম্ম গ্রহণ" বলা হয়। আমাদের মনে হয়, রামায়ণের সমাজ চলিয়া গেলে এমনই এক সময় আসিয়াছিল যখন দেশের পুরুষ-শক্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; তখন সমাজপতিগণ বৈদিক রীতিতে দেবরাদির নিয়োগ দ্বারা এবং ক্রমে তাহারও অভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে এই বৈদিক প্রথাটীর অনুবর্ত্তন ও বর্ণসঙ্কর প্রথার সৃজন—একটা দীর্ঘ যুগের ব্যবধানের পর আর একটা যুগে—দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ আপদ-ধর্ম্ম প্রচলনের বিষয় ভাবিবার সময় পাঠকগণ বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত ধ্বংসমান জাতি সমূহের জনবৃদ্ধির চেষ্টা ও চিন্তার ধারা একটু আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

তৃতীয়—বিবাহে বীর্য্যশুল্ক ও প্রতিযোগিতা। রামায়ণে বীর্য্যশুল্কের দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত নাই। মহাভারতে উভয়ই বিদ্যমান। রামায়ণের সময় আর্য্য সমাজ ছিল মাত্র দুই তিনটী ক্ষত্রিয় রাজ্যে সীমাবদ্ধ; মহাভারতের সময় ভারতে বহু প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের প্রতিযোগিতার পরীক্ষা বীর্য্যে। এই কারণে আমরা দ্রৌপদীর বিবাহে, অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহে এবং সুভদ্রার বিবাহে প্রতিযোগিতায় সংগ্রাম দেখিতে পাই। এইরূপ ব্যাপার সমাজের ক্রমোন্নতির—সুতরাং পরবর্ত্তিতারই পরিচায়ক।

সীতার বিবাহে আমরা যে বৈদিক সম্প্রদান রীতির অনাবিল চিত্র প্রত্যক্ষ করি মহাভারতে যে সে রীতির চিত্র নাই, তাহা নহে। মহাভারতের উত্তরার বিবাহ-চিত্র বৈদিক রীতিরই একটী সুন্দর চিত্র। এই দুই যুগের এই দুটী বিবাহ রীতির একত্র আলোচনা করিলে কোনটী পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ও কোনটী পরবর্ত্তী যুগের রীতির নিদর্শন, তাহার সুস্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সীতার বিবাহ চিত্র পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। (২৮২—২৮৩ পৃঃ) সীতার বিবাহ যজ্ঞ মুখ্য; বিবাহ প্রাঙ্গন স্ত্রী সমাগম শূন্য। অপরপক্ষে উত্তরার বিবাহে অনুষ্ঠানের অবধিই নাই। কামিনী কুলের সমাগমে সে বিবাহ অঙ্গন উদ্ভাসিত। হোমের ধূপ সেখানে গৌণ, সুতরাং অত্যন্ত বিরল।

ইহার পর সূত্র যুগের বিবাহে দেখিতে পাওয়া যায়—স্ত্রী আচারের অবধিই নাই, সূত্রগ্রন্থগুলিতে স্ত্রী-বরযাত্রীর কথাও আছে। বেদমন্ত্রের অর্থ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের এইরূপ অবান্তর ক্রিয়াগুলি বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। "সূত্রযুগের সমাজ" গ্রন্থে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

অনুষ্ঠান বাহুল্য বিকাশেরই পরিচায়ক। বিকাশ জাতির স্বাধীন অবস্থায় খুব দ্রুত হয়; বিপ্লব সংঘটিত হইলে অকস্মাৎ হয়। শেষোক্ত স্থলে উন্নতি অবনতি উভয়ই এক ভাবে হয়। পরাধীনসমাজ আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া অবনতির দিকেই ধাবিত হইতে থাকে। ভারতীয় সমাজে এই তিন অবস্থারই দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং সমাজে আবিলতা উন্নতি, অবনতি, বিপ্লব—সকল অবস্থায়ই প্রবেশ করিতে পারে। সাধারণতঃ সমাজদেহে আবিলতা সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গেই প্রবেশ করে; সভ্যতা স্থাপনের সময়ে নহে। সভ্যতা স্থাপন সময়ে যে আবিলতা লুপ্ত ভাবে থাকে, তাহাই ক্রমে অবসর পাইয়া সভ্যতার মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে—ব্যবস্থাকার ঋষিরা অনন্যোপায় হইয়া তখন তাহা সমাজ বিধির অঙ্গীয় করিয়া লইতে বাধ্য হন। মহাভারতে ও পুরাণ সমূহে এই সত্য নানা ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সীতার বিবাহের চিত্রটী অনাবিলতা হেতু বা অনুষ্ঠান বাহুল্যের অভাব হেতুই মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী হইবে—এই যুক্তি সমীচীন নহে।

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ মতটী (২৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত) ঐতিহাসিক হুইলার সাহেবের। মিথিলা-রাজ জনক নিজে বরকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন দেখিয়া হুইলার লিখিয়াছেন "It will be noticed that the Brahmans play little or no part in the cerimony." হুইলারের এইরূপ মন্তব্যের কারণ—তিনি (হুইলার) কৃতনিশ্চিত যে, বাল্মীকি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্বে—অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবের কালে আবির্ভূত হইয়া রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। এবং সেই রামায়ণী যুগে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

হুইলার সাহেব বৈদিকযুগের কোন গ্রন্থে বর্ণিত কোন বৈবাহিক ক্রিয়ার সহিত তুলনায় বিচার করিয়া এই মন্তব্যে উপনীত হন নাই। তিনি তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামক কোন ব্যক্তির মুখে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের বৈবাহিক অনুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতির কথা শুনিয়া বোধহয় এই ত্রুটিটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশকে আমরা আরোহ প্রণালী বা "সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ" রীতি (deductive method) বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। (১৮৯ পৃষ্ঠা) হুইলার যে কোন প্রাচীন গ্রন্থই অনুসন্ধান করিতেন—বেদ, রামায়ণ, মহাভারত,—কোন গ্রন্থেই আধুনিক নিয়মে ব্রতীকে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইতেছেন, এইরূপ প্রথা দেখিতে পাইতেন না। এই প্রথাটী বৌদ্ধবিপ্লবের পরেই ক্রমে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। পৌরাণিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে—যজ্ঞই ছিল একমাত্র ক্রিয়া—এবং তাহা করিবার অধিকারী ছিলেন—বিশিষ্ট বিশিষ্ট যজ্ঞের জন্য—বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঋত্বিক। ঋত্বিক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে ও পিতৃগণকে আহ্বান করিলে যজমান আহুতদিগকে সম্মুখে উপস্থিত পাইয়াছেন কল্পনা করিয়া ঋত্বিকগণ সাক্ষী করিয়া তাঁহাদিগের নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন বা প্রার্থনা নিবেদন করিতেন। এই নিবেদন-বাক্য বা অভিপ্রায় যজমানই ব্যক্ত করিতেন। পিতা বা ভ্রাতার কন্যা-সম্প্রদান করিতে বা পুত্রের স্বর্গীয় পিতার আত্মাকে তর্পণ দ্বারা বা পিণ্ড দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন (শ্রাদ্ধ) করিতে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পূর্ব্বযুগে কর্ম্মীকে পুরোহিতের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া মন্ত্র পাঠ

দ্বারা কোন ক্রিয়া করিতে হইত না। যজমান ও ঋত্বিক উভয়ে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেন। যজ্ঞকার্য্য ও অন্যান্য করণীয় বৈবাহিক কার্য্য যে ব্রাহ্মণ ঋষিরাই করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে। ঋষি প্রবর বসিষ্ঠকে জনক বলিতেছেন—

কারয়স্ব ঋষে সর্ব্বামৃষিভিঃ সহধার্ম্মিক ॥ ১৮

রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো ॥ ৭৩।

অর্থ—ধার্ম্মিক মহর্ষে! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক ক্রিয়াসকল নির্ব্বাহ করুন।

বশিষ্ঠও তদনুসারে জনকের কুল পুরোহিত শতানন্দ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে জনক কন্যা দান করিলেন।

পুরোহিত ও ঋত্বিকগণ কি কি কার্য্য করিলেন, তাহার উল্লেখ রামায়ণে নাই বটে কিন্তু ঋক বেদের সূর্য্যার বিবাহের (১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের) বর কন্যা সম্বন্ধীয় ঋক মন্ত্রগুলির আলোচনায় তাহা অনুমান করা যায়। ঐ মন্ত্র গুলিই পুরোহিত এবং ঋত্বিকগণ উচ্চারণ করিয়া বরকন্যার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং দেবগণের নিকট সুখ সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিতেন। সেকালে সকল গৃহস্থই (গৃহমেধিন্) যাগযজ্ঞাভিজ্ঞ ছিলেন সুতরাং তাঁহাদের নিজের করণীয় কার্য্যে প্রতিনিধির প্রয়োজন হইত না, অথবা কি বলিয়া দান করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য উপদেষ্টারও প্রয়োজন হইত না। দশ কর্ম্মান্বিত প্রাজ্ঞ কায়স্থ বা বৈদ্য কর্ম্মীর এখনও মন্ত্র প্রবক্তার প্রয়োজন হয় না। এই রীতিই ছিল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগের রীতি।

অতঃপর বৌদ্ধ বিপ্লবে বৈদিক মন্ত্র প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেলে ক্রিয়া কার্য্যের বিধি ব্যবস্থায় ঘোর বিপর্য্যয় ঘটে; ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেশ হইতে বিদূরিত হয়; বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্বন্ধে দেশে ঘোর অজ্ঞানতা প্রবেশ করে। এ দেশের স্থানে স্থানে এই বেদ বিরুদ্ধ ভাব প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বিরাজ করিয়াছিল। ইহার পর বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিলে নূতন করিয়া পুরোহিতের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয়, তখন যজমানকে পুরোহিতের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইত।

বর্ষা বৈচিত্র্য।

কাজল-উজল-সজল-জলদ-রথে,
নিশীথ-নভেরি নিশুতি-সুপ্ত-পথে,
বরষের পরে এসেছে নবীনা বরষা,
তৃষিত তাপিত ব্যথিত জীবন-ভরসা।
রিমি রিমি রবে রণিত রাগিণী কিবা,
গুরু গরজনে গমকে গুঞ্জে গ্রীবা;
ঝলকে ঝলকে পলকে পুলক-পরশা;
আনন্দময়ী উৎসবময়ী বরষা!
সন সস সন স্বনিছে পবন বেগে,
নাদিল মাদল বাদল-বিলাসী মেঘে,
ভেক মকো মকো কলাপীর কেকা কাকলী
ঝিল্লির ঝাঁঝে পল্লী উঠিল আকুলি!
সজল-জলদে উজল বিজলী-বিভা—
নিকষে বিকশে কষিত কনক কিবা!
গগন-লগন বলাকাবলীর মালিকা,
রচিল সে কোন্ নিপুণ ঐন্দ্র জালিক!?
কলাপী কলাপে বিবিধ বরণ ছটা—
ভূতলে অতুল ইন্দ্র ধনুর ঘটা!
বধূরা মধুরা চমকি চাহিছে চকিতে—
প্রোষিত পতির আগমন পথ লখিতে!
নীপ-পরিমলে নন্দিত বন-বীথি,
কেতকী সুবাসে জাগিয়া উঠিল প্রীতি,
সিক্তা মেদিনী গন্ধামোদিত পবনে—
নির্ম্মল নব আনন্দ আনে ভবনে!
নাগরী গাগরী ভরিতে তটিনী তটে,
কাজরী গাহিয়া গৌরব গাথা রটে।
সরিতে ত্বরিতে প্রবাহ-পুলক ছলকে।
ফেন-মণি-মালা জড়িত সুনীল অলকে।
চাতক-ঘাতক-নিদাঘে নাশিল প্রাণে,
মীন দীনদশা দূরীত তাহারি দানে,
গোপন করিল তপনে আপন কবলে,
উষরে ধূষরে সজীবতা দিল স্ববলে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

হাতী খেদা।

(৭)

এখন আরণ্য হস্তীর জড়াজড়ির ভাব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল—বস্তুতঃ এই অবস্থায় হস্তীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ অসম্ভব প্রায়। ইহাদের অবস্থা দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হস্তী পরস্পর গাত্র ঘর্ষণে বড়ই সুখাশ্লিষ্ট হয়।

এইবার পালিত কুম্‌কীগুলি এক একটা আরণ্যকে অপরগুলি হইতে পৃথক করিবার প্রয়াস করিতে লাগিল। ইহাকে "ভিড়ান" বলে। কুম্‌কী পিছাইয়া পিছাইয়া পশ্চাৎভাগ আরণ্যের শরীরে ঘর্ষণ করিতে করিতে এক একটাকে দল হইতে পৃথক করিয়া আনে। অপর কুম্‌কীগুলি অপর আরণ্যগুলিকে চতুর্দ্দিকে ভিড়াইয়া চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টায় বড় হস্তিনীটাকে দল হইতে পৃথক করিল—এই অবস্থায় দুটী কুম্‌কী দুই পার্শ্বে চাপিয়া রহিল, পশ্চাতে সিঁড়ির দুই কুম্‌কী রহিল এবং সম্মুখে ৩। ৪টা কুম্‌কী রহিল। এইরূপে এই হস্তীনীকে ঘিরিয়া কুম্‌কী দ্বারা এরূপভাবে এক ব্যূহ নির্ম্মিত হইল যে বাহির হইতে অন্য হস্তী এই ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। এখন দাইদার পরতালার রসি লইয়া অবতরণ করিল এবং হস্তীনীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ-পদদ্বয়ে পরতালা ভরিতে আরম্ভ করিল। আমরা উৎকণ্ঠায় চাহিয়া রহিলা—কখন কি হয়? লাঙ্গুলের সামান্য আঘাতে, কিম্বা একটু পদচালনেই দাইদারের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে। পরতালা ভরার এক প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে—এই কার্য্য কিরূপ বিপদ সঙ্কুল! কিন্তু শিক্ষিত দাইদারগণ অতি অনায়াসে একার্য্য সাধন করিতে পারে। আমাদের দাইদারগণ প্রায় ১০ বৎসর কাল আলস্য এবং অনভ্যাসে কাটানর ফলে এবং বার্দ্ধক্য হেতুও একটু অপটু হইয়া গিয়াছে—বড় হাতীর পরতালা ভরিতে দাইদারকে বহুবার সিড়ির কুম্‌কীতে উঠিতে হইয়াছে সুতরাং পরতালা ভরিতে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল সময় প্রয়োজন হইল। ইহার ছোট হাতীটাকে অপর এক মাহুতে পরতালা ভরিল। ইতঃপর হাতী দুটিকে গাছ লওয়াইতে (অর্থাৎ ফাদ দিয়া কোঠের তেখাম্বায় বাঁধিতে) আদেশ করা হইল। তখন প্রায় ৫টা বাজিয়া গিয়াছিল। অনেক সময় এমন হইয়াছে যে পরতালা ভরা হইলেও হাতী কোঠ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহাতে আমাদের এরূপ না হইতে পারে তাহার জন্যই বড় হাতীগুলির গাছ লওয়ানের কার্য্য অদ্য রাত্রির মধ্যেই শেষ করাইয়া রাখা ইহাই স্থির হইল। দেখা গেল দুইটী বড় হাতী, একটী মেয়ানী তাহাও সম্পূর্ণ খোড়া, একটী মেয়ানা, একটা ছোট মেয়ানী এবং একটা ছোট মোক্‌না—সর্ব্বসমেত ৬ হাতী আছে। ইহাদের মধ্যে বড় দুইটীকে গাছ লওয়াইয়া অপর গুলিকে ছাড়িয়া রাখিলে ক্ষতির কারণ নাই।

পরতালা ভরার সময় বড় হাতীটা বারম্বার কুম্‌কীর লেজ কামড়াইয়া নষ্ট করার চেষ্টা করিতেছিল এবং বারম্বার কুম্‌কীকে আক্রমণ করিতেছিল। মাহুতগণ সতর্ক না থাকিলে প্রায় সময়ই কুম্‌কীর অঙ্গহানি করিতে পারিত। পরতালা ভরার সময় হাতী বিশেষ কিছু করে নাই, কিন্তু মোটা ফাঁদ পায়ে বাঁধিয়া গাছ লওয়াইতেই এমন টানিতে আরম্ভ করিল এবং আছাড় খাইতে লাগিল যে দড়িগুলি মট্ মট্ শব্দ করিতে লাগিল এবং ২। ১ বার ছিঁড়িয়াও গেল। হাতী মাটিতে পড়িয়া লম্বা হইয়া টানিতে লাগিল—টানের চোটে একটা খাম্বা ভাঙ্গ-ভাঙ্গা হইয়া গেল। হস্তীর এতদবস্থা উপভোগ্য। গাছ লওয়ান হইলে ২। ৩টা ডোল লাগান হইল; কিন্তু হস্তিনীর এমনই অভ্যাস যে ৩।৪টা ডোল লাগান হওয়া মাত্র উপর্য্যুপরি কামড়াইয়া কাটিয়া ফেলিল। তখন ৪টা ডোল একত্রে বাঁধা হওয়ায় আর কাটিতে পারিল না। এই ভাবে ছোট হাতীগুলিকেও গাছ লওয়ান প্রভৃতি হইয়াছে দেখিয়া আমরা দর্শকের মাচাং হইতে অবতরণ করিলাম। খেদা পরিচালকগণকে রীতিমত ভাবে বন্দুক এবং অগ্নি দিয়া কোঠ রক্ষা করার আদেশ দেওয়া হইল। কারণ তখনও বহু গুণ্ডা হস্তী বাহিরে ছিল; আবদ্ধ হস্তীগুলির ডাক শুনিয়া গুণ্ডা বাহির হইতে কোঠ আক্রমণ করিলে অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে—বোধেই এই সাবধানতা বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা হইল। পাতাও মজমুত রাখার আদেশ করা হইয়াছিল কারণ, পুনরায়

আর একটা ড্রাইভ করিবার বাসনা আমাদের ছিল। আজ আমাদের মত নব্যদের খুবই উৎসাহ। Campএ ফিরিতে প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল কিন্তু আজ ফিরিবার সময় আর অবসাদ নাই।

কাল পুনরায় খুব প্রাতে হাতী বাহির করিতে হইবে এবং এই সময় আমরা উপস্থিত থাকিয়া দেখিব সুতরাং দাইদারকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহারা ৬টার মধ্যে কুম্‌কী লইয়া আমাদের Camp এর নিকট আসে এবং আমাদিগকে কোঠের স্থানে লইয়া যায়। পিল্‌খানা আমাদের নিকট হইতেও প্রায় ২ মাইল। পিল্‌খানা দূরে রাখাই রীতি; নতুবা বন্যহস্তী পালিত, হস্তীর শব্দে ও গন্ধে প্রায়ই পলায়ন করে।

২১শে অগ্রহায়ণ। কল্য রাত্রিতেই স্থির হইয়াছিল আজ হাতী নামাইয়া জগন্নাথপুর রাখা হইবে, এবং আমরা আহারান্তে সুসঙ্গ চলিয়া যাইব। চা পান করিয়াই কোঠের দিকে যাত্রা করা গেল। আমার কামেরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল কিন্তু যতীন দাদার হেণ্ড কামেরা ছিল; এটা তিনি কখনও সঙ্গ ছাড়া করিতেন না—ফলকথা খেদার সময় একটা কামেরা আমরা আগা গোড়াই সঙ্গে রাখিতাম। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সফলকাম খুব কমই হইতাম।

কেম্প হইতে কোঠের স্থানে যাইতে প্রায় ১ ঘণ্টা ১½ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। কোঠের স্থানে যাইয়াই দেখি, দ্বিতীয় হস্তিনীটা মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে, এবং বড় হস্তিনীটা প্রায় সমুদয় বন্ধনই ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কেবল মাত্র দক্ষিণ পদের বন্ধনটী আছে। দ্বিতীয় হস্তিনীকে এমন ভাবে পতিত থাকিতে দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইলাম। হস্তিনীর এ অবস্থা দর্শনে মনে হইল ইহার আশা ত্যাগ করিতেই হইবে। যাহা হউক, কল্যকার মত কুম্‌কী কোঠে প্রবেশ করিলে পর প্রথমে হস্তী দিয়া ঠেলিয়া পতিত হস্তিনীকে তুলিবার প্রয়াস করা হইল; ইহার পর মানুষ নামিয়া তাহার উপর চড়িয়া সমুদয় বন্ধন মুক্ত করাতেও যখন উঠিল না তখন একেবারে নিরাশই হওয়া গেল। অবশেষে এক মাহুতের পরামর্শে হস্তিনীর নিম্নস্থিত পদ কুম্‌কীর কোমড়ে বাঁধিয়া টানিতেই হস্তিনী উল্‌টাইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরই উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া পরমানন্দে মাহুতগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং আমরা নারায়ণের নাম স্মরণ করিলাম। ইহার পর যথারীতি হস্তীগুলিকে কুম্‌কীর কোমড়ে বাঁধা হইল। এবং পরতালার রশিগুলি খুলিয়া দেওয়া হইল।

হস্তীগুলিকে পালিত হাতীর কোমড়ে বাঁধিয়া প্রথম কোঠের বাহির করিতেই মুক্তি অনুমান করিয়া এমন বেগে পলায়নের প্রয়াস করিল যে পালিত কুম্‌কীগুলি এই চোট সামলাইতে উপুর হইয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ টানাটানির পর হস্তী নিজের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া কিছু শান্তভাব অবলম্বন করিল এবং পালিত কুম্‌কীর সহিত সম ভাবে চলিতে লাগিল। বড় হস্তীটার সহিত ৪ টা সবল কুম্‌কী বাঁধা হইয়াছিল। সেটা ৭´ ১১˝ উচ্চ ছিল। দ্বিতীয়টার সহিত ৩ টা কুম্‌কী এবং অপরগুলির সহিত ১ টা করিয়া বাঁধা হইয়াছিল। টানিবার সময় খোঁড়া হস্তিনীটার রকম সকম বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

কেম্পে আহারাদি করিয়া সুসঙ্গ রওনা হইতে হইবে এই কারণে আমরা হাতী বাহির করা হইয়াছে মাত্র দেখিয়াই চলিয়া আসিলাম। আমরা চিকিসিম কেম্প হইতে হাঁটিয়াই জগন্নাথপুর পর্য্যন্ত গেলাম—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বড় কাকাও আমাদের সঙ্গে বেলা দুইটার সময় এই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে হাঁটিয়া আসিলেন। তিনি একক হাতীতে যাইতে স্বীকার করিলেন না। দুই টার পর রৌদ্র তাপে পার্ব্বত্য পথে আরোহণ অবরোহণ মোটেই আরাম প্রদ হয় নাই। আমরা পাহাড় হইতে আসিবার পূর্ব্বেই হস্তী সমতল ভূমিতে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল এবং আমরা জগন্নাথপুরে আসিয়া দেখি হস্তী যথারীতি গাছে বাঁধা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় হাতীগুলিকে দেখিয়া অনেক কথাই মনে হইতেছিল।

আবদ্ধ হস্তীগুলির কোনটা রাগে মাটিতে পড়িতেছে, কোনটা বা মানুষের দিকে সবেগে ঘাস কিম্বা কলাগাছ (যাহা খাইতে দেওয়া হইয়াছে) ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। কিছুকাল এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার পর হস্তী বাহনে গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তায় খেদার গল্প এবং কি করিলে কোনটা ভাল হইত—তাহাই আলোচনা

করিতে করিতে ১০½ ঘটিকায় বাড়ী পঁহুছিলাম। ১০। ১২ দিন পাহাড় বাসের পর বাড়ীর আরাম বেশ তৃপ্তিপ্রদ বোধ হইল।

আমরা পূর্ব্বেই খেদা পরিচালকগণকে বলিয়া আসিয়াছিলাম যেন কোঠটা আর একটু অগ্রসর করিয়া খলের মলমে বাঁধে; কারণ এই স্থান দিয়াই প্রত্যহ হাতী অতি অনায়াসেই আসিত। স্থির হইল "পাতা" সুদৃঢ় রাখিয়া তিন দিনের মধ্যেই পুরাতন কোঠ উঠাইয়া এই স্থানে স্থানান্তরিত করা হইবে। পুরাতন কোঠ আট পাটের ছিল, নূতন কোঠটা ৭ পাটের করিলেই চলিতে পারে বলিয়া তাহাই করিতে বলা হইল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

নারীর অধিকার।

(কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

প্রিয় সই!

তোমার চিঠি পেয়েছি। আজ একটা নূতন খবর দিচ্ছি। অহিংসা ও অসহযোগ ব্রতে ব্রতী, নারীকর্ম্মী, নারী কুলের গৌরব কুমিল্লার মাসীমার নাম বোধ হয় তোমার অজানা নেই। আমাদের এই উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা দেশকে উদ্ধার করবার যে ভাব এসেছে—মহাপ্রাণ ঋষি মহাত্মা গান্ধীর ভিতর দিয়ে. তাঁরই বাণী দেশের ও দশের কাছে প্রচার করে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এখানে তিনি এসেছিলেন।

তাঁর মুখ থেকে মহাত্মাজীর বাণী শুনে আশ্চর্য্য হয়েই ভাবতে হয়—আমরা কি জগতেই আছি? আমাদের নারীত্বের এবং মাতৃত্বের গর্ব্ব অনেক কাল আগেই অনন্ত সাগরের বুকে মিশে গিয়েছে, তার অস্তিত্বটুক পর্য্যন্ত আমাদের ভিতরে নেই, তাও অনন্ত সমুদ্রের অতল বারিধি রাশির ভিতর লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা আমরা জানি কি? আমরা আজকাল নারীর নারীত্ব বলে যে জিনিষটার গর্ব্ব করি তার মূলে কিন্তু কিছুই নেই, সে শুধুই ফাঁকি। লোকের চোখে ধূলো দেওয়া, এইমাত্র। নারী জাতির পক্ষে এটা যে কত বড় লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় তা আমরা মোটেই ভাবি না। নারীর মর্য্যাদা যে কতটুকু উচ্চে আজ আমরা নিজেদের বুদ্ধির ত্রুটিতে নিজেরাই তা বোঝবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। কতটুকু হীন হয়ে পড়েছি আমরা। আজকালকার মা জাতিরা নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরব—মাতৃত্বের গর্ব্ব যা করেন তা শুধুই মিথ্যা আত্মাভিমান ও স্তোক্। সন্তান যখন সরল উদার প্রফুল্লমনে "মা" বলে মার কাছে এসে দাঁড়ায় এবং মাও গর্ব্বে মাথা উচুঁ করে দাঁড়ান, আমি বলি মা সন্তানকে তখন ঠকান, প্রবঞ্চনা করেন।

কেন জান? মাতৃত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার মত শক্তি এখনকার মাদের মোটেই নেই। মা হওয়া তো মুখের কথা নয়। সুভদ্রা, সীতা, কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী এরাও তো মা ছিলেন। তাঁরা কি শুধু নিজের সন্তানটিকেই মা বলতে শিখিয়েছিলেন—না বিশ্বের জননী তাঁরাই হয়েছিলেন? মা কি একার কখনও হতে পারে? মা শব্দটিতে কি মধুরত্বটুকুই না ফুটে উঠে! কিন্তু আজ কালকার মাদের সেটুকু মুছে গিয়ে মধুরত্বের যায়গায় ফুটে উঠছে—কঠোরত্ব। নিজের ছেলেটিই শুধু মাকে মা বলবে—অন্য আর কারো ছেলেটি যদি মা বলে—তা শুনতে যতই মিষ্টি লাগুক না কেন—তবু যতটুকু মা নিজের ছেলেটির প্রতি দাবী করেন পরের ছেলেটির প্রতি তার কিছুই করেন না। সে যে পর, তার দূরত্বটুকু মা কিছুতেই ঘুচিয়ে নিতে চান না। এই আপন পরের সমস্যায়ই কি মায়ের দুর্ব্বলতাটুকু ধরা পড়ে যায় না? তাই বলতে হয় যে মা জাতি নিজের সন্তানকেও মায়ের স্নেহে প্রতিপালিত করেন না। এ শুধু স্বার্থের ভালবাসা। পরের ছেলের সঙ্গে স্বার্থের কোন যোগ নেই, তাই পর বলে পরের ছেলেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এতে কি মায়ের নিঃস্বার্থ ও সুনির্ম্মল স্নেহে সন্তান বিমল সুখের অধিকারী হতে পারে? স্বার্থের দাসী মা কি ছিলেন কোন দিন? কিন্তু প্রকৃত মা যিনি, যিনি মাতৃত্বের গৌরব এমনিভাবে যথেচ্ছা রকমে লুপ্ত হতে ও হেয় করে দিতে চান না, আপন পর জানেন না, বিশ্ববাসী সমস্ত সন্তানদের মধুর কল্যাণস্বরে বিশ্বজুড়ে "মা" এই ধ্বনি শুনে অমৃতময়ী মায়ের বুক মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায়

নির্ম্মল স্নেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। মাসী মাও তাঁদেরই ভিতর একজন। আজ তাঁর বড়স্নেহের বড় আদরের সন্তানরা বিদেশীদের হাত থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করতে যেয়ে জেলখানায় পিষে মরছে। তাই মা সন্তানদের দুর্দ্দশা দেখে ঘরে থাকতে পারেন নি—ঘৃণা বিলাসিতার মত্ততায়।

কিন্তু তাঁরই মেয়েরা আমরা, এবং মাসীমার প্রিয় ভগ্নীরা আজও বিলাসিতার মোহময় কুহকে ভুলে তারি কোলে গা ঢেলে দিয়ে চোখ বুঁজে আরামে একেবারে ঘুমিয়েই পড়েছি। এটা কি এখন বিলাসীতার সময়, না মরণ বরণের দিন এসেছে—চোখ খুলে একটিবার চেয়ে দেখতেও আমরা একবারেই নারাজ। আজ যদি আমরা বোনরা ভাইদের পাশে দেশের জন্য দাঁড়াতে পারতাম এবং দেশের মারাও মাসীমার মতই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে ছুটে এসে দাঁড়তেন তাহলে বোধ হয় আমাদের এতগুলি ভাই আজ যম যাতনায় পঁচে মরত না। তাঁরা মায়ের উৎসাহে বোনের উৎসাহে নূতন উদ্যমে দেশের বিপদ সঙ্কুল কর্ম্ম ক্ষেত্রের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ত—মায়ের ও বোনের শুভাশীষ মাথায় নিয়ে। মায়ের আশীষ পেলে সন্তানের কি না হয়? কিন্তু আজ সেই মারাই যখন সন্তানদের নিজের হাতে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে বিলাসিতার আড়ম্বরে নিজকে ডুবিয়ে রেখে সংসারে জড়পদার্থের মত পড়ে আছেন—তাঁরা কি আবার পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী, সংযুক্তা—এদের বোন হবার স্পর্দ্ধা রাখেন? না আমরা তাঁদেরই কন্যা একথা বলে গৌরব করতে পারি কখনো? তাঁদেরই রক্ত এখনো আমাদের শিরাতে ধমনিতে মিশে আছে—আমি বলব এ গৌরব করলে আমাদের আর্য্যা সতীলক্ষ্মী 'মা' দের তাতে অপমান করব আমরাই। তাঁরা কি তাঁদের স্বামী পুত্র ভাইদের শুধু দেশের কাজে পাঠিয়ে আমাদের মত নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন? না তাঁরাই স্বামী পুত্র ভাইয়ের আগে দেশের জন্য, নারীত্বের এবং মাতৃত্বের মর্য্যাদায় কলঙ্ককালি লেপন না হবার জন্য—প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন? আমরা কি সেই বীরমাতা বীরজায়াদের গৌরব কাহিনী ইতিহাসের অমর গাঁথায় পাই না? তবু ভ্রান্ত হয়ে কেন এত গর্ব্ব করি?

দেশের কর্ত্তব্য কাজে নারী পুরুষ দুয়েরই সমান অধিকার। আমরা ভাবি যে এটা বুঝি শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া। পদ্মিনী কর্ম্মদেবী এরা যে আমাদের মা বোন্ একথা ঠিক্। কিন্তু আমরা তাঁদের মেয়ে ও বোনের যোগ্যতা কিছু রেখেছি কি? এ গৌরব এখন আমাদের মোটেই শোভা পায় না। যেদিন বিশ্ববাসী সকল ছেলেরা ও ভাইরা দেখবে যে তাঁদেরই জন্য এবং দেশের জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁদের আগে মরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছি সে দিনই তাঁরাও গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে এবং আমাদেরও সেই দিন মনে করবার দিন আসবে যে আজই আমরা আমাদের কল্যাণী মায়ের প্রকৃতই যোগ্যা কল্যাণী কন্যা এবং বোন্। তার আগে নয়। এত দিন আমরা নিজেরাও ভুল বুঝে আমরা নারী মহীয়সী বলে যে গর্ব্ব করে এসেছি পুরুষদের কাছে—সে সব ভুল। আমরা তাদেরে শুধু ঠকিয়েছি। আমরা প্রত্যেক নারীই যে মহামায়ার অংশ একথা ভুলে গিয়ে আমরা জেনেছি এখন যে প্রত্যেক নারীই বিলাসিতার ও অলসতার অংশ। অলসপ্রিয় আমরা এতটা হয়ে উঠেছি যে নিজের হাতে চরকায় সুতো কেটে কাপড় তৈরী করে দেশের কাজে স্বামী পুত্র ভাইদের সাহায্য করতে চাই না ও তাদের মঙ্গল করতে চাই না, শুধু আমাদের অলসতার ও ঘুমের অভাব হয় বলে।

নারী জাতি কি এমন পাষাণ ছিল কোন দিন? ঘুম কি আমাদের এতই মিষ্টি যে সন্তান ও ভাই আজ দেশের জন্য মরণকে বরণ করে নিয়েছে—আমাদের তবু ঘুম ভাঙ্ছেনা। তাই একজন কবি বড় দুঃখে নারীজাতিকে সম্বোধন করে গেয়েছেন—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা—
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

জাগবার দিন আমাদের কোন দিন আসবে জান? যে দিন নাকি 'পর-পর' বলে দূরে সরে থাকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভগবানের দণ্ডবিধান নিজ নিজ স্বামী পুত্র ভাইয়ের বুকের উপর এসে পড়বে, সেই দিন। তখন জাগব, চরকাও ধরব। নারীজাতীর পক্ষে এর চাইতে দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে কি? কি

রকম ঘৃণার পাত্র আজকাল হয়ে উঠেছি আমরা। নারীর এই কলঙ্ক যাতে ধুয়ে মুছে ফেলে দিতে পারা যায় ও নারী যে মহামায়ার অংশ—আগেও ছিল এবং এখনও আছে, এই অহঙ্কার টুকু নির্ম্মূল ভাবে আবার যাতে নারীজাতীর ভিতর পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠতে পারে তাই কি আমাদের করা উচিত নয়? ভারতের নারী-শক্তি যা লোপ পেয়ে গিয়েছে তাকে পুনরোদ্ধার করে জাগিয়ে তুলতে হবে—ঘুম ছাড়িয়ে জাগতে হবে। চরকা ধরতে হবে—মুখে এই বাণী নিয়ে—

জাগতে হবে উঠতে হবে
লাগতে হবে কাজেরে ভাই লাগতে হবে কাজে।

তুমি এইটুকু জেনো যে দেশমাতৃকারূপে মাসীমা আমার কাণের কাছে মহাত্মাজীর বাণী শুনিয়ে আমার বিবেক বুদ্ধির প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছেন, নইলে এত শীঘ্র বোধ হয় এতটুকু হতো না। আমার ক্ষুদ্র নারী শক্তিকে জাগিয়ে তুলে চরকা ধরব—মাসীমার মহিমাময়ী পবিত্র মূর্ত্তিটি আমার ধ্যানে ফুটিয়ে রেখে। এবং তাঁরই আদর্শে চলতে চেষ্টা করব। দেশের কর্ত্তব্য কাজে আমার সম্পূর্ণ সার্থকতায় আমি যেন কর্ত্তব্যের পথে পরিপূর্ণ হয়ে ফুটতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ করো। মাসীমাকে প্রণাম শত সহস্র বার। কোন্ শুভমুহূর্ত্তে জানি না তিনি দেবী দেশমাতার বার্ত্তা বহন করে এনে কল্যাণসুরে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে দেশের কাজে নারীশক্তির কর্ত্তব্য অত্যন্ত বেশী। আর লিখিবার কিছু নেই।

তোমার 'সুজাতা'
শ্রীজ্যোৎস্না রায়।

পল্লী-সঙ্গীত।

ভগবানের কৃপায়, পূর্ব্ববঙ্গে সঙ্গীত রচয়িতার অভাব ছিল না ও নাই। বঙ্গমাতা এ বিষয়ে কোন দিন কৃপণতা করেন নাই। কিন্তু এ প্রদেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ যে কোন সাহিত্যের পরিপোষক, উৎসাহ দাতা ও উপযুক্ত সমজদার না থাকায় কত রত্ন খনির তিমির গর্ভে থাকিয়া জল বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, ও যাইতেছে; কে তাহার খোঁজ রাখে। এখন ও যে দুই একটী কবিতার পদ বা পদ্যাংশ রসজ্ঞ বর্ষীয়ান ব্যক্তির বা কৃষক ও রাখাল বালকের স্মৃতিপ্রথারূঢ় থাকিয়া, কদাচিৎ পথে ঘাটে গোচারণের মাঠে মুখরিত হইয়া তথা কথিত অজ্ঞাত কুলশীল কবির, অস্তিত্বের ক্ষীণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কে জানে ঐ সকল জন কয়েক ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিস্মৃতির চির অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া, শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া যাইবে না!

পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে অধিকাংশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেই সাহিত্য সমালোচনার জন্য লাইব্রেরী আছে। তাহাতে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য রসজ্ঞগণ একত্র হইয়া সাহিত্য সুধাপান করতঃ পরিতৃপ্ত হন। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় লুপ্তপ্রায় কবিতা ও সঙ্গীত গুলি রক্ষা করিয়া থাকেন; এবং নবোদিত কবিদিগের রচনাগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে একদিকে যেমন ব্যবসায় হিসাবে প্রকাশক লাভবান হইয়া থাকেন, অন্যদিকে তেমনি লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়া সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট হয়, পরন্তু উদীয়মান নবীন কবিদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে নূতন চিন্তার সুযোগ প্রদান করে।

কতিপয় বৎসর হইল উত্তর বঙ্গে মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের প্রযত্নে কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের অক্লান্ত শ্রম এবং অর্থানুকুল্যে যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহাতে বহু প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার এবং অনেক প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে তাদৃশ প্রতিষ্ঠান বা চেষ্টা কোথায়ও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এরূপ প্রতিষ্ঠান জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইলে যে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইত, ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের এ জিলার অধিকংশ অধিবাসী নিরক্ষর ও অশিক্ষিত হইলেও কবিত্ব সম্পদে ময়মনসিংহ জননী কোন কালে দুঃখিনী নহেন; আজ ময়মনসিংহ গীতিকা জগতের সম্মুখে তাহা প্রমাণ করিতেছে। ভগবৎ কৃপায় মনুষ্য নিরক্ষর হইলেও মূর্খ ও কবিত্বহীন হয় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ সঙ্গীত রচয়িতা নিরক্ষর কিন্তু মূর্খ নহেন। অনুসন্ধান করিলে শিক্ষালোক প্রাপ্ত বহু গ্রন্থ পাঠে সক্ষম অনেক

এ দেশে পূর্ব্বে কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কবি, হোলীগান, ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে পরিমাণ ধর্ম্ম জ্ঞান বিস্তার হইত এবং সাধারণ লোক নিরক্ষর থাকিয়াও যে পরিমাণে শিক্ষিত হইত, এখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তদপেক্ষা বেশী শিক্ষা লাভ হইতেছে, একথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্ম্ম প্রবণ জাতি। ইহাদের শিক্ষা পদ্ধতি হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা বাদ দিলে, যাহা থাকে, তাহা আর যাহাই হউক, তাহা যে সুশিক্ষা নহে, ইহা খাটি সত্য।

এ জেলার নানা স্থানে হিন্দু, মুসলমান কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত বহুবিধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত হইতে ভজন, কবি, দেহতত্ব, হোলী, কীর্ত্তন, পাগলা কানাইর গান, ভাসানযাত্রা, ঘাটু, বারমাসি, জারী, ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর ধর্ম্মমূলক ও ঐতিহাসিক গীত রচিত হইয়া এককালে শ্রোতার আনন্দবর্দ্ধন ও নিরক্ষর জনগণের ধর্ম্ম ও ইতিহাস জ্ঞানের সহায়তা করিত। ঐ সকল গীত রচনাকারী অধিকাংশ ব্যক্তিই সহায় সম্পদ শূন্য, প্রতিপত্তি হীন ও নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক বড় কেহ ছিল না, এজন্য তাঁহাদের রচিত গীতগুলি, অযত্ন প্রসূত বনকুসুমের মত স্বভাব কর্ত্তৃক ফুটিয়া আপনিই ঝরিয়া পড়িয়াগিয়াছে; কেহই কোন খোঁজ রাখে নাই। এখনও প্রাচীন লোকের মুখে ঐ সকল কবির গীতের দুই এক চরণ যাহা শুনা যায়, তাঁহার ভাষা ও ভাব-মাধুর্য্যে মন প্রাণ আকৃষ্ট হয়।

আমাদের এই আলাপসিংহ পরগণার অনেক স্থানে ঐ প্রকার নানা শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-কবি বর্ত্তমান ছিলেন; তন্মধ্যে হোলীগান, রচয়িতার সংখ্যাই বেশী। সেকালে সংকীর্ত্তন ও হোলী গানের লড়াই প্রায় প্রতি গ্রামেই হইত। এই সকল সঙ্গীতের জিজ্ঞাসা ও উত্তর দেওয়ার প্রণালীকে সাধারণতঃ চাপান ও জবাব নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল সঙ্গীত যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক যোগ দিতেন। এখন যেমন উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য সভা, সমিতি বক্তৃতা অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই, অথচ প্রকৃত মিলনের প্রমাণাভাব ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে কিন্তু এ জিলাতে হিন্দু মুসলমানের এরূপ অনৈক্যের গন্ধ মাত্রও ছিল না। তখন উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর প্রেমালিঙ্গন ও কোলাহলে পল্লী ভূমি মুখরিত ছিল। কুক্ষণে এই অভিসপ্ত জাতির সমাজ দেহে অনৈক্যের জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে—আমরাও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যাইতেছি। সে যাহা হউক, তৎকালে এই সকল সঙ্গীত যুদ্ধে উভয় সম্প্রদায়ের নিরক্ষর লোকের বহুল পরিমাণে ধর্ম্মশিক্ষা ও ইতিহাস জ্ঞান জন্মিত; এবং এগুলি উভয় সম্প্রদায়ের একতা পরিবর্দ্ধনের সহায়তা করিত, সর্ব্ব শ্রেণীর লোক বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতেন; এবং ঐ সকল বাদানুবাদযুক্ত গীতে ভাষার পুষ্টি সাধন হইত। বহু ব্যয় সাধ্য শিক্ষাতে এখন সমাজের এক শ্রেণীর অতি সামান্য লোকই অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই পূর্ব্বোক্ত সহজলভ্য শিক্ষা প্রণালীর তিরোধানে পশুবৎ হইয়া যাইতেছে। অসৎকর্ম্ম করিলে পাপ হয়। পাপ করিলে পরিণামে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। এই সকল শিক্ষা পূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণে পৌরাণিক উপাখ্যান মূলক পল্লী কবিদের নানাবিধ গানের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য আমোদ সমূহ লুপ্ত হওয়াতে সমাজে এখন অনাচারের মাত্রা দিন দিন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। পৌরাণিক যুগের এই ভারতের ঔশিনর, শশবিন্দ, মরুত্ত, রন্তিদেব, প্রভৃতি দানশীল, যজ্ঞশীল ও সর্ব্বস্বত্যাগী মহাত্মা রাজর্ষিগণের নাম পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষিত যুবকের নিকট অপরিচিত। অথচ তাহারা মোগল, পাঠান ও পাশ্চাত্য রাজবংশের আমূল বৃত্তান্ত এক নিশ্বাসে বলিতে পারেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সমাজের নিম্নস্তরের নিরক্ষর ব্যক্তিরাও সবক্তগীন, আলতামাস, তৈমুরলঙ্গ, বাবর, টলেমি প্রভৃতির বংশ পরিচয় না দিতে পারিলেও, হিন্দুর রামায়ণ মহাভারতোক্ত, সূর্য্য, চন্দ্র বংশের নৃপতিগণের বৃত্তান্ত অনেকে অবগত ছিল। আমি বাল্যকালে, আমাদের বাড়ীর চাকর, দবু সেখের নিকট রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের, অনেক তত্ব শিক্ষা পাইয়াছিলাম। এই দবু সেখ হোলীগানের দোহার ছিল। আমরা শিশুকালে দেখিয়াছি, সরস্বতী পূজার সময়, হইতে দোলযাত্রার পর বারুণী তিথি পর্য্যন্ত, প্রতি পল্লীতে হোলীগানের

পাল্লা হইত।* উহাকে সাধারণ ভাষায় হোলীর লড়ক বলিত। বোধ হয়, লড়াই শব্দের অপভ্রংশই লড়ক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে ঘোষবাড়ীর, কৃষ্ণসুন্দর অগ্রয়, মুক্তাটীর শ্রীকান্ত অধিকারী, বাঁশাটীর কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঘোষবাড়ীর লোকনাথ সূত্রধর, রূপাথালীর দামোদর পণ্ডিত, রবিলোচন পণ্ডিত, রামচন্দ্র নাথ, রামজয় দে সরকার, নিমতলার উমাচরণ নাগ, কলাকান্দার নীলমণি চন্দ, বাণিয়াকান্জির, রামহরি চন্দ, লাঙ্গুলীয়ার হরগোবিন্দ দে, চিতলীয়ার কমলচন্দ্র ভৌমিক, তারাটীর শম্ভুনাথ ধর, মুক্তাগাছার প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও বহু ব্যক্তি অল্পাধিক পরিমাণে হোলীগানের চর্চ্চা করিতেন। ঐ সমস্ত হোলী রচয়িতাদের মধ্যে অনেকের গীত অতি উৎকৃষ্ট ও উচ দরের ভাবপূর্ণ ছিল।

ঘোষবাড়ী নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর অগ্রয় মহাশয়ের পিতা ৺কিশোরচন্দ্র অগ্রয় মহাশয়ও উৎকৃষ্ট গান রচনা করিতেন। তাঁহাকে আমি দেখি নাই, কিন্তু সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট তাঁহার ২।১ টী গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একটী গানের কিয়দংশ আমার মনে আছে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া রূপ মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—

আতশী চশমাতে আগুন জ্বলে তপন তাপ মিশাইলে
তেম্নিত অনল দেখি রাই তোমার বদন কমলে।
সে আগুনে বন পোড়ে,
এ আগুনে মন পোড়ে,
এমন মা পোড়া আগুন কেব রাখ্‌লো বদন কমলে॥

উক্ত কবির আরও দুই একটী গানের পদ কিছু কিছু স্মরণ আছে। কিন্তু সেই সকল গানে আদি রসের বাহুল্য থাকায় এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। নিম্নে চিথলিয়া নিবাসী স্বর্গীয় কমলচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের একটী গান লিখিত হইল। ইহাতেই বোধ হয় অনেক মার্জ্জিত-রুচি-পাঠক, নাসিকা কুঞ্চিত করিতে বিরত হইবেন না। কিন্তু আধুনিক কথা সাহিত্যে যেরূপ নায়ক নায়িকার অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া এক শ্রেণীর গ্রন্থকার সাহিত্যের সম্রাট উপাধি লাভ করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেহ লেখনী ধারণ করিলে, তরুণের দল আর্টের দোহাই দিয়া লেখককে এক ঘরে করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন, আমাদের আলোচ্য গ্রাম্য কবির গান আদ্য রসের বাহুল্য থাকিলেও সে রসে সেরূপ কাম গন্ধ নাই।

জটিলা কুটিলা সর্ব্বদা শ্রীমতী রাধিকার বিরুদ্ধে আয়ানকে উত্তেজিত করিতেছে। আয়ান নিরীহ ভাল মানুষ; সে মাতা ও ভগ্নীর হইয়া রাধিকাকে কোন নির্যাতন করিতেছে না। এজন্য কুটিলা আয়ানকে নিরতিশয় অনুযোগ করিলে আয়ান তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ ঔদার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়াই কুটিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ঘরের মুষিক কাটে রশি, কারে আমি দিব দোষ।
(বড়াই) বুড়ী হইলো, সখ্ মিটাইলো, তবু যায় না
সে আপসোস্।
দিবা নিশি প্রেম চাতুরী,
সামলাতে পারে না ছুড়ী,
বৃন্দা করে কুটনাগিরি, মোক্তার হয় তার সুবল ঘোষ॥

অর্থাৎ—আয়ান বলিতেছে—রাধিকার বেশী দোষ নাই, তাঁহার বয়স অল্প, পুরোহিত গর্গমুনির ভগ্নী বড়াই (বড় আই) সর্ব্বদা রাধিকার নিকট প্রেমালাপন করে এবং রাধিকার রক্ষয়িত্রী বৃন্দা সর্ব্বদা দূতীগিরি করিয়া থাকে। শ্রীমতীর ভ্রাতা সুবল সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা চালাইয়া থাকে; এক্ষেত্রে রাধিকার কোন দোষ দেখি না। যত দোষ তোমাদের; কেন না, তোমরা উহাদিগকে আমল দেও... ইত্যাদি। এই যে তত্ত্ব ইহা অশ্লীল নহে। ইহা রসজ্ঞ ব্যক্তির উপভোগ্য।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে কৃষ্ণসুন্দর অগ্রয় মহাশয়ই হোলী গানের রাজা ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিয়া বহুতর হোলী গানের দ্বারা রচনা করয়া বহু নিম্নস্তরের গায়কদিগকে বিতরণ করিতেন। কেবল হোলী কেন, কবিগান মদন চতুর্দ্দশী যোগে এদেশে যে জাগ গান গীত হইত, তাহার অধিকাংশ তিনিই রচনা করিয়া দিতেন, এজন্য তিনি অনেক স্থলে আর্থিক সাহায্যও পাইতেন শুনিয়াছি। ১২৯৮ সনের কার্ত্তিক মাসে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবিত সময়ে তিনি এ

প্রদেশে হোলীগানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন এখনও বহু পল্লিতে তাঁহার রচিত সুর ও গান গীত হইয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন আমরা লহর কবির অনুকরণে দীর্ঘ সুর প্রচলন করিয়া, নূতন প্রণালীতে বহু পদবিশিষ্ট হোলী গানের সৃষ্টি করিলাম, তখন হইতেই, তাঁহার টপ্পার অনুকরণ বিশিষ্ট চা'র চরণের হোলীর প্রথা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু এখনও রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার গান আস্বাদনে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

তৎকালে কৃষ্ণসুন্দরের প্রভাতী ও গোষ্ঠ গানে পাষণ্ড ব্যক্তির হৃদয়ও দ্রব হইত, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরী ছিল, উপস্থিত বোলে, বিপক্ষের গানের উত্তর প্রদানে; যেমন করুণ রসাত্মক গান বাঁধিতে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, তেমনি হাস্য ও বিভৎস রসেও তাঁহার অনন্য সাধারণ শক্তি ছিল। জীবনে তিনি বহু শত গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান আছে তাঁহার নিকট শুনিয়াছি একখানা গানের খাতাও তাঁহার নিকট নাই। ইহা লড়ায়ে সঙ্গীত, যাহার হাতে পড়ে সেই উহা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য সময়ানুসারে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বিপক্ষকে পরাজয় করিবে। কিন্তু কালক্রমে উহা লুপ্ত হইয়াই যায়। যেমন যুদ্ধের অস্ত্রে দীর্ঘ কাল শান না দিলে, মরিচা ধরিয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ এই সকল নূতন ২ জংলা তাল-লয় যুক্ত গীতগুলি নির্দ্দিষ্ট সুর ব্যতীত অন্য সুরে গাওয়া যায় না সুতরাং গান করিতে না পারিয়া, জীর্ণ অস্ত্রের মত ফেলিয়া দেয়। নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ইহা লইয়া শেষে টানাটানি করে। এইরূপে কত রত্ন যে লুপ্ত হইয়াছে তাঁহার সংখ্যা কে করিবে?

প্রবন্ধ লেখকেরও বহু সংখ্যক সঙ্গীত এইরূপে অপহৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণসুন্দরের দুইটী হোলী গান পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কংশের ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের রথে আরোহণ করিয়া মথুরায় গিয়াছেন। সে স্থান হইতে আর বৃন্দাবন আসিতেছেন না। শ্রীরাধিকার অনুরোধে বৃন্দা দূতী মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছে—

এসেছ শ্যাম মথুরাতে পেয়ে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
হ'লো যজ্ঞ সাঙ্গ, ধনুর্ভঙ্গ কংশ রাজার হয় মরণ।
আর এক যজ্ঞ বৃন্দাবন,
এই ধর তার নিমন্ত্রণ,
আমি রথ নিয়ে আসি নাই, কর মন রথে আরোহণ॥

দ্বিতীয় পাল্টা।

নূতন একটী যজ্ঞ করবেন যজ্ঞেশ্বরীর আকিঞ্চন।
তুমি মথুরায় আসিলে কুণ্ডে অগ্নি হ'লো সংস্থাপন।
কোকিল ময়ূর ভৃঙ্গগণ,
তৃণ কাষ্ঠ আহরণ,
করে অনুক্ষণ,
সেই যজ্ঞেতে ঘৃতাহুতী দেয়—আপনি আইসে মদন॥

আমাদের অশিক্ষিত পল্লি কবির উপরি উক্ত গান দুইটী রসজ্ঞ সুধিবৃন্দ সমালোচনা করিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীমদনমোহন ঘোষ।

স্নেহের কাঙ্গাল।

ছিলি তুই স্নেহের কাঙ্গাল।
ওরে মাতৃহীন শিশু, আদরের আছিলি দুলাল
নিতান্ত যাঁহার তুই, সেও তোরে গেছিল ছাড়িয়া,
মরুমাঝে ক্ষুদ্র তরু অনিচ্ছায় রহিলি বাঁচিয়া?
শুধুই কি তপ্তবালু, হেথা কিরে না ছিল সলিল,
শিশিরের স্নেহস্পর্শ বহিত না মৃদু সন্ধ্যানিল?
তবে কেন নিতি নিতি সেজেছিলি নব সুষমায়,
ভাবী কুসুমের শ্রীতে মুকুলিত শ্যামল শোভায়?
গোপন সঞ্চিত যত আমাদের অন্তরের সুধা
তাহে কিরে মিটে নাই তোর ওই সর্ব্বনাশী ক্ষুধা?
বৃথা অভিমান ভরে কি সে স্নেহ, কাহার মায়ায়,
কোন স্বপনের পিছে চলে গেলি কিসের আশায়?
মোদের হৃদয়গুলি তোরি তরে আছিল উন্মুখ,
তবু দিয়ে গেলি ব্যথা? শূন্যতায় ভরে দিলি বুক!

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত।

আদর্শ।

দয়াল বাবু বড়ই সন্তানবৎসল ছিলেন। এই সন্তান বাৎসল্যের কারণ, বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ। তাঁহার প্রথমা পত্নী সুলোচনা দ্বাত্রিংশত বর্ষে নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে তিনি নিজের শক্তির প্রতি সন্দেহ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যে নিরাশ হইয়াছিলেন। পোষ্যপুত্র দ্বারা যে পরলোকের পথ পরিস্কার হয় না, এবিশ্বাস তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় ছিল; পরন্তু পোষ্যপুত্রগুলি যে ইহজন্মের পথই ঘোরতর কণ্টকাকীর্ণ করিয়া উঠায় এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান খুবই প্রবল ছিল।

সুলোচনার মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে দুটী বৎসর অনেক কন্যাদায় গ্রস্তেরই আবেদন নিবেদন ব্যর্থ করিয়া অবশেষে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বিশেষতঃ কিশোরী বাবু ডাক্তারের অনুরোধ ও নির্ব্বাচনে দয়াল বাবু একটী বহু ভ্রাতৃযুক্তা সুলক্ষণা কন্যার পিতাকে দায় হইতে মুক্তি দান করিয়া পরলোকের দিকে আশান্বিত হৃদয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ডাক্তার কিশোরী বাবু বলিয়াছিলেন—সন্তান বহুলা মাতার কন্যা গ্রহণ করিলে বংশ রক্ষার জন্য মোটেই চিন্তা করিতে হয় না। কিন্তু কাদম্বিনী যখন বিবাহের পরও চার পাঁচ বৎসর মধ্যে কোন ফলই প্রসব করিলেন না, পরন্তু দীর্ঘে প্রস্থে বাড়িয়াই চলিলেন, তখন দয়াল বাবু আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সংসার যখন পাতিয়া বসিয়াছেন, তখন নিঃসঙ্গ বৈরাগ্য বা সাধনা চালাইবার আর উপায় কি? সংসারে থাকিয়া সেইরূপ পন্থায়ই পরকালের সম্বল করিতে হইবে।

কিশোরী ডাক্তারের সাহায্যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই কিছু কাল চিকিৎসিত হইলেন; তারপর দয়াল বাবুর দেশীয় "টুট্‌কা নাট্‌কার" উপর ঝোঁক পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কাদম্বিনীর হার ও অনন্তের স্থান বহু স্বর্ণ, তাম্র ও লৌহ মাদুলী-কবজের সমাবেশে স্থূল হইয়া উঠিল।

এই সময় এতদ অঞ্চলে "পোয়াতি বিলের" জাগ্রত নাম প্রচার হইয়া উঠিয়াছিল। সে তীর্থে যে, যে চিন্তা করিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে—গৃহে ফিরিতে না ফিরিতেই সে তাহার কাম্য ধন লাভ করিয়াছে"—লোক মুখে এই কথা—হাটে মাঠে ঘাটে প্রচারিত হইয়া দেশের শান্ত অশান্ত উভয় শ্রেণীর লোককেই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। দয়াল বাবুর কর্ণেও এই কথা পহুছিয়াছিল।

দেশের লোক যাইতেছে আসিতেছে, কাহারও মনে বিরক্তির লেশ মাত্র নাই, বরং সকলেরই মুখে কাম্য ধন প্রাপ্তির লাবণ্য-লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া দয়াল বাবুও একদিন সস্ত্রীক সেই গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। অবিশ্বাসী লোক হাসিল। তাঁহাদের হাসি কান্নায় কি আসিয়া যায়!

তীর্থ স্নানের ফল বৎসর মধ্যেই ফলিল। কাদম্বিনী যথা সময়ে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া দয়াল বাবুর মুখ ও সম্মান রক্ষা করিলেন।

জয়ন্তের জন্মের পর কাদম্বিনীর আর সন্তান সম্ভাবনা দেখা গেল না। দয়াল বাবুর তাহাতে আপত্তি ছিল না; 'পুন্নাম' নরকের পন্থা পরিস্কার হইয়াছে, তবে একটী কন্যা হইলে—কামনার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিত না।

জয়ন্তের পনর বৎসর বয়সের সময় মা ষষ্ঠি কৃপা করিলেন; দয়াল বাবু কন্যার মুখ দেখিয়া ভগবানকে প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

এইরূপে বৃদ্ধ কালে দয়াল বাবু কামনানুরূপ পত্নী, পুত্র ও কন্যা লাভ করিয়া সুখে ও শান্তিতে দিন পাত করিতেছিলেন।

(২)

নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাহারও জীবন যায় না। পুত্র ও কন্যা-কামনা-সিদ্ধ দয়াল বাবুর শেষ বয়সে কন্যা-জামতা ও পুত্রবধূ দর্শনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এ বাসনা গৃহী মাত্রেরই স্বাভাবিক।

পিতা বিবাহের অনুসন্ধান করিতেছেন শুনিয়া জয়ন্ত মাকে লিখিয়া জানাইল "বি, এ পাস না করিয়া বিবাহ করিবার আমার ইচ্ছা নাই—ইহাই আমার স্পষ্ট অভিপ্রায়।"

পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের এই সৎ অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; অগত্যা স্নেহের কন্যা সুষমার জন্যই একটী কুলে-শীলে পাত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। পাত্র জুটিল। সৎ পাত্রে মণি ওরফে সুষমাকে অর্পণ

করিয়া দম্পতি যুগল গৌরীদানের পুণ্য লাভ করিলেন।

আট বৎসরের মেয়ে সুষমা বাড়ীতে যেমন পুতুলের সংসার পাতিয়া প্রকৃত সংসারেরই স্বরূপ-অভিনয় করিয়াগিয়াছে, দু দিন মাত্র শ্বশুর গৃহে বাস করিয়া সেখানেও সম বয়স্কা বালিকাদের সহিত ঠিক অনুরূপ অভিনয়ই করিয়া আসিয়াছে। এমন কি একদিন তাহার বৃদ্ধ শ্বশুর পর্য্যন্ত তাহার বালীর ভাত ও পাতার তরকারী গ্রহণ করিয়া তাহাকে হাস্য-প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সেই যে সুষমা বিবাহের পর পুনরায় পিত্রালয়ে আসিয়াছে, আর সে কখনও সেখানে যায় নাই। সে গৃহের কথা, সে গৃহের লোকদের কথা, বা সেই বিবাহ নামক উৎসবের কথা—আজ আর তার একেবারেই স্মরণ নাই। সে আজ একবৎসর অবিচ্ছিন্ন মায়ের কোল জুড়াইয়া, অনাবিল হৃদয়ে পূর্ব্ব ভাবেই খেলার ঘরে বসিয়া পুতুলের বিবাহ দিতেছে, নিমন্ত্রণের রান্না করিতেছে, নিমন্ত্রিতদিগকে পরিবেশন করিতেছে; পুতুল বধূর শ্বশুর বাড়ী যাওয়া উপলক্ষে বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন করিতেছে, উৎসবের গীত গাহিতেছে—একবারে সত্য সংসারেরই পাকা গৃহকর্ত্রীর অভিনয় সে করিতেছে—অথচ প্রকৃত সংসার কি ও এ সংসারের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ—অভাগিনী একটুও বুঝিতেছে না।

শ্বশুরালয় হইতে আসিবার কিছুকাল পরে একদিন—যে দিন তাহার মা ও বাপ তাহাকে বুকে জড়াইয়া লইয়া উচ্চরোলে গগন পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া কাঁদিয়াছিলেন—সে দিন মায়ের ও বাপের সঙ্গে সুষমাও কাঁদিয়াছিল। মার সঙ্গে যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্নান করিয়াছিল। ঘরে আসিলে বিন্দি পিসী সেই যে তাহার হাত হইতে শাঁখা দুগাছ খুলিয়া লইয়াছিল, সে কথাও আজ তার স্মরণ নাই। কোন জিনিস কেহ অনিচ্ছায় কাড়িয়া লইলে সে যেমন কাঁদে, সে দিনও সে সেইরূপ কাঁদিয়াছিল; সে যেমন কাঁদিয়াছিল, তাহার মাও তেমনি কাঁদিয়াছিলেন। মা কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার হাতে সেই যে শাঁখার পরিবর্ত্তে সোণার বালা পরাইয়া দিলেন, তাহাতেই তাহার কান্না থামিয়া গেল, তাহার পর হইতে আর তাহাকে কখন শাঁখার জন্য কাঁদিতে দেখা যায় নাই। তাহার মা সিঁদুর ছাড়িয়াছিলেন সুতরাং সুষমারও সিঁদুরের আব্দার ছিল না।

দয়াল বাবু আজ এক বৎসর এই দুর্দ্দমনীয় শোক হৃদয়ে বহন করিয়া আছেন। মা বাপের হৃদয় যে শোকে আজ মুহ্যমান সরল শিশুর প্রাণে আজ তাহার কোন অনুভূতি নাই; থাকিতেও পারে না। নিদারুণ সমাজ যে তাহার জন্য চির বৈধব্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে—শিশুর সরল প্রাণে তাহা কি করিয়া অনুভূত হইবে।

(৩)

জয়ন্ত সম্মানের সহিত বি, এ পাস করিয়াছে। পিতার নির্দ্ধারণ এখন সে আর অগ্রাহ্য করিতে পারে না। প্রাণের ভগ্নী সুষমার অবস্থা কিছু দিন তাহাকে এতই অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে যখনই তাহার কথা তাহার মনোমধ্যে উদয় হইত, অশ্রুতে তাহার চক্ষু ভরিয়া উঠিত; সে পুস্তকের অক্ষর দেখিতে পাইত না—পাড়িবে কি? এরূপ অবস্থায় সে যে বি, এ পরীক্ষা দিতে পারিবে, তেমনটাই আশা করিতে পারে নাই। এই সময় তাহার সতীর্থ রমেশ তাহাকে এক উপায় দেখাইয়াছিল; জয়ন্তের তাহাই হইয়াছিল এক পরম সান্ত্বনার কারণ। পরীক্ষার পূর্ব্বে এইরূপ প্রবোধ জয়ন্ত না পাইলে আজ তাহার বি, এ, পাস করাই কঠিন হইত।

জয়ন্ত বি, এল পড়িতেছিল। পিতা মাতার শোকসন্তপ্ত চিত্তে আঘাত দেওয়া জয়ন্ত আর সঙ্গত মনে করিল না। বাড়ীর আহ্বানে বিবাহের সপ্তাহ পূর্ব্বে সে আসিয়া বাড়ী পঁহুছিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে জয়ন্ত তাহাদের ভিতর বাড়ীর ঘরে তাহার জন্য নূতন করিয়া বিছান বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। গত রাত্রির অনিদ্রার গ্লানীতে শরীর খুবই দুর্ব্বল ছিল, শুইবা মাত্রই ঘুম হইল; এবং তাহা একটু দীর্ঘ সময় স্থায়ী হইয়াছিল। বেলা শেষে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন সে শুনিতে পাইল—বালবিধবা সুষমা—তাহার প্রাণের বোন মণি—তাহারি শিখানো মন-মাতানো সুরে তার সদ্য বিধবা পুতুলের জন্য ক্রন্দনের সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছে—

"সুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো !
মলিন স্মৃতিকণা বাসনা মাখা গো !
আরতো আসিবে না, আরতো আসিবে না"

* * *

গানের রেশ জয়ন্তের মন কাঁদাইয়া দিল। সুষমার কণ্ঠ-স্বর সর্ব্বদাই জয়ন্তকে আনন্দ দান করিত, সে বিধবা হওয়ার পরে জয়ন্ত কখনও তাহাকে ডাকিয়া গান গাইতে বলে নাই—তাহাকে লইয়া তেমন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে আর তাহার ইচ্ছা হইত না।

গান শুনিয়া জয়ন্ত চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া পাছের দরজা দিয়া বাহির হইয়া বড় ঘরে মার নিকটে যাইয়া বসিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

জয়ন্তের মুখে কথা আসিতেছিল না। জয়ন্তের দিকে চাহিয়া মা চমকিত ভাবে বলিলেন —"ষাট্ ষাট্—কিরে খোকা, কি ?"

তখনও সুষমা গাইতেছিল। জয়ন্ত গানের প্রতি ইঙ্গিতে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ঐ শুন মা মণির গান—সে তার নিজের কথাই গানে গাইতেছে, অথচ নিজের অবস্থাটা শিশু এখন বুঝিতেছে না। আমি বিবাহ করিতে পারিব না, আমাকে ক্ষমা কর......" জয়ন্ত আর কথা বলিতে পারিল না।

মাও কাঁদিলেন, তারপর নিজ বস্ত্রাঞ্চলে পুত্রের চক্ষু জল মুছিয়া বলিলেন—"কি করিব বাবা, মানুষের কি হাত আছে তাতে? ভগবান যাকে যে ভাগ্য দিয়া পাঠাইয়াছেন ... কাঁদিস না বাবা মণি যেন শুনে না—সে যেন না বুঝে......" বলিয়া মাও কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

জয়ন্ত চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না মা, আমি বিবাহ করিব না—আমার চক্ষের সম্মুখে আমার প্রাণের অধিক প্রিয়তম শিশু ভগ্নীটাকে—যাকে আমি কোলে রাখিয়া মানুষ করিয়াছি, চির জীবনের জন্য বৈধব্য নামক একটা কল্পিত অত্যাচারী দানবের হস্তে ক্রীড়া-পুতুল করিয়া রাখিয়া নিজে বিবাহ করিব! সে আজ নিজের অবস্থা বুঝিতেছে না, তাই হাস্য মুখে নিজের সেই শোকাবহ অবস্থারই কথা বলিতেছে; সে যে দিন বুঝিবে, সে দিন তাহার অন্তরাত্মা কি এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুলিবে না? তার আত্মা কি চিরদিন এই নির্য্যাতনকেই বরণ করিয়া চলিতে চাহিবে ?

এই সময় মণি তাহার পুতুলের কাপড় লইতে ঘরে আসিয়াছিল। জয়ন্ত তাহাকে ধরিয়া স্নেহের সহিত কোলে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মণি, তোকে এই গানটা কে শিখাইয়াছে দিদি—এই যে—সুধু সে রেখে গেছে চরণ ?

মণি দাদার স্নেহ ক্রোড়ে ধরা দিয়া আত্মহারা হইয়া বলিল—"এ গান যে প্রীতিদিরা প্রতিদিন গায়; এর যে আবার একটা নকল গানও আমরা জানি..."

জয়ন্ত বলিল—"সে কেমন ?"

মণি গুণ গুণ করিয়া গাইয়া শুনাইল—

"সুধু সে রেখে গেছে চার আনার পয়সা গো !
মলিন ছাতাখানা বাঁশের ডাঁসা গো ...

জয়ন্তের চক্ষু পুনরায় অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে মণিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল "বেশ যাও...খেলা কর গিয়া..."

মণি চলিয়া গেলে জয়ন্ত বলিল "আজ যাহা সে বুঝে না, কাল যখন সে তাহা বুঝিবে, তখন কি সে তার মা-ভাইকে ঘোর স্বার্থপর বলিয়াই মনে করিবে না ?"

মা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"হিন্দুর মেয়েরা কি তা মনে করিতে পারে বাবা! তেমন চিন্তা মনে আসা যে হিন্দু বিধবার পক্ষে দোষের।" কথাটী বলিয়া মা পুনরায় চক্ষু মুছিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

জয়ন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"তবে মা আজ আমাকে কেবল মনুষ্যত্বের জন্যই মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—আমার এই শিশু বোনটীকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া তোমাদের আদেশ রক্ষা করিতে পারিব না। তোমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কর।"

জয়ন্ত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

কর্ত্তা ঘরে আসিলে গৃহিণী তাঁহাকে পুত্রের এই আকস্মিক মত পরিবর্ত্তনের কথা সবিস্তারে জানাইলেন। শুনিয়া দয়াল বাবু প্রমাদ গণিলেন। পুত্রবৎসল পিতা

পুত্রের মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না বটে কিন্তু নিজদায়িত্বের বিষয় ও বিবাহের সংকীর্ণ সময়ের বিষয় ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রের মানসিক ভাব যে দিক দিয়া তাহাকে কর্ম্ম বিমুখ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে সে ভাব তাঁহার নিজের মনে উদয় না হইলেও সময় সময় অনুরূপ চিন্তা তাঁহাকেও এইরূপ শুভ কর্ম্মে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করাইত।

বৃদ্ধ দীর্ঘ জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে ভগবান কামীর কামনা অপূর্ণ রাখেন না—কিন্তু সেই কাম্য ধন সকল সময় কেবল সুফলই প্রদান করে না।

তিনি কন্যা কামনা করিয়াছিলেন, কামনা পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু সে কাম্য বস্তু হইয়াছে এখন তাঁহার চক্ষের শূল। পুত্র পাইয়াছেন। সে পিতার অনুরক্ত হইয়াছে, চরিত্রবান হইয়াছে; বিদ্বানও হইয়াছে—এখন বিবাহের পর যদি ভগবান কামনার ফল তেমন ভাবেই প্রদর্শন করেন—কন্যা ও পুত্র বধূ লইয়া শ্মশানে বাস!......

ধর্ম্মভীরু দয়াল বাবুর চিত্তে এরূপ কুচিন্তা মণির দুরদৃষ্ট সংঘটনের পর অনেক দিন হইয়াছে। তাই আজ গৃহিণীর মুখে পুত্রের ভাবান্তর উপস্থিতের সংবাদ পাইয়া তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পর—মণি ঘুমাইলে সব কথা শোনা যাইবে—মনে করিয়া দয়াল বাবু নীরব রহিলেন।

(৫)

যথা সময়ে পিতা পুত্রে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। জয়ন্ত বিনীত ভাবে পিতাকে বলিল—আমি সংস্কারের দিক দিয়া বিষয়টার বিচার করিতেছি না—সে বিষয়ে আমার এমন কোন অভিজ্ঞতাই নাই, যাহাতে আমি ঋষি বাক্যের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতে পারি—আমি প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট সম্মান রাখিয়াই বলিতেছি—যদি আজীবন একটী অবলা অশিক্ষিতা বালিকা তাহার কৈশর ও যৌবন সুসংযত ভাবে পরিচালনা করিতে পারে তবে একটা শিক্ষিত যুবক তেমন আদর্শে নিজ জীবন পরিচালন করিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে পারিবে না কেন? যদি মণি আদর্শ রক্ষা করিতে পারে—উত্তম; আমরাও তাহার আদর্শ অনুসরণ করিব। সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্য সকলেরই প্রয়োজনীয়! বিবাহটা এই ৪। ৫ বৎসর দেখিয়াই করাইতে পারিবেন; তত দিনে আমারও উপার্জ্জনের পন্থা হউক।..."

পিতৃভক্ত পুত্রের কথা পুত্রবৎসল পিতা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পুত্রের মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক ভাবের দিকে চাহিয়া সকল ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মণির অবস্থা চিন্তা করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী সেই দিন হইতে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের দিকে অতিরিক্ত ভাবে মনোযোগ প্রদান করিলেন—যেন মণি তাঁহাদের আদর্শেরই পূজা করিতে পারে।

* * *

দয়াল বাবু ও তাঁহার গৃহিণী এখন স্বর্গে আছেন। মণি তাহার দাদার আদর্শে ব্রহ্মচারিণী হইয়া দাদারই সঙ্গে ৺কাশী-ধামে অবস্থান করিতেছে। জয়ন্ত এমন অমৃতানন্দ স্বামী নামে পরিচিত।

৺শ্রীনিবাস আচার্য্য চৌধুরী।

ফটিতে পারিত গো ফুটিল না সে ——
মুকুলে ঝরে গেল......................

সত্য সত্যই আজ একটী আধ ফুটন্ত জীবন কুসুম উন্মেষিত প্রভাতে ঝরিয়া পড়িল। আমাদের প্রিয়দর্শন শ্রীনিবাস বাবু আর ইহ জগতে নাই। বিগত ৮ই শ্রাবণ তাঁহার জীবনরবি অকালে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

পরলোকগত শ্রীনিবাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় শ্রীনাথ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীনিবাস সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কয়েকটী গল্প সৌরভে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্য ব্যতীত সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যায়ও তাঁহার অনুরাগ ছিল।

তাঁহার পবিত্র আত্মা অসীমের চরণে চিরবিরাম লাভ করুক।

শোক সংবাদ।

ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, স্বাধীনতা মন্ত্রের মন্ত্র-গুরু, মহাবাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই। ২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবা দেড় ঘটিকার সময় ৭৭ বৎসর বয়সে এই অক্লান্তকর্ম্মী মহাপুরুষ নশ্বর-দেহের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। দেশের দুরদৃষ্ট এই দুঃসময়ে ভূপেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী পুরুষগণ একে একে চলিয়া গেলেন। ভগবান সুরেন্দ্রনাথের অমর আত্মার শান্তি বিধান করুন ও তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

৺সুরেন্দ্রনাথ।

বাংলা মায়ের পরাণে আর কতই আঘাত সয় না বল;
"চিত্ত"-শোকে চিত্ত-হারা শুকায় নি মার চোখের জল।
আজো রে ভাই কাঙ্গালিনীর আকাশ ভরা ব্যথার সুর,—
দেশ দেশান্তে বেড়ায় কেঁদে—সারা বিশ্ব শোকাতুর।
স্মৃতির অনল বাংলা জুড়ি আজি ও ভাই তেম্‌নি জ্বলে;
নিভেনি গো চিতার আগুন—এরি মাঝে তার নিলে?
সুরেন্দ্র মা-র সেরা ছেলে. নব জীবন আন্‌লে দেশে;
দেশ-প্রেমের সে প্রবল বন্যায়, সারা ভারত গেল ভেসে।
মাতৃপূজার পাঞ্চজন্য তারি মুখে প্রথম ফুটে;
রক্তমাখা মাতৃমন্ত্র তারি মুখে প্রথম ছুটে।
স্বদেশ প্রীতি, স্বদেশ সেবা, জাতি শিখে তারি কাছে;
দেশের তরে দশের লাগি সে-ইত প্রথম জেলে গেছে।
সে-ই পুরোহিত মহাসভার, রাজনীতিকের সে-ইত পিতা;
সুরেন্দ্রনাথ লেখেছিল আমাদেরই স্বরাজ গীতা।
জাতি আজি গড়ছে দেউল,—এ ভিত্তি যে তাঁরই গাঁথা;
তারি হাতের তৈরী যে ভাই এরি মাঝে ভারত মাতা।
তারি পথে চলছে নবীন সংস্কারের রাস্তা কাটা;
এরেই দেশ করে নিচ্ছে নূতন ছাঁচে পরিপাটী।
বর্ত্তমানের ভুল মুছে দাও—দূর অতীতের সে-ইত নেতা;
সে-ই করিল মায়ের বোধন—মাতৃমন্ত্রের প্রথম হোতা।
এমন বাগ্মী এমন সাধক কোন্ দেশেতে ক'জন মিলে;
বাংলা মায়ের সিংহ ছেলে কথাতে তাঁর অগ্নি খেলে।
কালের ডাকে গেল সুরেন কোন্ সুদূরের অচিন দেশ;
কাঁদ বঙ্গ, কাঁদ ভারত—নাইকো মোদের শোকের শেষ।
সে-ই ছিল ভাই ভারত মায়ের মুকুট বিহীন মহারাজ;
বেলার শেষে চলে গেল ভেঙ্গে ফেলে খেলার সাজ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সাহিত্য সংবাদ।

মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার সুকবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের "উপল-খণ্ড" বাহির হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা।

আশুজিয়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত "মহিম্নস্তোত্রম্" প্রাপ্ত হইয়াছি। মূল্য এক টাকা।

২০শে শ্রাবণ বুধবার গৌরীপুর পূর্ণিমা-সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আঠরবাড়ীর রাজগুরু, সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক চারিটি প্রবন্ধ এবং সাতটি কবিতা পঠিত হইয়াছিল। রাত্রি দশটায় সভা ভঙ্গ হয়।

শোক-সভা।

১৮ই শ্রাবণ মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনীর এক অধিবেশন হয়। রাজগুরু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার তরুণ সাহিত্য সেবী ৺শ্রীনিবাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ জন্যই এই বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বর্গীয় তরুণ সাহিত্যিকের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত করুণারঞ্জন দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দেবনন্দন পাণ্ডে, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুত মদনমোহন ঘোষ, শ্রীযুত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীমতী বিভাবতী দেবী চৌধুরাণী।

Shourabh—Reg. No.C 745.

ত্রয়োদশ বর্ষ। ভাদ্র—১৩৩২ অষ্টম সংখ্যা।

সৌরভ

সম্পাদক

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী।

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩৩২ | অষ্টম সংখ্যা।

রামায়ণে উপবাস তত্ত্ব।

রামায়ণী যুগে আর্য্য সমাজে অভিষেকের পূর্ব্ব দিবস যজ্ঞের জন্য উপবাস করিবার ব্যবস্থা ছিল। রাম ও সীতা তাহা করিয়াছিলেন। স্মৃতির বিধানে উপবাসের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রামায়ণের সেই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ যুগে যে সে বিধান ছিল না, তাহা এস্থলে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। রামায়ণী যুগের সময় নির্ণয়ে 'উপবস্তব্য' বা উপবাসের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা এস্থলে তাহার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিলাম।

অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে "উপবস্তব্যা" (উপবাস) শব্দটী এইরূপে আছে—রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন স্থির করিয়া তাহাকে বলিলেন—

তস্মাত্ত্বয়াদ্যপ্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহবধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা॥ ২৩

"রাম, তোমার এক্ষণ হইতে সংযত চিত্ত হইয়া রাত্রে পত্নীর সহিত উপবাস করিয়া কুশ শয্যায় শয়ন করা বিধেয়।" (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)। অন্যত্র—রাম এই সংবাদ জননী কৌশল্যাকে প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়াসহ।
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা॥ ৩।২।৪

"উপাধ্যায়গণ পিতাকে বলিয়াছিলেন অদ্য রামকে সীতার সহিত উপবাস করিয়া রজনী যাপন করিতে হইবে।" (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

এই অনুবাদ—আধুনিক কালে উপবাস সম্বন্ধে যে সংস্কার প্রচলিত আছে—তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে। এই সংস্কার ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থে কথিত উপবাস বিধির বিরোধী।

সাময়িক সংস্কার দ্বারা প্রাচীন রীতি-বিচারের এই জন্যই আমরা পক্ষপাতী নহি।

রামায়ণের সেই সুপ্রাচীন যুগে উপবাস বা উপবাস্তব্য শব্দে অনশন বা অনাহার বুঝাইত না।

যজমান ও তাহার স্ত্রী—পর দিবস যে যজ্ঞ হইবে—সেই যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া অগ্নির আগারে গিয়া সেই অগ্নির সন্নিহিত হইয়া শয়ন বা অবস্থানকেই উপবাস বা উপবাস্তব্য বুঝাইত। এই উক্তি শতপথ ব্রাহ্মণের।[২] ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এই নির্দ্দেশ স্বীকৃত হইয়াছে।[৩] রামায়ণের উক্তি দ্বয়ও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে। অনশন থাকিবার কোন আভাস উপর্য্যুক্ত শ্লোকদ্বয়ে আছে বলিয়া মনে হয় না।

বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য স্মৃতি-প্রভাব কালের লোক হইলেও উপবাস শব্দে তিনি অনশন ব্যাখ্যা করেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—"যাগরূপং ব্রতংনিশ্চিত্য গার্হপত্যাদাগ্নি সমীপে যো বাসঃ স উপবাসঃ।"

উপবাস দিনে ভোজন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যুগে বিশেষ কোন নিয়ম ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণের উক্তি—"তস্মাত্ত্বয়াদ্যপ্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা" প্রভৃতিতে সেই দিবসের কোন কর্ত্তব্যের আভাস নাই, নিশা কালের কর্ত্তব্যের ব্যবস্থাই আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উপবাস দিনের

২ শতপথ ব্রাহ্মণ ১।১।১।১১

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২।১০

দিবাতে যজমানকে পত্নীর সহিত ভোজন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে; এমন কি ইচ্ছা করিলে দম্পতি যুগল রাত্রিতেও ভোজন করিতে পারিবেন—বলা হইয়াছে।[৫] শতপথ ব্রাহ্মণে হবি ভোজনের কথাও আছে। আপস্তম্ব-শ্রৌত-সূত্রে অধঃশয়ন অর্থাৎ নীচে মৃত্তিকায় বা পাষাণে শয়নের ব্যবস্থা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।[৬] রামায়ণেও এই ব্যবস্থারই উল্লেখ আছে।

স্মৃতির যুগে উপবাস অর্থ অনশন ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

"উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ।"

প্রাচীন স্মৃতির এই নির্দ্দেশ নব্যস্মৃতিতে "অনশন" ব্যাখ্যাত হইলেও শ্রৌত সূত্রের আধুনিক টীকাকারগণ প্রাচীন রীতির ব্যভিচার করিতে সাহস করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রের টীকাকার কর্কের উক্তি ও গোভিল-গৃহ্য-সূত্র-ভাষ্যে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারধৃত পাঠ উদ্ধৃত করা গেল। কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রের টীকাকার কর্ক লিখিয়াছেন—"স চায়মুপবাসশব্দঃ নিয়তদ্রব্যকালপরিমাণেঽপ্যশনে উপলভ্যতে, যথা—চান্দ্রায়ণ-মুপবসেদিতি। অতো যমনিয়মবিষয়তোপবাসশব্দস্য।" "উপবসেদিত্যনেন অত্র অনশনং ন বিধিয়তে, কুতঃ?

কর্কের এই শেষ উক্তি—অনশনং ন বিধিয়তে কুতঃ—হইতে বুঝা যায়, এই সময় উপবাসের অনশন ব্যাখ্যা চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহারই প্রতিবাদ কর্ক করিতেছেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় যে প্রাচীন স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—"উপবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তুবাসো গুণৈঃসহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীর বিশোষণম্॥"[৮]

অর্থ—মনকে পাপ চিন্তা হইতে বিরত করিয়া উন্নত চিন্তায় বাস করাকে উপবাস বলে। তাহা শরীর বিশোষণ দ্বারা নহে।

নবীন স্মৃতিকারেরা "উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীর বিশোষণম্" এই শ্লোকের শেষ বচন "ন শরীর বিশোষণম্" পরিত্যাগ করিয়া "সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ" করিয়াছেন।[৯] এই রূপে ক্রমে উপবাস অর্থ—'অনশন' হইয়াছে।

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৪।১—২
৬ আপস্তম্ব শ্রৌত-সূত্র ৪।৩।১৪—১৫

উপবাস শব্দ যে প্রাচীন স্মৃতির যুগেও অনশন অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল সূত্র-গ্রন্থের এইরূপ নির্দ্দেশে এবং পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়নের "অভুক্ত্যর্থস্য ন" নির্দ্দেশে ইহার আভাস আছে।

আমাদের মনে হয়, উপবাসের সহিত অনশনের অর্থ সম্বন্ধের কল্পনা কাল ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নহে। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সময় রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী;

এইবার প্রকৃত প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাউক। রাম পিতৃ উপদেশ অনুসারে অভিষেক দিনের পূর্ব্বে রাত্রিতে সস্ত্রীক উপবাস ব্রত পালন করিয়াছিলেন; স্নান করিয়া নিয়ত-মানস-চিত্তে পত্নীর সহিত অগ্নির সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন; কুলদেবতা ও বংশ দেবতা সূর্য্যের[১১] উপাসনা করিয়াছিলেন। অনন্তর বিধি অনুসারে মস্তকে ঘৃত পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে সেই ঘৃত কতক

---

১১ মূলে "নারায়ণ" শব্দ আছে; যথা—

ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে॥৩।২।৬

নারায়ণ শব্দ দ্বারা বিষ্ণু বা সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করিবার ভাব অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার কারণ "সমাজের দেবতা" প্রসঙ্গে আলোচিত হইল। রাম বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু শব্দে সে কালে সূর্য্যকে বুঝাইত। (বিষ্ণুরাদিত্যঃ—দুর্গাচার্য্য) এ সম্বন্ধে প্রাচীন নিরুক্ত কারগণের মত পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। (১০০ পৃষ্ঠা) অযোধ্যাকাণ্ডের এই ষষ্ঠ সর্গের আরো অনেক কথাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহের যোগ্য। এই সর্গেও উপবাসের উল্লেখ আছে যথা—

'কৃতোপবাসস্ত তদা বৈদেহ্যা সহরাঘবম্।' ৯

এস্থলে যেন 'উপবাস' শব্দে 'অনশন' অর্থই প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

সূর্য্যোপাসনাই সে কালের যুগ-ধর্ম্ম ছিল। বেদের সাবিত্রী মন্ত্র সূর্য্যের উদ্দেশ্যেই কল্পিত। বৈদিক কালের অবসানে তাহা গ্রহণই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি তাহারই সাক্ষ্য দেয়। অযোধ্যার রাজবংশ যে সূর্য্যবংশ বলিয়া পরিচিত তাহাও যেন সূর্য্যের প্রাধান্যেরই পরিচয় প্রদান করে। রাবণ বধের পূর্ব্বে রাম সেই বংশ দেবতারই স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাম, কৌশল্যা প্রভৃতির যে 'নারায়ণের' পূজার উল্লেখ রামায়ণে আছে, তাহা সাবিত্রী মন্ত্রে সূর্য্যের ধ্যান বলিয়াই আমরা মনে করি। [সমাজের দেবতা অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

হবন করিলেন [১২] এবং অবশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ভক্ষণ করিয়া সেই দেবায়তন মধ্যেই বাক্‌যত হইয়া কুশ শয্যায় রাত্রি যাপন করিলেন।

না-ফোটা কুসুম।

১

সে যে এক না-ফুটা কুসুম!
সবে তার ভাঙ্গিবারে চেয়েছিল ঘুম,
সবে আশা জেগেছিল প্রাণে
আপনারে মেলি দেবে আলোকের পানে।
ওই আসে, আসে—
প্রসন্ন পূরবাকাশ উষালোকে হাসে,
বুক তার ভরি ওঠে পুলকে ও আশে
শিহরণ আনিল বাতাসে।
পাখী কণ্ঠে জাগে আবাহন।
জাগো, জাগো,—আঁখি মেলি জাগুক যৌবন
পূর্ণ করি লহ আপনায়
প্রভাতের অনাবিল প্রাণের ধারায়!
"খোল, আঁখি খোল,—
একান্ত আমারি পানে নত্র আঁখি তোল
নির্ব্বিচারে খুলে দেরে হৃদয় দুয়ার,"
আলো আসি ডাকে বার বার!

২

ওই আসে, আসে,—
মেঘের কালিমা বুঝি আলোকেরে গ্রাসে!
পাতাগুলি বলে সর্ সর্,
পূব হ'তে এল আলো—পশ্চিমেতে ঝড়।
সরিবার কোথা অবসর?
নিষ্ঠুর বাতাস ফেলে ধরণীর পর!
স্নেহের সবুজে গড়া কোথায় ভবন?
কোথা আলো—কোথা জাগরণ?

৩

বনের নিবিড়ে যেথা আলো নাহি পসে—
কুসুমটী পড়েছিল খ'সে,
শ্যাম শষ্পে, গুল্মদলে, স্খলিত পাতায়,
রচেছিল আঁধার কারায়!
কেহ নাহি আসে—
প্রাণ তার ভরা তাই শুধুই হুতাশে?
না, না, সেত' ভরে আছে পরাগে ও বাসে,
শিশির যে স্নেহ লয়ে হাসে!
নাই আলো, সফলতা, কোথা জাগরণ?
বুক ভরা আছে ত' স্বপন,—
আছে ত' ব্যথার সুখ, সজল নয়ন,
আসে সুর, ভাসে গুঞ্জরণ!
ধন্য করি কয়নি আলোক?
তবু তার নাহি ক্ষোভ, নাই আজ শোক!
আপনি যে ধন্য হবে, যাবে বিতরিয়া
গন্ধটুকু নিঃশেষ করিয়া;
যে ব্যথা জেগেছে প্রাণে, শুনেছে যে গান,
জগতেরে তাই দেবে দান।

৪

এ কামনা মিটিবে না? না ফুরাতে আশা
যাবে গান, স্তব্ধ হবে ভাষা?
কে যেন চরণে তারে যাইবে দলিয়া—
গন্ধ নাহি যেতে ফুরাইয়া?
ওই আসে, আসে,—
শ্বাপদের পদ শব্দ আনিছে বাতাসে,
চুপে চুপে ওই মৃত্যু আসে!

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

---

১২ মূলে আছে—"প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ। মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে॥" ২।২।৬

হুইলার সাহেব এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—"Placing on his head the vessel containing the purefying liquids &." এই 'purefying liquids' কি? হুইলারই স্বীয় পুস্তকের ফুট নোটে লিখিয়াছেন—"The purefying liquids are the five products of the sacred cow; viz :—milk, curds, butter, urine and ordure."

ইহা আধুনিক ব্যবস্থা শাস্ত্রোক্ত 'পঞ্চগব্য'। হুইলার সাহেব পঞ্চগব্যকে এই অনুবাদে স্থান দিয়াছেন কোন রামায়ণের বলে, বুঝিতে পারিলাম না।

রুষিয়ার কথা সাহিত্য।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য তার নিজস্ব ভাবধারাটীকে বিসর্জ্জন দিয়া বিজাতীয় ভাবাপন্ন হওয়ায় সাহিত্যের কতটুকু ক্ষতি হইয়াছে তাহা আজো বিচার সাপেক্ষ; কিন্তু এ কথা মানিতেই হইবে, আজ যে বিদেশী প্রভাব-পুষ্ট বিপুল সমৃদ্ধ সাহিত্য বাংলার শ্যামল বক্ষে নববসন্ত সমাগমে তরুরাজীর মত ফলফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে।

বাংলা সাহিত্যের এই "রেণেসাসের" যুগে আমরা বিশ্বসাহিত্যের সংযোগ পরিহার করিতে পারি কি ? আজ যে বৈদেশিক সাহিত্যের আলোচনায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এতে বাঙ্গালীর রসবোধের ক্ষেত্র একটু পরিসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সঙ্কীর্ণতা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থি। সাহিত্য ক্ষেত্রে যাহারা সঙ্কীর্ণতার সমর্থন করিয়া নিজেদের ঘর লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে চান, তারা আপনাদের কল্পিত স্বদেশ প্রেমে অন্ধ হইয়া সাহিত্য সৃষ্টির পথ কণ্টকিত করেন। বিস্ময়ের বিষয় এই অক্ষয় দত্তের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সঙ্কীর্ণতায় সমর্থনকারীদের বাদপ্রতি-বাদের শেষ হইল না!

বৈদেশিক কথা সাহিত্য বাঙ্গালী অনেক হজম করিয়াছে, সুখও পাইয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু রুষিয়ার ঔপন্যাসিক সম্প্রদায় বাংলার শিক্ষিত নরনারীর চিত্তে যে অপরূপ রস-ধারার সৃজন করিয়াছে, তেমন আর কোন বৈদেশিক সাহিত্য করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। এর কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় রুষদেশের প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অনেকটা আমাদেরই মত। বিশাল রুষিয়ার অধিকাংশই কৃষিক্ষেত্র, প্রায় আমাদেরই মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতায় সে দেশ সমাচ্ছন্ন। আর তাদের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে আমদের কোন্ জায়গায়' মিল সেটা আজকার দিনে বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বেচ্ছাচারিতা ও নানা অত্যাচার দুষ্ট শাসনে রুষিয়া ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কাছে পরাজিত ও অপমানিত হইলেও আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বসে নাই।

সত্য বটে একদিন ফরাসী ভাষা ও ফরাসী সভ্যতরা আদর্শ রুষিয়ার শিক্ষিত নরনারীর মনকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। বৈদেশিক ভাবপ্রবাহে যে হৃদয় একদিন বহির্মুখি হইয়া ছুটিয়াছিল, রুষিয়ার শক্তিমান মনীষীবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় আবার উহা স্বদেশের বিস্মৃতপ্রায় আদর্শের চরণমূলে মাথা নোয়াইয়াছে। তার অন্তরের সে সুপ্ত মাধুর্য্য কোমলতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংমিশ্রণে গঠিত এই অর্দ্ধ সভ্য জাতির হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ও অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার লুকায়িত আছে, আজ রুষিয়ার ঔপন্যাসিক-দের নিপুন তুলিকায় সে চিত্র অতি অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে মনোজ্ঞ চিত্র যে আমাদের হৃদয়ে আনন্দের রেখাপাত করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না।

বিলাস-লালসা-জর্জ্জরিত প্রতীচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে টলষ্টয়ের মতামত যে খুব উৎসাহজনক নহে একথা সকলেই জানেন। বরং প্রাচ্যের শক্তিপ্রদ সংযত ভাবটাকে তিনি যে একটু প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। জার্ম্মান দার্শনিক সোপনহেয়ারের কাছ হইতেই টলষ্টয় তাঁর এই প্রাচ্যদেশসুলভ প্রেম ও ভক্তিবাদ এবং ধর্ম্মসাধনার কথা পাইয়াছিলেন। টলষ্টয় নিজে অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও এই সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কিছু মাত্র সহানুভূতি ছিল না। বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতা রুষীয় আভি-জাত্য সমাজের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তিনি তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Anna Karaninaতে তিনি তাঁর সামাজিক মতা-মত অনেকটা ব্যক্ত করিয়াছেন। জনসাধারণের দুঃখে চিরদিন তাঁর নয়নের জল ঝরিয়াছে, কিসে তারা নীতি-পরায়ণ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে এটাই ছিল তাঁর ধ্যান-ধারণা।

কোন কোন দিক দিয়া রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদনার পুরোহিত ডষ্টয়ভস্কির ন্যায় এমন দুঃখের গান আর কেহই গাহিতে পারে নাই।

"Our sweetest songs are those that speak of saddest thought" কবির একথাটা খুব সত্য; সেজন্যই বুঝি "Les miserables" ও "Crime & Punishment"

এত ভাল লাগে। তাঁর উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের মতই ডষ্টয়ভস্কির নিজের জীবন দারিদ্র্য পীড়নে ভীষণ যন্ত্রণাময় ও দুঃখপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অদৃষ্ট দেবতা তার জীবনটা লইয়া এমনি খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন যে বেচারী কামানের গোলা ও সাইবেরীয়ার খনি হইতেও বাঁচিয়া আসিয়াছিল। বোধ হয় তিনি স্বয়ং দুঃখের স্বাদ একটু ভাল রকম পাইয়াছিলেন বলিয়াই, জীবনের অন্ধকারময় দিকটা ভাল করিয়া আঁকিতে সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁর উপন্যাসগুলিতে এমন একটা করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাতে পাঠকের চিত্ত বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। দারিদ্র্য, অভাব ও কুশিক্ষার ফলে তাঁর সৃষ্ট নায়ক নায়িকারা ঘোর পাপিষ্ট হইয়া উঠিলেও তারা আমাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হয় না। মানব হৃদয়ের নানা বিপরীত প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্ঘাটিত করিয়া, এমন মনস্তত্ব বিশ্লেষণে পারদর্শী ঔপন্যাসিক খুব কমই দেখা যায়। ডষ্টয়ভস্কির নায়ক নায়িকারা প্রায়ই সাধারণ শ্রেণীর। তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাজ্ক্ষা ও দুর্গতির ছবি সমগ্র রুষিয়ার তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র বলিয়াই মনে হয়। স্বেচ্ছাচারিতার দাপটে রুষিয়ায় সাধারণ সমাজ কিরূপ নিষ্পেষিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাদের মনোবৃত্তি কোন পথে পরিচালিত হইতেছিল, তাহা ভুক্তভোগী আমরা বেশ বুঝিতে পারি। উপযুক্ত শিক্ষা ও ক্ষেত্র পাইলে যে হৃদয় একদিন অনন্ত ভাব সম্পদে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা রাজনৈতিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে পদদলিত হইয়া উন্মার্গগামী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজরোষে রুষিয়ার কত প্রতিভা কারাগারের তিমিরাচ্ছন্ন কক্ষে, সাইবেরীয়ার ভীষণ প্রান্তরে অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। স্বদেশ প্রেমের বন্ধুর পথে চলিতে গিয়া কত যুবকের হৃদয়-শোণিতে সে দেশ রঞ্জিত হইয়াছে—তার উজ্জ্বল চিত্র আমরা ডষ্টয়ভস্কির লেখায় দেখিতে পাই। সে সব কাহিনী আমাদের মত বিদেশীকেও বেদনায় আপ্লুত করে।

আইভান টুর্গেনিভ ধনীর ছেলে হইলেও, গরীবের জন্ম তাঁর চিত্তে সমবেদনার অন্ত ছিল না। তাদের ব্যাকুল ব্যথায়, তাঁর হৃদয় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনের শেষ ভাগ তিনি প্যারিসে কাটাইলেও, তাঁর স্বদেশের সুখ দুঃখের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। প্যারির বিলাস সমুদ্রে বাস করিলেও রুষিয়ার নদ নদী, কানন, কান্তার, বিশাল কৃষক সমাজের সরল প্রাণের আশা আকাজ্ক্ষার কথা তাঁর হৃদয়ে বরাবর জাগরূক ছিল। "ভলগা"তীরে দিনান্তে রুষ কৃষকের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র অতুলনীয়। লিপি চাতুর্য্যে টুর্গিনিভ অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর লেখায় যে নিপুণ আর্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটী অপর কোন রুষ লেখকের লেখায় আছে কি না সন্দেহ। শাসনের বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য এবং প্রবলের অত্যাচারে যে রুষিয়া ক্রমাগত ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া মরিতেছিল, বিক্ষুব্ধ জনসমাজ যে ধীরে ধীরে স্বদেশ প্রেমে উদ্বোধিত হইয়া উঠিতেছিল, এটা তিনি অনেক আগে হইতেই লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই—তার সে সব কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তাঁর Virgin soilএ তিনি স্বদেশিকতার যে অনুপম ছবি আঁকিয়াছেন তাঁর তুলনা কথা-সাহিত্যে দুর্লভ। তাঁর Father & Childrenএ রুষিয়ার সামাজিক জীবনের যে মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, তাহা রুষিয়ার অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফল। অবিচলিত প্রেম ও নিষ্ঠা যে নর নারীকে আপন কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তা তাঁর "On the Eve" পড়িলে বেশ বুঝা যায়। উৎপীড়িত কৃষকগণ ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় আপন অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া ধনীর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া তাদের বিলাসের উপকরণ যোগাইতেছিল, কিন্তু একদিন যে এই অসন্তোষের বহ্নি, সামান্য অগ্নিস্পর্শে বারুদ স্তূপের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ প্রাসাদ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে টুর্গেনিভ বহুদিন আগে তাহা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।

শেখভ, ম্যাক্সিম গর্কি ও গগুলের গল্প সাহিত্য যেমন বস্তুতন্ত্রতাপূর্ণ তেমনি চিত্তাকর্ষক সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনের বিচিত্র আলেখ্য। তাদের লেখায় যে ভাব উৎসারিত হইয়াছে, তাহা এমনি মধুর রসসিক্ত যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় নানা ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

রুষিয়ার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি "পুশকিণের" কবিতার সহিত

বিস্তারিত ভাবে রুষিয়ার কথা সাহিত্যের পরিচয়ের ইহা স্থান নহে, সংক্ষেপে সামান্য দুই চারিটা কথা বলা হইল মাত্র।

রুষিয়ার কথা সাহিত্য আমাদের এত ভাল লাগিবার কারণ, বোধহয় উহা একটু বেশী পরিমাণে বস্তুতান্ত্রিক বলিয়াই। রুষসাহিত্য ফরাসী সাহিত্যের কাছে অশেষ ঋণী সন্দেহ নাই। একদিন ফরাসী সাহিত্য শিক্ষিত রুষিয়ার মনোরাজ্যে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কাজেই ফরাসী সাহিত্যের অপূর্ব্ব ভাব সম্পদ ও বিশেষত্ব-গুলি রুষীয় সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়া উহাকে সঞ্জীবীত করিয়াছে। অনেকে হয়ত জানেন না, রুষিয়ানদের মত এমন বহু ভাষাবিদ্ জাতি জগতে বিরল, এমন জ্ঞানানুশীলনে অনুরক্ত পরিশ্রমী জাতি অপরের কাছ হইতে তাদের এই সাহিত্যের অনুপ্রেরণা লাভ করিলেও স্বকীয় প্রতিভাবলে আজ আপনাদের সাহিত্যকে জগতে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে।

সুচিকিৎসক যেমন কোন কঠিন রোগ আরোগ্য করিবার মানসে, ব্যারামের সমস্ত ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইয়া, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন, তেমনি রুষ সাহিত্যিকেরা, রাজনৈতিক সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সমস্ত দোষ ত্রুটির নগ্ন-চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কোন দোষ রাখিয়া ঢাকিয়া তারা প্রকাশ করেন নাই। মানুষের স্খলন, পতন চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইয়া দিলে তার উন্নতি অসম্ভব। বোধহয় সেই জন্যই তাদের লেখায় যেমন একটু বেশী Touch of realism দেখা যায়, অন্যত্র সেরূপ দেখা যায় না। কথা সাহিত্য সমাজের ফটো বই আর কিছু নহে। রুষিয়ার Realistic লেখকেরা সমাজের ফটো তুলিতে গিয়া কোন প্রকার কৃত্রিম Back Ground সৃষ্টি করিতে নারাজ। ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিই তাঁরা ফুটাইয়া তুলিতে চান। যেরূপ আবেষ্টনে মানব চরিত্র গড়িয়া উঠে, তাঁর সবটুকু খোলাখুলি ভাবে দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত আলেক্ষ্য দেখান হয় না, অন্ততঃ এইরূপ তাঁদের ধারণা।

Art for art sake অর্থাৎ শুধু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টি কাব্য সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইলেও, রুষিয় কথা সাহিত্য পাঠে আমাদের মনে হয়, তাঁরা যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়াই লিখিতে বসিয়াছেন। এবং সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। বিপর্য্যস্ত ও উৎশৃঙ্খল শাসন প্রণালীতে রুষিয়ার নরনারী দলিত, উৎপীড়িত হইয়া জীবনের খেলা শেষ করিতেছে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভা নিয়োজিত করিলে হয়ত সুফল ফলিতে পারিত। সুশিক্ষার অভাবে যারা পশুবৎ আচরণে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়া ছ তারা জ্ঞানে ধর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া, স্বদেশ প্রেমের অপূর্ব্ব উন্মাদনায় আপনাদের প্রিয় জন্মভূমিকে সত্য এবং সুন্দরের পথে লইয়া যাইতে পারিত। রুষিয়ার সব লেখকেরাই তাঁদের দেশবাসীকে সে আশার উপদেশবাণী শুনাইয়াছেন। কাজেই রাজ রোষে তাঁদের অনেককেই লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে।

রুষিয়ান লেখকদের বস্তুতন্ত্রতার দিক দিয়াও তাদের কথা-সাহিত্যের দ্বারা যে আমাদের দেশের অনেক শক্তিমান লেখক অনুপ্রাণিত হন নাই, একথা অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য এটা স্বাভাবিক। তবে অবস্থা ভেদে সে দেশের পক্ষে যাহা সম্ভব, আমাদের দেশে তাহা অসম্ভব। একথাটা অনেকে বুঝিতে ভুল করেন বলিয়াই, অনুকরণ অনেক সময় দোষণীয় হইয়া দাঁড়ায়।

তবে আশার কথা এই, জগতের অন্যান্য দেশের মত বাংলা দেশের এই নব-জাগ্রত কথা সাহিত্যেও গণতন্ত্রতা এবং বস্তুতন্ত্রতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যেমন অভিজাত সম্প্রদায়ের কথায়ই কথা সাহিত্য ঝঙ্কৃত হইত, আজ আর সে দিন নাই। সমাজের যারা মেরুদণ্ড তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষায় আমাদের সাহিত্য মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের ভিতর যে প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে, তাতে ভরসা হয়, একদিন উহা ভাবসম্পদে অতুলনীয় হইয়া জগতের দরবারে হাজির হইতে পারিবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

অলোক লতা।

(কথা চিত্র)

ফুল বাগানের পাচীলের ফাটলে কি একটি লতা লতিয়ে উঠেছে। এত গাছ পালা লতাপাতার সঙ্গে তা'র পরিচয় নেই। তা'রা সব গলাগলি ঢলাঢলি করে আমোদে মেতে আছে, ঐ ছোট লতাটির উপর কারো নজর পড়ে না। সে আপন দীনতা নিয়ে আনমনে থাকে।

মালী এসে সকাল সন্ধ্যায় গাছে জল ঢালে, ঘাস মেরে মাটি খুঁড়ে দ্যায়, কেয়ারি করে' গরু বাছুরের মুখ থেকে তা'দের বাঁচিয়ে রাখে, অলোক লতা দ্যাখে আর তাকিয়ে থাকে।

ভোরে পাখীর গানে জেগে উঠে রাঙা রোদের তাজ পরে হাওয়ার তালে হেলে দুলে তা'রা যখন নাচে, শিশির ভিজা লতাটি তখন আলোর পরশে চম্‌কে চায়।

দুপুরে সারা বাগান যখন মিনিয়ে যায় চোট্ট লতাটি তখন আল্‌গোছে পাচীলের ছায়ায় বসে থাকে।

কত ছেলে মেয়ে, কত বাবু বেড়াতে আসে বিকালে। ছেলেরা ফুল তুলে, মালা গাঁথে, বাবুরা ফুল ছিঁড়ে বুকে পরে, লতা তা'র ছোট লাল ফুল ক'টি বুকে করে' থাকে; সে দিকে কেউ ভুলেও তাকায় না।

চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, সারা বাগান জোছনায় নেয়ে ফুলে ফুলে হাসতে থাকে; অলোকলতার লাল ফুলে লাল তারার একটু আলো ঠিক্‌রে পড়ে, সে তা'ই পেয়েই খুসি।

বাদল মেঘের ভেরীবেজে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে, গাছ পালা সব ভিজে জড়সর; ও তখন ছোট দেহটুকু নেতিয়ে দিয়ে পাচীল-ঝরা জলে নেয়ে ওঠে

কোয়াসার ধোঁয়ায়, শীতের কনকনে হাওয়ায় ওরা যখন হিমসিম খেয়ে যায়, এ তখন রাঙা পাচীলের ভাঙা ফাটলে আপনাকে লুকিয়ে বাঁচে।

এম্‌নি করে' কত দিন যায়, একদিন শীতের আল্‌গা আগল্‌ ভেঙে পাগ্‌লা হাওয়া হঠাৎ ছুটে এসে জানিয়ে দিলে 'বসন্ত আস্‌ছে।' দূরে কোকিলের গলায় বাঁশী শোনা গেল। রঙ বেরঙের প্রজাপতি কেতন উড়তে লাগল। সারা সংসারে অর্ঘ্যের আয়োজন জেগে উঠ্‌ল। ভোম্‌রারা ভামিনী কিশোরীর কালো চোখের মতো 'ইতি-উতি' করতে লাগল। ফুল মহলে ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি পড়ে গেল।

কোনো ভোম্‌রা ফুলে বসে মধু না পেয়ে ঠেলে দিয়ে চলে গেল। কা'রো মুখে মুখ লাগাতেই বিরতি এল। কেউ বা যেতে যেতে একটু থেমে মুখ দেখেই হেসে গেল। কেউ দেখেও দেখে না। ফুলেরা সবুজ ঘোমটা খুলে মুখ বাড়িয়ে দ্যায়।

তা'রা যে সারা সম্পদ আগেই হারিয়ে ফেলেছে। হায়, আজ তা'দের রিক্ততা তারা ভালকোরেই বুঝল।

অলোক লতা দেখে, আর তরাশে তা'র পরাণ কেঁপে ওঠে; "কেউ যদি আসে আমি কি ক'রব! এ টুকু বুকেত ঠাঁই হবে না।

একটা দলছেঁড়া ভোঁমরা আনমনে উড়তে উড়তে দেখতে পেলে লতাটি। সে যেন অমানিশিথের শুভ্র আকাশ। ফুল ক'টি ফুটে আছে লাল তারার মতো। ভোম্‌রা নতমুখী লতাটিকে বুকে তুলে নির্ভয়ে তা'র মধু পান করল।

"কে তুমি অচাওয়া পথিক! আজ আমার সারা বেদনা সফল ক'রে দিলে?"

অশ্রুমুখীর আঁখি আবেশে আনত হ'ল।

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

অন্ধ নিষ্ঠা।

ঠাকুর বাড়ীর নব পূজরীর বেজায় নিষ্ঠাচার,
দেন না ভুলেও মাড়াতে কাহারে দেব মন্দির দ্বার!
ছায়ার পরশ লাগে যদি কার নিকটে চলিতে কেহ,
স্নান করি শত গায়ত্রী জপি শুদ্ধ করেন দেহ।
এমন নিষ্ঠা! পান না তথাপি কভু দেবতার সাড়া,
"কোন অপরাধে?" ভাবিয়া সেকথা ঝরে আঁখিজল ধারা।
দৈব বাণীতে কে তাহারে কহে—"মানুষেরে ঘৃণা করে'
পে'তে চাও তারে—ঘৃণা বাজে তাঁর বুকের উপরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে পাতা দেবতার রত্ন সিংহাসন,
সেই তাঁরে পায়, বিশ্ব জুড়িয়া দেখে যেই নারায়ণ।"

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।
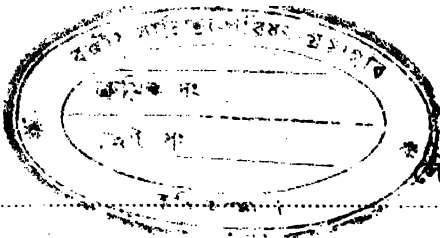
হাতী খেদা।

(৮)

কেম্পে থাকিতে স্থির হইয়াছিল, দুই দিন বাড়ীতে থাকিয়াই ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় বারের জন্য পুনরায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। তাহাই হইল।

যথারীতি কোঠ বাঁধা হইয়াছে সংবাদ আসায় আমি ও মেজ কাকা ছাড়া পূর্ব্বের দলের অপর সকলেই রওনা হইয়া গেলেন। এবার কেম্প হইল পাহাড়ের উপরে। অতি ক্ষুদ্র একটা ঝরণা পাওয়া গিয়াছিল, তাহার জলে কেম্পের কার্য্য চলিল। নিকটে অন্য জলাশয়ের অভাবে অনেক বন্য জন্তু এই স্থানে জলপান করিতে আসিত। এরার ভৃত্য ছিল যোগেন্দ্র। একদিন খুব সকালে সে জল আনিতে গিয়া দেখিল, তাহার নিকট হইতে ৫। ৭ হাতের মধ্যে এক প্রকাণ্ড Royal Tiger শায়িত অবস্থায় তাহার দিকে সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। যোগেন্দ্র জলের টিন ফেলাইয়া চীৎকার করিয়া কেম্পে ছুটিয়া আসিয়া বলায় নগেন্দ্র বাবু বন্দুক লইয়া গেলেন; কিন্তু ব্যাঘ্র তখন চলিয়া গিয়াছে! এই বাঘটাকে প্রায়ই অন্যান্য লোকেও দেখিতে পাইয়াছে।

২৫শে অগ্রহায়ণ খেদার দিন অবধারিত হইল; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই কেম্প হইতে সংবাদ আসিল যে ৩০। ৪০ টা হাতী বাহির হইয়া গিয়াছে। সকলেই অনুমান করেন যে, যে হাতীগুলি প্রত্যহ আম্নির মুখ পর্য্যন্ত আসিত, সেই হস্তীগুলিই বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সকলেরই নিরাশ হওয়ার কথা; কারণ এই হস্তীর জন্যই কোঠ স্থানান্তরিত করিয়া সম্মুখে আনা হইয়াছিল। সান্ত্বনার বিষয় এই ছিল যে বেড়ে এখনও হাতী ছিল।

কারণাধীনে আমি এই খেদায় যাইব না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীমান তরুণ ও ক্ষিতি ঢাকা হইতে খেদা দেখিতে আসিয়া আমাকে তাহাদের সহিত লইয়া চলিল। তখন খেদা দেখার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। অখিল দাদা পূর্ব্বের খেদায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং এবার তিনিও চলিলেন। আমরা অতি প্রত্যুষে আহারাদি সমাধা করিয়া যথাসময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলাম।

আজিকার ড্রাইভ অত্যন্ত খারাপ হইল। হাতী আম্নির মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া সবই ফিরিয়া গেল। অখিল দাদা এবং আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, আমরা চলিয়া আসিবো—সুতরাং ড্রাইভের এই অবস্থা দেখিয়া চলিয়া আসিলাম। জগন্নাথপুর আসিয়া কিছু কদলী ভক্ষণ করিয়া রাত্রি ১২½ টার সময় শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ফিরা গেল। শুনিলাম পর দিবসের ড্রাইভেরও ফল একরূপই হইয়াছে।

কেম্প হইতে চিঠিতে শেষ দিনের (অর্থাৎ ২৭শে অগ্রহায়ণের) ড্রাইভের যে বর্ণনা পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইল—এই উপভোগ্য দৃশ্য দেখা উচিত ছিল। পত্রে এবং ইতঃপর দর্শক বৃন্দের নিকটও জানা গিয়াছিল যে—সে দিন ৯ টা হাতী একেবারে "রুমঘর" পর্য্যন্ত আসিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত হাটিয়া আম্নির ভিতর বেলা দুইটা হইতে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত ছিল; কোনও মতেই গড়ে প্রবেশ করে নাই। হাতী আম্নিতে প্রবেশ করিতেই ফায়ার লাইন জ্বালাইয়া দিয়া খুব ফাঁকা আওয়াজ করা হইয়াছিল; ঝাঁঝ বিউগেল প্রভৃতিরও ভীষণ শব্দ করা হইয়ছিল কিন্তু হাতী অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল। এত অস্বাভাবিক শব্দেও তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোনই ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। একটা মেয়েনা বাচ্চা হঠাৎ ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া দরজার ২। ৩ হাত দূরে রুমঘরে ২। ৩ টা ধাকা মারিয়া ফিরিতেই সমস্ত হাতী ফিরিয়া আসিয়া ফায়ার লাইনের নিকট দাঁড়াইল। ফায়ার লাইন ভীষণ ভাবে জ্বলিতে থাকায় হাতীগুলি আর আম্নির বাহিরে যাইতে পারিল না। সর্দ্দারগণ আজ হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির করিয়াছিল। তাহারা অবিশ্রান্ত বন্দুকের আওয়াজ বর্ষণ করিতে লাগিল—প্রথমে ফাঁকা, তাহার পর no. 8 shots, পরে no. 4 shots, ইতঃপর no. 1 shots, পরে ss.g. অবশেষে s.g. shots পর্য্যন্ত করা হইল; কিন্তু সবই নিস্ফল হইল। আজ তাহাদেক্ দেখিয়া বীর জাতি যে প্রাণপাতেও কিরূপে স্বাধীনতা বজায় রাখে—সেই কথা প্রত্যেকের স্মরণ হইয়াছিল। হস্তীগুলি যেন মরিবে স্বীকার, তথাপি গড়ে প্রবেশ করিয়া মানুষের বশ্যতা

স্বীকার করিবে না। হস্তীর স্বভাবে যে একটা সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্য আছে ইহাতে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। হস্তী একটা মুষিক দেখিয়াও ভীত হয় কিন্তু আজ তাহার প্রতিজ্ঞা অটল—সাহস দুর্জ্জয়।

সমস্ত পাতবেড়ের লোক উঠাইয়া আনিয়া আগ্নির মাথায় বসান হইয়াছিল এবং দুই আগ্নির মাথায় মিলাইয়া একটা ফায়ার লাইন সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সর্দ্দারগণ আজ মরিয়া হইয়া লাগিয়া গেল, সুতরাং হাতী এবং মানুষে আজ যুদ্ধ চলিল। তখন ঝাঁঝ, ঠাঁঠা এবং বন্দুকের গর্জ্জন অবিরাম চলিতে লাগিল কিন্তু হস্তী পশ্চাৎপদ হইল না। এইরূপ রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময় এক দল হস্তী কোথা হইতে আসিয়া বাহির হইতে শব্দ করিয়া উঠিতেই ভিতরের দলের শ্রেষ্ঠ এক অতি বৃহৎ মুখ্‌কি সবেগে ছুটিয়া আগ্নির মধ্য দিয়াই অন্য হস্তীগুলির জন্য এক পথ প্রস্তুত করিল। তখন অমিত বিক্রমে সব হাতীই বাহির হইয়া গেল। এইরূপ সাহস হস্তীর হইলে মানবের সাধ্য কি তাহাকে আবদ্ধ রাখে। হস্তীর এবম্বিধ সাহসের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে কেহ দেখিয়াছেন কি না জানি না; ইহা আমাদের নিকট বিস্ময়কর এবং অসম্ভব বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা! এই হস্তীর দলকে ধরার প্রয়াস এই খানেই শেষ হইল; কারণ এবম্বিধ ভীতিহীন হস্তীকে ধরিবার প্রয়াস বারম্বারই ব্যর্থ হইবে—এই বিবেচনায় এখান হইতে সমুদয় "বহর" অন্যত্র উঠাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইল।

পাঞ্জালীর সংবাদানুসারে কুলি দাগ্‌সী অঞ্চলে পাঠানই স্থির হইল। ঐ স্থান চিকিসিম হইতে ৩|৪ দিনের পথ। সোমেশ্বরী নদীর উজানে রেঙ্গাক থানা—তথা হইতে নদীর উঃ পশ্চিম তীরে এক দিনের পথ।

কুলি লইয়া গোস্বামী মহাশয় এবং নগেন্দ্র বাবু রওনা হইয়া গেলেন; আলকৃফাং কেম্প হইতে আমাদের সংবাদ দিলেন—'বাঘমারা রিজার্ভে এক দল হাতী আসিয়াছে; ইহাদের বেড় দেওয়ার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু বড় সর্দ্দার এবং অপর সর্দ্দারের মধ্যে হস্তীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হওয়ায় কোনও কাজ হইয়া উঠিতেছে না।' বাবুরা আরও সংবাদ দিলেন—কর্ত্তৃপক্ষের একজন উপস্থিত থাকিলে সুবিধা হয়। বড়কাকার খুবই জ্বর হওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, মেজকাকাও অসুস্থ, ছোটকাকা সাংসারিক কার্য্য ব্যস্ত—সুতরাং আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই বড়কাকাকে বলিয়া ১০ই পৌষ বিকাল ৪॥টার সময় আলকৃফাং অভিমুখে রওনা হইলাম। সঙ্গে নিলাম বাবু উপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়কে। তিনি যদিও ইতিপূর্ব্বে সাধারণ কেম্পের ও রসদ আফিসের কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি চিকিসিমের খেদা ভিন্ন অন্য কোন খেদার কার্য্য ইহার পূর্ব্বে দেখেন নাই। তথাপি ইনি পাহাড়ে এবং পথে ঘাটে আমাদের খুব যত্নে এবং সুবিধায় রাখিতে পারিতেন এবং মোটামোটি হিসাবে সকল কার্য্যেরই বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন।

রতনমালা ও আশোয়ারীতে আমরা সোয়ার হইলাম। বংবাজারের নিকটবর্ত্তী হইতেই পথে সংবাদ পাওয়া গেল, আলকৃফাং হইতে কেম্প তুলিয়া গোঁসাই এবং নগেন্দ্র বাবু চলিয়া আসিতেছেন। সুতরাং নদীর চরে গিয়া আমরা দাঁড়াইতেই দেখি তাঁহাদের নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। তাঁহারা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন হাতী দাছিং ছড়ায় চলিয়া আসায় বেড় ছোট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেম্প উঠাইয়া আনিয়া নিকটে করিতে হইবে।

আমরা তাঁহাদেরে তুলিয়া লইয়া নদীর অপর পারে আমাদেরই জমিদারীর অন্তর্গত ভবানীপুর নামক স্থানে কেম্প খাটাইব স্থির করিলাম। খেদাবাবুদের নিকট শুনিলাম, বড় সর্দ্দার তাঁহাদের রীতি মত কোনও সংবাদাদি দেয় না। অথচ ডাকের লোক সমস্তই তাহার সঙ্গে ছিল! বড় সর্দ্দারের যথেচ্ছ ব্যবহারে তাঁরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, বোঝা গেল। যাহা হউক রাত্রি পার হইলে যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে, ইহাই স্থির করিয়া উপেন্দ্র বাবু আহারাদির ব্যবস্থা এবং পট্টাবাস রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আজ ছোট তাঁবুই খাটান হইল। আমি ও মনিদাদা এক তাঁবুতে এবং উপেন্দ্রবাবু ও অপর তিন বাবু আর এক তাবুতে ছিলেন; চাকরদের একটা পাল এবং কেম্প প্রস্তুতকারকদের (camp pitcher) এক ডেরা হইল। এ জায়গাটায় সোজা উত্তরের কণকণে হাওয়ায় আমরা অল্প

সময়েই অস্থির হইয়া উঠিলাম। আজ রাত্রি এই ভাবেই কাটিয়া গেল। বেড়ের কোনও সংবাদ পাইলাম না।

১১ই পৌষ। প্রাতঃকৃত্যাদির পর চা পান করিয়া পাতবেড়ের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিয়া দাহিংছড়া লোনার নিকট পাতার লোক পাইলাম। সিংহ মহাশয়কে সমুদয় সংবাদ লইয়া কেম্পে যাইবার কথা বলিয়া আমরা কেম্পে ফিরিলাম। আহারাদি সমাধা হইতে ৩ টা বাজিল।

সিংহ মহাশয় ৫ টায় কেম্পে আসিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম, বড় সর্দ্দার নিজের প্রাধান্তের পরিচয় প্রতিপদে দিতে যাইয়া কার্য্য সুগমের পক্ষে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটাইতেছে। যাঁহা হউক পাতবেড়ের স্থান বোথরা ও বড়লোনা এবং রাঙ্গাছড়া লোনা ও কান্দাছড়ার মধ্যে হওয়ায় আগামী কল্য কেম্প বাদামবাড়ীতে স্থানান্তরিত করিব—উপেন্দ্র বাবুকে ইহাই বলিলাম।

১২ই পৌষ। সকাল হইতেই পট্টাবাস সমস্ত গোছান আরম্ভ করিলাম। এই সময় সুসঙ্গ হইতে মেজ কাকা, ছোট দাদা, বিজয় এবং ডাক্তার ননীগোপাল সিংহ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদেক্ আহারাদি করাইয়া রওনা দিতে আমাদের কিছু সময় গেল। মেজ কাকার শরীর অসুস্থ বোধে তিনি আবশ্যক মত সাবধান হইয়া চলিয়া গেলেন; আমরা আমাদের কেম্পের স্থান দেখাইয়া দিয়াই একবার পাতবেড়ের জায়গাটা বেড়াইয়া আসিতে গেলাম। বড় সর্দ্দার রাত্রিতে আসিলে তাহাকে সমস্ত বিষয় হুসিয়ার করিয়া দিয়া ৫ দিনের মধ্যে ড্রাইভ করিতেই হইবে—জানাইয়া দিলাম। তাহার নিকট জানিলাম—পাতবেড় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

১২ই পৌষ। আজ নিজে গিয়া কোঠে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম। যদিও আমি ইতঃপূর্ব্বে খেদার কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি নাই, তথাপি আমার বিশ্বাস ছিল যে, রামদয়াল প্রভৃতি হাতীর স্বভাব মোটামুটি ভাবেই জানে অবস্থা বিশেষের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাহাদের তত বেশী নাই। মোটের উপর তাদের ব্যবস্থার উপর আমরা সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। কার্য্য কালে দেখিলাম যে ইহা করিয়া ভালই হইয়াছিল।

আজ নিকটস্থ হাজং, গারো এবং বানাই প্রজাগণ প্রায় এক শত জন খেদার কার্য্যে সহায়তা করিতে আসিয়াছিল। ইহারা আসায় পাতবেড়ের খুবই সহায়তা হইল।

আমি এবং মণি দাদা প্রত্যহ প্রাতে ৭। ৭৷৷০ টায় কার্য্য দেখিতে যাইতাম। ২। ২৷৷ টায় ফিরিয়া আসিতাম। উপেন্দ্র বাবু রাত্রিতে উঠিয়া কিছু খাবার তৈয়ার করিয়া দিতেন। তাহাই আমরা খাইয়া যাইতাম।

কোঠের স্থানে যাওয়ার সময় আমরা প্রায়ই নানাবিধ পক্ষী শিকারের ব্যর্থ প্রয়াস পাইতাম এবং বিকাল বেলাতেও একটু শিকারের চেষ্টা করিতাম।

১৪ই পৌষ। ছোট দাদা, বিজয় এবং শ্রীমান সুধীর আসায় কেম্পের জীবনটা বেশ জমিয়া উঠাইয়াছিল। শ্রীমান সুধীন আমার আশৈশব সঙ্গী—আজ ২ বৎসর পর এই কেম্পে তাহার সহিত সাক্ষাৎ, সুতরাং ইহার আনন্দ কতটুক, তাহা যাহারা ইহার আস্বাদন পাইয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন। ছোট দাদার চোখের বেদনা হওয়ায় তিনি ১৫ই চলিয়া গেলেন।

কোঠের কার্য্য ১৭ পৌষ প্রায় সমাধা হইয়াগিয়াছিল, ১৮ই বাগান লাগাইয়া তার পরই "ড্রাইভ" আরম্ভ করা স্থির করিয়া দুর্গাপুর সংবাদ দেওয়া হইল। বহু দর্শক হইবে আশঙ্কায় পূর্ব্বেই আমরা দর্শকের স্থান বহু দূরে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলাম।

১৮ই পৌষ। আমরা ৮ টার মধ্যেই আহারাদি করিয়া কোঠের স্থানে আসিয়া দেখি—রাত্রিতে হাতী আসিয়া আল্লির কতক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। কুলীদের তখনই আল্লি মেরামত কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং রামদয়ালের মতানুসারে বাঁদিকে কতকটা অংশ বাড়াইয়া দেওয়ার আয়োজন চলিল। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইতে প্রায় ২২ টা বাজিয়া গেল। ইহার পর পরিশ্রান্ত কুলিদিগকে দিয়া গুলানের কার্য্য চালবে না এবং হাতী একবার ঘুরিলে ফিরান কঠিন হইবে বোধে আজিকার মত ড্রাইভ স্থগিত রাখাই পরামর্শ হইল। ফলে প্রায় ৩০০ দর্শক বিফল মনোরথ হইয়া ফিরি গেল।

আজ রাত্রিতে কেম্পের সমস্ত লোককে পাহারা দিবার জন্ত পাঠাইয়া দেওয়া হইল যেন মুহূর্ত্তের অনবধানতায় সমুদয় কার্য্য পণ্ড না হয়। অন্ত রজনী অত্যন্ত উৎকণ্ঠায়

কাটান হইল। বিশেষতঃ রাত্রিতে হাতীর ডাক শুনিয়া অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছিল।

১৯ শে পৌষ। আজিও খুব সকাল সকাল আহারাদি করিয়া যথা স্থানে যাইলাম। বড় সর্দ্দারকে ১০ টার মধ্যে সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। বড় সর্দ্দার তদনুযায়ী গুলানেওয়ালা, তুরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

বাঘের আগ্নি একটা ছড়া পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই ছড়াটার উভয় পার অত্যন্ত খাড়া, কেবল মাত্র দুইটী মলম ইহাতে ছিল; এতভিন্ন অন্য কোনও দিক দিয়া হাতী নামিতে বা উঠিতে পারিতো না। এই ছড়া পার হইলেই হাতী আগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়। ছড়ার অপর পারে তুরীর লোক—তুরীর ভিতর উচ্চ বৃক্ষে ২। ৩ জন বন্দুকধারী রাখা হইয়াছিল। ডাইনের আগ্নিটা সময়াভাবে ছড়াপর্য্যন্ত অগ্রসর করা যায় নাই। এই খানে ২ জন অত্যন্ত সাহসী সর্দ্দার রাখা হইয়াছিল—এই দিকটা একটু ঢালু থাকায় হাতী ফিরিয়া গেলে এই দিক দিয়াই যাইবে, ইহাই আশঙ্কা করা হইতেছিল। এই ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা চলিয়া গেলাম।

আমরা যে স্থানে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম তথা হইতে খল এবং কোঠের দৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বন্দুকের শব্দ প্রায় ১২ টার সময় পাওয়া গেল। বন্দুকের শব্দ পাওয়া মাত্র আশায় উৎকণ্ঠায় হৃদয় পূর্ণ হইল। আমার অরণ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বাসী অনুচর জুঙ্গী পূর্ব্বেই একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল এই স্থান দিয়া হাতী আসিবার সময় একটী একটী করিয়া গণনা করা যাইবে তদনুযায়ী ঐ দিকেই চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল খলের মধ্যভাগে ছড়ার দক্ষিণ পারে ছোট টিলার উপর দিয়া শ্রেণীবদ্ধ হস্তী আসিতেছে—আমরা আনন্দ ও উৎসাহের সহিত পরস্পর পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলাম। হঠাৎ বৃক্ষান্তরাল হইতে দুইটী বন্দুক ধ্বনিত হইল, অমনি হস্তীগণের বংশী বাদন এবং ত্রাসের শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। ভয়ে শব্দে ধূলি মেঘের মধ্যে প্রায়স—শুণ্ডোত্তোলন করিয়া হস্তীকুল গড়ঞ্জাম দিয়া সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। ছড়াটার দক্ষিণ পারে আসিয়া হাতী একটু দাঁড়াইতেই তুরীর গোলন্দাজগণ তুমুল গর্জ্জন আরম্ভ করিল। হাতী সমস্তই ক্রমে আগ্নির ভিতর প্রবেশ করিয়া রহিল—বহুক্ষণ এই ভাবে রহিল। এই সময় ডাইনের তুরীর লোক ২। ১ টা বন্দুক আওয়াজ করিলেই হাতী কোঠে ঢুকিয়া যাইত; কিন্তু সেই ব্যক্তিদ্বয় ভীত হইয়া স্থানান্তরে যাওয়ায় সমস্ত হাতী ডাইনের আগ্নির সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহাতে বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সামান্য ত্রুটির জন্য আগ্নি প্রবিষ্ট হাতীগুলি এমন ভাবে বাহির হইয়া গেল!

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

প্রাণের বাঁশী।

কাহার গানে　　কাহার তানে
　　ভরা মর্ম্মপুর ?
কোন্ গানেতে　　কোন্ রাগিণী ?
　　ধরিব কোন্ সুর ?
ফুল বসন্তে নবীন রাগে
কার ছবিটী প্রাণে জাগে
কাহার কথা—বিষাদ ব্যথা
　　সকল করে দূর !
কোন্ গানেতে কোন্ রাগিণী ?
　　ধরিব কোন্ সুর ?
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
　　ভরা ভাদ্র মাসে ;
পুরাণ বাতাস প্রাণের কথা
　　বলছে কাছে এসে !
　　দিনের বেলা সাফ্‌লা সুঁদী ;
　　ছিল তাদের নয়ন মুদি ;
শারদ রাতের জোছনা পেয়ে
　　উঠ্‌ল চেয়ে হেসে !
প্রাণের বাঁশী বাজ্‌ল আমার—
　　ছুট্‌ল সুদূর দেশে !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

আমাদের দেশ।

পৌরাণিক ভূগোল পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে—ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব এবং পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ যাহা আমাদের বাসভূমি পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, সহর সেরপুর প্রভৃতি, তাহা বাস্তবিক বঙ্গদেশ নহে; বিখ্যাত পুণ্যভূমি কামরূপেরই অন্তর্গত কৈকয়দেশ।

করতোয়ানদী হইতে আরম্ভ করিয়া শিবসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী দিক্ষুনদী পর্য্যন্ত প্রদেশ যে কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ কালিকাপুরাণে পরিদৃষ্ট হয়।

যথা— পশ্চাল্ললিতকান্তায়াদেশং কৃত্বাবধিং পুনঃ।
করতোয়া নদীং যাবৎ কামাখ্যা নিলয়স্তু তৎ।

অর্থাৎ—ললিতকান্তার পশ্চিমদেশ হইতে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত কামাখ্যা নিলয় অর্থাৎ কামরূপ। পবিত্রতোয়া করতোয়া নদী দিনাজপুর এবং বগুড়ার পূর্ব্বভাগে প্রবাহিতা;

ললিতকান্তাকে কেহ কেহ জয়ন্ত্যা বলিয়াথাকেন, কিন্তু তাহারা তন্মূলে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন। বাস্তবিক অন্যান্য প্রমাণের সহিত এক মত হইয়া বলিতে হইলে, "ললিতকান্তা" দিক্ষুরই নামান্তর কিংবা যথায় দিক্ষুনদী প্রবাহিতা তথাতেই ললিতকান্তা নামে কোন ও স্থান ছিল বা আছে নির্দ্দেশ করিতে হয়। সম্ভবতঃ এখন ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের অনুসন্ধানে তথায় ললিতকান্তার সন্ধান সম্ভব হইতে পারে।

চীনদেশের পশ্চিমভাগে দিক্কর নামে যে নদী আছে—তাহাই দিক্করিকা—বা দিক্ষুনদী কি না, তাহাও বিবেচ্য। দিক্কর বা দিক্করিকা দিক্ষুরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

১৩১৮ বাংলা সনে সেটেলমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত, সদলবলে আমাদের আলয়ে অবস্থিত, আসাম শিবসাগর নিবাসী ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্, শ্রীযুক্ত খগেশ্বর শর্ম্মা নামক কোন ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছিলাম, তাহার নিবাস দিক্ষুনদীরই তীরে অবস্থিত।তাহারা তথাতেই প্রতিনিয়ত স্নান ও তাহার জল পানাদি করিয়া থাকেন। এবং ঐ নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্য প্রদায়িনী ও পাপ নাশিনী বলিয়া তাঁহারা ও দেশবাসী জনগণ তাহাতে সর্ব্বদা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দিক্ষু নদী পদ্মা বা যমুনার মত বৃহৎ নহে, কংসের ন্যায় মধ্যমা। তাহাকে তাঁহারা ও তদ্দেশবাসীরা দিক্ষুনদী বলিয়াই অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। পশ্চাদুদ্ধৃত যোগিনী তন্ত্রবচনের "তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে" এই অংশ মতে দিক্ষুনদীতে তদ্দেশবাসীর গঙ্গাভক্তি অসঙ্গত নহে। সুতরাং ঐ দিক্ষুনদীই বাস্তবিক কামরূপের পূর্ব্বসীমা—সন্দেহ নাই।

যোগিনীতন্ত্রে কামরূপ ত্রিকোণাকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহাতে উত্তরে নেপালের কঞ্জগিরি, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও শীতললক্ষার সঙ্গম, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী বা দিক্ষুনদী এই চতুঃসীমার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ ঐ বচনের কোন স্থানে পূর্ব্বসীমা দিক্করবাসিনী এবং কোন অংশে দিক্ষুনদীর উল্লেখ থাকায় দিক্করবাসিনী দিক্ষুরই নামান্তর মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য যোগিনীতন্ত্রের নানা স্থান স্থিত বচন নিয়ে একত্র সন্নিবেশিত হইল। যথা—

নেপালস্যচ কঞ্জাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমং।
করতোয়াংসমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনীং।

* * *

উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিং করতোয়াতু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়া সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতিখ্যাত সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ।

* * *

ত্রিংশদ্ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শত যোজনং।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুত্তমং
ঈশানে চৈব কেদারো বায়ব্যাং গজশাসন।
দক্ষিণে সঙ্গমো দেবি! লাক্ষায়া ব্রহ্মরেতসঃ।
ত্রিকোণ মেবং জানীহি সুরাসুর নমস্কৃতং।
তত্র যে মানবাঃ সন্তি তে দেবা নাত্র সংশয়।
তত্র যদ্ যজ্জলং দেবি তৎ সর্ব্বং তীর্থ মেবহি।

অর্থাৎ নেপালের কঞ্জগিরি হইতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম এবং করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ। উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্ব্বে

তীর্থ-শ্রেষ্ঠা দিক্কুনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র লক্ষার সঙ্গম, হে গিরিকন্যকে! ইহাই কামরূপ নামে সকল শাস্ত্রে নিশ্চিত হইয়াছে।

এই কামরূপ ত্রিশ যোজন বিস্তৃত, শতযোজন দীর্ঘ এবং ত্রিকোণাকার বলিয়া জানিবে। ইহার ঈশান কোণে কেদার, বায়ুকোণে গজশাসন, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষার সঙ্গম; এই ত্রিকোণাকার স্থান সুর অসুরেরও প্রণম্য। এই কামরূপে যে সকল মানব বাস করেন তাহারা দেবতা স্বরূপ ইহাতে সংসয় নাই! এবং তৎস্থান স্থিত জলরাশি সমস্তই তীর্থ জল বলিয়া জানিবে। লাক্ষা ব্রহ্মপুত্রের সংঙ্গম, লাক্‌পুরের সন্নিকট।

তন্ত্র চূড়ামণি নামক গ্রন্থেও কামরূপের আকার, সীমা, এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বসীমা শিখরবাসিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহাও সম্ভবতঃ দিক্করবাসিনী বা দিক্কুরই নামান্তর। স্থান ভেদে এক নদীর নানা নাম প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। দিক্করবাসিনীস্থলে শিখরবাসিনী বা শিখরবাসিনী স্থলে দিক্করবাসিনা প্রমাদ বশতঃ ঘটিয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। এ সম্বন্ধে তথায় সন্ধান করিলে এ সমস্ত রহস্যেরই সম্পূর্ণ উদ্ভেদ হইবে। এ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের সহিত সামঞ্জস্যই আছে; সুতরাং এই প্রমাণ দ্বারাও আমাদের দেশ—(পূর্ব্বময়মনসিংহ) কামরূপের অন্তর্গত বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। যথা—

করতোয়াং সমাসাদ্যযাবৎ শিখরবাসিনীং।
শত যোজন বিস্তীর্ণং ত্রিকোণং সর্ব্ব সিদ্ধিদং।
দেবা মরণ মিচ্ছন্তি কিং পুনর্ম্মানবাদয়ঃ!

* * *

সর্ব্বত্র বিরলাচাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।

অর্থাৎ করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শিখরবাসিনী পর্য্যন্ত শতযোজন বিস্তীর্ণ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ত্রিকোণাকার কামরূপ। তাহাতে দেবতারাও মরণ ইচ্ছা করেন, মানবের কথা কি? আমি (ভগবতী) সর্ব্বত্রই বিরল। কিন্তু কামরূপে গৃহে গৃহে অবস্থান করিয়া থাকি;

[illegible] আমাদের এ দেশ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব ও পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী সহর সেরপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূভাগ কামরূপেরই অন্তর্গত সুতরাং উহা আধুনিক ভূ বিবরণে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অভিহিত হইলেও উহা বঙ্গ নহে।

বঙ্গদেশের সীমা শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীর হইতে ময়মনসিংহ, ঢাকা, বিক্রমপুর, যশোহর, কলিকাতা ইত্যাদি প্রদেশই বঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব বা পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ নহে। পাঠকগণের অবগতি জন্য তৎ প্রমাণও এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশোময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।

অর্থাৎ সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত এদেশ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শক বঙ্গদেশ নামে উক্ত হইয়াছে।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ সমাজে "বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালা" প্রবন্ধে নোয়াখালী, কুমিল্লা ও বরিশালের কিয়দংশকে লোহিত্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক তল্লিখিত এবং পূর্ব্বোক্ত রত্নাকরং সমারভ্য ইত্যাদি প্রমাণ সহ একমত হইয়া তৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তদুক্ত লোহিত্য নামে উক্ত দেশকেও বঙ্গান্তর্গত বলিতে হইবে। সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজত্ব নিয়া পরে লোহিত্যাদি নানা নামে বৃহৎ প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই জন্যই মহাভারতাদিতে লোহিত্যাদি দেশের উল্লেখ বিরল। তর্করত্ন মহাশয়ও পূর্ব্বোক্ত সমাধানের অনুরূপ আভাস একস্থলে দেখাইয়াছেন; যথা—"লোহিত্য জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও পৌণ্ড্র, ওড্র, প্রাগজ্যোতিষ, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জনপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল।" ইহাদ্বারা তিনি লোহিত্যে পরে কোন কারণে নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বলিতেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কারণ অনুমান অসঙ্গত নহে।

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য পৌরাণিক নানা প্রদেশকেই আধুনিক নানা নামে অভিহিত, বিভক্ত এবং অপরাপর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন সুতরাং আমাদের এই প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট কল্পিত বঙ্গদেশ হইলেও

বাস্তবিক পুর্ব্বোক্ত প্রমাণ লব্ধ বঙ্গদেশ উহা নহে, প্রত্যুত উহা কামরূপেরই অন্তর্গত—তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

কামরূপেরই দক্ষিণাংশ অর্থাৎ গণেশ গিরি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত প্রদেশ কামরূপান্তর্গত কৈকয় দেশ নামে শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; যথা—

"ব্রহ্মপুত্রাৎ কামরূপাৎ মধ্যদেশেতু কৈকয়ঃ।

ব্রহ্মপুত্র ও কামরূপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ কৈকয়। এই বচনে কামরূপ বলিতে গণেশ গিরিই বুঝিতে হইবে। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে গণেশগিরি খণ্ডকেও কামরূপ বলা হইয়াছে। যথা—

কালেশ্বরং শ্বেতগিরিং ত্রৈপুরং নীল পর্ব্বতং
কামরূপাভিদোদেশো গণেশগিরি মূর্দ্ধনি।

কালেশ্বর, শ্বেতগিরি, ত্রৈপুর, নীল পর্ব্বত নিয়া কামরূপ নামক দেশ গণেশ গিরি খণ্ডকে অবস্থিত। এই কামরূপ যেন নানা স্থানে বিভিন্ন সুতরাং এই কামরূপ পুর্ব্বোক্ত কামরূপ হইতে স্বতন্ত্র বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ প্রাগজ্যোতিষাধিপতি নরক প্রভৃতি নরপতিগণের অধিকৃত কামরূপ অন্তর্গত বিভিন্ন ভূভাগ বিভিন্ন সীমা নির্দ্দেশ দ্বারা এক ত্রিকোণাকার কামরূপই নানা আকার ধারণ করিয়াছে। এবং আকার ভেদে এক কামরূপই শ্বেতগিরি, ত্রিপুরা, কালেশ্বর, গণেশ, কৈকয় ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে কৈকয়ের উত্তর সীমা কামরূপ বলিতে কামরূপের প্রসিদ্ধ অংশ গণেশগিরিই বুঝা উচিত। প্রধানকে লক্ষ্য করিয়াই শব্দ প্রয়োগ এবং বোধ হইয়া থাকে। গণেশ কামরূপের প্রধান কেন্দ্র স্থল বলিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বহুদেশ বিভাগ প্রমাণান্তরে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"গণেশ্বরং সমারভ্য মহোদধ্যন্তগং শিবে।
শিলহট্টাভিদো দেশঃ পর্ব্বতে তিষ্ঠতি প্রিয়ে।"
"গণেশ্বরাৎ পূর্ব্ব ভাগে সমুদ্রাচ্ছত্তরে শিবে।
কচ্ছ দেশঃ সমাখ্যাতঃ" ··· ইত্যাদি।

এখানে কামরূপের প্রধান কেন্দ্র গণেশ হইতে সাগর পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট এবং গণেশের পূর্ব্বে সমুদ্রের উত্তরে কচ্ছদেশ—বলা হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণতঃ কামরূপ বলা হয় নাই। এই প্রকার—

"শিলহট্টাৎ পুর্ব্বভাগে কামরূপাৎ তথোত্তরে।
পুলচ্ছি দেশো দেবেশি! নরনারায়ণঃ পরঃ।"

এস্থলেও কামরূপের উত্তর বলিতে কামরূপের অপর প্রসিদ্ধ অংশ ত্রৈপুর অর্থাৎ ত্রিপুরার উত্তর, বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্মপুত্র লাক্ষার সঙ্গম পর্য্যন্ত কামরূপের দক্ষিণ, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর কৈকয়, এবং তাদৃশ কামরূপের উত্তর শিলহট্টের পূর্ব্ব পুলচ্ছি দেশ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং এখানে শব্দ জ্ঞান নিয়া কৈকয়ের উত্তর কামরূপ বলিতে ত্রিপুরার ন্যায় গণেশকেই বুঝিতে হইতেছে এবং তাহাই সুসঙ্গত।

সুসঙ্গ দুর্গাপুরের উত্তরে যে উন্নত শৈলশৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকেই তত্রত্য জনগণ গণেশ বা গণেশ্বর পর্ব্বত বলিয়া থাকে। "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" সুতরাং প্রমাণ বা যুক্তি বিরুদ্ধ না হওয়ায় ঐ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াই উহাকে গণেশ গিরি নিশ্চয় করা সুসঙ্গত।

পৌরাণিক ভূগোল "বিশ্ববিজ্ঞান" গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর রঘুনাথ সার্ব্ব-ভৌম মহাশয়ও বহু গবেষণা পুর্ব্বক উহাই গণেশ—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত পুর্ব্বক লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব সুসঙ্গোত্তরবর্ত্তী অত্যুন্নত শৈলমালাই গণেশ ; তাহা হইতেই ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত কৈকয় দেশ বিস্তৃত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য কেকয়বাসী কোন ক্ষত্রিয় নৃপতি এদেশ অধিকার করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদবধিই উহা কেকয় বাসীর অধিকৃত দেশ বলিয়া কৈকয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে. বাস্তবিক উহা কৈকয় নহে, এরূপ কথার অবতারণাও অনেকে করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ব্রহ্মপুত্রাৎ কামরূপাৎ ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা এ দেশই কৈকয় নামে প্রমাণিত হওয়ায় প্রমাণ বিরুদ্ধ ঐ অনুমান স্বীকার্য্য নহে ; যদি ও গর্গ সংহিতায় প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে

বিপাশাং স তদোত্তীর্য্য সন্যৈঃ শোননদং নৃপ!
কৈকয়ানাং য যৌ ধম্বী প্রদ্যুম্নোমিত্র বিক্রম।

এ বচনোক্ত বিপাশা নদী এবং শোননদ অতিক্রম করিয়া প্রদ্যুম্ন কৈকয় দেশে উপনীত হইয়াছিলেন. লিখা দ্বারা বিপাশা সমীপে কৈকয় দেশ প্রতীত হয়

এবং তাহা পঞ্জাব মধ্যবর্ত্তী বোধ হয়। তথাপি ঐ গর্গ সংহিতা বচনের পূর্ব্ব বচন—

আসীমাধিপতিং ডিম্বং গৃহীত্বা যাদবেশ্বরঃ।
বলিমাদায় যত্নভিঃ কামরূপং সমাযযৌ।

ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে প্রদ্যুম্ন বঙ্গাধিপতিকে পরাজয় করিয়া আসামে উপনীত এবং তথাকার নৃপতিকে পরাজয় পূর্ব্বক উপহার সহ ডিম্বকে নিয়া সসৈন্য বিপাশা ও শোন নদ উত্তীর্ণ হইয়া কৈকয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাতে কামরূপ এবং আসামের সন্নিকটবর্ত্তী—কৈকয় দেশ বোধ হইতেছে। বঙ্গ, আসাম, কামরূপ, কৈকয় ইত্যাদি প্রকারে ক্রমশঃ দিগ্বিজয়ের নির্দ্দেশে কামরূপের পর পঞ্জাব দেশস্থ কৈকয়ের পরাজয় কোনও যুক্তি বা প্রমাণ লভ্য নহে, বরং পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সহ এক মত হইলে এ দেশই সর্ব্বথা কৈকয় নামে স্থির নিশ্চয় হইয়া পড়ে। উত্তর কামরূপ হইতে কৈকয় দেশে আসিতে গণেশ শৈলকে দক্ষিণে রাখিয়া ঘুরিয়া আসিলে বর্ত্তমান শুনাই ও বরাক নামে প্রসিদ্ধ নদীদ্বয় পাওয়া যায়; এ শুনাই নদীই সম্ভবতঃ পূর্ব্বে শোন নামে অভিহিত হইত। বরাকই বিপাশার অপভ্রংশ কিম্বা বিপাশা অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দানাপুরের সন্নিকট শোন নদ প্রসিদ্ধ থাকিলেও তন্নিকটে বিপাশা না থাকায় এবং কামরূপ প্রভৃতি দেশ সমূহের পরস্পর সান্নিধ্যাভাব জন্য ঐ শোন নদ সে শোন নদ নহে। সুতরাং পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায় উদ্ধৃত বচনোক্ত শোন নদই বর্ত্তমান শুনাই নদী। বিপাশাও বিরাক বা বরাকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বিজ্ঞপাঠকগণ—তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রণিধান করিবেন।

দশরথ মহিষী কৈকেয়ীর জন্মস্থান যে স্বতন্ত্র কেকয়দেশ, পরন্ত এই কৈকয় দেশ নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্ববিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণেতা ৺রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় ঐ গ্রন্থ শেষে আত্ম পরিচয় প্রদান কালে বলিয়াছেন—"যাহার উত্তরে নীলগিরি এবং নগরাজ গণেশ বিরাজমান, লৌহিত্য পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী কৃষিশ্রেষ্ঠ মনোহর কৈকয় দেশ, কংসনদীর দক্ষিণ তীরে সুসঙ্গান্তর্গত স্কন্দপল্লী (কান্দাপাড়া) গ্রামে আমার বসতি। যথা—

রম্যে কৈকয় দেশকে কৃষিবরে লৌহিত্য পূর্ব্বোত্তরে
লিঙ্গং নীলগিরিং গণেশ-নগরাট্ শৃঙ্গেন যস্যোত্তরে
শোভামাতনুতে সুসঙ্গসকলে কংসাখ্যানদ্যা স্তটে
দক্ষে মে বসতিঃ সদাত্র শুভতী যা স্কন্দপল্লীনরৈঃ॥

পরমারাধ্য—অধ্যাপক পণ্ডিত কুলশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তৎ প্রণীত উদ্বাহচন্দ্রালোক প্রভৃতি গ্রন্থে আত্ম পরিচয় প্রদান কালে নিজ নিবাস ভূমি লৌহিত্য পূর্ব্ববর্ত্তী সহর সেরপুরকে কৈকয় দেশান্তর্গত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ আপনাকে কৈকয়বাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"রাধাকান্ত ব্রহ্মময়ী সূনোঃ কৈকয় বাসিনঃ॥

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসা, বিচার নিপুণতা তৎপ্রণীত বিশ্ববিজ্ঞানের ভূগোল খগোল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বিজ্ঞপাঠকগণকে বিমোহিত করিবে। যন্ত্র ও পাশ্চাত্য ভাষার অনাশ্রয়ী ক্ষুদ্র পল্লীবাসী প্রাচীন পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দর্শনে আত্মহারা হইবেন। তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপে ও বিচারে বিমুগ্ধ ভারতপূজ্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ও অনেক সময় তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যে বিশেষ প্রসংশা করিতেন। সুতরাং ঈদৃশ সকল পণ্ডিত-জন-গণ-মান্য পণ্ডিত মহোদয় দ্বারা নির্দ্ধারীকৃত লৌহিত্য পূর্ব্ব ও পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী কামরূপান্তর্গত এ প্রদেশ কৈকয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোন কোন ঐতিহাসিক মহোদয় এ দেশের অভিনবত্ব এবং কিছু দিন পূর্ব্বে এ দেশ সম্পূর্ণ অনার্য্যগণের নিবাসভূমি ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি—পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রাদিতে এদেশের নাম, সীমা, কীর্ত্তিকাহিনী কীর্ত্তিত রহিয়াছে; সুতরাং মধ্য যুগে ইহার অধিবাসী অনুমানে অনার্য্য বহুল প্রতিপন্ন হইলেও প্রাচীন ঋষিযুগে এ পবিত্র ভূমি প্রবল পরাক্রান্ত ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় নরপতিগণের আধিপত্যে আর্যগণেরই অধ্যুষিত ছিল। পাঠকগণকে গর্গ সংহিতা হইতে তৎসম্বন্ধে একটী প্রমাণ উপহার দিতেছি যথা—

কৈকয়স্যাধিপো রাজা ধৃষ্ট কেতুর্ম্মহাবলঃ।
বসুদেব স্বসুঃ কেতুঃ শ্রুতকীর্ত্তেঃ পতির্ম্মহান্।

অর্থাৎ বসুদেবভগ্নী শ্রুতকীর্ত্তির পতি শ্রেষ্ঠ মহাবল

ধৃষ্টকেতু কৈকয়াধিপতি ছিলেন! মহাবল পরাক্রান্ত আর্য্য শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু অনার্য্যের আধিপত্য নিয়া অনার্য্য সংসর্গে এ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ পূত প্রদেশ অনার্য্যেরই আবাস ভূমি ছিল এরূপ কল্পনা একান্তই অশ্রদ্ধেয়। সুতরাং এ দেশে আর্য্যবসতির এবং প্রাচীনত্বের ইতোধিক প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

প্রকৃত তত্ত্বানভিজ্ঞ বঙ্গদেশবাসী কোন কোন ব্যক্তি এ দেশ পাণ্ডব বর্জ্জিত বলিয়া কি জানি কি বুদ্ধিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। পাণ্ডবগণের অনাগমন দ্বারা এ দেশ সম্বন্ধে তাহাদের তত্ত্বাবের প্রতি তদ্দেশাপেক্ষা এ দেশের অভিনবত্ব কিম্বা পাপ ভূমি কল্পনাই কি হেতু?

তীর্থ যাত্রা ব্যাতিরেকে যে দেশে গমন করিলে—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাদৃশ দেশে এবং বহু ম্লেচ্ছ-দেশেও অভিগমন ও তদধিপতিকে পরাজয় পূর্ব্বক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদের গমনাগমন দ্বারা দেশের কি গৌরবাগৌরব বা পবিত্রাপবিত্রত্ব নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণের অনাগমন প্রমাণও তাহারা প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন। পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় সমকালিন পাণ্ডবসখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তনয় মহামতি প্রদ্যুম্ন যে দিগ্বিজয় করিতে এ দেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে গর্গ সংহিতোক্ত "কৈকয়ানাং যযোধন্বী প্রদ্যুম্নোমিত বিক্রমঃ" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং তত্র যে মানবাঃ সন্তি তে দেবা নাত্র সংশয়" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বহু প্রমাণ প্রয়োগে এ দেশ জাত জন মানবাদির পবিত্রতা দ্বারা দেশের পবিত্রত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপরও বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ দেশের আধুনিকত্ব বা হেয়ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া ঘৃণায় নাসিকা নিকুঞ্চন সঙ্গতে কি না নিরপেক্ষ বিজ্ঞ-পাঠকগণের উপর বিচার ভার সমর্পণ করিয়া বিরত হইলাম।

পাণ্ডবগণের কৈকয়ে শুভাগমনের স্পষ্ট প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হইলেও মহাভারতোক্ত ভীমার্জ্জুন দিগ্বিজয় হইতে তাহাদের কামরূপ ও কৈকয় দেশাগমনও যুক্তিক্রমে প্রতীতি হয়, যথা।—ভীম দীগ্বিজয়ে—

বসুংতেভ্য উপাদায় লোহিত্যমভিজগ্মিবান্।
স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতিন্ সাগরানুপবাসিনঃ।

ভীম রাজগণ হইতে ধন রত্নাদি গ্রহণ করিয়া লোহিত্যে উপনীত হইলেন এবং তিনি সাগরকূল-বাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকেও পরাজিত করিলেন। ভীমসেন পূর্ব্বদেশ জয় করিতে আসিয়া লোহিত্যাভিগমনের পর সাগর সন্নিকটবাসী ম্লেচ্ছ নরপতিগণের পরাজয় দ্বারা লোহিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কৈকয়াগমন এবং তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সাগর সন্নিকটস্থ ম্লেচ্ছদেশ পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক তদধিপতির পরাজয় প্রতীতি করিতেছে।

এতদ্বারা ইহাও প্রত্যয় হইতেছে—কৈকয়ের বহু পূর্ব্বে সাগর সন্নিকটেই ম্লেচ্ছাধিবাস ছিল; কিন্তু কৈকয়ে নহে।

কালিকাপুরাণে এবং যোগিনীতন্ত্রে কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ নরকের অধিকৃতছিল উল্লেখিত হইয়াছে। অর্জ্জুন, কিরাত, চীন ও সাগর তীরবাসি অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধৃবর্গে পরিবৃত ভগদত্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভগদত্ত নরক-নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপেরই রাজধানী। ভগদত্তইতৎ কালে কামরূপের অধীশ্বর ছিলেন, সুতরাং তাহাকে পরাজয় করিতে যাইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অর্জ্জুনের কামরূপাগমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। কৈকয় কামরূপান্তর্গত তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং তাহার কামরূপাগমন দ্বারা কৈকয়াগমন ও ব্যঞ্জিত হইতেছে না কি? অন্যান্য দেশের কোনও এক স্থানে তাহাদের শুভাগমনের ন্যায় এ দেশেরও কোন ও এক প্রান্তে পাণ্ডবগণের আগমনে এ দেশকেও পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ বলা যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে প্রমাণশূন্য নিন্দাবাদকারীগণের আত্মশ্লাঘা উপহাসের সহিত উপেক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক মহাত্মাগণের মনোনিবেশ সানুনয় প্রার্থনা পূর্ব্বক সম্প্রতি ইতোধিক নিবেদনে বিরত হইলাম।

শ্রীকালীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।
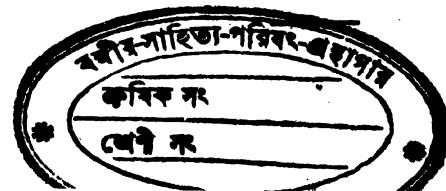
দেবী-বন্দনা।

ওগো নারী, দেবতার আরাধ্য রতন !
পূজে যোগী ঋষি নিত্য রাতুল চরণ !
ও-দিব্য মাধুরী মাঝে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাজে,
যুগে যুগে তাই তুমি চির-সুশোভন !
তোমার মোহন স্পর্শে, জাগরণ আসে হর্ষে,
আনন্দে নয়ন বর্ষে মুক্তা বিমোহন !
ফুটাইছ পুণ্য প্রেমে জীবন যৌবন !
তব প্রীতি-সাহচর্য্যে ধন্য হলো রাম।
প্রাণ লভে সত্যবান্ বিধি যবে বাম !
লক্ষ্মীন্দ্র ও শিখিধ্বজ, পেয়ে বিন্দু প্রেম-রজ,
তোমারি সাহায্য শেষে হোলো সিদ্ধকাম !
পূজি' তোমা চণ্ডীদাস, করিছে বৈকুণ্ঠে বাস,
দিলে বিল্বমঙ্গলেরে শিক্ষা অভিরাম !
তুলসীদাসের ঘোচে জীবন-সংগ্রাম !
এজগতে কে করিবে তোমাদেরে ঘৃণা ?
শিব সে তো শবপ্রায় হ'লে শক্তিহীনা !
যে জন যেমন চায়, তুমি তাহা দাও তায়,
সংসার চলে না কভু তোমাদেরে বিনা !
মন্থনে গরল ওঠে, দনুজেরা থেতে ছোটে,
অমৃত খেয়েছে শুধু দেবতারা কি না ?
পূজার প্রকার ভেদে তদ্রূপ দক্ষিণা !
তুমি না রহিলে বিশ্ব হ'ত মরুময় !
জীবন-সংগ্রামে নিত্য হ'ত পরাজয় !
সাদরে হৃদয়ে টানি', কে শোনাতো মধু-বাণী,
আবার বাঁধিতে বুক কে দিত অভয় !
কাহার সহজ প্রেমে, স্বর্গ হেথা আসে নেমে,
ঘুচাইতে হাহাকার, জুড়াতে হৃদয় !
তুমি আছ সৃষ্টি তাই পায়নি বিলয় !
তথাপি তোমারে যত পাপাত্মা কুক্কুর,
পথে ঘাটে গৃহকোণে পিষিছে প্রচুর !
স্পর্শিলে তোমার দেহ, সমাজে লয় না কেহ,
বিনা দোষে রুদ্ধ গেহ সদা 'দূর দূর' !
নারীর সম্মান ভবে, আবার রাখ, মা, সবে,
কর্ত্তব্যে কঠোর হ'তে কোরো না কসুর।
সতীত্বে পড়েছে হাত, বিনাশো অসুর !
আজি নত শিরে, নারী, নমি বারম্বার !
লহ মাতা, ভগ্নী, জায়া, দুহিতা আমার !
লো রমণী, মনোরমা, যুক্ত করে চাহি ক্ষমা,
সহিছ ধরিত্রীসম কত অত্যাচার !
বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চল এবে সাথে সাথে
আলোকিত কর পন্থা ঘুচাও আঁধার !
তুমি কি পাবে না পূজা ভারতে আবার ?

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কাল।

কাল-সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র লহরীর ন্যায় এই নবীন বৎসর তাহার ক্ষণিক জীবন লীলার নবীন উপকরণ লইয়া উদিত হইল। অনাদি সৃষ্টি চক্রে মহাকালের বিশালবক্ষে এরূপ কত অগণিত বৎসরের উদয় ও বিলয় হইয়াছে। তাঁহার বিরাট বিগ্রহ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই বিশাল ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে, আবার তাঁহারই সীমা শূন্য ব্যাপ্তিতে লুক্কায়িত হইয়াছে। অনন্ত জীব নিচয় বিচিত্র ফেন বুদ্‌বুদের মত ভাসিতেছে—ভাঙ্গিতেছে; কল্লোল কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত; সাগর কিন্তু এ সকলে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার, তাঁহার ইহাতে ক্ষয় বৃদ্ধি নাই।

ক্ষুদ্র জীব আমরা ক্ষণিকের সহিত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছি। সময়ের গতায়াতে আমরা দেখিতেছি পরমায়ুর ক্ষুদ্র আয়তনের কতখানি অতিক্রান্ত হইল ও কি পরিমাণ অবশিষ্ট রহিল। ষষ্টি, সপ্ততি বৎসর যাঁহারা ধরাধামে জীবন ধারণ করিয়া রহিতে পারেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য আমাদের দৃষ্টিতে লোভনীয়রূপে প্রতিভাত হয়। আমরা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই যে দেখিতে দেখিতেই ত এ সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে, কাল পূর্ণ হইলে সাধের শরীর বিশীর্ণ হইবে, নির্দ্দয় দৈবের অপ্রতিবিধেয় কর-তাড়নে জীবন-কুসম বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িবে, প্রাণোপম আত্মীয়গণ অচ্ছেদ্য মমতা বন্ধনে বৃথাই বাঁধিতে প্রয়াসী হইবে, আকুল অশ্রু নিষ্ফল ব্যাকুলতায় বৃথাই বিগলিত হইবে, সংসারের

নশ্বর সুখৈশ্বর্য্য অলব্ধ ভোগের মরীচিকা রচনায় বৃথাই হৃদয় বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। জীবন-মৃত্যুর সে মহা সন্ধিক্ষণ—সে কুলিশ কঠোর পরীক্ষা দিবস কত দূরে—এই প্রশ্নই তীব্র আঘাতে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

কাল সর্ব্বাপহারী। সংহত জলবিন্দুর সমবায়ে গঠিত সাগর তরঙ্গ যেমন ক্ষণিক প্রাদুর্ভাবের পরই বিশ্লিষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায় তেমনি সংহত পরমাণু নিচয়ে রচিত এই শরীর ও অচিরেই বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাট কাল হৃদয়ে লীন হইয়া যাইবে।

অস্মিতার মিথ্যা পরিধির মধ্যে বিশ্বশক্তির ক্ষুদ্রতম সংঘাতটিকেও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। অদ্য যাহা আমার বলিয়া অভিমান করিতেছি, সংহার রূপিণী কালশক্তি কল্যই তাহা বিধ্বস্ত করিবেন। আমার আধারে যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে দৈব নির্দ্ধারিত স্থিতির পর তাহার বিলয় ও অনিবার্য্য।

বস্তুতঃ আমার বলিয়া কোন পদার্থের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব অনৃতময়ী বুদ্ধিরই পরিকল্পনা। অহং কেন্দ্রের মধ্যে যাহা কিছু বিকশিত হইয়া উঠিতেছে তাহা বিশ্বরূপিণী প্রকৃতিরই ক্রীড়া বিশেষ। শুধু তাই নয় এ অহংকারও তাঁহারি অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার সৃষ্টি—তাঁহারই ত্রিগুণ-ময়ী লীলার একটি যন্ত্র মাত্র। জীবের অহংবুদ্ধি আপনাকেই কর্ত্তৃরূপে বিবেচনা করিয়া অনন্ত সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে—কালের ঘাত প্রতিঘাতে নিয়ত বিপর্য্যস্ত হইতেছে। সে তাহার দেহজ সুখ তাহার ধন-জন-যৌবন একান্ত অপনার মনে করিয়া নিশ্চিন্ত বিলাসে সময় উদ্‌যাপন করিতে চাহে বলিয়াই কালের কঠিন পীড়নে নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে। চিরসঞ্চিত দুষ্কৃতি বশেই সে কাল পুরুষের ভ্রূকুটি কুটিল উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আতঙ্কে মুহ্যমান হইতেছে। বস্তুত তাহার বদ্ধমূল অশুভ সংস্কারের গ্রন্থি বিদীর্ণ করিবার জন্যই তীব্র প্রহারে কাল তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছেন। যখন তাহাতেও তাহার অজ্ঞানতা দূর হইতেছে না তখন নিঃশেষেই তাহাকে ধ্বংস করিয়া সৃষ্টির চিরন্তন চক্র পরিচালিত করিতেছেন।

কালপুরুষ একাধারে ভীষণ ও রমণীয়। একদৃষ্টিতে কালের প্রজ্বলিত করাল বদনে অনন্ত কোটি বিশ্ব অগণ্য জীবপুঞ্জ লইয়া প্রবেশ করিতেছে—কঠোর দংষ্ট্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। পক্ষান্তরে তিনিই শান্ত প্রসন্ন চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে জগতের স্থিতি বিধান করিতেছেন। এক দিকে মুণ্ডমালিনী শ্মশানরঙ্গিনী এই কালশক্তি অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া রক্তাক্ত খড়্গের আঘাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বংস করিতেছেন। অপর দিকে ইনিই স্মেরানন সরোরুহা কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে বরাভয় দানে ভক্তকে আপ্যায়িত করিতেছেন। মা আমাদের অসুরদলনী কিন্তু ভক্তজন প্রতিপালিনী।

অহংকারের আমূল উৎসর্গেই ভক্ত ভাগবতী কৃপার অধিকারী হন। ভক্ত আপনার তরে কিছুই রাখেন না, জগজ্জননীর চরণে সকলই নিঃশেষ নিবেদন করেন। ভক্তি যোগের বিচিত্র সুন্দর ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রথম বাহিরের পুষ্প ফল জল নৈবেদ্য ও ইন্দ্রিয়ের প্রিয় যাবতীয় ভোগ্য বস্তু শ্রীভগবানের উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া থাকেন। এই ভাবে, বিষয় নিচয়ের সহিত মমত্ব বোধের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ ক্রমে তিরোহিত হইতে থাকে; তাহার পর প্রাণের বিচিত্র বৃত্তি ও অন্তঃকরণের বিবিধ ভাব তাঁহারই শ্রীচরণে পুজাঞ্জলিরূপে অর্পণ করেন। পরিশেষে, অজ্ঞানতার কেন্দ্র-দুর্গ ও বন্ধনের একমাত্র অবলম্বন অহংকারটিকেও তাঁহারই শ্রীহস্তে তুলিয়া দেন। ভক্ত কাল্পনিক সর্ব্বস্বের বিনিময়ে শ্রীভগবানকেই জীবিত সর্ব্বস্ব করিয়া গ্রহণ করেন।

আসুর অহংভাব পরিহার পূর্ব্বক দিব্য ভাব অর্জ্জন করিতে করিতে জীব পরম পদ অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, কাল পুরুষের অমিত তেজ ধারণে সে ততই সমর্থ হয়। সে তখন ইহা উপলব্ধি করিতে পারে যে আত্মা অবিনাশী—শাশ্বত কালের সহিত ইহা অন্বিত। তাহার আপাত প্রতীয়মান ব্যক্তিত্ব কাল সাগরের বুদ্‌বুদ মাত্র—ধ্বংস তাহার অনিবার্য্য!

এইরূপে জীবের অভিমান যতই তিরোহিত হইতে থাকে জ্ঞানের জ্যোতির্লেখা ততই উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। আঁধারের ঘনকৃষ্ণ আবরণ বিদীর্ণ করিয়া আত্মার হিরণ্ময় প্রতিমা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে; ক্রমে জীব তাহার অসিদ্ধ, বদ্ধ ও অশুদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া

জ্ঞানোদ্ভাসিত আলোকে, কোটি সূর্য্য সঙ্কাশ বিষ্ণুর স্বধামে উপনীত হয়। তথায় সে শুদ্ধ, বুদ্ধ ও সিদ্ধ। পরমেশ্বরের স্বধর্ম্ম সে প্রাপ্ত হইয়াছে। আর সে ক্ষণিকের ক্রীড়া কন্দুক মাত্র নয় সে স্বয়ংই মায়াধীশ ও অন্তর্য্যামী। তাহারই শাসনে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংসাধিত হইতেছে।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতিসূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু ধাবতি পঞ্চমঃ।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রসারিত তাহার বিরাট ক্রোড়ে অনন্ত ভাব ও বস্তু সূক্ষ্মে ও স্থূলে ক্রীড়া করিতেছে। যুগ, সংবৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত তাহারি বিশ্বপ্রসারিত দৃষ্টির উন্মীলনে বিকসিত হইতেছে, আবার নিমীলনে অন্তর্হিত হইতেছে। সে একাধারে স্রষ্টাপুরুষ ও সৃষ্টিশক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর—মহাকাল ও মহাকালী।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

মুক্তি।

মণিরামপুরের সুবৃহৎ পালগোষ্ঠী আপনাদের পৈত্রিক ব্যবসায়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিলেও সরস্বতীকে এক রকম দূর হইতেই নমস্কার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। বেশী লেখা পড়া না শিখিলেও যখন পরম শান্তিতে ভুঁড়ি দোলাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা চলিয়া যায়, তখন বামুন কায়েতের ছেলেদের মত লেখা পড়া শিক্ষা করা বা তজ্জন্য অর্থ ব্যয় করা তার মোটেই প্রয়োজনীয় মনে করিত না; কাজেই বাংলা বিদ্যা-বারিধি পাড়ি দিয়া জ্ঞানের তরীকে ওপারে ভিড়াবার তাহাদের একেবারেই আগ্রহ দেখা যাইত না। অন্ততঃ পালগোষ্ঠীর সৌভাগ্য-স্রোত যতদিন এক টানা বহিয়া ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের এ সংস্কারের ব্যতিক্রম হয় নাই।

কিন্তু নবকিশোর পাল হইল দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। ছেলে বেলা হইতেই পিতার মুদি দোকানে বেচাকেনা করা অপেক্ষা পড়া শুনা করিতেই সে যেন ভালবাসিত বেশী। বয়ঃ বাহুল্য লেখা পড়ার প্রতি তার এই অখণ্ড মনোযোগ পিতার নিকট খুব প্রীতিকর হইল না। কিন্তু বাপ কিছুতেই ছেলেকে দোকানের কাজে বেশীক্ষণ খাটাইতে পারিত না। এমন কি এই নিয়া তারা স্বামী স্ত্রীতে সময় সময় রাগারাগি করিতেও ছাড়িত না। স্ত্রী বলিত, বড় ছেলে দু'জনইত সংসারের কাজ দেখ্‌ছে, এই দুধের ছেলেকে আবার ওখানে টান্‌ছ কেন, ও পড়তে চাচ্ছে, পড়ুক না।

ছেলের ভাবগতিক দেখিয়া পাড়ার পাঁচজনেও বলিল—তা ছেলেটার যখন নিজের বিষয় ব্যবসা শিখার দিকে মোটেই ঝোক্ দেখা যাচ্ছে না, তখন ওকে পড়তেই দাও হে নবীন পাল—আখেরে ভাল হইতে পারে।

সুতরাং চারিদিক হইতেই বাধা পাইয়া নবীন পাল হাল ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ দিকে ছেলে ও আপন মনে বীণাপাণির মনোরম কুঞ্জপথে ধীরপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে সে যখন দশ টাকা জলপানি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন পাড়ার লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। লেখা পড়া না করিতেই যারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে. তারা সমব্যবসায়ী পাল নন্দনের এই সফলতায় একেবারে অবাক হইয়া গেল। নবীন পালের মনে ও যে একটুখানি গর্ব্ব হয় নাই তা বলা যায় না, তবে সবচেয়ে নবকিশোরের মাতৃহৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল বেশী।

স্ত্রী ধরিয়া বসিল, ছেলেকে আরো পড়াইতে হইবে। দশজনের মুখে কলেজে পড়ার খরচের কথা শুনিয়া নবীন পালের চোখ কপালে উঠিয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীর ঘোরাল যুক্তি তর্ক ও ভ্রূকুটী কুটীল কটাক্ষের কাছে তার কোন আপত্তিই টিকিল না। ছেলে কলেজে ভর্ত্তি হইল, এবং বছর চারি পরে গ্রামবাসীর অধিকতর প্রশংসা ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া, সসম্মানে বি, এ ডিগ্রী লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

এবার ছেলের চোখ ফুটিয়াছে। অতঃপর এক সঙ্গে এম, এ, বি, এল পড়িবার জন্য সে নিজেই বাপকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু অনেক বলিয়া কহিয়াও কিছুতেই তার

বাপের মত করাইতে পারিল না। তার কারণ ছিল।

কালবশে নবীনপালের সৌভাগ্য নদীতে তখন ভাটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি দেনার দায় তাকে কতকটা বিব্রত করিয়াই তুলিয়াছে। বড় ছেলে জগমোহন ইতিমধ্যে তরলপদার্থের একটু অতিমাত্রায় ভক্ত হইয়া উঠিয়া ঘূর্ণিতলোচনে তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় সুরু করিয়া দিয়াছিল। মধ্যম রাজমোহন সঙ্গীত রসে বেজায় মসগুল হইয়া পড়িয়া পাড়ার সখের থিয়েটারের আড্ডায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করায়, দোকানের কাজকর্ম দেখিবার তার বড় ফুরছুৎ হইয়া উঠিতেছিল না। সংসারের এই অবস্থা দেখিয়া নবীনপালের চক্ষু স্থির হইয়া গেল।

নবীনপালের বয়স হইয়াছে। গুরুতর পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায়, তার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ব্যবসায় দেখা ও রাখার মত যোগ্যতা এই দুই ছেলের একটারও নাই দেখিয়া ভিতরে ভিতরে সে শুধু গুমরাইয়া মরিতে লাগিল। আপনার অভাবে এই পালপরিবারের ভবিষ্যত যে অন্ধকার তাহা বুঝিতে এই পাকা ব্যবসায়ীর দেরী হইল না।

'নবা' যখন বি, এ পাশই করিয়া ফেলিয়াছে তখন তাকে একটা চাকরীতেই ঢুকাইয়া দিবে, না তাহার ব্যবসাতেই টানিয়া আনিবে এটাই হইল এখন নবীন পালের ভাবনার বিষয়। কিন্তু ইংরাজীপড়া ছেলে এই মুদি দোকান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে কি? ছেলে আবার উকীল হইতে চাহিতেছেন। কিন্তু নূতন উকীল বাবুদের "অন্তভক্ষধনুর্গুণ" অবস্থা দেখিয়া একাজ নবীন পালের পছন্দ হইল না।

সেবার গ্রামে একটা সাংঘাতিক মারামারি মামলার তদন্তে আসিয়া দারগা বাবু কি টাকাটাই না লইয়া গেল! আর তার কি সম্মান! এর তুলনায় নূতন উকীলদের কি ই বা রোজগার! চাকরি যদি করিতে হয় তবে এমন চাকরিই করা উচিত—ভাবিয়া নবীন পাল মন স্থির করিয়া লইল এবং একদিন ছেলেকে নিভৃতে ডাকিয়া তার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। শুনিয়া নবকিশোর ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া দৃঢ়চিত্তে তার অসম্মতি জানাইল। এবং পিতাকে এর কুফল বুঝাইতেও ত্রুটি করিল না।

অবস্থার বিপর্য্যয়ে নবীন পালের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল।

কি করিয়া বেশী অর্থ ঘরে আসিবে, এই চিন্তা ও আশায় তার হৃদয় নিয়ত দোলায়মান থাকিত। কাজেই ছেলের তর্কে সে রাগিয়া উঠিয়া কহিল—দু'পাতা ইংরেজী পড়েছ কি না, তাই বাপের উপর কথা না কইলে চলবে কেন? আরে বাপু পণ্ডিতই হও আর যাই হও, সংসারের ভাল-মন্দ বুঝতে তোমাদের এখনো ঢের দেরী—বলিয়া খরম পায়ে ফটাফট শব্দ করিতে করিতে অন্দরে ঢুকিয়া গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

অবস্থা দেখিয়া গিন্নি ছেলেকে ডাকিয়া আনিয়া স্নেহ কোমল স্বরে কহিলেন—বাবা সুপুত্র তুমি ওঁর কথা মতই চল।

ছেলে আর দ্বিরুক্তি করিল না। কারণ এই "মা"টী ছিল তার একান্ত গর্ব্বের বস্তু। এঁর প্রতি অচলা ভক্তি নবকিশোরের কোন দিন ক্ষুণ্ন হয় নাই। বাপের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য হইলে তার জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার রঙ্গীন কল্পনা যে জলবুদ্বুদের মত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে এচিন্তায় তার মনে আর ক্ষোভের অন্ত রহিল না। কিন্তু কোন উপায় নাই।

যাহা হউক প্রিন্সিপালের সুপারিশের জোরে অপেক্ষাকৃত সহজেই নবকিশোর পুলিশের সবইন্সপেক্টর পদে বহাল হইয়া গেল। তার হৃদয়ে কিন্তু এর জন্য অনুমাত্রও আনন্দ হইল না। সে পিতৃ আদেশের যুপকাষ্ঠে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়া কর্ত্তব্য পালন করিল মাত্র।

দেখিতে দেখিতে নবকিশোরের দারগগিরির একটী বৎসর কাটিয়া গেল। হঠাৎ পিতা তিন শত টাকা চাহিয়া বসিলেন। যে জিনিষটার প্রলোভন দমন করিতে না পারায় এই বিভাগটী কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া দশের দুর্নাম কিনিয়া বসিয়াছে তাহার ভাগী হইতে নবকিশোর কিছুতেই আপনার শিক্ষিত মনকে উৎসাহিত করিতে পারিল না। ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিলেও মনুষ্যত্ব হারাইতে সে কোন মতেই রাজী হইল না। কাজেই মাহিয়ানার ক'টী টাকাই ছিল তার সম্বল এবং ফল হইল দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম। এই বৎসরাধিক কাল চাকরী করার পর

তার হাতে যে সামান্য কিছু টাকা জমিয়াছিল তাহাই বাপকে পাঠাইয়া দিল।

মাস তিনেক পরে সাংসারিক অসচ্ছলতার কথা জ্ঞাপন করিয়া নবীন পাল পুত্রের কাছে এক পত্র লিখিল। সংসার আর চলে না, সম্প্রতি পাঁচ শত টাকার নিতান্ত দরকার।

চিঠি পাইয়া নবকিশোর হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এত টাকা সে কোথা হইতে দিবে। হাতে যে একটী পয়সাও নাই! অগত্যা নিরুপায় হইয়া নিজের ঘড়ি চেন বিক্রয় করিয়া ও বন্ধুবান্ধবের কাছ হইতে ধার করিয়া টাকাটা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

চাহিবা মাত্র টাকা পাইয়া বাপের আর আনন্দের সীমা রহিল না। রোজকারী ছেলের কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া নবীন পালের চাহিদাও দিন দিন বাড়িয়া চলিতে লাগিল। নবকিশোরের কিন্তু অসোয়াস্তির আর অন্ত ছিল না। অথচ মুখ ফুটিয়া পিতাকে কিছু বলিতেও সে পারিল না।

কিন্তু অল্প কয়দিন পরেই যখন আবার এক হাজার টাকা পাঠাইবার আদেশ আসিল তখন সে কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। স্পষ্ট ভাষায় নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানাইয়া দিল। সে যে একটীও বাজে পয়সা লয় না, মাত্র বেতনের কয়টী টাকাই যে তার অবলম্বন—একথা লিখিতেও ভুলিল না।

চিঠি পাইয়া নবীন পাল জ্বলিয়া উঠিল। দারগা হইয়া ঘুষ লয় না—এমন কথা ত সে কখনও শুনে নাই, আর ঘুষের টাকা না লইলে দারগা গিরি চাকরী করাই বা কেন? পাকা ব্যবসায়ী নবীন পাল ছেলের এ সব কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না—বুঝা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তাই সে মনের মত করিয়া ছেলের কাছে জবাব লিখিয়া দিল।

চিঠি পাইয়া পিতার মনের ভাব উপলব্ধি করিতে নবকিশোরের ক্ষণ মাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় সেদিন কাটাইয়া দিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

প্রায় ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে; নবকিশোর বাড়ীতে একটী পয়সাও পাঠাইতে পারে নাই। সাংসারিক দুরবস্থার কথা জানাইয়া, তাহার পিতা টাকার জন্য বারম্বার পত্র লিখিয়া নিরাশ হইয়া, অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। বলা বাহুল্য পুত্রের প্রতি তার মন বিরূপ হইয়া উঠিল।

পরাণগঞ্জ থানায় বদলি হইতেই, নবকিশোরের উপর এক ভীষণ খুনি মামলার তদন্তের ভার পড়িল। সরজমিনে মামলা তদারক করিতে গিয়া সবিস্ময়ে সে শুনিল মোকদ্দমার প্রধান আসামী তারই গুণধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! কার্য্যপলক্ষে এখানে আসিয়া এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের নায়ক হইয়া গিয়াছেন।

নবকিশোরের হাতে মামলার ভার পড়াতে আসামীরা নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। দারগার নিজের ভাই যখন আসামী তখন এ মামলার ফল যে তাদের অনুকূলেই হইবে, সে বিষয়ে তাহারা এক প্রকার নিঃসন্দেহ হইল।

কিন্তু দারগা বাবুর ভাব গতিক দেখিয়া তাদের এ ভুল ভাঙ্গিতে বেশী দেরী হইল না। মামলার ফলাফল সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া, দারগা প্রথমেই একটা মোটা রকমের টাকা দাবী করিয়া বসিল। জগমোহনের বন্ধুবান্ধবেরা অবশ্য কথাটা তার বাপের কাণে তুলিতে ছাড়িল না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নবকিশোর টাকা ছাড়িয়া দিতে রাজী হওয়া দূরে থাকুক, একটী পয়সা ও কমাইতে সম্মত হইল না।

ফরিয়াদী পক্ষের লোকেরাও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। দারগার নিজের ভাই আসামী শ্রেণী ভুক্ত বলিয়া যাহাতে এ মামলার তদন্তের ভার অন্য দারগার হাতে পড়ে তাহারা সে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া এই অল্প দিনের ভিতরেই নবকিশোরের সুনাম ছড়াইয়া পড়ায় এমন নির্লোভ সুদক্ষ দারগার হাতে ন্যায় বিচারের অপব্যবহার হইবে না বলিয়া ধারণা হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ফরিয়াদী পক্ষের কথায় কর্ণপাতই করিলেন না।

জগমোহন কিন্তু রাগে ফুলিতে লাগিল। ভাই হইয়া

ভাইয়ের প্রতি এমন নির্ম্মম ব্যবহার! বড় হইলে লোক এম্‌নি হয় বটে! বুড়া নবীন পাল কেবল হায়, হায় করিতে লাগিল। এত গুলি টাকা এই নচ্ছারের জন্য বাহির হইয়া যাইতে বসিয়াছে, আর সে টাকাও এক ভাই আর এক ভাইয়ের কাছ হইতে ঘুষ লইতেছে! তাজ্জব কাণ্ড! পুলিশের লোক এমনি ঘুষ খোর হয় বটে! এদের, দয়া, মায়া, চক্ষু-লজ্জার লেশ মাত্রও নাই।

বলা বাহুল্য দীর্ঘকাল যাবৎ নবকিশোরের কাছ হইতে টাকা পয়সা না পাওয়ায় পুত্রের প্রতি বুড়ার আর বিরক্তির অবধি ছিল না। বোধ হয় সে জন্যই তার নীতি জ্ঞান ও আজকাল একটু বেশী রকম বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

যা'হউক কঠোর উৎপীড়নে এক হাজার টাকা ঘুষ আদায় করিয়া দারগা সদর্পে থানার চলিয়া গেল এবং ভ্রাতার সপক্ষেই রিপোর্ট লিখিয়া দিল।

প্রায় মাস খানেক পরে, নবকিশোরের নিকট হইতে এক সঙ্গে হাজার টাকা পাইয়া নবীন পালের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সবিস্ময়ে সে জানিতে পাইল যে তার অত সাধের রোজকারী পুত্র এমন চাকরীটা ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতা সহরে গান্ধী মহাআজী না কে একজন আসিয়াছে—ছালার মত মোটা কাপড় পড়িয়া তারই পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রতিবেশী রাধানাথ পাল কলিকাতায় স্বচক্ষে নবকিশোরের এই অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছে! মাথায় তৈল হীন রুক্ষ চুল, খালি পা, উদাস দৃষ্টি,—দুরবস্থা দেখিয়া রাধানাথ তার সঙ্গে কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু নবকিশোর একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া সংক্ষেপে দু'চারিটি কথা বলিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। রাধানাথ কথা শেষ করিয়া কহিল—কি করবে ভাই সব অদেষ্ট, বিধাতার লেখা কে খণ্ডাবে বল,—নবকিশোরের নিশ্চয় মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে এমন সোণার চাঁদ ছেলের এই বেশ, আর এমন সুখের চাকরী কেউ ইচ্ছা করে ছাড়ে!

হায়, ছেলেটার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, এমন চাকরিটী—যাতে বাপ ভাইকেও বিশ্বাৎ করা নাই—ছাড়িয়া দিবার আগে একবার আমাকে জানাইলও না—ভাবিতে ভাবিতে নবীন পালের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; কারণ নবকিশোরের বেদনাতুর হৃদয়ের যন্ত্রণা—বিচিত্র মনস্তত্ত্ব বুঝিবার মত জ্ঞান তার ছিল না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

বিবিধ সংগ্রহ।

নূতন গ্রহ।

বিজ্ঞানের নানা শাখা যেরূপ দিন ২ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে জ্যোতির্বিদ্যাও সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। কিছু দিন হয় সৌর জগতে একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিজ কক্ষে ঘূরিতে ২ কখন ইহা সূর্য্য মণ্ডল হইতে ৩৪০০ লক্ষ মাইল দূরে যায় আবার কখন ১১৩০ লক্ষ মাইল নিকট আসিয়া থাকে। ইহা পৃথিবীর কক্ষ হইতে ১৮০ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল দূর দিয়া পরিভ্রমণ করে। ইহাকে ইরস (Eros) ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্ব নিকট গ্রহ বলা যাইতে পারে। ইরস ৩০ বৎসরে একবার পৃথিবীর ১৪০ লক্ষ মাইল নিকটে আসিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রহটী কিরূপে উদ্ভুত হইল তাহা রহস্যাবৃত। ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহের সমষ্টি ইহাদের প্রত্যেকটির পরিমাণ কতিপয় মাইল মাত্র। অনেকে মনে করিতেন ইহা কোন গ্রহের উৎক্ষিপ্ত অংশ মাত্র। ইহাদের গতি বিধি এরূপ বিভিন্ন যে বর্ত্তমানে ইহাদিগকে বিভিন্ন গ্রহের ভিন্ন ২ সময়ের উৎক্ষিপ্ত অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা ১০০০ এর উপরে এবং সে জন্য ইহাদের নামকরণ করা সুকঠিন। অধুনা ইহাদের কোন কোনটীর নাম টোকিও, রোম্‌, চিকাগো প্রভৃতি রাখা হইয়াছে।

মরুভূমে মৎস্য।

এযাবৎ কেহই বোধ হয় অগ্নিময় মরুভূমে কখন জীবিত মৎস্যের অস্তিত্ব কল্পনা করেন নাই। বর্ত্তমানে সেই ভীষণ সাহারা মরুভূমে খাদ্যের উপযোগী জীবিত মৎস্য পাওয়া গিয়াছে। যে প্রকারে এই জীবিত মৎস্য লোক চক্ষুর গোচর হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই আশ্চার্য্যজনক। মরুভূমের মাঝে ২ খেজুর বৃক্ষের কুঞ্জ দেখিতে পাওয়া

যায়। উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপরে এই বৃক্ষ জল ব্যতীত কিরূপে জীবিত থাকে? ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে ইহাদের মূলে নিশ্চয়ই কোথাও জল আছে। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে এই সকল বৃক্ষের নিম্ন দিকের শিকড় প্রায় ২০ ফিট গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া থাকে। এবং সেই নিম্ন প্রদেশের মৃত্তিকা ঈষৎ আর্দ্র মনে হওয়ায় অনুসন্ধানকারীরা অনুমান করিলেন যে অত্যন্ত গভীর প্রদেশ হইতে বৃক্ষ এই জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। তখন অনুসন্ধানকারীদের মনে প্রশ্ন উঠিল ঐ গভীর প্রদেশের জল এত প্রচুর কি না যে উহা উপরে উঠাইলে উহাদ্বারা কৃষিকার্য্যে চলিতে পারে। ইহা অনুসন্ধান করার জন্য ঐরূপ এক স্থানে তাহারা (artisian well) আর্টিসিয়ান কূপ খনন করিতে আরম্ভ করেন। একশত ফিটের উর্দ্ধে খনন করার পর দেখা গেল ক্রমেই আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। আরও গভীর প্রদেশে যাওয়া মাত্র অকস্মাৎ এক স্বচ্ছ শীতল জলের ফোয়ারা কর্ম্মচারিদের মাথার উপরে ২০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল। ইহাতেও ইঞ্জিনিয়ারগণ তত আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন এই উচ্ছসিত জলরাশি বালুকার উপরে পড়িবার সঙ্গে ২ প্রচুর জীবিত মৎস্য পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে তখন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। স্বর্গ হইতে সুধার ধারা প্রবাহিত হইলেও বোধ হয় তাঁহারা এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না। ইহারা কি ভূগর্ভস্থ কোন হ্রদ কিম্বা নদী হইতে উত্থিত হইল? ঐ ইঞ্জিনিয়ার দলে যে সকল জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করিলেন যে উহা চিরপরিচিত মৎস্য যাহা নদী তরাগ প্রভৃতি মিঠা জলেই পাওয়া যায়।

যক্ষের ধন রক্ষা।

তিন বৎসর যাবৎ রিজেণ্ট পার্কের নিকটে এক মহিলা তাহার ধন সম্পদ রক্ষার জন্য একটী সর্প পোষণ করিতেছেন। কেমডেন সহরের পার্ক ষ্ট্রীটস্থ জর্জ্জ পামার নামক এক ব্যক্তি সর্প বিক্রয় করে। ডেইলি নিউজ পত্রিকায় প্রকাশ যে উক্ত সর্প বিক্রেতা উক্ত মহিলার নিকট ধন সম্পত্তি রক্ষার এক অভিনব পন্থার প্রস্তাব করেন। সর্প বিক্রেতে বলিতেছে যে "মহিলা একদিন আমার সর্প দেখিতে আসেন। আমি একটী ভীষণ দর্শন সর্প তাঁহার হাতে দিলাম। তাহাতে তিনি বিচলিত হইলেন না। দেখিলে মনে হয়, তাঁহার যেন সর্পের প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। তিনি ৯ ফিট লম্বা একটী দক্ষিণ আমেরিকার বাজ সর্প বাছিয়া লইলেন। তিনি ঐ সর্পের জন্য একটী বিশেষ বাক্স প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং উহাতে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য ছিদ্র ছিল। তিনি দিবা রাত্রি সর্পটীকে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই সর্পটীর উপরে এত বিশ্বাস ছিল যে তিনি বেঙ্ক হইতে তাঁহার সমস্ত টাকা এবং অলঙ্কারাদি বাড়ীতে আনিয়া ঐ সর্পের বাক্সে রাখিয়া দিলেন। ঐ যক্ষের নিকট সম্পত্তি সমর্পন করিয়া চোর ডাকাতের ভয় হইতে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। সর্পটীর খোরাকী বাবদে সপ্তাহে তাঁহাকে ১০ শিলিং খরচ করিতে হইতেছে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

পুরাতনের ব্যথা।

আমি রিক্ত, আমি পুরাতন—
আসন্ন ঊষার কোলে উন্মুখ-মরণ
জোৎস্নাময়ী নিশার স্বপন।
আমি অতীতের আলো, আজিকার ছায়া;
সে দিনের জাগরণ, এ দিনের মায়া!

দেব হীন আমার মন্দির—
বহে না ধূপের গন্ধ আকুল সমীর,
দেবতার সন্ধ্যা আরতির—
থেমেছে বন্দনা-গীতি, শঙ্খ ঘণ্টা রোল,
অঙ্গনে প্রসাদ-লোভী শিশুর কল্লোল।
আমার এ পাদপীঠ তলে
মন্ত্রমে আনত-শির নহে ভক্ত দলে,
আজ হেথা সন্ধ্যা নাহি জ্বলে!

ভগ্ন মোর প্রাসাদ শিখরে—
আজ কোন কাদম্বরী লীলা-ছল ভরে

বিলাস বিস্তার নাহি করে—
বৃথা টানি আবরিত বক্ষের বসন,
বদ্ধ বেণী মুক্ত করি আবার বন্ধন!
ছিদ্র-হীন শুদ্ধতা বিরাজে—
নির্ব্বাপিত-মণি-দীপ কক্ষগুলি মাঝে,
কঙ্কণ কিঙ্কিনী নাহি বাজে!

শূন্য-ছায়া মোর উপবন—
মরকত শিলা তলে কেহ ত শয়ন
পদ্ম-পত্রে করে না রচন;
ধারাযন্ত্রে উৎসারিত নহে জলধার
তমাল বীথির তলে শুধু অন্ধকার!
পঙ্ক-শেষ মোর সরোবরে—
ভবন-হংসেরা কোথা স্বচ্ছন্দে বিহরে,
চক্রবাক্ ক্রীড়া নাহি করে!

ভ্রংশ মণি রত্ন সিংহাসন—
কোথা বেত্রলতাবতী, সভাসদ্‌গণ,
জনহীন এ সভা ভবন!
ছিন্ন চন্দ্রাতপ আজ বিবর্ণ মলিন,
পরিত্যক্ত রাজদণ্ড শাসন-বিহীন!
বিশুষ্ক যে ছুটি কর্ণোৎপল,
কণ্ঠের মালতী মালা; কোথায় সরল
দীর্ঘদেহ যৌবন-চঞ্চল!
শীর্ণ মণিবন্ধ হ'তে স্খলিত 'বলয়'
ঘন বিকম্পিত দেহ চাহিছে আশ্রয়।
কোথা ভাষা জলদ-গম্ভীর
শুনি যাহা হত সবে ভক্তিনত শির—
ভগ্নকণ্ঠ—কম্পিত অধীর!

সারা জীবনের মোর আশা—
একদিন মুখে যার ফুটাইনু ভাষা,
বক্ষ নীড়ে দিয়েছিনু বাসা—
আজ সে আমারি ভাষা পারে না বুঝিতে,
বদ্ধ ভ্রমে স্নেহপাশ চাহিছে টুটিতে!
হৃদয়েরে নিঃস্ব করি দান
দিনু যারে, মোরি বক্ষ রক্ত করি পান
সে দিন যে রেখে ছিল প্রাণ,—
মোরি তরে মৃত্যুশয্যা করিছে রচন,
আমি চির পরিত্যক্ত, আমি পুরাতন!

আমার এ শ্রীহীন মন্দিরে
আজ আর কেউ নাই কি রে,
জ্বালাইতে সন্ধ্যা দীপটিরে?
আমারে ঘিরিয়া নামে সাঁঝের ম্লানিমা,
ঘনাইছে আঁখি পাতে ঘুমের জড়িমা!

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

সাহিত্য সংবাদ।

সাহিত্য চর্চ্চা বিষয়ে ময়মনসিংহের স্থান বাঙ্গলার জেলা সমূহের মধ্যে শীর্ষ স্থানে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ময়মনসিংহের প্রতি মহকুমায়ই এক একটী সাহিত্য চর্চ্চার প্রতিষ্ঠান আছে এবং তাহাতে স্থানীয় সাহিত্যিকগণ সাময়িক ভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রবন্ধ ও কবিতাদি পাঠ করিয়া থাকেন।

গত ১৮ই শ্রাবণ নেত্রকোণা সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় দত্ত হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী বি, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

১৫ই ভাদ্র মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

১৭ই ভাদ্র বুধবার গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের অধিবেশন হইবে; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন ও "পূর্ব্বময়মনসিংহের" প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

৺শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই টাঙ্গাইল সাহিত্য সঙ্ঘেরও বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

ত্রয়োদশ বর্ষ। আশ্বিন—১৩৩২ নবম সংখ্যা।

সম্পাদক
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

বিষয় সূচী

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সৌরভ

ত্রয়োদশ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩৩২ } নবম সংখ্যা।

আগমনী।

আশ্বিন আসিলেই কবিগানের কথা, সঙ্গে সঙ্গে রামু, রামগতি, রামকানাই, পরাণ, শম্ভু, কালী, গোবিন্দঠাকুর প্রভৃতি ময়মনসিংহের খ্যাত নামা কবিদ্গণের কথা মনে পড়ে। জীবনের অধিকাংশ সময় ইঁহাদের সঙ্গে কবিগান করিয়া কাটাইয়াছি এবং কবিগানের প্রতপ্ত আনন্দ-মদিরা পানে বিভোর হইয়াছি; কবিতা-রস-মাধুর্য্যের আ[illegible] করিয়া আত্মহারা হইয়াছি। কলা বিদ্যা ও কাব্য শাস্ত্রের আলাপালোচনা করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আর তাঁহারা কেহই নাই। কেবল মাত্র আছি [illegible]মি।

এবার আশ্বিনের বাতাসে মনে একটি উত্তেজনা আসিল কবিগান করিয়া একটুকু আনন্দ লাভ করি; কিন্তু শক্তি কোথায়? আমিও যে শয্যায় পড়িয়া অন্তিম আহ্বানেরই অপেক্ষা করিতেছি। তাই আজ প্রাণের ঐকান্তিক প্রেরণায় দুইটি আগমনী মালসী লইয়া "সৌরভের" কৃপাময় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া শারদীয়া দুর্গা পূজার নিয়ম রক্ষা করিলাম। এই সঙ্গে রামু ও রামগতি সরকারের দুইটী আগমনী ডাক মালসীও লিখিয়া দিলাম।

(আগমনী ডাক মালসী।)

(১)

মা শিব সীমন্তিনী শক্তি সনাতনী জননি!
দিতে ভক্ত জনে মা চরণ দু'খানি
এসেছ ভক্তের বাড়ী।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী স্কন্ধ গণপতি
পদে পশুর রাজা অসুর অরি॥
দিতে ভক্ত জনে মা চরণ দু'খানি···ইত্যাদি।
সারাটা বৎসর গতে একবার
আশ্বিনে অম্বিকা আসিবে আবার
বারম্বার থাকি এই আশা মনে করি।
হৈল বাসনা পূরণ—এই নিবেদন
মরণ কালে যেন চরণ হেরি॥
দিতে ভক্ত জনে মা···ইত্যাদি।

(ঝুমুর)

আহা মরি কিবা অপরূপ শোভা
চণ্ডী মণ্ডপ হইয়াছে আলো!
ভক্তের ভবনে দেবীর আগমনে
সঘনে দুন্দুভি বাজিল॥
চণ্ডী মণ্ডপ হইয়াছে আলো!
আনন্দ সাগরে আনন্দ জোয়ারে
অতুল আনন্দ উথলিয়া উঠিল।
আনন্দময়ী আনন্দ দানে
আনন্দে ভুবন ভরিল॥
চণ্ডী মণ্ডপ হইয়াছে আলো!

(২)

(লহর মালসী।)

চিতান — পিতা মাতার স্নেহের কথা
জগন্মাতা করিয়ে মনে।
পরাণ — লয়ে সঙ্গে লক্ষ্মী ভারতী
ষড়ানন গণপতি

কল্লেন শুভ যাত্রা সপ্তমী দিনে।

লহর এথা উমা আসার আশা পেয়ে,
পথ পানে ছিলেন চেয়ে
ব্যাকুল হয়ে গিরিরাজ জায়া।
হায়রে! মায়ের কত মায়া!
অদূরে উমাকে হেরি
বলে মেনকা সুন্দর
এই যে! এলো আমায় মনে করি
প্রাণ কুমারী বিজয়া॥

মিল আনন্দে অধীরা হয়ে গিরিরাজ জায়া
অগ্নি দ্রুত গতি ধেয়ে যেয়ে
হিমালয়কে বলতেছে।

মহড়া গিরিরাজ হে! শীঘ্র দেখ এগে
এই যে আমার উমা ধন এসেছে॥

পঞ্চম বারটা মাস ছিলাম চেয়ে
দেখা হৈল মায়ে ঝিয়ে
এলো আমার উমা!
গিরি ত্রিজগতে কোথায় মিলে
উমার উপমা।
কোলে বসে ডাকিবে মা
মা, ডাকে কি মাধুরিমা!
আমার নিরুপমা উমা সমা
মেয়ে কে আর পেয়েছে?॥
গিরি রাজ হে,—ইত্যাদি।

খাদ—উমারূপে পুরী আমার আলো করিয়াছে।

লহর—আমি কত জন্ম, জন্মান্তরে
কত কঠোর সাধন করে,
গর্ভে ধরেছিলাম উমা ধনে,
আমার কতই না সুখ মনে।
বৎসরে বৎসরে আসি,
উদয় হয় মোর উমা শশী,
(আমি) আনন্দ সলিলে ভাসি
'মা' ডাক শুনলে চাঁদ বদনে॥

মিল,—কৈলাস হইতে আসতে পথে,
কষ্ট হৈল ভারি,
তারে খেতে দেইগে তাড়তাড়ি,
বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে॥
গিরি রাজ হে, ইত্যাদি।

অন্তরা,—গিরি, আর আমি উমারে. দিব না হে ছেড়ে।
যেতে কৈলাস পুরে দু'চার মাস।
আমি রাখিয়া উমারে আপনার ঘরে
পুরাব মনের আশ॥
কি নিশি দিনে ঘুমে জাগরণে
সর্ব্বদা করি হা হুতাশ
যদি নিতে আসে শিবে না দিলে কি নিবে?
এবার ফিরে যাবে কৃত্তিবাস॥

পরচিতান—উমার কথা বলতে গেলে
অশ্রুজলে ভরে দু'নয়ন।

পারাণ—ভবে এমন মেয়ে আছে কার
রূপে গুণে চমৎকার।
আমার বহু ভাগ্যে মিলেছে এই ধন॥

লহর—আমার উমা ধনকে কল্লে কোলে
সর্ব্বজ্ঞান হয় ধরাতলে—কর্ম্ম ফলে
ফলে এমন ফল।
উমা নিদানের সম্বল॥
চাইলে উমার বদন পানে
কার প্রাণে আর ধৈর্য্য মানে
আপ্‌নে ঝরে নয়ন কোণে
ফোটা ফোটা স্নেহ জল॥

মিল (পূর্ব্ববৎ।)

(৩)

(আগমনী ডাক মালসী।)

গিরি! আমার গৌরী এসে বসেছে
রূপে ভুবন আলো হয়েছে।
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিন যামিনী সমান করেছে।
উমা আমার নয়ন তারা. লোকে বলে "তারা তারা"
তারা কি তার কাছে?
জিনি কোটি শশী বদন শশী
কত শশী পদে পড়েছে!!

(অন্তরা)

ভোলানাথ আসবে নিতে—দশমীতে
এখনি ভাবতেছি তাই মনে !
(আমার) আঁধার ঘরের উজল মাণিক
ছেড়ে দিব কোন্ পরাণে ?।
দুখ পাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা রতন
কে তারে করিবে যতন ? শিব থাকে শ্মশানে।
তাঁর বাড়ীর ভিতর ভূতের আড্ডা,
ভূতে কি তার যত্ন জানে !!

(রামু মালী)

(৪)

(আগমনী ডাক্ মালসী)

এস এস প্রাণকুমারী
গৌরী তোরে করি গো কোলে।
তুই ত বড়ই কঠিন, এতগুলি দিন
কেমন করে ছিলে তোর মায়েরে ভুলে॥
গত কল্য নিশি শেষে দেখলাম তোরে স্বপ্নাবেশে
কোলে নিলেম তুইলে।
অদ্য সপ্তমীতে পেলেম তোরে
গত নিশির সেই স্বপ্নের ফলে॥

(অন্তরা)

তোর আশায় পথ পানে আকুল প্রাণে
আমি যে সদায় থাকি চেয়ে।
তুই যে পাষাণ মেয়ে পাষাণ হয়ে
মায়ের কথা যাইস ভুলিয়ে॥
না হেরে তোর বদন শশী কেন্দে মরি দিবা নিশি
বৎসরেতে একদিন আসি তুই ত যা'স চলিয়ে।
আমি অভাগিনী দীন দুঃখিনী
থাকি বুকে পাষাণ দিয়ে॥

(রামগতি শীল।)

রামু ও রামগতি ময়মনসিংহের নিরক্ষর কবি। তাঁহাদের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব পূর্ণ ছড়া পাঁচালীগুলি হাওয়ায় মিশিয়া গিয়াছে। গীত কবিতা যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রায় সমস্তই অসম্পূর্ণ। সুতরাং তাঁহাদের রচিত অঙ্গহীন লহর মালসী লিখিতে বিরত রহিলাম। শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

বৈদেশিকী।

মন্তব্য—সাহিত্যের ভিতর দিয়া হাসাইবার একটা আবশ্যকতা আছে। ইহা অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদন করিতে এবং বহুবিধ নিত্য বস্তু বিষয়ে অভিনব চিন্তার উন্মেষ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। বিশুদ্ধ হাসি 'ভাঁড়ামী' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। উহা স্রোতের মত অবাধ সচ্ছন্দ গতীশীল ও অনাবিল; কূপোদকের মত বদ্ধ, দূষিত বাষ্পোদগারী নহে। উহা যুবক-বৃদ্ধ, গুরু-শিষ্য, ভ্রাতা-ভগ্নী সকলের সমকালে সমভাবে উপভোগ্য; কোনপ্রকার হীনতা, ব্রীড়া বা সঙ্কোচের উপাদান ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। 'ভাঁড়ামী' হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য এইখানে।

ইন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের হাসি আমাদিগের গৌরবের সামগ্রী হইলেও বাংলা সাহিত্যে তেমন ধরণের হাসি আজিও নিতান্ত অপ্রচুর। সুতরাং বিদেশী বাগান হইতে কলম উঠাইয়া বাংলা-হাসির ফসলের উৎকর্ষতা ও প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি করা অসঙ্গত নহে। মার্কিন হাস্যরসিক Stephen Leacock এর সহিত অনেকেই হয়ত পরিচিত নহেন। তাই সৌরভের পাঠকবর্গকে ধারাবাহিক ক্রমে তাঁহার কৌতুক রচনার নমুনা উপহার দিবার ইচ্ছা হইল।

A. B. C.

মিশ্র ও অমিশ্র নিয়ম চতুষ্টয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে'ই পাটিগণিতের শিশু-ছাত্রকে problem নামধেয় কতকগুলি প্রশ্নমালার সম্মুখীন হ'তে হয়—সকলেই তা' অবগত আছেন। সেগুলো হয়তো 'Adventure' নয়তো 'Industry' ঘটিত কোন না কোন গল্প—যার প্রারম্ভ আছে কিন্তু পরিসমাপ্তি নেই। আর Plot হিসাবে সবাই পরস্পর জ্ঞাতিবর্গভুক্ত হ'লেও তাদের প্রত্যেকেরই ভিতর যে একটু স্বতন্ত্র রকমের Romance আছে তা' একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে।

উক্ত Problem রূপী গল্পসমূহে Plot সৃষ্টি করবার জন্যে সাধারণতঃ A. B. C. নামক পাত্রত্রয়ের প্রয়োজন

হ'য়ে থাকে; আর তা'দের অবতারণাও প্রায় এইরূপেই হ'য়ে থাকে; যথা—

"এ বি সি কোন নির্দ্দিষ্ট কাজে (Certain piece of work) লিপ্ত হ'লো। এ এক ঘণ্টায় যত কাজ করবে বি তা' দু'ঘণ্টায় এবং সি চার ঘণ্টায় সম্পন্ন করবে। কত দিনে তারা ঐ কাজ……ইত্যাদি।" অথবা

"এ বি সি একটা পুকুর কাটতে যাবে। সি যত কাটে বি তার দ্বিগুণ এবং এ বির দ্বিগুণ পরিমাণ কাটতে পারে; কতক্ষণ কাটলে পর……ইত্যাদি।" নতুবা

"এ বাজি রাখলে যে সে বি ও সি র চেয়ে বেশী দৌড়াবে। এ বির দ্বিগুণ এবং সির তিনগুণ দৌড়ালো। রাস্তাটী কত লম্বা হলে……ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এই ধরনের এ বি সির রকমারি কাজের অন্ত নেই। সে কালের পাটিগণিতকারের অনুরোধে তারা Certain piece of work করেই সন্তুষ্ট থাকৃত; কিন্তু যাই দেখা গেল যে তাতে কাজটা ঝাপসা থেকে যায়, আর কাজের Romance টুকুও ক্ষুণ্ণ হয়, অমনি ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ালো, কি কাজ তাই স্পষ্ট করে বলা। তারপর থেকে তাঁরা মাটি কাটা, বাচ্‌খেলা, ঘাসকাটা, সাঁতার কাটা, চাষ করা, বাজিরেখে দৌড় দেওয়া, এমন কি ব্যবসা বাণিজ্যে Certain capital নিয়ে partnershipএ পর্য্যন্ত লেগে গেল। মাঝে মাঝে হেঁটে হেঁটে ক্লান্তি বোধ করলে, ঘোড়ায় বা বাইসিকেলে চড়ে অপেক্ষাকৃত অসম সাহসী পায়ে-হাঁটা প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে প্রতিযোগীতা করতেও কসুর করে নাই। আর কখনো যদি আমোদ আহ্লাদ ভাল না-ই লাগল তো খাঁটি কেজো লোকের মত একেবারে Cisternএ গিয়ে জল pump করতেই সুরু করে দিল। সে কেমন Cistern যার তিনটির ভিতর দু'টিই যে অল্প বিস্তর leak করবে এ এক রকম জানা কথা। অদৃষ্টদেবী বরাবরই Aর প্রতি প্রসন্না কেন না যেটি leak করবে না সেই চৌবাচ্চাটি, চড়বার বেলায় সব চেয়ে ভাল ঘোড়াটি, চাষ করতে সবচেয়ে ভাল বলদ জোড়াটি—সে পাবেই পাবে; তা' না হলে সে জিতবে কেমন করে?

কিন্তু থাক্ সে কথা। এ বি সি এর জীবনচরিত পাঠ করলে দেখা যায় শৈশবে যখন তারা মার্ব্বেলের বখ্‌রা নিয়ে পরস্পর প্রাথমিক পাটিগণিতকারের দ্বারে বিচার প্রার্থী হতো, তখন তাদের নাম ছিল যথাক্রমে রাম, শ্যাম ও যদু। আর যে সব খেলা চার জনের কমে সম্ভব হতোই না সেই সব খেলায় মাঝে মাঝে তাদের চেয়ে বেশী বয়সের গম্ভীর প্রকৃতির আর একটি ছেলেকে টেনে আনৃত, নাম তার মধু; উত্তর কালে সে ডি বলে পরিচিত হয়েছিল।

রাম এ নামটি গ্রহণ করে যৌবনে পদার্পণ করবা মাত্র দেখা গেল সে একটি পুরাদস্তুর জোয়ান মরদ, একটু একগুঁয়ে, খেয়ালি ও সহযোগিদের উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী হয়ে উঠেছে। তাদের ভিতর যত কিছু কাজের প্রস্তাবনা সেই করবে; যাকে ইচ্ছা তাকেই পদে পদে Challenge করে বসবে। শারীরিক শক্তি তার যেমনই যথেষ্ট সহিষ্ণুতা তার তেমনই অপরিমেয়। একদমে ৪৮ ঘণ্টা হাঁটতে অথবা ৯৬ ঘণ্টা pump করতে সে সমান পটু। আর আঁক কস্‌তে বসে যদি ভুল কর তো তাকে দিয়ে পক্ষাধিককাল একই ভাবে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পার; চাই কি, recurring decimal এ বসিয়ে দিতে পার তো—তাকে দিয়ে যা' কাজ করানো যায়—তার অন্তই নেই।

বি কিন্তু হয়ে উঠল আরেক রকম। সে শান্ত ও সরলপ্রকৃতির; তা'র যা কিছু ভয় ঐ এ কে। সির জন্য তার সহানুভূতির অন্ত নেই। সংসারে সে উন্নতি লাভ করতে পারতো সন্দেহ নেই; উন্নতির যা' কিছু অন্তরায় ঐ এ।

বেচারী সি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়, শক্তিহীন, গোবেচারী গোছের লোক। তা'র কাতর দৃষ্টিই তা'র দীনতা হীনতার পরিচায়ক। ক্ষমতার অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি ক'রে, pump ক'রে ক'রে তা'র স্নায়ুপেশী সব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়েছে। তাই এ বা বির সঙ্গে সে কিছুতেই পেরে উঠে না দেখে ৺যাদব চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে বলতেন "A can do more work in one hour than c in four".

* * *

বাচ্‌খেলার পর একদিন সন্ধ্যা বেলায় প্রথম আমার

তাদের সাথে পরিচয় হলো। তারা সবেমাত্র খেলা সেরে বাড়ী ফিরছে। দেখা গেল এ এক ঘণ্টায় যতদূর দাঁড় টেনে গিয়েছিল—বির ততদূর যেতে দু'ঘণ্টা আর সির চার ঘণ্টা লেগেছিল। বি ও সি উভয়েই সাংঘাতিক অবসন্ন হয়ে পড়লেও—সির অবস্থাটাই বেশী মারাত্মক মনে হ'লো। একটা খারাপ রকমের কাসি উঠে ক্রমাগতই ত'কে আরো কাবু করে ফেলছিল। বি বল্লে "কিছু ভয় নেই ভাই সি, আমি তোমাকে সোফায় শুইয়ে খানিকটা গরম চা খাইয়ে দিচ্ছি।" এমন সময় এ ঘরে ঢুকেই বল্লে "তোমাদের এসব কি হচ্ছে! যাদব বাবু বলছিলেন তাঁর বাগানে তিনটে tank কাল সন্ধ্যার ভিতরেই pump করে ভর্ত্তি করে দিতে হবে। আমি বলছি কি তাতে তোমাদের দুজনকেই এক সঙ্গে হারিয়ে দিব। যাও আর কথাটি নেই—উঠে পড়। আর জানো সি তোমার tank টা কিন্তু একটু leak করবে—আগে থেকেই তা বলে রাখলুম।" বি তাই শুনে আপত্তি জানিয়ে বল্লে "এটা বাস্তবিক ভারী অন্যায়—বিশেষ সি এখন যা বেহাল হয়ে পড়েছে।" সে যাই হোক, তারা সকলে মিলে উঠে গেল, সেই tank তিনটে pump করতে।

তখন থেকে ফি বছর সহরের আশেপাশে তাদেরে সর্ব্বদা একটা না একটা কাজে ব্যস্ত দেখে আসছি। তারা যে কখন খায় দায় ঘুমোয় কেউ কখনো দেখেনি। তারপর অনেক দিন বাড়ী ছেড়ে বিদেশে ছিলাম, তাই তাদেরে দেখতে পাইনি। বাড়ী ফিরে এসে এ বি সির ভিতর কাউকে তাদের অভ্যস্ত কাজ কর্ত্তে না দেখে একটু আশ্চর্য্য হলুন। খোঁজ নিয়ে জানলুম যে তাদের কাজ এখন N, M, Q বলে নূতন তিনজনে করছে। আর Algebraর কতগুলো কাজে Alpha, Beta, Gama, Delta বলে জনকতক বিদেশী লোক (Greek) নিযুক্ত হয়েছে।

হটাৎ একদিন রাস্তায় ডির সঙ্গে দেখা হলো। দেখি সে বুড়ো হয়ে গেছে। প্রথমতঃ এ, বি, সি কে সে চিনে কিনা জিজ্ঞেস করতেই সে বল্লে "তাদের আর চিনিনে মশাই? ছেলে বেলায় যখন তারা Bracket এর ভিতর থাকত তখন থেকেই তাদের ভালরকম জানি। এ ছেলেটা বড্ডো তোখ্‌খার ছিল বটে কিন্তু বিকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগত। এক সঙ্গে কত কাজ করেছি! তবে আমি কোন race টেসে বড় একটা যাইনি; তোমরা যাকে বলবে সোজা খাটুনি, তাই খেটেছি। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, এসব কাজ টাজ তত পোষায় না। নিজেরই ছোট্ট বাগানটুকুর ভিতর দুটো একটা Logarithm, Common denominator জন্মাতে চেষ্টা করছি। তবে Euclid সাহেবের Agent, Mesers Hall & Stevenson Co.র অনুরোধে মাঝে ২ তাদের proposition solve করতে যেতে হয়—না গিয়ে পারিনে।"

এই বক্‌বকুমে বুড়ো ডির কাছ থেকে আমার চিরপরিচিত এ, বি, সির পরিণাম যা শুনলুম—তাতে কার না অপশোষে হয়? আমি সহর ছেড়ে যাবার অল্প পরেই নাকি সি কাহিল হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। একটা বাজি রেখেছিল—তাতে এ আর বি নৌকায় দাঁড় টেনে যাচ্ছিল আর সি পারের উপর দিয়ে বরাবর দৌড় দিচ্ছিল। পথে হাঁপাতে হাঁপাতে একবার বসে পড়েই খানিকটা জলখেয়ে নিল। সেই জল খাওয়া অমনি sunstroke। এ, বি উভয়েই বাড়ী ফিরে দেখতে পেল সি শয্যাশায়ী। এ তাকে শক্ত ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে "ওঠ সি, চল railway yard এ গিয়ে slipper টেনে stack দিতে হবে। সির চেহারা দেখেই কিন্তু বি ব্যাপারখানা বুঝে নিয়েছিল—তাই সে বল্লে—দেখ এ, তোমার কথা আর কিছুতেই বরদাস্ত হচ্ছে না,—দেখতে পাচ্ছ না সে আজ রাত্তিরে কিছুতেই উঠতে পারবে না। সি একটুখানি ক্ষীণ হাসির চেষ্টা করে বল্লে—একবার উঠে বসতে পারলে দেখা যেতো খানিকটা পারি কি না। বি তখন বড্ডো ভয় পেয়ে বলে উঠল "এই আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি, সি যে মারা যেতে বসেছে!" এ একেবারে রুখে উঠে ব'লে ফেল্লে "তোমার ডাক্তার ডেকে আনবার টাকা কোথায় বল তো? বি উত্তর কর্ল্লে "আমি ডাক্তারকে তার lowest term এ reduce ক'রে নিয়ে আসচি, দেখে নিও।"

সে যাই হোক্ সি হয়ত সে যাত্রা বাঁচলে

বাঁচতেও পারত; কিন্তু তা'রা ঔষধ খাওয়াতে একটা গুরুতর ভুল করে বসল। ঔষধটা সি-র মাথার দিক্ দিয়ে একটা Bracket এর উপর ছিল. Nurse ভুল করে সেটা Bracket থেকে sign (+ −) না বুলিয়েই সরিয়ে নিলে, ফলে সি তাড়াতাড়ি (step by step) sink করতে লাগল। দিন ফুরোতে না ফুরোতেই কারো বুঝতে বাকী রইল না—তার আর রক্ষা নেই। দেখলাম A পর্য্যন্ত ধৈর্য্য হারিয়ে কেবলি খামাখা ডাক্তারের সঙ্গে সি-র যে শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল, তাই নিয়ে বাজী রাখতে লাগল। সি আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বল্লে "ভাই এ আমি বড্ডো দ্রুত চলছি মনে হচ্ছে।" এ জিজ্ঞেস কর্ল্লে "কি rate এ যাচ্ছ বলতে পার?" সি— "বলতে পারিনে, তবে যে rate ই হোক্ আমি যাচ্ছি বটে।" খানিক পরেই তার চোকের আলো সব নিবে আসতে লাগল। আবার ক্ষণেকের জন্যে একটু সাম্‌লে নিয়ে সে এ-কে তার নীচের ভগার অসম্পূর্ণ কাজগুলো করার জন্যে ইঙ্গিত কর্ল্লে। এ সেসকলের ভার নিলে দেখা গেল—সির আত্মা আস্তে ২ স্বর্গে চলে গেল। বি আকুল হয়ে কেঁদে উঠে বল্লে "তার ঐ ছোট চৌবাচ্চাটি, তার বাচ্‌খেলার পোষাকগুলো—সব তুলে রাখ, আমি আর ওসব দেখতে পারিনে; আমারো ওসব কাজ ফুরিয়ে গেছে জন্মের মত!"

সির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাদাসিদে রকমেই হলো; তবে sportsmen আর mathematician দের সম্মান রক্ষার্থ দু'টো শববাহী গাড়ী ভাড়া করা হলো। তার একটাতে বি coffin নিয়ে, আর বাকী যেটা খালি রইল তাতে চড়ে এ রোয়ানা হল। দু'টো গাড়ীই একবারে start কর্ল্লে বটে তবে, এ ভদ্রতা ক'রে 100 yards এর handicapএ রাজী হয়ে বি-র সঙ্গে জন্মের শোধ একটিবার race দিতে স্বীকার কর্ল্লে। ১০০ গজ handicap সত্ত্বেও বি-র চারগুণ বেগে হাঁকিয়ে সে আগেই গিয়ে গোরস্থানে হাজির হলো। (গোর স্থানের দূরত্ব কত?) Coffin এর উপর মাটি চাপা দেওয়া শেষ হলে পর, কবরের চা'র ধারে ফুলের পরিবর্ত্তে Euclid এর 1st bookএর কাটা-চোড়া যত figures ছিল সব ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

তারপর থেকে দেখা গেল এ-ও বেমালুম বদ্‌লে গেছে। বি-র সঙ্গে race খেলার সখ তার একদম মিটে গেল। তার আগেকার bet করা যা কিছু উপার্জ্জনের সুদের উপর সে একরকম দিন গুজরান করতে লাগল। অার বি এমনই shock পেল যে তার বুদ্ধি ভ্রংশ হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। সে সব সময়েই কী যেন ভাবতো, কারো সঙ্গে বড় কথা বলত না—যা ও বলত সব monosyllable এ। Mathematics একদম ছেড়ে দিয়ে সে শিশুদের ইংরাজী সাহিত্যের জন্যে সহজ সহজ শব্দ তৈয়ের করে দিয়ে যা' কিছু পেত তা'তেই উদরান্ন নির্ব্বাহ করতে লাগল।

শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র রায়।

সহুরে কাঙালীর গান।

(Parody)

কেন বঞ্চিত হব ভোজনে?
আমি, কত আশা করে' আসিয়াছি লুচি
ঠুসিতে ক'খানি বদনে!
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো!
তবে, মোদের শোণিত-শোষক তোমার
নামটি কেন বা র'বে গো!
হয়ে, ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি দোর বন্ধ?
বৃথা, দ্বারে বসে' কেন ডাকি 'বাবা' বলে'
র'বে যদি সোফা-শয়নে!
আমি, শুনেছি, হে দুখহারী।
তুমি, এনে দাও তারে বোতলামৃত
বন্ধু যে চাহে বারি!
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
খোসামুদে যিনি তুমি যে তাঁহার,
একি সব মিছে কথা? লুচির কথাটা
আজি জাগে শুধু স্মরণে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ঝরাফুল।

(কথিকা)

বাগানের কত সুন্দর ফুল-লতার মাঝে, একটি হেনার ঝাড়ের পাশে, এককোণে ছোট্ট একটি লতা মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে—তার করুণ-ম্লান অথচ সুন্দর মূর্ত্তিখানি নিয়ে। বাগানের আর আর ফুল-লতাদের মতো বাইরে তা'র সৌন্দর্য্য লুকান আছে, তার খবর সে তার বাইরের দীনতা দিয়ে ঢেকে রাখতেই চাইত। তবুও লুকাবার সেই গোপন চেষ্টাটুকুতেই তার প্রাণের সৌন্দর্য্যটুকু ফুটে বেরিয়ে আসত, যাতে তার করুণ মূর্ত্তিখানি নির্ম্মলতার উজ্জ্বল্যে ছেপে উঠত।

পাশেই তার রূপসী গর্ব্বিতা ফুল ও লতিকারা যখন বাইরের এবং ভিতরের রূপগুণের ব্যাখ্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, কত সুখ সোহাগের কথা বলে হাসি গল্প করত, আর মাঝে মাঝে ছোট্ট লতাটির দিকে বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাত, লতাটি তখন তাদের সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে আপন দীনতা নিয়ে আপনাতেই মিলিয়ে যেতে চাইত। এমনি ভাবে বিদ্রূপ ও অশ্রদ্ধা সয়ে সয়েই দিনগুলো তার বয়ে যাচ্ছিল।…

একদিন ভোরের বেলা অরুণ রাঙা করুণ রবির সোণালী আভা যখন সুনীল আকাশে লালিমার ছোপ লাগিয়ে দিলে, আর তারই উজ্জ্বল রশ্মি ফুল-লতাদের মুখে পড়ে তাদের জাগবার জন্যে তাড়া দিলে, ছোট্ট লতাটি তখন ঘুম জড়ানো চোখ দুটি মেলে তাড়াতাড়ি চমকে চেয়েই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে দেখলে সারা বাগানখানি জুড়ে কিসের যেন সাড়া পড়ে গিয়েছে। নব কিশলয়ে ঢাকা লতাপাতার দলে মাতামাতি লেগে গেছে। ভ্রমর মধু পানে মশ্‌গুল্ হয়ে উঠেছে। মৃদু হাওয়া কি এক আনন্দের উচ্ছ্বাসে ফুল-লতাকে নাচিয়ে তুলছে।

সে পাশে তাকিয়ে দেখলে, হেনার মুখে রাত্তিরের স্নিগ্ধ হাসিটুকু এখনও ফুটে রয়েছে। সে ভাবলে "কিসের এ পুলক ?" লতাটি হেনাকে বড় ভালবাসত। বিনিময়ে যদিও হেনার কাছ থেকে সে অনাদর অবহেলা ছাড়া আর কিছুই পায়নি, তবুও তার কোমল অন্তরের নির্ম্মল ভালবাসার উৎসটি সমস্ত অন্তর উজাড় করে হেনারি কাছে ঝরে পড়েছিল। ভালবেসে আত্মদান করেই সে তৃপ্ত ছিল। তবু মাঝে মাঝে তার ব্যথিত প্রাণটি একটু স্নেহ পাবার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু এই ব্যর্থ ব্যাকুলতাকে সে তখনই বোঝাত, সে শ্রীহীনা।

সঙ্কোচে কম্পিতা লজ্জারক্তমুখী, নমিতা লতিকাটি আজকের এ আনন্দের কারণ হেনাকেই শুধাবার লোভটুকু সামলাতে পারলে না। লতিকাটি তার করুণ চোখ দুটি হেনার মুখের সামনে মেলে দিয়ে বল্লে—"হ্যাঁ ভাই হেনা, আজকে তোমাদের এত আনন্দ কিসের ভাই ?" চোখ দুটিতে বিস্ময় ও কণ্ঠে বিদ্রূপ ভরে নিয়ে অবজ্ঞার সুরে হেনা বলে উঠল "ওগো ম্লানিমা লতা, মলয় এসে যে ঋতুরাজের আগমন সংবাদ জানিয়ে দিয়ে গেল তা কি জান না ?" বলেই সে অন্য ফুল-লতাদের পানে চেয়ে এই লজ্জিতা লতাটির অজ্ঞতায় হেসে ফেল্লে। তারাও এই দীনা ম্লান সঙ্কুচিতা লতাটির দিকে একবার অবজ্ঞার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। এম্নিভাবে ব্যথা পেয়ে ব্যথাকেই সে বরণ করে নিলে।

বসন্তের বেলাশেষে রাঙা রবির স্তিমিত আলোটুকু ধরণীর বুকের উপর সিন্দুরের রক্তিমা ছড়িয়ে, অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্যের সুন্দর শিল্প রচনা করে দিয়ে, মধুর হাসি হেসে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তার সে আলোর রেশ্‌টুকুও একটু একটু করে মুছে গিয়ে চাঁদের উজ্জল রূপের উচ্ছল আলো ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকের উপর। বাগানের সুন্দরী ফুলদের সৌরভে চারদিক গন্ধে ভরপুর। মুগ্ধ বাতাস তারি নেশায় টলতে টলতে লতাপাতা ফুলের দেহে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল!

লতাটি হেনারদিকে চেয়ে দেখলে আজকের এই পুলক শিহরণের উচ্ছ্বাসে হেনার উজ্জল রূপ যেন আরো উজ্জল হয়ে উঠেছে। তার নিজের রূপের ও সৌরভের আনন্দে নিজেই সে মাতোয়ারা। নীরব সন্ধ্যাটিকে সকলে এম্নি করে যখন মুখর করে তুল্লে লতাটি তখন তারই বাঞ্ছিতার দিকে চেয়ে রইলে। কতবার সে এই সুন্দরী হেনার দিকে চেয়ে ভেবেছে "আহা এই সুন্দরীর প্রাণের

ভিতর যদি তার জন্যে একটুখানি বেদনায় সহানুভূতি থাকত, তবে হয়ত সে তার এই ছোট্ট জীবন ভরা ব্যথার ভার খুব সহজে লঘু করে নিতে পারত।" আজো সে এম্নি কত কথাই ভাবতে লাগলে্। দিন তার কাটতে লাগল্ তেম্নি!

সুন্দর বসন্তের সকাল থেকেই কেন যে সেদিন বর্ষাদেবীর অশ্রুবরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে এলো তা তিনিই জানেন না। তাঁর অনন্ত অশ্রুর আকুল ধারায় ফুল-লতারা সিক্ত হয়ে উঠল। কোমল ছোট্ট লতাটির গায়ে কয়েকটা বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা পড়তেই সমস্ত শরীর তার যেন আঘাতের শিহরণের মতই কেঁপে উঠল।

কালবোশেখীর উড়ো ঝঞ্ঝার উন্মাদ হাওয়ার মতই বাতাস মাতাল হয়ে উঠল। সেই ক্ষিপ্ত ঝড়ের প্রচণ্ড হাওয়া লতাটিকে প্রলয় দোলায় দোলাতে লাগলে। লতাটির বেদনাতুর দেহখানি সে আঘাতে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে। বড় কষ্টে চোখদুটি মেলে সে একবার চারদিক তাকালে—কই আরতো কেউ তার মত এত ক্লান্ত নয়? ফুল-লতাদের মুখে তাদের সে মধুর হাসিটুকু না থাকলেও প্রশান্ত ভাবটুকু তো মুছে যায় নি?—হেনার দিকে চাইতেই কেমন যেন একটা ক্লান্তিভরা স্নিগ্ধতায় সারা মনখানি তার ভরে গেল। ধীরে ধীরে আবার সে চোখ বুঁজলে।—"উঃ বড় যাতনা যে? এসময়ও হেনা যদি"···হঠাৎ একটুখানি নির্দ্দয় হওয়ার ঝঞ্ঝার সঙ্গে বাদল বরিষণের বাঁধনহারা বৃষ্টিধারায় অজস্র ভাবে বারি ঝরে পড়ল। লতাটি আবার একবার হেনার দিকে চাইলে। তারপর? তারপর তার ব্যথায় উচ্ছ্বসিত ক্ষুদ্র জীবনখানি ঝরে পড়ল পৃথিবীর কোলে।

ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য থেমে গিয়ে রাত্তিরে বসন্তের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বাগানখানি আলোকিত হয়ে উঠল। ফুলের সৌরভে চারদিক মেতে উঠল। লতারা হাসি মুখে চাইলে। হেনার মুখে তার চিরাভ্যস্ত হাসিটুকু ফুটে উঠল। তখন হঠাৎ কি ভেবে হেনা তার পাশে তাকালে, তাইত! ছোট্ট লতাটি তার বেদনাতুর জীবনখানি নিয়ে নির্ম্মম ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে যে?

এত দিনের পর আজ প্রথম—যাকে সে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছে, তারই জন্যে দরদে তার প্রাণ আজ সত্যি সত্যি কেমন ব্যথিয়ে উঠল। লতাটির দিকে চেয়ে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে ব্যথায় অভিভূত হয়ে সে বলে উঠল—"আহা বেচারী ব্যথিতালতা!"

শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায়।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।

"শাস্ত্র বলছেন কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কিন্তু সেই কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য ব্রজগোপীরা কাত্যায়নীর পূজা করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন :—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধিশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং কৃষ্ণং পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

আপনারা বলিতে পরেন কি স্বয়ং ভগবান্‌কে পাইতে আবার কত্যায়নী ব্রতের আবশ্যকতা কি? সেই কৃষ্ণের পূজা করিয়া কি কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না? তবে তিনি কেমন ভগবান্? তাঁহাকে পাইতে আবার অন্যের সাহায্যগ্রহণ করিতে হইবে?

এখন এই সব প্রশ্নের উত্তরে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। প্রথমে মাধুর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হউক।

মাধুর্য্য বলিতে নানা জনে নানাপ্রকার অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মধু হইতে "মধুর"। যাহাতে মধু আছে তাহাই মধুর। মধুরের যাহা ভাব তাহাই মাধুর্য্য। যে কোন ভাল জিনিষের সহিত আমরা মধুর তুলনা করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাতে মধু আরোপ করি। যেমন কোকিলের ধ্বনি কি মধুর। প্রাতঃসমীরণ বড়ই মধুর!! আবার যেমন শ্যালিকার সহিত সম্পর্কটা বড়ই মধুর!!

কিন্তু মহাশয়গণ! যে মহাপুরুষ "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" এই ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার মত বে-রসিক আমি খুব কম দেখিয়াছি। কোথায় বদ্‌গন্ধি ইক্ষুগুড়, আর কোথায় দানাদার কমলা মধু!! হায় কবি, তুমি গাহিয়াছ—"কান্তাধর পল্লব মাধুরিমা"। আজ তাহার পরিবর্ত্তে ইক্ষুগুড়!! অতঃপরং কিং ভবিষ্যতি? বিখ্যাত

কমলাকান্ত তাহার বিখ্যাত জোবানবন্দীতে হুলপের ভাষা শুনিয়া বলিয়াছিল "ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।" আমরাও শ্রাদ্ধ করিবার সময় ঐ শব্দটী অনেকবার বলি এবং ঐ দ্রব্যটীও ব্যবহার করি। বোধ হয় নীরস শ্রাদ্ধ ব্যাপারটীকে সরস করিবার জন্যই দ্রব্যে ও শব্দে মধুর ব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলেন অমৃত ও মধু এক জিনিষ। সুধা জিনিষটীর লোভে অনেকেরই স্বর্গে যাইতে সাধ হয়। তবে সুধা বা অমৃত এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে বেশ আমদানী হইয়াছে। সাক্ষী কবি ভারতচন্দ্র; তিনি বলেন—

দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি বিদ্যামুখে থুলা লুকাইয়া॥

জ্যামিতির এক নিয়মে ইহা প্রমাণিত হয় যে সুধা ও মধু এক জিনিষ। কারণ এক কবি বলিতেছেন "কান্তাধর পল্লবে মধুরিমা"; এখন আবার কান্তাজাতীয় বিদ্যার অধরে সুধার সন্ধান মিলিতেছে, সুতরাং সুধাও মধু এক পদার্থ। এই সুধা বা মধু বা অমৃত পাইবার লোভে এত কষ্ট করিয়া স্বর্গে যাইবার আবশ্যকতা নাই। পৃথিবীতে নানা স্থানে এই অমৃত ছড়ান রহিয়াছে। প্রথমতঃ ধরুণ "অমৃতং বালভাষিতং"—আবার "অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ" শীতকালে আগুন পোয়ান বা অগ্নিসেবন! "অমৃতং পুত্র পণ্ডিতঃ"। তারপর "অমৃতং যুবতীভার্য্যা"। কিন্তু মল্লীনাথ বলেন এ পাঠ ঠিক নয় "অমৃতং গুণবতীভার্য্যা" বস্তুতঃ ভার্য্যাগুণবতী হইলে যৌবনাপগমেও অমৃতং। আর "অমৃতং শ্বশুরগৃহং" এবিষয়ে শিব, বিষ্ণু ইহারা বড় বড় সাক্ষী। এ স্থানে আমার এ তথ্য বিশ্লেষণ না করাই সঙ্গত।

কিন্তু অমৃত ও মধু এক জিনিষ হইলেও মাধুর্য্য কিন্তু একপ্রকার নয়। শিশুর গদগদ কথার মাধুর্য্য বা কান্তার নয়নভঙ্গী মাধুর্য্য বা কোকীলের মধুর স্বর লহরীর মাধুর্য্য আপনারা সহজে অনুভব করিতে পারিলেও ঝাঁটা মাধুর্য্য আপনারা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন ঝাটা সম্মার্জ্জনী তাহা শুধু অঙ্গন ঝাঁটদিতে আস্তাকুড় পরিষ্কার করিতে, জঞ্জাল দূর করিতে ব্যবহৃত হয়। সম্মার্জ্জনীর সব কয়টী কাজইত মাধুর্য্যলেশ হীন সুতরাং ঝাঁটা মাধুর্য্য আপনারা সহজে বুঝিতেছেন না। তবে শুনুন ঝাঁটা-মাধুর্য্য জানিয়া রাখুন।

মৃণালিনীর দিগ্বিজয় ভৃত্য গিরিজায়ার সহিত মধুর রসের চর্চ্চা করিতে গেলে তাহার লাভ হইত ঝাটা প্রহার। দিগ্বিজয় চায় গিরিজায়ার মাধুর্য্য গিরিজায়া কোমর বাঁধিয়া ঝাঁটা হস্তে ধাবমানা। দু, এক ঘা পৃষ্ঠদেশে পড়িলে তবে মধুর রসের চর্চ্চা শেষ হইত। একদিন সমস্ত সকাল বেলা, সমস্ত দুপুর বেলা, সমস্ত বৈকাল সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের এত আলাপ হইল, কিন্তু গিরজায়া আজ অতিরিক্ত দুষ্টা বড় মধুর হাসিতেছে, সে একবারও ঝাঁটা খুলিল না। পর দিন প্রাতে দিগ্বিজয় অতি বিমর্ষ ভাবে গিরিজায়ার নিকট আসিয়া বলিতেছে "ভাই, তুমি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করিয়াছ। গিরিজায়া কহিলে কেন? কিসে বুঝিলে আমি রাগ করিয়াছি? দিগ্বিজয় কহিল "তুমি কাল একবারও আমাকে ঝাঁটা মার নাই, তুমি নিশ্চয় রাগ করিয়াছ।" আশাকরি আপনারা এই ঝাঁটাবিহারী মধুর রসের চর্চ্চা ভালবসিবেন না। কিন্তু এই ঝাটারও যে মাধুর্য্য আছে তাহা জানিয়া রাখুন।

এখন উৎকট মাধুর্য্যের একটু নমুনা দেই। এই উৎকট মাধুর্য্য নূতন আমদানী নব্যবঙ্গের কোনও দাম্পত্য-প্রেমিক বলিতেছেন!—

"রান্না ছাড়াই নভেল পড়াই এংলো বেংলো যাহা পাই,
ভেঙ্গে ঘড়ী গহনা করি সাড়ীও কিনি বোম্বাই।
ঘেনর ঘেনর পেনর পেনর তবুত ছাই ছাড়ে না,
এযে বেড়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে ধন দৌলত ত বাড়ে না।'

এই প্রেমিক মহাশয়ের গৃহে কিঞ্চিৎ দাম্পত্য কলহ ছিল তাই তিনি বলিতেছেন:—

"পাণ্ডুকুরু যদু কুলে রইলনাক পুত্র আর
ধ্বংস গেছে বংশ সে যে শ্রীশ্রীমতী উত্তরার,
তবু নিত্য কুরুক্ষেত্র আমার গৃহ ছাড়ে না
এবং বেড়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে ধন দৌলত ত বাড়ে না।"

তারপর—

"গীতার দীক্ষা নীতি শিক্ষা কত দিলুম গিন্নিকে
মতি দিলেন পুরুত ঠাকুর তিনটী বেলা আহ্নিকে।

তবু একি ভেস্কারে ভাই ঘাড়ে ভিন্ন চড়ে না।
তথাপি বেড়ে যাচ্ছে ছেলে ও মেয়ে ধন দৌলত ত বাড়ে না।"
"বাপের বাড়ী মায়ের পাড়ি ঘর সংসার চলে না।
এ সোজা কথায় মাথায় ব্যথা বেজায় মান ভাঙ্গে না॥
ধরাশায়ী বিছানাতে যত ঠেলি নড়ে না
কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে ধন দৌলত ত বাড়ে না॥"
এখন এই উৎকট মাধুর্য্যের চরমসীমা—
"রোদন বেদন জানাই কিছু আফিসে আর বালিশে
জানেন কিছু ডাক্তার বাবু পৃষ্ঠদেশের মালিশে
কেন না দাম্পত্য প্রেমের পথ্যে সকল রোগত সারে না।
আহা! বেড়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে ধনদৌলত ত বাড়ে না॥"
এই গেল উৎকট মাধুর্য্য।

মাধুর্য্যের আলোচনা করিতে যাইয়া আপনারা নানা-প্রকারের মাধুর্য্য আস্বাদ করিলেন। এখন সেই আসল তথ্যে উপনীত হই। গোপীরা কৃষ্ণের মাধুর্য্য মূর্ত্তির উপাসক তাই কাত্যায়নীর ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তির উপাসনা। আমরা অধিকাংশ দেবতার পূজা করি—নিজের নানা সুখ কামনায়; দেবতার যে ঐ অলৌকিক শক্তি, ঐ দান করিবার ক্ষমতা তাহাই তাহার ঐশ্বর্য্য, তিনি সেই ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বলে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তাই দেবপূজা সময় আমরা স্বার্থ চিন্তায় ব্যাকুল। আমরা দেবতার কাছে বর চাই কিন্তু দেবতাকে ভালবাসি কি? মনসা পূজা করি সর্প ভয়ে কিন্তু মনসা মূর্ত্তিতে আমাদের প্রীতি আছে কি? দেবতাকে আমরা ভয় করি, যাহাকে ভয় করা যায় তাহার সহিত প্রেম হয় কি?

আমার বাল্য বন্ধু রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সেই রাজা মহিমময় মূর্ত্তিতে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের জাকজমক লইয়া সিংহাসনে আসীন। তাহার পরিচ্ছেদের দ্যুতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তাহার গাম্ভীর্য্যময় মুখশ্রীর দিকে চাহিতে ভয়ে সঙ্কোচে চক্ষু নত হয়। অতি সন্তর্পণে অর্থী প্রত্যর্থী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। রাজা তাহার পদোচিত মর্য্যাদার সহিত রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। সভাশেষ হইল, রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের পথে অগ্রসর হইতেছেন সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে আমি তাহার অলক্ষিতে তাহাকে অনুসরণ করিতেছি। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া ফেলিল "এই যে তুমি পলাইয়া ফিরিতেছ" বলিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, কি হাসির উৎস! কি আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। মুকুট ফেলিয়া দিয়া রাজবেশের অমর্য্যাদা করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল! প্রিয় সমাগমে আমি বিহ্বল! তাহার হাস্যলাঞ্ছিত তিরস্কারে আমি আনন্দ সমুদ্রে স্নাত। মাধুর্য্যরস যেন মূর্ত্তি ধারণ করিল!! এই মূর্ত্তির নিকট স্বার্থকামনা সাজে কি? রাজার সিংহাসনের মূর্ত্তি ভয়ের, মাধুর্য্যের নয়। তাই মাধুর্য্য মূর্ত্তি কৃষ্ণের নিকট গোপীদের কিছু চাহিবার নাই। কত্যায়নী দশভুজা দশপ্রহরণ ধারিণী মহাঐশ্বর্য্যশালিনী, আর কৃষ্ণ বেণুবাদ্য-বিনোদী, নটবর বর্হাভিরাম, দ্বিভুজ মুরলীধর!! আত্মসুখের কামনাই কাম। তাই কৃষ্ণ সুখের কামনাই প্রেম। এই মাধুর্য্যরস বিগ্রহের নিকট আমাদের কি চাহিবার আছে? আমি কি চাই? আপনারা কি চান? এজগৎ কি চায়? জানি না। সত্যই আমরা জানি না আমরা কি চাই। আমরা চাই ঐশ্বর্য্য না মাধুর্য্য? বড় কঠিন রহস্য, আমরা কি চাই জানি না।

অতি সুন্দর ফুলগাছ। প্রাণ-মন-বিমোহনকারী সৌরভ সেইপুষ্পের। ফুল এখনও ফোটে নাই। মাত্র কুঁড়ি দেখা দিয়াছে। সৌরভ সেই কুড়ির ভিতরে আবদ্ধ। সে চায় ফুল ফুটুক আমি বাহির হই!

"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ য়ে
কাঁদিছে আপন মনে
কুসুমের দলে বন্ধ হ'য়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে হায় হায়, বেলা যায়, বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায়!!"

আমরা জীবরূপী অফুটন্ত কুঁড়ি। আমাদের উদ্দাম প্রেমতৃষ্ণারূপ সৌরভ অদম্য গতিতে ছুটিতে চায়। কিন্তু সে আবদ্ধ তাই তার এই ক্রন্দন।

এই ক্রন্দন আমার, এই ক্রন্দন আপনার, এই ক্রন্দন জগতের। প্রত্যেক জীবের ভিতর হইতে এই ক্রন্দন অলক্ষিতে বাহির হইতেছে। তৃষ্ণা মিটিতেছে না, অথচ আয়ু ফুরাইতেছে, আমি যে কি চাই তাহা বুঝি না,

অথচ দিন যায়। তাই কাঁদি হায়, হায়, বেলা যায়, বেলা যায় গো, ফাগুনের বেলা যায়!! এই ক্রন্দন বিশ্বের। এই ক্রন্দন অনাদি ওঙ্কার ধ্বনিতে

"ভনমি ওঙ্কারে শব্দ তরঙ্গ
কোটি বজ্রনাদে ছুটে।
মরণ হইতে লভিতে জনম
পরাণ প্রয়াস করে॥

এই ক্রন্দন জীবের অনাহত ধ্বনিতে "হায় হায় বেলা যায়, বেলা যায় গো ফগুনের বেলা যায়।"

এই ক্রন্দন তরঙ্গিনীর উচ্ছল কল কল ধ্বনিতে, কুলু কুলু নাদে চলিয়াছে "কহিতে বারীশে হেন এ দুঃখ কাহিনী" বেলা যায়, বেলা যায় গো। এই ক্রন্দনই পবনের স্বন স্বন ধ্বনিতে, ফুর্ ফুরে হাওয়ায়, বিহগের মধুর কাকলীতে কোকিল কুহরে—বেলা যায়, বেলা যায় গো, ফাগুনের বেলা যায়!!

এই প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে ঐশ্বর্য্যের সাধনা আরম্ভ করিলাম। আসন করিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিলাম "রূপং দেহি জয়ং দেহি ধনং দেহি দ্বিষোজহি"। হৃদয়ের রক্ত দিয়া সাধন করিলাম। ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হইল, ক্ষুধা মিটিল কি? রূপ, ধন জয় লাভ হইল, ক্ষুধা মিটিল কি? দম্ভ, অহঙ্কার, লোভ কেশাকর্ষণ করিয়া কুপথে টানিয়া লইয়া চলিল; ক্ষুধাত মিটিল না? "চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তা মুপাশ্রিতাঃ" এই প্রলয়ান্তকারী ক্ষুধা কেবলই বাড়িয়া চলিল।

"হরিতে নারিলি মণি, দংশিল প্রবল ফণী
এবেরে পরাণ কান্দে।"

কিসে প্রাণ সুশীতল হইবে? আজ কুঁড়ির ভিতর গন্ধ উদাসপারা। মন আজ বৈরাগ্যের মূর্ত্তি ধরিয়াছে, ঠিক কুঁড়ির ভিতর গন্ধের মত। কুঁড়িতে আবদ্ধ সৌরভ বাহির হইতে পারে না আর ভাবে হায় হায় আমার জীবন এমন ব্যর্থ হইল কেন গো! তেমনি জীবও ভাবিতেছে আমার জীবন এমন ব্যর্থ হইল কেন গো! এই ভাবনা বিশ্বব্যাপী তাই এত হাহাকার! ধনের জন্য, জনের জন্য, ভোগের জন্য এত হাহাকার, কি চায় সে জানে না, কিছুতে তৃপ্তি পায় না, আর ভাবে :—

"জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থ হারা?
কহিছে সে হায় হায়, কেন আমি কান্দি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়!"

এই যে বিশ্বব্যাপী এই হাহাকার ইহার কি প্রতিকার নাই? এই যে বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা ইহা কি মিটিবে না? এই যে অদম্য বাসনার উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য, ইহা কি থামিবে না? এই যে মানুষের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইতেছে, ইহার কি শান্তি হইবে না? কেমনে হইবে? কোন পথে? ঐশ্বর্য্যের পথে, না মাধুর্য্যের পথে? মাধুর্য্যের পথে এই বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে। তাই কবি অভয় দিয়া বলিতেছেন :—

"ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি পুরাবি কামনা
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি
জনম ব্যর্থ যাবে না!!"

ইহাইত চরম সাধনা। ইহাই চরম সিদ্ধি। এই জীবের হৃদয়ে আবদ্ধ প্রেমতৃষা যে দিন বিশ্ব ব্যাপী হইয়া সর্ব্বভূতে সমভাবে বিতরিত হইবে সেই দিনই জীবনের সার্থকতা; সেই দিনই জীবন ধন্য হইবে।

যোগীর যোগসিদ্ধিতে এই মাধুর্য্য দর্শন সর্ব্বভূতে প্রেম! জ্ঞানীর সেই সিদ্ধি প্রতি অনুপরমাণুতে সে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিকাশ দেখিয়া ধন্য হয়—মাধুর্য্যে আত্মহারা হয়। আর ভক্ত সেও মাধুর্য্য রসে ভরপুর—

"যাহা যাহা নেত্র পরে তাহা কৃষ্ণস্ফুরে।"

সুতরাং যত ভাবের সাধনা আছে তাহার চরম পরিণতি এই মাধুর্য্য ভাবে। বুদ্ধদেব এই মাধুর্য্যের প্রেরণায় সর্ব্বত্যাগী, খৃষ্ট এই মাধুর্য্যের স্বাদ পাইয়া ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও পাপীর জন্য কাঁদিয়াছেন, চৈতন্য দেব এই মাধর্য্যরসের অবতার!! তাই গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন :—

সর্ব্বভূতস্থ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

অর্থাৎ যোগে সমাহিত চিত্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী

সেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অভেদে দর্শন করেন। ইহাই মাধুর্য্যের দর্শন। এই দর্শনে সমস্ত জীবে প্রেম হয়। এই মাধুর্য্য মূর্ত্তি পাইতে গোপীরা কাত্যায়নী ব্রত করিলেন। এই পরম প্রেম বা প্রীতিরই নামান্তর পিরীতি। আমরা অতি অসতর্ক ভাবে এই পিরীতি শব্দের ব্যবহার করি। ভক্তের নিকট এই মাধুর্য্য মণ্ডিত পিরীতি অতি পবিত্র পদার্থ; তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন :—

বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমান কৈল "পি"
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাহে উপজিল "রী"
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল "তি"
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি?

এই মাধুর্য্যের পুলক যখন বিশ্ব প্লাবন করিতে চায় তখন
"মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগত মাঝারে লুটিতে চায়!।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত।

কর্ম্মবীর।

ধর্ম্ম আমার কর্ম্ম করা মর্ম্ম আমার কেও না বুঝে,
দেখবে আমি ব্যস্ত সদাই কাজের মত কাজের খুঁজে।
জীবন দিব পরের তরে করব আমি দেশের সেবা,
বীরের মত কাজ করিব দেখব কাছে দাঁড়ায় কেবা।
কিন্তু বড়ই দুঃখ আমার দেশবাসীরা হতচ্ছাড়া,
আমার মত কর্ম্মবীরের খবর কিনা নেয় না তারা।
সদুপদেশ দিতে গেলেই কোমর বেঁধে প্রতিবাদ,
এমন বাধা পেলে পরে করতে কিছু হয় কি সাধ?
বৃদ্ধ মায়ের নেই না খবর ব্যস্ত শুধুই দেশোদ্ধারে,
বুকটা বুঝি গেলই ভেঙ্গে দেশবাসীদের হাহাকারে।
হেন লোকের নাইরে পূজা অকৃতজ্ঞ বলে কারে,
সকল দেখে হলুম বোবা দেশটা গেল ছারেখারে।
কিন্তু তবু কাজ যা করি কেবা করে আমার মত,
যে যা করুক আমি তাতে খুঁৎ ধরিব নানা মত।
কাজের মত কাজ করিবে নাই রে কেহই আমি ছাড়া,
মানুষ কেহ থাকলে পরে মোর কথাতে দিতই সারা।
সমাজটারে গড়ব আমি ইচ্ছা হল মনের মত,
বলব কি ভাই তাতেও কিনা পরল বাধা শত শত।
উঁচু নিচু করব সমান বলবে লোকে সদাশয়,
নিগৃহীতের পরম বন্ধু হবে আমার পরিচয়।
এই না ভেবে গ্রামে গ্রামে তুলতে চাঁদা যখন যাই,
ধূর্ত্ত লোকের বলাবলি টাকা চুরির ফন্দি ভাই।
এর পরে যা করল মোরে অশেষ রকম লাঞ্ছনা,
আমি বলেই ঠিক রয়েছি সয়ে সে সব যন্ত্রণা।
বলব কি ভাই ইচ্ছা হল করতে পল্লী সংস্কার,
গ্রামের দিকে গেলুম ছুটে গড়নু বাড়ী চমৎকার।
বাড়ীখানার বহর দেখে পল্লীবাসীর আর্ত্তনাদ,
মোদের বুকে গড়লে বাবু তোমার কি না রাজপ্রাসাদ।
জীবন ব্যাপী কর্ম্মে আমার কতই হল অন্তরায়,
ভগবানই জানেন শুধু কি যে আমার কষ্ট তায়।
পরিবারের সংস্কারটাও আমি কিন্তু দিইনি বাদ,
চিরকালটা সংস্কারতেই জেন কিন্তু আমার সাধ।
কচি বৌয়ের জীবনান্ত বুড়াবুড়ীর হুহুঙ্কার,
সহ্য আমার হলনাকো ঠিক করিনু প্রতিকার।
রান্নাঘরে বুড়ীর হাতে দিয়ে দিলুম কাজের ভার,
বৌয়া সবে করুক খেলা পাকুক তাদের কচি হাড়।
আমার দলে এসে এখন অনেক মহৎ সদাশয়
বীরের মত দিচ্ছেন দেখি সৎসাহসের পরিচয়।
এই ভাবেতে দেশটা যখন ক্রমে হবে অগ্রসর,
আমার কথার মূল্য কত—বুঝবে লোকে অতঃপর।

হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

পথহারা।

(গল্প)

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ট্রেণে।

গাড়ীতে সে দিন মোটেই ভিড় ছিল না। ইণ্টার ক্লাসের একটা কামরায় তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। হাতের ব্যাগটা ঠিক করিয়া রাখিয়া বসিতে না বসিতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মাত্র একজন ভদ্রলোক বেঞ্চের একধারে চুপ করিয়া বসিয়া যেন কিসের ধ্যানে মগ্ন আছেন দেখিলাম। তাঁর দৃষ্টি কোন সুদূরে—অনন্ত নীলাকাশে প্রসারিত। হাতে একটা খবরের কাগজ। পুরুষের এত রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। বয়স বোধহয় ২৬। ২৭ এর বেশী নয়; গায়ের রঙ্গ খুব ফর্সা, বেশ হৃষ্ট পুষ্ট চেহারা। তৈলহীন রুক্ষ কুঁকড়া চুল তাঁর প্রশস্ত ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সেই সুঠাম যৌবন প্রদীপ্ত দেহে সব চেয়ে আশ্চর্য্য তাঁর বড় বড় কাল চোখ দুটী। যে একবার দেখিয়াছে, সে আর এ সুন্দর মুখ ভুলিতে পরিবে না।

পোষাক পরিচ্ছদের কোন বালাই নাই। এমন কি পায়ে জুতা বা গায়ে জামা পর্য্যন্ত নাই, একটা মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত।

ব্যাগ হইতে "Virgin Soil" খানা খুলিয়া চোকের সামনে ধরিতেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"মশায় কতদূর যাবেন?"

"এই যে ময়মনসিংহ" বলিয়া উৎসুক নেত্রে তাঁর দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন "আমিও সেখানেই যাচ্ছি, বেশ বসে গল্প করা যাবে! আপনার হাতে ওটা কি বই?"

"Virgin Soil."

"ও টুর্গেনিভের বুঝি?" তিনি বলিতে লাগিলেন।

"কিন্তু কি আশ্চর্য্য লোক এই লেখকটী। কত আগে তিনি রুসিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টার চোক দিয়ে দেখেছিলেন। যে বিপ্লববানে রুসিয়া আজ তরঙ্গায়িত, একদিন তিনি অকতোভয়ে তারই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এর ফলে তাঁকে দেশত্যাগী হতে হয়। আর শুধু তিনিই নন, রুসিয়ার শক্তিমান লেখকদের অনেকেই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের আভাষ দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের প্রায় সকলেরই কঠোর শাস্তি ভুগতে হয়েছিল। আমি অনেক সময় ভাবি কি জানেন— বাংলাদেশে কেন আজও একটা "টুর্গেনিভ" একটা "ডষ্টয়ভস্কি" জন্মাল না। এর কারণ বোধ হয় এদেশের লেখকেরা তেমন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে স্বদেশের জন্য ভাবেন না।"

তখন ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত "রুসো" ও "ভলটেয়ার" হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বার্গসর দর্শন ও শরৎচন্দ্রের কথা সাহিত্য আসিয়া পড়িল। দেশ বিদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার এমন সুনিপুন বিশ্লেষণ জীবনে বোধ হয় এই প্রথম শুনিলাম।

ট্রেণ তখন হুহু করিয়া প্রান্তর কাঁপাইয়া ছুটিতেছিল। পূর্ব্বগগনে সবে পুর্ণিমার চাঁদ উঠি উঠি করিতেছে, তারই শুভ্র কিরণ রেখা নিস্তব্ধ বনানীর গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঝরিয়া পড়িয়া অপূর্ব্ব লুকোচুরী খেলিয়া যাইতেছিল। খোলা জানালা দিয়া বিশ্ব প্রকৃতির এই চির নূতন খেলা মর্ম্মবীণার তারে কত না বিচিত্রছন্দে বাজিয়া উঠিতেছিল! ধীরে ধীরে আমাদের তর্কও ঘোরাল হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম—"কিন্তু এই বিপ্লব-বাদ সম্পূর্ণ বিদেশের আমদানী; এ আমাদের দেশে কখনও আগে ছিল না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"তা সত্যি, জিনিসটা বিদেশ থেকেই এসেছে বটে, কিন্তু তাই বলেই খারাপ হতে পারে না, আর আমরা এটাকে ছেড়েও দিতে পারিনে"।

বিপুল বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—

"তা হলে আপনি বিপ্লব-বাদ সমর্থন করেন?"

"নিশ্চয় করি! করা উচিত।"

মুখ হইতে আমার আর কথা বাহির হইল না! কিন্তু তিনি থামিলেন না। বিপ্লব-বাদের কারণ থেকে তার ক্রমোন্নতি ও প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুরবস্থার কথা বলিতে বলিতে তার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল; আবার পরক্ষণেই সেই দৃপ্ত নয়ন কোণ হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল! দেখিলাম, ইঞ্জিনের

গাঢ় বাষ্পের মতই তার হৃদয়ের ভাবরাশি টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে :

ভয়ে ভয়ে কহিলাম—"এই বিপ্লববাদে দেশের কতটুকু লাভ হয় বলা সহজ নহে।"

"আপনি দুনিয়ার বিপ্লব বাদের ইতিহাস পড়েন নি বলেই একথা বলছেন, নইলে দেখতে পেতেন এতে কোন দেশের কখনও অশুভ হয় নি। যখনি যেখানে শাসন-তন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেছে, তখনি সেখানে বিপ্লব-বাদের অনল শিখা জ্বলে উঠে দাম্ভিকতাকে পুড়াইয়া ধ্বংস করে ছারখার করে দিয়েছে। কাজেই যারা এই তাণ্ডব লীলার সৃষ্টি করে তাদের বড় বেশী দোষ দেওয়া চলে না। মানুষের সহ্য করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ তার উপর জুলুম করলে তার বিদ্রোহীমন বল্‌গাহীন ঘোড়ার মত পথে-বিপথে ছুটে চলে। জগতে Autocracy-র দিন ফুরিয়ে এসেছে, আজ Democracy-র জয়জয়কার।"

আমি আবার তর্ক জুড়িয়া দিলাম—"কিন্তু আমাদের এই প্রাচ্য দেশে এর প্রতিষ্ঠা শুভ হবে কি? আমাদের এই নির্ব্বিরোধ শান্ত প্রকৃতিকে জোড় করে এই বিপদ সঙ্কুল পথে—এই টানা হেচড়ার মধ্যে নিয়ে গেলে এতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কাই বেশী মনে হয়। বিপ্লববাদের দুর্গম পথটা স্বাধীন প্রতীচ্য দেশের পক্ষে যেমন সহজ সরল পন্থা, তাদের স্বভাবের সঙ্গে যেমন খাপ খায়, আমাদের দেশের পক্ষে সেটা তেমন কার্য্যকরী নাও হতে পারে। যারা বহুকাল ধরে নিজদের দেনা পওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে অভ্যস্ত হয়েছে তারাই একে পরিচালনা করতে পারে। আমরা কিন্তু অতশত চুল চিরা বিচার বুঝতে পারিনে। আমাদের প্রকৃতিতেই কেমন একটা স্বাভাবিক নম্রতা ও Servile ভাব রয়ে গেছে, যাতে ওসব দেশের মত আমাদের চিত্ত autocracy-র বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে উঠে না। গণতন্ত্রতা জিনিসটা যেন আমাদের ধাতে সয় না!"

আমার মুখের পানে তাঁর সেই বিশাল নয়নের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ক্ষণকাল আবদ্ধ রাখিয়া তিনি একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র।

উঃ সে দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ—কি মর্ম্মভেদী!

আমার হৃদয়ের অন্তস্থলটাকে তিনি যেন স্বচ্ছ নির্ঝরিণীর মত এক নিমিষে দেখিয়া লইয়া আবার গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"আপনি যা বল্লেন, তা আংশিক ভাবে সত্য হতেও পারে; আমি তা অস্বীকারও করিনে। কিন্তু প্রাচ্য চিরকাল প্রাচ্য ভাবাপন্নই থেকে যাবে, এর কোন মানে নেই। শান্ত সুবোধ ছেলেটী পড়া শুনায় ভাল হলেই তার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা হল না, তার শরীরটাকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে তাকে ছুটা ছুটি করে—ব্যায়াম করে তাঁর জীবন্ত ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। জাতির সম্বন্ধেও একথা খাটে। চুপ করে জগতে টিকে থাকার কোন সার্থকতা নেই, প্রমাণ ভারতের অগণিত অসভ্য জাতি। এ জাতিকেও বাঁচতে হলে তার যুগযুগ-সঞ্চিত জড়তা, এবং আরো অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে নবীন জীবন্ত জাতিদের সাথে এক তালে পা ফেলে চলতে হবে। নতুবা তার আর দুঃখের অন্ত থাকবে না। আমরা নিজেদের দেনা পাওনা ভাল করে বুঝে সুজে নিতে পারিনি বলেই আমাদের আজ এ দুর্দ্দশা। জীবন মরণের সমস্যাটা পরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিলুম বলেই আজ জীবন-ধারণ করাটা আমাদের কাছে এত দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। দুর্ব্বলতাব অজুহাতে যে লোক কেবলি দীনতা স্বীকার করে, তার সেই নম্রতাকে প্রশংসা করা চলে, কিন্তু তার পক্ষে জগতে কোন একটা বড় কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়! চিরদিন পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে একদিন মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী করে নেওয়া ভাল নয় কি?

"স্বীকার করি এ দেশের এই Servile attitude অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। এ দেশ প্রবলের নিকট হতে চেয়ে নেওয়ার যে হীনতা, তাকে ঠিক দীনতা মনে না করে লোকেরা ভক্তি আখ্যা দিয়েছে; এবং সেই ভক্তির মাত্রাধিক্যে প্রবলের পায়ে আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে নিজের স্বাতন্ত্রটাকে একেবারে হারিয়ে বসেছে। সে জন্যই আমাদের দেশে গণতন্ত্রতা ঠিক তেমন ভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে নি।

"আর এর জন্য এ দেশের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কারই যে অনেকটা দাবী তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

একটু ভাবলেই দেখতে পাবেন আমরা চিরদিন আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাল মন্দ সব কাজ এক শ্রেণীর পণ্ডিত-মণ্ডলী ও শাসকদের উপর নির্ভর করে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ঘর কন্নার কাজে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলুম; কিন্তু দশে মিলে আপনাদের উপকার করতে কখনও অগ্রসর হইনি বা আদায় করতেও শাসককে বাধ্য করবার ধৃষ্টতা হয় নি।

"Democracy'র বাহন যে সুশিক্ষা এ তো আপনাকে না মেনে উপায় নেই। সে জিনিষটারই কিন্তু এ দেশে অভাব। ওরা স্বাধীন জাত বলে কাজ বাগিয়ে নিলে, আর আমরা স্বভাব দুর্ব্বল পরাধীন বলে চুপ করে বসে থাকব—এ একটা প্রকাণ্ড ভাবের ঘরে চুরী বই আর কিছু নয়।"

লোকটা একেবারে বদ্ধ "Anarchist" বুঝলাম। কেমন যেন ভয় হতে লাগল। যে লোক আঁধার রাতে ঘর থেকে বাহির হতে ভয় পায়, যার জ্ঞান কলেজের খান কতক পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার কাছে এ সব আলোচনা যে খুব চিত্তাকর্ষক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ তেমন করে এ সব বিষয় ভাববার অবসরই বা কোথায়!

আজ সহসা এই দীর্ঘ আলোচনায় একটা নূতনত্বের মোহে হৃদয়ে যেন অপূর্ব্ব স্পন্দন অনুভব করলাম। চিন্তারাজ্যে একটা অভিনব সাড়া পড়ে গেল। এসব কথা যে এর আগে মোটেই শুনি নাই, তা নয়; কিন্তু অই অল্প সময়ের মধ্যে, অল্প কথায় এমন করে ত আমার চিত্তকে কেহই মাতাইয়া তুলতে পারে নাই। এমন চোখে আঙ্গুল দিয়া ত কেহই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কখনও এ সব আলোচনা করে নাই?

যতই ভাবতে লাগলাম ততই মনে নানা বিচিত্র সমস্যা জেগে উঠতে লাগল।

এ সংসারে এমন কতকগুলি লোক আছে যারা অতি সহজেই অপরের চিত্তকে জয় করতে পারে—আপনার করতে পারে। আমার মনে হল এ লোকটা সেই শ্রেণীর। কুতার্কিক বলে আমার একটু বদনাম ছিল। কিন্তু কোন যুক্তি তর্কেই ত এর সঙ্গে আটিয়া উঠতে পারলাম না। তর্কের ধরাণটাও এর কিছু অদ্ভুত রকমের। কোন বিষয়েই জোর করে স্ব-মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নাই। কখনও হাস্যোচ্ছ্বাসে, কখনও গাম্ভীর্য্যের সহিত, কখনও বা বেদনার সুরে তিনি তার বক্তব্য অসামান্য যুক্তিবলে আমার সামনে ধরে আমার কথায়ই আমাকে ঠেকাতে লাগলেন। আমাকেও অবশেষে বাধ্য হইয়ে তার মত মানিয়ে নিতে হল।

ঢাকা হতে ময়মনসিংহের পথ খুব বেশী দূরে নহে। বুঝলাম আমরা গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়ে পড়েছি। ভদ্রলোকটা কি করেন জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হল না। সে এক রকম আন্দাজেই বুঝতে পেরেছিলাম।

ষ্টেশনে পহুছিয়া জিজ্ঞাসা করলাম—"মশায়ের পরিচয়টা"...

অন্য মনস্কের মত তিনি বললেন—"পরিচয়.........তা আমার নাম স্বদেশ, বাকীটুক পরে জানতে পান। আপনার পড়ার সখ আছে নিশ্চয়ই"।

সলজ্জভাবে কহিলাম "একটু একটু আছে বই কি।"

"তা হলে অবশ্য দেখা হবে। আসি মশায় নমস্কার, অনেক কথা বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।" বলেই ঈষৎ হেসে দ্রুত গতিতে চলে গেলেন।

বাসায় এসে কেবলি লোকটার কথা ও তার অদ্ভুত আচরণ মনে হতে লাগল। নাম বললে—স্বদেশ! এমন নাম ত বড় শুনি নাই। তবে কি পুলিশের ভয়ে নাম ভাড়ালে! লোকটা যে Anarchist দলের সহিত সংশ্লিষ্ট তার আর ভুল নাই!

কিন্তু কি শান্ত সংযত ভাব! বিলাসিতার নাম গন্ধ নাই, যেন মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য! অথচ কি গভীর পাণ্ডিত্য! তার প্রতি কথায় কত অজানা রাজ্যের গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ছিল। তাঁর জ্ঞানোজ্জ্বল আননে একটা সুস্পষ্ট প্রতিভার ছাপ আঁকা দেখলাম। এমন সুন্দর সুকুমার ভদ্র চেহারা, এমন জ্ঞানযোগী, কিন্তু লোকটা বিপ্লববাদীদের দলে গেল কেন—ভাবতে ভাবতে মনটা এক এক বার তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু সে বেশী ক্ষণের জন্য নহে; পর মুহূর্ত্তেই আবার প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি হৃদয়

ঝুইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য আমার মত নিরীহ লোকের বিপ্লব বাদীদের প্রতি একটুও সহানুভূতি ছিল না।

(২)

সে দিন নিষ্কর্ম্মার মত রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ সামনে পাবলিক লাইব্রেরীটা দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। সহসা চোখ ফিরাইতেই দেখি—সে দিনকার সেই ভদ্রলোকটী—স্বদেশবাবু ঘরের এক কোণে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি একটা বই পড়িতেছেন।

কাছে যাইতেই নমস্কার করিয়া হাসি মুখে বলিলেন—এই যে আমার পথের দেখা নবীনবন্ধো, বলুন, ভাল আছেন তো? আমি ঠিক ভেবেছি একদিন লাইব্রেরীতে নিশ্চয় আপনার সহিত দেখা হবে।

প্রতি নমস্কার করিয়া, তাঁর হাতের বইটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম—"আপনি সব রকম বইই পড়েন দেখছি। কিন্তু "কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের" ভিতর যে কি রস আছে, তাত মশায় বুঝতে পারি নে"?

বইয়ের পাতাটা মুড়িয়া তিনি উত্তর করিলেন—নিতান্ত সাধারণ লোকে যা বলে, আপনিও তাই বল্লেন দেখছি—দেখুন রস জিনিসটা সব পুস্তকের ভিতরেই অল্প বিস্তর আছে, তবে উপভোগ করাটা নির্ভর করে—ব্যক্তিগত যোগ্যতা আর অনুরাগের উপরে। আমাদের অনেকেরই যে যোগ্যতা নেই, এমন কথা আমি বলিনে, তবে অনুরাগের যে যথেষ্ট অভাব আছে, সেটা নিশ্চয়। যে দেশের যে জিনিস, সেখানে তার আদর না হয়ে, হচ্ছে বিদেশে। শুনে অবাক হবেন এই কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের অনুবাদ পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই হয়ে গেছে, কিন্তু এ দেশের কয়টা লোক এ সব বইয়ের খোঁজ রাখে? Slave mentality আমাদের জীবনের সব দিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। খুব ভাল সংস্কৃত জানিনে, নইলে বেদগুলো ভাল করে পড়তে ইচ্ছে হয়।

চলুন একটু হেঁটে আসা যাক্।" বলে তিনি আর একটা বই নিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নদীর ধারে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া, একটু নির্জ্জন দেখিয়া একটা জায়গায়—শ্যামল দূর্ব্বাদল-খচিত আসনে বসিয়া পড়িলাম।

পরিপূর্ণ বর্ষায় লৌহিত্যের জল-ধারা প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিতেছিল। ওপারের গাছ পালাগুলির মাথার উপর দিয়া বর্ষণোন্মুখী কাল মেঘের আনাগোণা দেখিতে দেখিতে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া স্বদেশবাবু কথা কহিলেন—

দেখুন এই ভীষণ খরস্রোত ব্রহ্মপুত্রের মতই একদিন ফরাসী জাতির হৃদয় দুর্ণিবার বিপ্লব তরঙ্গে নেচে উঠেছিল—সে দুর্ব্বার গতি রোধ করবার কারো সাধ্য হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই মোটা বইটা খুলিয়া স্থানে স্থানে পড়িয়া আমাকে অনুবাদ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। বইখানা ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাস—মূল ফরাসী ভাষায় লেখা।

পড়িতে পড়িতে ক্ষণে ক্ষণে তার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। কখনও আবার কি ভাবিতে লাগিলেন।

আমি কহিলাম—আজ ওটা থাক।

এমন বই সম্বন্ধে আমার এরূপ মন্তব্য শুনিয়া ও আগ্রহহীনতা দেখিয়া তিনি বোধ হয় একটু বিস্মিত হইলেন।

আর একদিন আর একটা বই আপনাকে পড়ে শুনাব। বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তখন আবার তর্কের পালা। কথা উঠল "রেণেসাস" যুগের সাহিত্য ও আর্ট লয়ে। তিনি বললেন "দেখুন আজ বাংলা দেশের নবীন জীবনেও ভাবের রেণেসাস্ এসেছে, তাই তার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠছে।" এ চাঞ্চল্য এক দিন নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত হবে।

বাঙ্গালীকে এখন দেশ বিদেশ ভাল করে দেখবার দরকার। ঘর ছেড়ে তাকে এখন বেড়িয়ে পড়তে হবে।

সত্যেনদত্ত ঠিক বলেছেন—

শাস্ত্র শাসন রইল মাথায় তর্ক মিছে নাইক ফল
বন্দরে ঐ দাঁড়িয়ে জাহাজ বেড়িয়ে পড় বন্ধুদল।

এখনো ভাল করে জার্ম্মাণ ভাষাটা শিখতে পারিনি, ইচ্ছা আছে একবার জার্ম্মাণীটা ঘুরে আসব।"

"আপনি যে সব কাজেই বিশারদ তা টের পেয়েছি, কিন্তু এত লেখা পড়া জেনেও কি করে যে আপনি এই বিপ্লববাদের—এই সব বিপথগামীদের সপক্ষে কথা বলেন—তা বুঝতে পারিনে।"

আমার কাঁধে হাত রাখিয়া পরম স্নেহের স্বরে তিনি বলিলেন—"ভাবতে শিখো বন্ধো, তা হলে দুনিয়ার অনেক রহস্যই জানতে পারবে। সংস্কার ছেড়ে দিয়ে একবার সত্যের আলোকে হৃদয়টাকে পরখ করে নেও, দেখবে অনেক মেকি ধরা পড়ে যাবে, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক।"

তার পর হতে আর আমাদের আলাপ আলোচনায় কোন বাধা রহিল না। সময়ে অসময়ে, দেখা সাক্ষাৎ ও নানা রকম প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া তাঁর সহিত আমার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল সেটা ইহজীবনে ভুলিবার নহে। আমার ভাবপ্রবণ কত বিনিদ্র রজনী তাঁর সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের—কত বিচিত্র সমস্যার আলোচনায় কাটিয়া গিয়াছে—দেশ দেশান্তরের ভাব রাজ্যের কত অলিতে গলিতে, কত দুস্তর চিন্তাসাগরে তাঁর সাথে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি তার হিসাব নিকাশ ছিল না। বাংলা দেশের কত পল্লী, কত নগরই না তার সাথে ঘুরিলাম! এমন গুরুর মত বাৎসল্য, ভাইয়ের মত স্নেহ, বন্ধুর মত সৌহার্দ্দ্য ত এ জীবনে আর পাইলাম না। অবশ্য সব সময়ে তাঁর বিতর্ক-বহুল জটিল চিন্তাজাল ছিঁড়িয়া তার ভিতর ঢুকিতে পারিতাম না, কিন্তু তবুও হৃদয়ের মহত্ব ও মাধুর্য্যে তিনি আমাকে একেবারে তাঁর কাছে টানিয়া মুগ্ধ করিয়া লইয়া ছিলেন।

(৩)

ইহার কিছু দিন পর এক দিন বিকাল বেলা প্রায়ান্ধকার নির্জ্জন নদীতটে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি বলিলেন—

"নগেন তোকে অনেকবার বলছি, যে লোক যত বিরুদ্ধবাদী সে ই তত শীঘ্র ভক্ত হয়ে উঠে, আজ কাল যে তোর আর সেই আগেকার মত তর্ক করার নেশা নেই? কেন জানিস, তোর মনটাকে আমি হরণ করে নিয়েছি। স্বামীজীর কথা শুনিস নি? শেষে তিনি কিন্তু গুরু ছাড়া আর কিছু জানতেন না। তোর অবস্থাটাও হয়েছে তাই, না রে?" বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই ভারী খুসী হইয়া উঠিলেন।

আমিও হাসি মুখে বলিলাম—"আপনি আমার গুরু সত্য—কিন্তু তর্ক করার নেশাটা আমার নানা কারণে ছুটে গেছে। এ সব তর্কের কোন মূল্য নেই।"

"মূল্য নেই? বলিস কি রে? মূল্য না থাকলে তোকে এত সহজে ভজাতে পারতুম না। ভেবে দেখ, কি ভীরু ছিলে তুই, আর আজ আমি আদেশ করলে জলে ঝাঁপ দিতে পারবি, আগুণে পুড়ে মরতে পারবি! নয় কি?"

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আমি কহিলাম—"তা পারব বোধ হয়।"

"তবেই ত তোর জীবনধারাটা আগাগোড়া বদলে গেছে; আর এ বদলানোটা কি আমার তর্কের প্রভাবেই হয় নি?"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়।"

তিনি খুসী হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা; কিন্তু এক কথা কাল রাত ৮টার সময় তোকে এক জায়গায় যেতে হবে—এক ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর, আমার আদেশ পালন করবি?"

"আমি কি আপনার অবাধ্য?"

"বেশ তা হলে ঠিক থাকিস যেন।" বলিয়া হর্ষগদগদকণ্ঠে আমার হাত খানা টানিয়া লইয়া কহিলেন—"ভাই মানুষ হতে চেষ্টা করিস! বাঙ্গালী জীবনটা বড্ড এক ঘেয়ে হয়ে পড়েছে। ওরে এ দেশটায় আর প্রাণ নেই; নব সাধনায় এর ভিতর জীবনী শক্তির সঞ্চার করতে হবে। যিনি এই পতিত জাতির প্রাণটাকে অসীম শক্তিতে আজও অল্প অল্প সঞ্জীবীত করে রেখেছেন তাঁকে প্রাণ ভরে ভালবাসতে ভুলিস নে।" পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় আপনি "দূর হয়ে" "তুমি" এবং শেষে "তুই" এ নামিয়া আসিয়াছিল।

(৪)

রেল হইতে নামিয়াই দেখি স্বদেশবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া। তিনি ইসারায় কাছে ডাকিয়া কহিলেন—"চুপ! আমার অনুসরণ কর, কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই! কেবল আদেশ পালন করবি মাত্র! ব্যস।"

তখনো বিষয়টা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু নৌকায় উঠিয়া থাকি পোষাক পরা, মুখস ঢাকা সঙ্গীদের আচরণ দেখিয়া অবস্থাটা বুঝিতে আর মুহূর্ত্তও দেরী হইল না। মুখে যতই বীরসের আস্ফালন করি না কেন, কাজের বেলায় এর পরিণাম কি হইবে, তা মনে মনে বেশ জানিতাম। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না।

নৌকা খানা বাঁধিয়া রাখিয়া আমরা ডাঙ্গায় উঠিতেই আদেশ হইল "fall in." ফিরিয়া দেখি কাপ্তান আমাদের স্বদেশ বাবু!

ত্বরিতপদে কাছে আসিয়া তিনি আমার হাতে একটা "মসার পিস্তল" গুঁজিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য নৌকায় উঠিয়া আগেই রীতিমত খাকির যোদ্ধ্‌বেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল।

দলপতি হুকুম করিলেন "মার্চ্চ।" তখন বীরদর্পে পল্লীপথ প্রকম্পিত করিয়া সসস্ত্র আমরা স্বদেশ উদ্ধারের উপকরণ সংগ্রহ করিতে ছুটিলাম। নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর সামনে আসিয়াই যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম সূচনা—দুম দুম করিয়া কয়েকটা আওয়াজ করিতেই দেউড়ীর হিন্দুস্থানী গোটা দুই দারোয়ান দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ব্যাটাদের আর আমরা হাত পা নাড়িবার অবসর দিলাম না। দলপতি তাহার ইঙ্গিতের ভাষায় আদেশ করিলেন—"বাঁধো।" আর দু'জন এদের পাহাড়ায় থাক।" নিমেষ মাঝে এই নিরস্ত্র হিন্দুস্থানীদ্বয় এই বাঙ্গালী স্বদেশ-প্রেমিক ডাকাত দলের হাতে বন্দী হইল!

তারপর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, আমাদের মশালের আলোকে ও যুদ্ধ সজ্জার অপূর্ব্ব উন্মাদনায় সহসা জাগ্রত পৌরজনগণের মধ্যে একটা ভীষণ আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উঃ সে কি মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ ও কোলাহল! মনটা একেবারে দমিয়া গেল। কিন্তু ভয় করিলে ত এখন চলিবে না, আমরা যে দেশের কাজ করিতে আসিয়াছি!

বাড়ীর কর্ত্তাই বোধ হয় ছুটা ছুটি করিতে করিতে সামনের দালানের বারান্দায় আসিতেই আবার ইঙ্গিতে হুকুম হইল। আমরা নীরবে ইঙ্গিত পালন করিলাম।

কর্ত্তাটী অতি ভাল মানুষ গোছের। ভয়ে একেবারে জড়সর হইয়া পড়িলেন। বাঙ্‌ নিষ্পত্তি রহিত হইয়া শুধু ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইতে লাগিল!

দলপতি কহিলেন—ভয় পাবেন না মশায়, এখন দয়া করে লোহার সিন্দুকের চাবি গুলো দিয়ে ফেলুন। "মা" দের কোন অমর্য্যাদা হবে না। আমাদের কার্য্যের জন্ত দুঃখ করবেন না। আপনার টাকা দেশের সেবায় লাগবে; এর চেয়ে অর্থের আর কি সদ্ব্যবহার হতে পারে?

এ সব কথার মর্ম্মপরিগ্রহ করবার মত বোধ হয় তখন কর্ত্তা মহাশয়ের মানসিক অবস্থা ছিল না। তিনি নিঃশব্দে চাবির গুছ খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

ম্যাপ দেখিয়া আমরা চট্‌পট্‌ কাজ শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহিলারা ভয় সন্ত্রস্তপদে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলেন। কোন মহিলার কোলের শিশু 'মা'দের চাপা কান্না শুনিয়া ভীতি বিহ্বল চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শব্দে বাড়ী ফাটাইয়া দিতেছিল। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যে অতি বড় পাষাণেরও হৃদয় গলিয়া যায়, তবে আমরা নাকি নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ তরুণ বাঙ্গালী বীর, তাই আমাদের দুর্ব্বলতা দেখাইলে চলিবে কেন? ও যে কাপুরুষতার লক্ষণ!

দলপতি অগ্রসর হইয়া মহিলাদের পথ আগলাইয়া সসম্ভ্রমে অতি মোলায়েম কণ্ঠে কহিলেন—'মা'রা দয়া করে আপনাদের গয়নাগুলা খুলে দিয়ে যান্‌। ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে—দেশের কাজের জন্ত এ অনুগ্রহ কত্তে হবে। ভয় নেই, কোন অসম্মান হবে না, অলঙ্কারগুলি খুলে দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যান।"......

তখন অলঙ্কার খোলার মৃদু সিঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধমান কণ্ঠের নীরব তিরস্কারের এই শোকাবহ দৃশ্য নয়নের সামনে যে ভাবে ফুটিয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। হায়, না জানি কত অভিশাপ কুড়াইয়া সেদিন এই বীরত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম! এরই জন্ত কি আমি এই উন্নতমনা ত্যাগশীল গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছিলাম। ভাবিতে ভাবিতে মনটা বিকল হইয়া পড়িল। হঠাৎ দলপতির তীব্র আদেশ বাণী সচকিত করিয়া তুলিল।

দলপতি আমাকে ইঙ্গিত করিলেন—"ঐ দেখ একজন অলঙ্কার না দিয়ে চলে যাচ্ছে।"

বছর তের চৌদ্দ বয়সের একটী তরুণী বোধ হয় অত্যধিক অলঙ্কার প্রিয়তার জন্তই এ সময়েও ওগুলি পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া চুপে চুপে চলিয়া যাইতেছিল। আদেশ পাইবা মাত্র এক লাফে যমদূতের

মত তাহার সামনে গিয়া হাজির হইলাম। মেয়েটী অত্যন্ত সপ্রতিভ। আমাকে দেখিয়া কিছু মাত্র ভীত হইল না, অকম্পিত স্বরে কহিল—"আমি পালিয়ে যাচ্ছিনে, খোকা একা ঘরে রয়েছে···বেশ, তা নিয়ে যাও।" বলিয়া একে একে তার গায়ের অলঙ্কারগুলি খুলিতে লাগিল। হাতের সোণার চুড়ি চার গাছি খোলা হইলে আমি বলিলাম—"থাক, ও দু'গাছা থাক।" মেয়েটী রাগিয়া উঠিয়া কহিল—"চাইনে ডাকাতের দয়া, সব নিয়ে যাও।"

প্রচণ্ড বিক্রমে এই নির্ম্মম কার্য্য সমাধা করিয়া প্রচুর টাকা কড়ি ও অলঙ্কার পত্র সহ বিদ্যুৎগতিতে পিস্তল ছুড়িতে ছুড়িতে নৌকায় আসিয়া পড়িলাম। গ্রামের কেহই সাহয্যের জন্য আসিতে সাহসী হইল না! এইরূপে বিনা বাধায় আমাদের বীরত্বের জয়ধ্বজা উড়াইয়া, স্বদেশের পরম মঙ্গল সাধন করিলাম—বলিয়া মনে ভারী আত্মশ্লাঘা হইল।

টাকা কড়ি ও অলঙ্কারাদি সেই যে তহবিল রক্ষকের হাতে গিয়া উঠিল, আর তার বজ্রমুষ্ঠি হইতে বাহির হইয়া সেগুলা দেশের কোন সৎকাজে লাগিল কি না, বলিতে পারি না, তবে এটা সত্য যে এই ধনাধ্যক্ষের সাংসারিক অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল! স্বদেশ বাবু টাকা পয়সার কোন ধার ধারিতেন না, কারণ এটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব! তিনি কেবল হুকুম করিতেন মাত্র!

(৫)

ইহার পর নানা বিভীষিকায় পড়িয়া জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। জননীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বুঝিলাম এ পথই সরল।

বিবাহ শেষে উৎসব-মুখর আলো ঝলমল বাসর কক্ষে বসিতেই একটী নব-যৌবন-বিকশিত তরুণী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া রূপের প্রভায় বিদ্যুৎ হানিয়া, কাছে সরিয়া আসিয়া হাসির ঝলকে কহিলেন—"কি গো মশাই, সে দিন তো ডাকাতি করে আমার অত সাধের গয়নাগুলো নিয়ে গেলেন, আর আজ যে মানুষ নিয়েই ডাকাতি। কেমন আক্কেল আপনার ?·········

কথাটা ছ্যাৎ করিয়া বুকে বাজিল। কোন মতে চোখ তুলিতেই মনে হইল—মুখ খানা যেন চেনা চেনা।

সাহস করিয়া কহিলাম—"আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হয়।"

"তা আর হবে না? সেদিন রাতে কি কাণ্ডটাই না করলেন আপনারা! ছি, ছি জোড় করে মেয়েদের গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে বাহাদুর সেজে বড়াই করা হয়—আমরা স্বদেশ প্রেমিক! ধিক্ এরূপ স্বদেশ প্রেমিকের!"

এ তিরস্কারের কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম না। তর্ক করার আর প্রবৃত্তি ছিল না।

"কি চুপ করে রইলেন যে? তা দাঁড়ান, আপনার কপালে এর জন্য কঠোর শাস্তি আছে।" বলিয়া হাসি ও এসেন্সের গন্ধে কক্ষ আমোদিত করিয়া যুবতী বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই দীর্ঘ ঘোমটাবৃত নববধুটীকে ধরিয়া আনিয়া একেবারে আমার উপরে ফেলিয়া দিল। এখন বেশ করে কাণটা মলে দাও ত দিদি ডাকাত বাবুটীর, তা হলেই উপযুক্ত শাস্তি হয়।" বলে আমার পানে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। কি মুখরা যুবতী!

সুযোগ মত প্রিয়ার হাতখানি টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি, তোমরা কি করে সে ডাকাতির খবর পেলে? অনন্তপুর তো তোমার বাপের বাড়ী নয়।" চাপা হাসি টানিয়া প্রিয়া কহিলেন—"কেন, আমার খুড়তুতো ভাই পরেশদাও যে ডাকাত দলেরই একজন; সেই ত বাবাকে চুপি চুপি সব বলে দিলে। অনন্তপুর আমার মেসো মশায়ের বাড়ী, তখন আমরাও সেখানেই ছিলুন যে।"

"তা জেনেও তোমার বাপ এমন জামাইর হাতে তাঁর মেয়ে দিলেন?"

"বাবা যে ন্যাশনেল স্কুলের মাষ্টার, তার মতও প্রায় ঐ রকমেরই।"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

এই সময় একপাল নানা বয়সের স্ত্রীলোক হুড় মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিতেই আর কোন উত্তর শোনার সুযোগ হইল না!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

শরতের সওগাদ।

ভোরের স্বপন ভাঙ্গল মহানন্দে রে;
স্নিগ্ধ-মধুর শিউলি ফুলের গন্ধে রে!
কর্‌লে আমায় উন্মনা,
আজ প্রেয়সী তোমার কথা শুন্‌ব নাকো শুন্‌ব না!
প্রাণ যে আমার দিচ্ছে সাড়া নূতন গানের ছন্দে রে!

শিউলি তলায় ফুলের ফরাস্‌ পাতলে কে?
কুঞ্জলতায় মোতির লহর গাঁথলে কে?
আজ্‌কে আমার অঙ্গনে—
রক্ত-রঙ্গীন ফুল ফোটালে যত্নে-ছাটা রঙ্গনে!
ধরার নূতন রংফলাতে এমন করে মাত্‌লে কে?

রোদের রংএ সোণার ছটা ঝল্‌মলে!
সোণার গাছে সাচ্চা সোণার ফল ফলে!
শ্রান্তি কাহার দূর করি—
কাশের বনে চামর দোলায় লক্ষ হাজার হুরপরী?
যৌবনেরি জয়গাথা কি গাচ্ছে নদী কল্‌কলে?

শুভ্র শোভা—অভ্র উড়ে অম্বরে;
দিক্‌ বধূরা ওর্ণা বুকে সম্বরে!
বিন্‌-মেঘে যে গর্জ্জে রে—
গৌরী যাওয়ার দিন ঘনালো, ধূর্জ্জটি তাই তর্জ্জে রে!
হংস রচে শূন্যে তোরণ—নাইকো তাতে স্তম্ভ রে!

স্বচ্ছ দীঘী—যার বাঁধানো আর্শী যে!
হাল্‌কা হাওয়া লিখ্‌চে বুকে ফার্শী যে!
কঞ্জ কুমুদ কহ্লারে—
ভোমরা বধূ লুটচে মধু; গুঞ্জরণের হল্লা রে!
মন ভোলানো ঐ মাধুরী আঁকতে নাহি পারচি যে!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত।

তপ্‌সী পানওয়ালা।

(কথা চিত্র)

বিশ বছর আগে তপ্‌সি পানওয়ালার দোকান ছিল হাড়কাটা গলিতে। বিরাজ বাড়ীওয়ালীর বাড়ীর বাইরের দেয়াল থেকে কাঠের ছাউনির চালা করে' তক্তপোষ পেতে ফুট্‌পাতের ধারে তা'র দোকান।

সোডা লেমনেড্‌ জিঞ্জারেটের বোতল, রেলওয়ে হাওয়াগাড়ী কলেম্বিয়া সিগারেটের বাক্‌স, চক্‌চকে পিতলের থালায় কলাপাতা মোড়া পানের দোনা, সামনে পিতলের হাতবাক্স, এক একটা কাঠি পোরা পিতলের চূণদানি খয়ের দানি; আর দোকানের সাম্‌নে আড়ায় ঝুল্‌ন্ত একটা কণ্ঠিআলা টিয়াপাখী।

সন্ধ্যার পর ঢাকি আলোটা জেলে দিয়ে খৈনি মুখে পূরে, মোচে তা দিয়ে তপসী টিয়াটাকে পড়া'ত—"বোলো বেটা রাধাকিষণ গোপীজী।" পাখীটা তা'র আওয়াজের অনুকরণ করে বলত—"গোপীজী গোপীজী।" আর দাঁড়টাকে শক্ত করে ধরে উঁচু নীচু হয়ে নাচতে থাকৃত। তাদের ছোট চোখ গুলি খুসিতে বেড়ে উঠ্‌ত।

গলিটার বাড়ী গুলার দোতালা তেতালা থেকে হরেক্‌ রকমের আওয়াজ বেরত। কোনো বাড়ীতে হারমোনিয়ামের বেমিল গলায় নাকি সুরে কেউ গাচ্ছেন——"ভালবাস দুটি কথা মন তোমারে বলে রাখি।" কোনো বাড়ী থেকে মাতালের বেবস হাতের এলোমেলো চাটি শোনা যাচ্ছে। কেউ ডাকৃছেন—"ও—তপসী, একটা জল, দুটো দোনা, একটা রেলওয়ে পাঠিয়ে দা—ও।"

তপসী বেজায় আওয়াজে "হাঁ—যাতেছে" বলে চেঁচিয়ে উঠে সোডা, পান, সিগারেট পাঠিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ উপরের খোলা জান্‌লা থেকে বুক অবধি বেরিয়ে কোন সুন্দরী এক খানা কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে বলছেন—"তপসী হাওয়াগাড়ী।"

তপসী খুঁটে বাঁধা পয়সা ক'টা খুলে নিয়ে এক বাক্স সিগারেট বেঁধে দিত।

মোচ ছাটা, কলপ-কাল-চুলে টেরি কাটা, কোকিল পেড়ে কাপড় পরা, পাকানো চাদর কাঁধে, বুড়ারা ত'ধারের

বাড়ী পানে চাইতে চাইতে ছড়ি ঘুরিয়ে ধীরে আস্তে চলেছেন— দিনান্তে 'পিত্তি রক্ষা' করতে।

হালকা হাসি পলকা চলন বাবুর দল সিগারেট ফুকতে ফুকতে আনাগোনা করছেন, কেউবা তপসীর দোকানের সাম্‌নে এসে—"এক দোনা!" 'বলে ঠক্ করে' থালার উপর একটা পয়সা ফেলে দিচ্ছেন। তপসী এক দোনা পান দিলে সবক'টা একবারে মুখে পুরে কলাপাতাটা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

বৌবাজার থেকে যারা জান্‌বাজার যাবেন, তাঁরাও একবার এই গলিটা দিয়ে সর্টকাট্ করে যাচ্ছেন।

এক এক বাড়ীর নাচ্‌দরজায় মেয়ে গুলো রূপের মুখস্ পরে বসে আছে। কাপ্তেন্ ছোঁড়াদের আড্ডা জমে গেছে সেখানে। কেউ যেতে যেতে—"কি বাবা মেয়ে মানুষ—" বলে মাড়োয়ারী রসিকতা করে যাচ্ছে। আর তা'রা তা'র পালটা জবাবে লঙ্কা খেয়ে ওদের বাপের মুখে কিছু করবার ব্যবস্থা করছে। ওরা তাতেই আমোদ পেয়ে "হি—হি" করে হেসে ছুটে পলাচ্ছে।

এই রকমে গানেতে, বাজনাতে, মাতালের বেতালা বাহাবার চীৎকারে, ফেরিওয়ালার হাঁকে খদ্দেরের ডাকে, চলতি লোকের জুতার ঘট্‌খটিতে সন্ধ্যা থেকে সারারাত গলিটা সজাগ থাকৃত।

অনেক দিন পর সেবার কলকাতায় এসে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে হাড়কাটা গলি দিয়ে "সর্টকাট" করে যাচ্ছি; দেখি তপসী বসে তার পানের দোকানে। সে চেহারা নাই, গোপ ঝুলে পড়েছে, চোখ ঝিমিয়ে এসেছে, একখানা হেঁটো ময়লা কাপড় পরে বসে আছে। দোকানের সে শ্রী নাই। দু'চারটী সোডার বোতল, দু'এক দোনা পান পড়ে আছে।

আমি বললাম—"কে তপসী! তুমি?"

সে বললে—"হাঁ বাবু!"

"এ রকম হয়েছ?"

তপসী কপালে হাত দিল।

"সে পাখীটা কই?"

তপসী 'হাউ হাউ' করে কেঁদে উঠল।

"বাবু ও দেওতা থা, ও যাকে হামারা এসা হাল হুয়া।"

তার কান্না দেখে বড় কষ্ট হল; চলে' এলাম।

বন্ধু যতীনের সঙ্গে দেখা হতে তপসীর কথা বললাম।

সে বললে—"তা জানোনা বুঝি! ভারি মজা হয়েছে। ঐ যে হাড়কাটা গলির ননী ছিল না! যাকে মিত্তিরদের বড় বাবু রেখে ছিল! কেউ জানতনা, ঐ তপসে বেটা ছিল তার পি, এন্। বোকা বাবুটাকে দুয়ে যা কিছু আদায় করত সব দিত তপসীকে। সেই টাকাতেইত ও বেটার অত ফুটানি ছিল। শেষে টের পেলে একদিন। আসা বন্ধ করে উকিলের চিঠি দিলে—"হাজার টাকা দামের আঙটি ফেলে এসেছি শীগি্‌র পাঠিয়ে দাও!" মাগীও তেম্নি ঘাগী; সে লিখলে "হাঁ আঙটি আছে, এসে নিয়ে যাবে।"

মৎলব, এলে হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে ফেলবে। বাবুটা কিছুতেই বাগ মানল না, মাগী মোকর্দ্দমায় জের-বার হয়ে গেল। শুন্‌ছি নবদ্বীপে গিয়ে ভেক্ নিয়ে আছে। একটা কাজ হয়েছে। ছোড়াটার চোক্ ফুটেছে।

বে থা করে ভাল হয়েছে; আর ওকাজে যায় না। আর ও-বেটার হালত দেখেই এলে।

শ্রীসুরজিৎ দাস গুপ্ত।

দুনিয়াদারী।

(১)

দুনিয়াতে একি মজা!
যাঁরা যত পান, খেয়ে মারা যান,
খেতে নাহি পায় 'ভজা'!
কাঙালের ছেলে বাড়ে অবহেলে,
কোথা পাবে জিবে গজা?
তথাপি এ ভবে কাঙালেরা সবে
খাটিয়া অমর হয়!
যত 'কেনারাম' পরের গোলাম
সারাটি জীবন রয়!
গেলে শিঙা ফুঁকে, ল্যাঠা যায় চুকে,
ভুলিয়া স্মরে না কেউ!
তোষামুদে তার থাকুন হাজার,
কেহ তো ধরে না ফেউ!

(২)

আচ্ছা মজার বোঝা!
ঋণ ভারে নাকি মরে প্রাণ-পাখী,
লঙ্কায় গেল সোজা!
'উড়িতে' সেথায় ভাবনা কোথায়?
এ যুগে নাই রে খোজা!
আগাছাবল্লী সকল পল্লী
ছাইয়া ফেলেছে দেখি,
কত 'মহাশয়' পূজার সময়
ঘোরে ধরাময়; একি?
টানিয়া বোতল গড়ায় ভূতল,
করিতে শীতল কায়!
কুকুর মশায় ঠ্যাঙ্ তুলে', হায়,
কাজ সেরে চলে যায়!

(৩)

ছেলেটি কেমন সোজা!
পিতামাতা তার পায়না আহার,
সে পরে গেঞ্জি মোজা!
মাথে বিট্‌কেল সুগন্ধি তেল,—
কোথা এ ভূতের ওঝা?
বিনে বার্ড্‌সাই করে আই-ঢাই,
পেট নাকি ওঠে ফেঁপে'!
দশানা ছ'আনা চুলে বাবুয়ানা,
যৌবনে গেছে ক্ষেপে'!
কিসের জন্য জোটে না অন্ন,
শুনিবে কি সেই কথা?
যাহা কিছু পায় নিশীথে উড়ায়,
পড়ে' থাকে যথা তথা!

(৪)

এ' এক নূতন সাজা!
হাতে নাহি মারে, ভাতে মেরে সারে,
কিনে খাই মদ গাঁজা!
কত সংসার হোলো ছারখার,
সুরাবিক্রেতা রাজা!
ট্যাঁক্ থেকে দিয়ে দমমেরে, পিয়ে,
খাই যবে ঢলাঢলি,
রুলের গুঁতায় থানায় নে যায়,
নেশা যায় কোথা চলি'!
দিই জরিমানা, মদে নাহি মানা,
ব্যবসা ধন্য, মানি!
দুই দিকে আয়, এটা যেন, হায়,
শঙ্খকরাত্ খানি!

(৫)

কেমন বাঙ্গালী গিন্নি!
কচি বৌদেরে শুধু ধরে তেড়ে,
নাচে ধেই ধেই ধিন্নী!
মুখে অবিরত খই ফোটে কত!
বড় পটু খেতে 'সিন্নি'!
চুল ধরে মারে, রাখে অনাহারে,
বৌরা কাঁদিয়া সারা!
বৌদের বাপ ভাবে, কাল-সাপ!
বহু দূর থাকে তারা!
ছোবলের ভীতি প্রাণে জাগে নিতি,
যায় না মেয়ের বাড়ী!
বাঙ্গালীর দেশে সদা কেঁদে শেষে
মরে' বাঁচে কুল-নারী!

(৬)

ধন্য পল্লী গ্রাম!
ঝগ্‌ড়া ও ঝাঁটি আছে ফাটাফাটি,
ঈর্ষা অবিশ্রাম!
কারো দেখি' ভালো মুখ করে কালো,
শত্রুতা নিষ্কাম!
কারে কে দাবায়ে রাখিবে দু-পায়ে
নিয়ত চিন্তা এই!
কূপমণ্ডুক! অতি ছোট বুক!
মিলে' কাজ করা নেই!
গুণীর কদর বুঝিয়া আদর
হেথা নাহি করে কেহ!

মিথ্যার পথে চলে কত মতে,
বিকায় বিবেক দেহ!
কত কথা কব? চুপ করে যাই!
আমিও নব্যকালের!
সব কথা যদি খুলে বলি পুনঃ
ব্যথা হবে সারা গালের!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য সংবাদ।

গত ১৫ই ভাদ্র সোমবার মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনীর দ্বাদশ শুক্লাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

১৭ই ভাদ্র বুধবার পূর্ণিমা তিথিতে গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক পঞ্চম সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি এল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐ তারিখে নেত্রকোণা সাহিত্য পরিষদের ৩৫শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল।

২৯শে ভাদ্র সোমবার জামালপুর মহকুমা মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে জামালপুর রিডিং ক্লাবের গৃহে জামালপুর সাহিত্য সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রবন্ধাদি পঠিত হয়।

৩১শে ভাদ্র বুধবার ধলা হাই স্কুল গৃহে ধলা সাহিত্য সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ ভিষক-শাস্ত্রী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

গত ২২শে ভাদ্র সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের উদ্যোগে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হলে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এম, এ, বি এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় রায় বাহাদুর শশধর ঘোষ, রায় সাহেব উমেশচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি-এল, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এল, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল, প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সহরে ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মেলন” নামে একটী স্থায়ী সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর এই সহরের সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যিকদিগকে লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

মহারাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর সভাপতি ও রায় বাহাদুর সারদাচরণ ঘোষ ও রায় বাহাদুর শশধর ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সাহিত্য সম্মেলনের নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটী ক্ষুদ্র কমিটী গঠিত হইয়াছে। আমরা এই সভার স্থায়ীত্ব কামনা করি।

টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদ কবিতা রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। পুরস্কারের প্রতিযোগীতার নিয়ম—টাঙ্গাইল মহকুমা নিবাসী লেখক লেখিকা যে কেহ কবিতা লিখিতে পারিবেন। কবিতা ৫০ লাইনের বেশী না হয়। প্রতিযোগীতায় যার কবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তিনি ও দ্বিতীয় ব্যক্তি পুরস্কার পাইবেন। কবিতা ১লা কার্ত্তিক মধ্যে সংসদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তত্ত্বনিধি মহাশয় নিকট পাঠাইতে হইবে। পুরস্কার বিতরণের তারিখ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরীর "ইঙ্গিত" বাহির হইয়াছে। কাগজ, ছাপা, মলাট উৎকৃষ্ট। মূল্য আট আনা মাত্র।

মহিলা কবি শ্রীমতী বিভাবতী দেবী চৌধুরাণীর কবিতা পুস্তক "খোঁজে" বাহির হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র;

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত শিকার ও শিকারী প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

এ জেলার সদর হইতে তিন খানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে। কিশোরগঞ্জ ব্যতীত অপর তিন মহকুমায়ও তিন খানা সংবাদ পত্র আছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, কিশোরগঞ্জ হইতেও "কিশোরগঞ্জ বার্ত্তাবহ" নামে একখানা সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে। ২৬শে ভাদ্র এই পত্রের জন্ম দিন। ইহাই কিশোরগঞ্জের প্রথম সংবাদপত্র। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বার্ত্তাবহের সম্পাদক হইয়াছেন। আমরা এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

স্থানীয় শান্তি লাইব্রেরীর তরুণ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গত পূজার পূর্ব্বে বার্ষিক "তপন" প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে তাহা মাসিক রূপে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বি, এল ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার তপনের সম্পাদক।

আগমনী।

প্রভাতে শিউলী ফুলে ঝরে কার হাসি,
নদীতটে কাস গুচ্ছ শুভে অতুলন।
জোছনা উছলি উঠে লয়ে রূপরাশি,
নিশিথে ভুলাতে কেন আজিকে ভুবন ?

প্রস্ফুট কুসুম চুমি ধীরে সমীরণ,
বহিয়া আনিছে ভবে নন্দন বারতা।
কার তরে দিকে দিকে হেন আয়োজন,
কেন বা আনন্দ ধারা আনে ব্যাকুলতা ?

মুছাতে নয়ন নীর বরষের পরে,
'জননী' আসিছে বুঝি বাঙ্গালীর ঘরে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

Shourabh—Reg. No.C 745.

ত্রয়োদশ বর্ষ। কার্ত্তিক—১৩৩২ দশম সংখ্যা।

সৌরভ

সম্পাদক
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী

বার্ষিক মূল্য— ময়মনসিংহ। —দুই টাকা।

ময়মনসিংহ—সৌরভ প্রেসে—প্রিণ্টার শ্রীরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সৌরভ

ত্রয়োদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩৩২ | দশম সংখ্যা।

রোগ ও আরোগ্য।

জানি না কবে কোন শুভ মুহূর্ত্তে, ব্যাধি পীড়িত-মানব-দুঃখ-কাতর, তপ প্রভাবে হুয়মান অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, পুণ্যকর্ম্মা ব্রহ্মজ্ঞাননিধি মহর্ষিগণ, পবিত্র হিমগিরি পার্শ্বে সমবেত হইয়া দীর্ঘজীবন অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা সুখোপবিষ্ট হইয়া এই পবিত্র ...র আলোচনা করিতেছিলেন যে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের আরোগ্যই মূল। তাহার বিঘ্নভূত রোগ শান্তির ...য় কি? তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ সুরলোকে গমন করিয়া ... প্রবর্ত্তিত পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ ইন্দ্র সকাশে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ...তবিষ্ণ মহামতি ভরদ্বাজ ধরাতলে প্রত্যাগত হইয়া যে দিন অগ্নিবেশাদি ষট্‌শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিতেছিলেন তখন তাঁহার সেই পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া স্বর্গস্থ দেবর্ষি ...মরবৃন্দ ও মহর্ষিগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সহর্ষ স্নিগ্ধ-গম্ভীর সাধুবাদ আকাশে উত্থিত হইয়া ত্রিলোক ছাইয়া ফেলিল।

> "শিবো বায়ু র্ববৌ সর্ব্বা ভাভিরুন্মিলিতা দিশঃ।
> নিপেতুঃ সজলাশ্চৈব দিব্যাঃ কুসুম বৃষ্টয়ঃ॥"

সুগন্ধ সমীরণ বহিতে লাগিল। দিক্ সকল আলোকিত হইল, স্বর্গ হইতে সজল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই দেবানুমোদিত ঋষিপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও আরোগ্য কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

রোগ কাহাকে বলে? চরক বলেন—

> "বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।"

বাগ্‌ভট্ বলেন—

> "রোগস্তু ধাতুবৈষম্যং ধাতুসাম্যমরোগতা"

ধাতুর বৈষম্যই রোগ ধাতুর সমতাই আরোগ্য। ধাতু কি?

> "রসাসৃঙ্মাংস মেদোহস্থি মজ্জ শুক্রানি ধাতবঃ।"

রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতু।

> "এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্নৃণাম্॥"

ইহারা দেহে থাকিয়া দেহ ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে। অর্থাৎ স্থূলতঃ এই সপ্তধাতু দ্বারাই দেহ নির্ম্মিত। এই সপ্তধাতুর বৈষম্য অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলেই রোগ হয়।

আরোগ্য কি? "ধাতু সাম্যমরোগতা।"

এই সপ্তধাতুর মধ্যে যাহা হ্রাস হইয়াছে তাহাকে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া এবং যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাকে হ্রাস করিয়া দেওয়াই আরোগ্য।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ডাঃ শুস্‌লারের মতেও মানব দেহ সাতটি উপাদানে নির্ম্মিত। "লাইম", "আয়রণ" "পটাস", "ম্যাগনেসিয়া", "সোডিয়াম্", "সিলিকা" এবং "টেথেলিন্।"

প্রত্যেক কোষ (টিস্যু) সমূহের মধ্যে এই পার্থিব পদার্থ নিয়মিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেই শরীর সুস্থ, জীবিত ও কার্য্যকরী থাকে। তাহাদের অভাব হইলেই বিকৃতি হয়। এই বিকৃতিই পীড়া। এই পীড়ার চিকিৎসার্থে উক্ত পার্থিব পদার্থ সকল ব্যবহৃত হয়। যখন ঐ পার্থিব পদার্থ সকল শরীরের কোষ সমূহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া যায়, তখনই তাহারা কোষ সমূহের অভাব মোচন করিয়া পীড়া আরোগ্য করে।

এককথায় যে বস্তুর অভাব হইয়াছে ঠিক সেই বস্তুর দ্বারা অভাব পুরণ করাই চিকিৎসার নিদান। যেমন শরীরে জলীয় পদার্থের অভাব হইয়া যখন তৃষ্ণায় পীড়া দেয়, তখন জল প্রয়োগ দ্বারা সে যাতনা দুর হয়। সেইরূপ জীবদেহে যে পার্থিব পদার্থের অভাব বশতঃ পীড়া হইয়াছে ঠিক সেই পার্থিব পদার্থের প্রয়োগ দ্বারা অভাব মোচন করিলেই সেই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে! ইহাই চিকিৎসার স্বাভাবিক নিয়ম।

এই আরোগ্য এই ধাতুসাম্য হইবে কি উপায়ে? আয়ুর্ব্বেদ বলেন ;—

"হেতু-ব্যাধি বিপর্যাস্ত বিপর্য্যস্তার্থ কারিণাম্।
ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্॥"

হেতু বিপরীত, ব্যাধি বিপরীত, হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত। হেতু সমান, ব্যাধি সমান, হেতু ব্যাধি উভয় সমান এই ছয় প্রকারে আরোগ্য সাধিত হইয়া থাকে।

হেতু অর্থাৎ কারণ বিপরীত। যে কারণে রোগ হইয়াছে তাহার বিপরীত চিকিৎসা। যেমন শৈত্য সেবন জনিত রোগে, উষ্ণগুণ বিশিষ্ট শুণ্ঠি আদি দ্রব্য প্রয়োগ।

ব্যাধি বিপরীত চিকিৎসা ;—যেমন অতিসার রোগে ধারক গুণ বিশিষ্ট অহিফেন প্রয়োগ

হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত ঔষধ—যেমন বাতজনিত শোথে, বাত নাশক ও শোথ নাশক—দশমূলাদি পাচন প্রয়োগ। এই হইল তিন প্রকার বিপরীত চিকিৎসা ;

এক্ষণে সমান চিকিৎসার বিষয় বিবৃত হইতেছে। হেতুর অর্থাৎ কারণের সমান—যেমন প্রদাহিত স্ফোটকাদি প্রশমন জন্য প্রদাহ জনক উষ্ণ প্রলেপ।

ব্যাধির সমান চিকিৎসা ; যথা—বমন রোগে বমনকারক মদন ফল প্রয়োগ দ্বারা বমন নিবারণ করা।

হেতুব্যাধি উভয়ের সমান চিকিৎসা ; যথা :—মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগে—মদ্যপান।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে চিকিৎসা স্থুলতঃ দুই প্রকার। বিপরীত এবং সমান। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এবং পাশ্চাত্য দেশের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রধানতঃ বিপরীত চিকিৎসা।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের এই সমান চিকিৎসার আবিষ্কর্ত্তা হ্যানিম্যান যে জন্য আজ জগৎপূজ্য অনেকে জানেন না তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহামতি ভরদ্বাজ এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। "মদনং বাময়তি বমনং নিবারয়তিচ" মদন ফল বমন করায়, বমন নিবারণও করায়।"

কিন্তু হ্যানিমানের মত একদেশদর্শী। তিনি বলেন সম চিকিৎসাই এক মাত্র আরোগ্যকর। বিপরীত চিকিৎসায় লোক আরোগ্য হয় না। ঔষধের ক্রিয়া প্রভাবে রোগ চাপা থাকে মাত্র। যেমন অতিসারে ধারক অহিফেন প্রয়োগ করিলে অহিফেনের সঙ্কোচন ক্রিয়া প্রভাবে মল স্তম্ভিত হয়, মূলরোগ আরোগ্য হয় না। অহিফেনের ক্রিয়া শেষ হইলে পুনরায় রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। এই জন্য রোগ-বিপরীত চিকিৎসা করিতে হইলে রোগ লক্ষণ দুর হইবার পরেও দীর্ঘকাল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ঔষধের ক্রিয়াকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হয়। ঔষধের ক্রিয়া দীর্ঘকাল রোগ প্রকাশ হইতে দেয় না। কিন্তু উহা স্থানান্তরে অন্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। যেমন অনেক সময় শিশুদিগের প্রবাহিকা অর্থাৎ "আমাশা" আরোগ্যের পর সর্দ্দিকাসি হইতে দেখা যায়। আপাত দৃষ্টিতে সর্দ্দি ও আমাশা স্বতন্ত্র পীড়া হইলেও বস্তুত উহা একই ; স্থান ভেদে নাম ভেদ মাত্র। আমাশা অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ ; সর্দ্দি শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ। দুইই—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ—"মিউকাস্ মেম্ব্রেণের ইনফ্লামেশন্। যেমন একই জল সঞ্চয় উদরে হইলে উদরী, অণ্ডকোষে হইলে কোষবৃদ্ধি (হাইড্রোসিল্) ফুস্‌ফুস্ আবরক পর্দ্দায় হইলে ফুস্‌ফুস্‌বেষ্ট প্রদাহ (প্লুরিসি) হৃদ্‌পিণ্ডের আবরক পর্দ্দায় হইলে হৃদাবরক প্রদাহ (পেরিকার্ডাইটিস্) মস্তিস্কাবরক পর্দ্দায় হইলে শীর্ষাম্বু (হাইড্রোকেফেলাস্) বলে।

সেই জন্য অনেক স্থলে এক স্থানের রোগ বিপরীত চিকিৎসার তাড়া পাইয়া অন্য স্থান আক্রমণ করে। বিচর্ব্বিকা (একজিমা) নামক চর্ম্মরোগ বাহ্য ঔষধ প্রয়োগে লুপ্ত হইয়া অন্ত্রে গিয়া আমাশা উৎপাদন করে বা স্বরযন্ত্র আক্রমণ করিয়া স্বরযন্ত্রের প্রদাহ (লেরিঞ্জাইটিস্) রোগ জন্মায়। বা ফুস্‌ফুস্ আক্রমণ করিয়া কাস রোগ জন্মায়।

ডাঃ ন্যাসের "লিভার অফ্ হোমিওপ্যাথিক্ থিরাপিউটিক্স্" গ্রন্থে দেখিতে পাই—একটী শিশুর মস্তকে "একজিমা" নামক চর্ম্মরোগ হইয়াছিল। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রয়োগ করায় উহা লুপ্ত হইয়া গেল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক উদরাময় দেখা দিল। চিকিৎসক মহাশয় বলিতে লাগিলেন উহা অন্ত্রের যক্ষ্মাবিশেষ; আরোগ্য হওয়া দুষ্কর। তথন ডাক্তার ন্যাস্‌কে ডাকা হইল। তিনি তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। শিশু আরোগ্য হইল, কিন্তু তাহার লুপ্ত চর্ম্মরোগ পুনরায় দেখা দিল।

বিপরীত চিকিৎসায় যে আরোগ্য না পাইয়া রোগান্তর উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহার প্রমাণ আমরা অহঃরহ পাইতেছি। যেমন অতিরিক্ত তিক্তরস সেবনে জ্বর আরোগ্যের পর কর্ণনাদ (কাণ ভোঁ ভোঁ করা) বাধির্য্য, অক্ষুধা, কোষ্ঠ কাঠিন্য শির:পীড়া প্রভৃতি জন্মে। পাঁচটী রোগ সৃষ্টি করিয়া একটী রোগ দূর করা প্রকৃত আরোগ্য নহে। তাঁহার মতে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত রোগ হইয়াছে যে ঔষধ সুস্থ শরীরে সেবন করিলে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত রোগ জন্মে তাহাই স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ঐ রোগ আরোগ্য হইবে। যেমন শঙ্খবিষ (শেঁকো আর্সেণিক) সুস্থ শরীরে সেবন করিলে জলবৎ ভেদ, বমন, উদরে বেদনা, পিপাসা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। কোন রোগ যদি ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে অল্প মাত্রায় শঙ্খবিষ সেবন করিলে আরোগ্য হইবে। তিনি উহার যুক্তি প্রদর্শন করেন—দুইটী দ্রব্য একই সময় একই স্থানে থাকিতে পারে না। হয় পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্যটীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে নতুবা ঐ দ্রব্যটীর উপরেই রাখিতে হইবে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বোঝা যাক। সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখস্থ টেবিলের উপরিস্থিত এই দীপাধারটি টেবিলের ঠিক যে স্থান টুকু অধিকার করিয়া আছে, সেই স্থানে যদি কোন দ্রব্য রাখিতে হয় তাহা হইলে দীপধারাটি স্থানান্তরিত না করিলে কখনই রাখিতে পারা যাইবে না।

সেইরূপ কোন রোগ দেহের যে কেন্দ্রটি অধিকার করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, ঠিক সেই কেন্দ্রটি অধিকার করিয়া ঐরূপ একটি রোগের সৃষ্টি করিতে পারে সেই প্রকার ঔষধ যদি প্রয়োগ করা যায় তবে ঔষধ প্রয়োগ জনিত রোগ পূর্ব্ববর্ত্তী রোগকে দূরীভূত করিয়া ঐ কেন্দ্র অধিকার করিয়া বসিবে। এই ঔষধ প্রয়োগজনিত রোগ কৃত্রিম ক্ষণস্থায়ী। পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ না করিলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহার ক্রিয়া শেষ হইয়া যাইবে। আর প্রকৃত রোগত পূর্ব্বেই দূরীভূত হইয়াছে।

এইরূপ রোগান্তর সৃষ্টি না করিয়া, শরীরের কোন উপাদানের হানি না করিয়া অনায়াসে যে আরোগ্য সাধিত হয় তাহাই প্রকৃত আরোগ্য। ইহাই মহাত্মা হানিমানের "সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার্।" আমাদের "সমঃ সমং শময়তি," "সদৃশং সদৃশেন শম্যতি" বা "বিষস্য বিষমৌষধম" বা তন্ত্রের—

"যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্ব জন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষক্‌নাশয়তে রুজম্॥"

যে মত প্রচার করিয়া হানিমান জগতের মহা কল্যাণ সাধন করিলেন, যাঁহার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা আজি লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ রক্ষা করিতেছে সেই হানিমানকে এ জন্য দারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার দেশবাসী তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু আমেরিকা তাঁহার প্রবর্ত্তিত নব আলোক সাদরে বরণ করিয়া লইল। ইহাত জগতে নূতন নহে—

"গুণিণি গুণজ্ঞরমতে না গুণশীলস্য কাচিৎ।
অলিরেতি কমলং বনাৎ নহি ভেকস্তদেকবাসোঽপি॥

গুণবানই গুণির মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পারেন, নির্গুণ কখন পারে না। অলি বন হইতে কমলের সন্ধানে যায়, ভেক নিকটে থাকিয়াও তাহাকে চিনিতে পারে না।

প্রসঙ্গ ক্রমে দূরান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব। যাহা বলিতেছিলাম—হানিমানের মত একদেশদর্শী। ভারত চিরদিনই সর্ব্ব বিষয়ে সার্ব্বজনীন। তাই ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান কেবল মাত্র সমচিকিৎসায়ই পর্য্যবসিত হয় নাই। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম ও বিষম্য ভেদে ছয় প্রকার চিকিৎসার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে সমই হউক আর বিষমই হোক চিকিৎসা

করিব কিরূপে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ধাতুর হ্রাস বৃদ্ধিই রোগ। এই হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিরূপে? ত্রিদোষের দ্বারা। ত্রিদোষ কি? বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ। ইহাদিগকে ত্রিদোষ বলে এই জন্য—

"ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দুষ্যন্তেভির্যতস্ততঃ।
বাতপিত্তকফা এতে ত্রয়ো দোষা এতে স্মৃতা॥"

ইহারা ধাতু সকলকে দুষিত করে বলিয়াই ইহাদিগকে ত্রিদোষ বলে। অথচ এই বায়ু পিত্ত কফই সমস্ত ধাতুকে পোষণ করে। এই ত্রিদোষ বায়ু পিত্ত কফ লইয়াই আয়ুর্ব্বেদের যাবতীয় তত্ত্ব। তাহার বিশদ ব্যাখ্য করিবার সময় এখন নয়। বারান্তরে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল। এক কথায় বলিতে হইলে শরীরস্থ জলীয় ভাগকে (লিকুইড্ সাবষ্টেন্স্) কফ, প্রাণী দেহের উত্তাপকে (এনিমেল্ হিট্) পিত্ত এবং এই সমস্তকে চালিত করাইয়া শারীরিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করায় এমন যে শক্তি বিশেষ তাহাকে বায়ু বলা হইয়াছে। ইহা ঠিক "নার্ভ" নহে। নার্ভ বা স্নায়ুকে অবলম্বন করিয়া যাহা আছে তাহাই বায়ু। যেমন বিদ্যুতবাহী তার বিদ্যুত নহে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যুত পরিচালিত হয়, সেইরূপ নার্ভ বা স্নায়ু বায়ু নহে। স্নায়ুকে অবলম্বন করিয়াই বায়ু প্রতিষ্ঠিত। এই বায়ুই প্রাণীদেহের স্থান ভেদে উদান প্রাণ সমান অপান ও ব্যান নামে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া আছে। জগতও এইরূপ জল অগ্নি ও বায়ু দ্বারা পরিচালিত।

যদিও বায়ু পিত্ত কফ যাবতীয় রোগ ও আরোগ্যের কারণ তথাপি বায়ুই সমস্তের কর্ত্তা। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

পুরুষো স্রোতোময়ঃ। যাবন্ত পুরুষে মূর্ত্তিমন্ত ভাব বিশেষাস্তাবন্ত এবস্মিন্ স্রোতসাং প্রকারঃ বিশেষাঃ। সর্ব্বে ভাবাহি পুরুষে নান্তরেণ স্রোতাংস্বভিনির্ব্বর্ত্তন্তেক্ষেয়ং বা ন গচ্ছন্তি।" (চরকসংহিতা, বিমানস্থান ৫ম অঃ)

শরীরের মধ্যে শিরা কোষ্ঠ মজ্জা মাংস প্রভৃতি যাহা স্থূল পদার্থ আছে তাহা সমস্তই স্রোতের প্রকার ভেদ মাত্র। আবার শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থ—ইহা না হইলে উৎপন্ন বা ক্ষয় হয় না। রস-রক্তাদি ধাতু সমস্তকে স্রোতই বহন করিয়া থাকে। এই স্রোত অসংখ্য। মহাস্রোত (মুখ হইতে গুহ্য দ্বার পর্য্যন্ত যে প্রণালী, অর্থাৎ মুখ, গলনলী, আমাশয় (ষ্টমাক্) পক্কাশয় (ডিওডিনাম্) ক্ষুদ্রান্ত্র ("ইন্‌টষ্টাইন্") বৃহদন্ত্র ইহাই মহাস্রোত (এলিমেণ্টারি-কেনাল) শিরা ধমনি এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত স্রোতোময়। এক কথায় বলিতে গেলে শরীরস্থ প্রত্যেক তন্তু ("টিস্যু") স্রোত মাত্র। যেমন একটী লেবু কোষ সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ শরীর স্রোতসমষ্টি মাত্র।

"স্রোতাংসি শিরা ধমন্যা রসবাহিন্যো নাড্যঃ পন্থানা মার্গাঃ শরীর ছিদ্রানি সংবাতাসংবৃতানি স্থানানি আশয়াঃ আলয়া নিকেতনাশ্চেতি শরীর ধাত্বাবকাশানাং লক্ষালক্ষাণাং নামানি।"

অর্থাৎ শরীরের দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত আকাশই স্রোত। সেই স্রোতই শিরা ধমনী নাড়ী পথ শরীরস্থ ছিদ্র সমূহ আমাশয় পক্কাশয় মূত্রাশয় রক্তাশয় (হার্ট) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে।

বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত পিত্ত বা শ্লেষ্মা এই সমস্ত স্রোতের ভিতর দিয়া বিচরণ করিতে করিতে যে স্থানে দুষিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তথায় রোগ জন্মায়। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মাই সমস্ত রোগের হেতু। স্থান ভেদে রোগের নাম ভেদ হইয়াছে মাত্র। কথিত আছে—

"পিত্ত পঙ্গু কফ পঙ্গু পঙ্গবঃ সর্ব্ব ধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নিয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ॥"

পিত্ত ও কফ অচল। বায়ু তাহাদিগকে যে যে স্থানে চালিত করে তাহারা সেই সেই স্থানে গিয়া ধাতুদিগকে দুষিত করিয়া রোগ জন্মায়। যেমন অচল মেঘ বায়ুদ্বারা যে যে স্থানে নীত হয় সেই সেই স্থানে বারি বর্ষণ করে।

এক্ষণে—এই ত্রিদোষ দুষিত হয় কিরূপে?

প্রাণী শরীরে একটী শক্তি আছে। তাহাকে প্রকৃতি কহে;

"জীব দেহেষু সর্ব্বেষু শক্তি প্রকৃতি রক্ষিণী।
অনির্বাচ্যাদ্ভুতা নিত্যাবীজং সংসার শাখিনঃ॥"

তাহার কার্য্য হইতেছে—

"জীবয়ন্ত্যানিশং জীবান্ বর্ত্ততে সংহরন্তপি।"

জীব দেহকে সর্ব্বদা জীবিত রাখে। তাহার অভাবেই জীবদেহের বিনাশ হয়।

সাত্ম গ্রহণসাত্ম্যাপ সারণেনৈব সা দ্বিধা।"

সাত্ম গ্রহণ এবং অসাত্ম অপসরণ করিয়া সেই একই শক্তি দুই প্রকারে কার্য্য করিতেছে।

সাত্ম কি ?

যদ্ দেহস্য শুভায় স্যাল্লিপ্সা যস্য চ জায়তে।

যস্যালাভে ভবেদ্ দুঃখং তৎ সাত্ম্যং তস্য কথ্যতে॥"

যাহা দেহের পক্ষে শুভকরী, যাহা দেহ চায়, যাহার অভাবে দেহ রক্ষা হয় না, তাহাই সাত্ম্য।

আর

যদ্ দেহস্যাশুভং কুর্য্যাদ্ যস্মিন্ দ্বেষশ্চ জায়তে।

দুঃখ শ্চোপস্থিতৌ যস্য তস্যাসাত্ম্যং তদুচ্যতে॥"

যাহা দেহের পক্ষে অশুভকারী, যাহা দেহ চায়না, যাহা দুঃখজনক তাহাই অসাত্ম্য

সাত্ম্য গ্রাহিণী শক্তির কার্য্য হইতেছে—

"বুভুক্ষা চ পিপাসা চ জায়তে হ্যত এব হি।"

এই সাত্মগ্রহণী শক্তি দৈহিক উপাদানের অভাব হইলে ক্ষুধা ও পিপাসা উৎপাদন করাইয়া উত্তাপের প্রয়োজন হইলে শীতের, শৈত্যের প্রয়োজন হইলে দাহ দ্বারা শীতলতায় প্রবৃত্তি জন্মাইয়া ঐ সমস্ত গ্রহণ করায়।

আর অসাত্ম্য বর্জ্জিনী শক্তি—

স্বেদমূত্র পুরীষাণি দেহাদপসরন্তি চ।

অতিভুক্তে বিষেপীতে ছর্দ্দিশ্চাশু প্রজায়তে।

শ্বাস মার্গ গতং ভোজ্যং বহির্যাত্যনয়ৈব হি।"

ঘর্ম্ম মূত্র মল প্রভৃতি দেহাভ্যন্তর জাত শরীরের অপকারী পদার্থ বাহির করিয়া দেয় এবং অতি ভোজন করিলে বা কোন বিষাক্ত পদার্থ শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এই শক্তি বলে বমনাদি দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। ভোজন কালে শ্বাস নলী পথে খাদ্য পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়া বিষম লাগিলে এই শক্তি বলেই কাসি হইয়া তাহা বহির্গত করাইয়া দেয়। চক্ষে কিছু পড়িলে অশ্রু আসিয়া তাহা ধুইয়া দিবার চেষ্টা করে। এই রূপে অসাত্ম্য বর্জ্জিনী শক্তি শরীরের অভ্যন্তর জাত অনিষ্ট কর পদার্থকে বহিস্কৃত করিয়া দেয় এবং বাহিরের অপকারী দ্রব্যকে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়।

এই দুই বিভিন্নমুখী প্রকৃতি শক্তি দ্বারা জীবের জীবন প্রবাহ চলিতেছে। এই মহাশক্তির অভাবে চেতনার ধ্বংস হয়। বৃক্ষের একটি শাখা কাটিয়া ফেলিলে উত্তাপে শুষ্ক হয়, জলে পচিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে যখন জীবনী শক্তি ছিল সেই রৌদ্র, সেই বৃষ্টি তাহার কিছুই করিতে পারে নাই। এই জীবনী শক্তিই তাহাকে সর্ব্বপ্রকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

যখন এই প্রকৃতি-শক্তির অংশদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি শক্তি দুর্ব্বল হয় তখন তাহারা সাত্ম্য গ্রহণ করিতে বা অসাত্ম্য বর্জ্জন করিতে পারে না। তখনই বাত, পিত্ত, কফ দূষিত হইয়া শরীরস্থ ধাতুর বৈষম্য উৎপাদন করে। এই বৈষম্যের ফলে শরীরস্থ উপাদানের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়।

রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ যেমন ঐ শক্তি, রোগ আরোগ্যের হেতুও তেমনি ঐ শক্তি। ঔষধ মুখ্যতঃ জীবদেহে ক্রিয়া করিতে পারে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি জলের আর্দ্রকরি শক্তি, যেমন তাহাদের নিজস্ব ঔষধের ক্রিয়া শক্তি সেরূপ তাহার নিজের নহে। জীবিত, ও মৃত উভয় দেহকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে, জল আর্দ্র করিতে পারে, কিন্তু ঔষধ কেবল মাত্র জীবিত দেহেই ক্রিয়া করিতে পারে, মৃত দেহে পারে না। প্রদাহ উৎপাদক ঔষধের প্রলেপে জীবিত দেহে ফোস্কা হয়, মৃত দেহে হয় না। প্রদাহক ঔষধের ফোস্কাকারক শক্তি যদি তাহার নিজস্ব হইত তবে সে মৃতদেহেও প্রদাহ জন্মাইতে সমর্থ হইত। ঔষধ এমন কিছুর সাহায্যের অপেক্ষা করে—যাহা জীবিত দেহে আছে; মৃত দেহে নাই। তাহা ঐ জীবরক্ষিণী প্রকৃতি শক্তি। ঔষধ ঐ শক্তির সহিত সম্মিলিত হইলেই কার্য্যকরি হয়।

"ঔষধেন বিনাব্যাধি অনেনৈব প্রসাম্যতি।"

কখন কখন বিনা ঔষধে যে ব্যাধি আরোগ্য হইতে দেখা যায় তাহা ঐ শক্তির বলে।

তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইল, জীবদেহরক্ষিণী প্রকৃতি শক্তি দুর্ব্বল হইলেই রোগ হয়। আর তাহা সবল করিয়া দিতে পারিলেই আরোগ্য হয়। ইহাই স্থূলতঃ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা তত্ত্ব।

এই জীবনী শক্তিকে উদ্দীপিত করা ইহা অল্প হইলে

যেমন আরোগ্য হয় না, বেশী হইলেও অনিষ্ট করে।

"সর্ব্বাণ্যেবৌষধানি ব্যাধ্যগ্নিপুরুষ বলান্যভিসমিক্ষ্য বিদধ্যাৎ।"

সর্ব্বপ্রকার ঔষধই ব্যাধি, অগ্নি ও পুরুষের বল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তত্র ব্যাধিবলাদধিকমৌষধমুপযুক্তং তমুপশম্যব্যাধিং ব্যাধিমন্যমাবহতি।

ব্যাধি বলের অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করিলে, সেই ঔষধ সে ব্যাধিকে নষ্ট করিয়া অন্য ব্যাধি উৎপন্ন করে।

"অগ্নিবলাদধিকং অজীর্ণং বিষ্টভ্য বা পচ্যতে।"

অগ্নিবলের অধিক ঔষধ সেবন করিলে অজীর্ণ হয়, অথচ অগ্নিকে বিষ্টব্ধ করিয়া পাক প্রাপ্ত হয়।

"পুরুষবলাদধিকং গ্লানি মূর্চ্ছামদানামাবহতি।"

"পুরুষ বলের অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করিলে গ্লানি মূর্চ্ছা ও মত্ততা উৎপাদন করে।

"হীনমেভ্যোদত্তমকিঞ্চিৎ করং ভবতি। তস্মাৎ সমমেব বিদধ্যাৎ।"

ঔষধের মাত্রাহীন হইলেও অকিঞ্চিৎকর হয়। অতএব সমমাত্রায়ই প্রয়োগ করিতে হয়।

(সুশ্রুত ৪০ অঃ)

চরক বলেন—

"কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধিনাং ত্রিবিধো হেতু সংগ্রহঃ॥"

মিথ্যাযোগ, অতিযোগ, ও অযোগ এই তিনটিই ব্যাধির কারণ। ঔষধের অতিযোগাদি দ্বারা যদি জীবনী শক্তিকে অতি মাত্রায় উদ্দ্‌ক্ত করা যায়, তাহা হইলে রোগ আরোগ্য হইয়াও ঔষধের অতিযোগ হেতু অন্য ব্যাধি সৃষ্টি করে।

চরক বলেন—

"যাত্ত্বদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া, নতু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ॥"

যে চিকিৎসা উদগত রোগ প্রশমিত করে অথচ অন্য রোগ উৎপন্ন করে না তাহাকেই প্রকৃত চিকিৎসা কহে।

বাগ্‌ভট বলেন—

"প্রয়োগ সময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ।
নাসৌ বিশুদ্ধ, শুদ্ধস্ত সময়েদ্‌ যোন কোপয়েৎ॥"

যে চিকিৎসা উপস্থিত ব্যাধি নিবারণ করে অথচ অন্যান্য ব্যাধি উৎপাদন করে তাহা বিশুদ্ধ চিকিৎসা নহে। যে চিকিৎসা ব্যাধির শান্তি করে অথচ অন্য দোষের প্রকোপ জন্মায় না তাহাই প্রকৃত চিকিৎসা।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

অতিথি-বরণ।

(১)

শাওন-বাদল দিনে,
অতিথি আমার হৃদয়ে এল যে কেমনে পথটি চিনে?
বসি বাতায়নে,
ছিনু কি যে ধ্যানে,
উদাস আঁখিতে চেয়ে পথ পানে,
হেনকালে মোর অচিন অতিথি এল যে সমুখে ধেয়ে,
কুতূহল-বশে রহি অনিমেষে তাহারি মু'খানি চেয়ে!

(২)

নবীন অতিথি বয়সে তরুণ
নয়ন যুগল বেদনা করুণ
দীপ্তকান্তি কনক-অরুণ,
বিষাদ-বরুণে ছেয়ে
করুণা মাগিল করুণ তরুণ দারুণ কাহিনী গেয়ে।

(৩)

এ তিন ভুবনে নাহি কেহ তার,
দেশে দেশে ভ্রমে বহি শোকভার,
মরম-মরমী খোঁজে অনিবার
না চাহে কামিনী, রত্ন;
অমৃত সরস আমারি পরশ লভিতে করিছে যত্ন!

(৪)

আমি কি মরমী?—মরম-যাতনা
জুড়াইতে পারি তৃষিত কামনা?
তবু বলে সে যে আছে আনমনা
আমারি ধেয়ান ধরি!
আমি যে উপোসী অমৃত-রূপসী অগরবী বয়ে বরি!

(৫)

অতিথি বলিল হে চিরন্তপসি,
তুমি হ'সে মম মানসী প্রেয়সী
নাহি ডরি আমি রহিতে উপেষী—
তোমাতে ডুবিয়া র'ব;
মক্ষিকারি মত তোমারি অমৃতে মরিয়া অমৃত হ'ব!

(৬)

থাকো তবে থাকো তরুণ অতিথি!
মম সহবাসে অফুরাণ্ তিথি,
তুমি হবে মম রথের সারথি,
ভ্রমিব ভুবন-ত্রয়,
এই বলি তারে প্রেমফুল হারে করেছি হৃদয়ময়।

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

রামায়ণের দেবতা।

রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় মাত্র তেত্রিশটী দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা—দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ও অশ্বীদ্বয় (অশ্বিনীকুমার)—এই তেত্রিশ দেবতা। ইহার পর ক্রমে পৌরাণিক যুগের দেবতাগণের নামও রামায়ণে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে রামায়ণের ছয় কাণ্ডে—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, সোম, যম, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বরুণ, বায়ু, কুবের, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, হর, কাম, জয়ন্ত, উপেন্দ্র, অনন্ত নাগ, দেব-বৈদ্য ধন্বন্তরী, দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ ও মরুতগণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ, ধাতা, বিধাতা, ধর্ম্ম, কাল,সাধ্য, বিশ্বদেব, বিরাট, অর্য্যমা পুষা, কৃষ্ণ প্রভৃতির উল্লেখও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঁহাদের অনেকেই বৈদিক কিম্বা রামায়ণের সমাজের দেবতা নহেন। আমাদের এই উক্তির সমীচীনতা নির্দ্দেশ পক্ষে দেব-তত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা দরকার। আমরা এস্থলে তাহাই করিতে চেষ্টা করিলাম।

ঈশ্বর জ্ঞান মানুষের জন্ম গ্রহণ করিয়াই হয় না। মানুষের যেমন শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি কাল আছে; এবং সেই সেই কালেও সংসর্গ এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত কালোচিত বুদ্ধি-বৃত্তি বিকসিত হয় না, মানব সমাজের ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধীয় ইতিহাসও সেইরূপ। মানুব চক্ষু মেলিয়া সর্ব্বপ্রথম যে জিনিসটার দ্যুতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল এবং যাহার কার্য্যের ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাকেই সে দ্যুতিমান বলিয়া অর্থাৎ "দেবতা" বলিয়া নত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিল। 'দেব' শব্দের অর্থ দ্যুতি, দীপ্তি। ঋকবেদের সর্ব্বপ্রথম ঋকটাই যেন তাহার প্রমাণ দিতেছে। যথা—'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।" রমেশবাবুর অনুবাদ—"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান।" বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য এবং নিরুক্তকার যাস্কও দেব শব্দের এই অর্থই করিয়াছেন।

মানব চক্ষু মেলিয়াই দেখিয়াছিল—আলো। ক্রমে সেই আলো বা দীপ্তির কারণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে দীপ্তিমান (দেবতা) বলিয়া তাঁহার নিকট মস্তক নত করিয়াছিল। ইহাই দেবতা জ্ঞানের আদি ইতিহাস।

মানব সূর্য্যকে এবং চন্দ্রকেই সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিয়াছিল। ইহার পর যাহার দ্বারা মানুষ উপকৃত হইত, অথবা ভীত হইত, অথচ তাহার শক্তির পরিমাণ করিতে পারিত না, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিল। এই পর্য্যায়ে বায়ু, বৃষ্টি, বজ্র প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে; এবং তাহা খুব স্বাভাবিক।

ক্রমে নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রভৃতিকেও মানব দেব ভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিল। ইহারও প্রত্যক্ষ কারণ, উপকার। নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, পর্ব্বতের আশ্রয় প্রত্যক্ষ ভাবে মানবের উপকার সাধন করিত; তাই চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় নদী-পর্ব্বত-বৃক্ষও আদিম মানব সমাজের নিকট দেবতা বলিয়া পরিচিত এবং সম্মানিত হইয়াছিল।

ইহাই আদিম বা প্রাক্‌বৈদিক যুগের দেবতা জ্ঞানের ইতিহাস। বেদে ইহার আভাস আছে। ঋক্ বেদের আপ্রী সূক্তে বৃক্ষের স্তুতি আছে। বিশ্বদেবগণ সূক্তে পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ ও তৎকালীন অন্যান্য পূজ্যগণের স্তুতি আছে। সূক্তটী আর্য্যদিগের কৃষি জীবন আরম্ভের পরের রচনা; কেন না ইহাতে কৃষির সাহায্যকারী গো এবং অশ্বেরও স্তুতি আছে। অন্য একটী সূক্তে ভেকের স্তুতি আছে। বৃষ্টিকামী বশিষ্ঠ

বৃষ্টি কামনা করিয়া ভেকের স্তুতি করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌বৈদিক যুগে অগ্নি বোধহয় আবিষ্কৃত হয় নাই। অগ্নি সভ্যতার প্রথম আবিষ্কার বলিয়াই মনে হয়, সেই জন্যই বোধহয় ঋক বেদের প্রথম ঋকেই অগ্নির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আদিম সমাজ যাহা বুঝিত সত্য, যাহা বুঝিত শিব, এবং যাহা বুঝিত সুন্দর, তাহাকেই পূজ্য বলিয়া উপাসনা করিত। যেমন—সূর্য্য, বৃষ্টি প্রভৃতি সাক্ষাৎ উপকারী অথবা অপকারী সুতরাং ইহারা প্রত্যক্ষ সত্য। বৃক্ষ, গাভী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপকারী সুতরাং শিব। চন্দ্র, ফুল প্রভৃতি মনের আনন্দদায়ক সুতরাং সুন্দর।

এই সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজা বৈদিক যুগেও চলিয়াছিল। প্রাক্‌বৈদিক যুগে দেবতার সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট ছিল না। বেদে দেবতার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঋক বেদ বলিলেন, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। যথা—

যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং॥

রমেশ বাবুর অনুবাদ—"যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ (সেবা) করেন।

তেত্রিশ দেবতার কথা ঋক বেদের অন্তত দশটী ঋকে আছে; কিন্তু—এই তেত্রিশ দেবতা যে কে—তাঁহাদের নাম কি? ঋক্‌বেদের কোন ঋকেই তাহার স্পষ্ট প্রকাশ নাই। বরং এক স্থানে, এই দেব সংখ্যারই ব্যতিক্রম পাঠ আছে। তথায় ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে।

বেদের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন উক্তি দেখিয়া ঋষিদের মধ্যেই যে কোন কোন ঋষি দেবতাগণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন, ঋক্ বেদের একটী ঋকে তাহার স্পষ্ট আভাস আছে।

যাহা হউক, এই সন্দেহ পরিশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সংখ্যাটীও ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণের বিচারে টিকে নাই। কেন না পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ ও মহাভারতে এই ৩৩ দেবতার উল্লেখই স্থির রহিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ তেত্রিশ দেবতা স্বীকার করিলেও এই সকলের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে; কারণ এই গ্রন্থগুলি বেদের ব্যাখ্যা নহে। বেদের শব্দ ব্যাখ্যাতা নিরুক্তকার যাস্ক বেদের ৩৩ দেবতার অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"তিস্রোএব দেবতা।" ৭। ৫

দেবতা তিন জন মাত্র। এই তিন জন কে কে?

নিরুক্ত বলিতেছেন—"অগ্নি পৃথিবী স্থানো বায়ুর্ব্বাইন্দ্রো বা অন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ। তাসাং মহা ভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহুনি নাম ধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্ম পৃথকত্বাৎ যথা—হোতা অধ্বর্য্যু ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।"

অর্থ—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগত্বের কারণ—এক এক জন দেবতার বহু বহু নাম। অথবা তাহাদের কর্ম্ম পার্থক্য হেতু নাম পার্থক্য। যেমন হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা—প্রভৃতি এক ব্যক্তিরই নাম, বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য এইরূপ পৃথক পৃথক হইয়া থাকে ও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা কাল যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই গ্রন্থগুলিতে এই তেত্রিশ দেবতার কিরূপ বিভাগ প্রদত্ত হইয়াছে অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈদিক "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ এখন নাই। তাহা সাম্প্রদায়িক প্রভাবে বিভিন্ন নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ৩৩ দেবতার বিভাগ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। "কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদাদিত্যা অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দশাদিত্যাস্ত একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশদিতি।" শতপথ ব্রাহ্মণ—১১। ৬। ৩। ৫

অর্থ—এই ৩৩ দেবতা কে কে? অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য। এই একত্রিশ। ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া তেত্রিশ।

এই মত বেদানুমোদিত নহে। শতপথ ব্রাহ্মণ দ্বাদশ মাসকেই দ্বাদশ আদিত্য বলেন। যথা

দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।
১১। ৬। ৩। ৮

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন—দেবতা ৩৩ জন সোমপ, এবং ৩৩ জন অসোমপ। মোট দেবতা এই ৬৬ জন।

এই উক্তির সহিত বেদেরও ঐক্য দেখা যায় না, শতপথ ব্রাহ্মণেরও ঐক্য দেখা যায় না।

রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়—"ত্রয়োত্রিংশদ্দেবাঃ।" রামায়ণের দেবতাগণের নামের উল্লেখ প্রবন্ধের প্রথমেই করা হইয়াছে। রামায়ণের তেত্রিশ দেবতার সহিত শতপথ ব্রাহ্মণের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐক্য আছে, কেবল শেষ দেবতা দুটীর নামের সহিত কোন গ্রন্থের ঐক্য নাই। রামায়ণের শেষ দেবতা দুটীর নাম—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ইঁহারাও বৈদিক দেবতা। সুতরাং সংখ্যার হিসাবে বেদের সহিত শতপথ ব্রাহ্মণ বা রামায়ণের কোন গোল নাই। ঋকবেদের কোনও স্থানে এই ৩৩ দেবতার নাম না থাকিলেও বিভিন্ন ঋকে তাহাদের নাম আছে। রামায়ণের দেবতাদিগের নামের সহিত বৈদিক দেবতাগণের নামের ও কার্য্যের কিরূপ ঐক্য ভাব আছে, তাহা আলোচনার সুবিধার জন্য এই স্থানে রমেশবাবুর ঋকবেদে প্রদত্ত দেবতালিকা হইতে নামগুলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ঋতুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, ঋভুগণ, ত্বষ্টা, সূর্য্য, পৃথিবী, বিষ্ণু, পৃশ্নি, যম, পর্জ্জন্য, অর্য্যমা, পূষা, রুদ্র, রুদ্রগণ, বসুগণ, উশনা, ত্রিত, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, আপ্রী, অহির্বুধ্ন, অজ, একপাৎ, ঋভুক্ষা, গরুত্মান্ প্রভৃতি দেবতাগণের নাম ঋকবেদে আছে। বেদে পৌরাণিক যুগের দেবতাগণের ন্যায় প্রত্যেক দেবতাই স্ত্রী-দেবতা লইয়া অবস্থান করেন না। কদাচিৎ—কাহারও স্ত্রী আছেন। ঋকবেদের স্ত্রী-দেবতাগণের নাম; যথা—সরস্বতী (নদী) সুনৃতা, ইলা, ইন্দ্রানী, মহী, হোত্রা, পৃথিবী, উষা, আপ্রী, রোদসী, রাকা, সিনীবালী, শ্রদ্ধা, শ্রী প্রভৃতি।

ঋক্‌বেদে অদিতি অর্থে অসীম আকাশ—বলা হইয়াছে। যাস্ক সেই অর্থে "আদিনা দেবমাতা" করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা অদিতির পুত্রগণ বলিয়া আদিত্যগণকে পাই। ক্রম-বিকাশের পথে যাইয়া পুরাণে ইনি কাশ্যপের স্ত্রী হইয়া আদিত্য দেবতাগণকে প্রসব করিয়াছেন। পুরাণের এই কল্পনা বেদ হইতে কল্পিত।

ঋকবেদের যে সমস্ত দেবতার নাম উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে এই নামগুলিই যে অথবা ইহার কতকগুলিই যে যাস্ক কথিত ঋকবেদের তিন দেবতার তেত্রিশটী নাম, তাহা বেদের টীকাকারগণের টীকা হইতে বুঝা যায়। আপাততঃ এই প্রসঙ্গের আলোচনায় যতদূর প্রয়োজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর টীকা হইতে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

আকাশের দেবতা আদিত্য (সূর্য্য) সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সামশ্রমী লিখিয়াছেন—"উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল। অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে 'ভগ' সেই কালের সূর্য্য।

"যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্প তেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

"পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল, ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমা অস্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

"মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।" ইত্যাদি।

এই ব্যাখ্যা নিরুক্তকারদিগের অনুসরণে করা হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

বেদের এই তিন দেবতা ক্রমে রামায়ণের যুগে তেত্রিশে আসিয়া পরিণত হইয়াছিলেন।

বেদের দেবতার নামের তালিকার মধ্যে পৌরাণিক যুগের শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নাম নাই, ইহা, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিষ্ণুর নাম বেদের অনেক স্থলেই আছে; কিন্তু তিনি সূর্য্য রূপে পরিচিত হইয়াছেন। ঋকবেদে ১ম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত ৬টী ঋকে বিষ্ণুর উপাসনা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে ১৭ ঋকটীর উল্লেখ করা হইল।

এই ঋকটিতে আছে—"ইদম্ বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদাধে পদং।"

রমেশ বাবুর অনুবাদ—বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

এই বিষ্ণু কে? তাঁহার তিন প্রকার পদ বিক্ষেপ ই বা কি?

নিরুক্ত ইহার উত্তর দিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক তাঁহার নিজ মত সহ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকার ঔর্ণবাভ ও শাকপূণির মত উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন— "বিষ্ণু" শব্দ দ্বারা এখানে সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সায়ন এবং দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরাদিত্যঃ" এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুর তিন পাদ কি—তাহার আলোচনা গ্রন্থের ১ম অংশের "প্রক্ষিপ্ত রচনা" অধ্যায়ে (১০০ পৃঃ) করা হইয়াছে। রামায়ণে বিষ্ণুর এই বৈদিক ত্রিপাদ বিক্ষেপের উল্লেখও আছে। যথা:—

তত্র পূর্ব্ব পদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণু স্ত্রিবিক্রমে।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ॥ ৫৮। ৪। ৪০

এই মতই অন্যতম নিরুক্তকার শাকপূণি গ্রহণ করিয়াছেন।

রামায়ণের আদিম স্তরের রচনায় আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ পাই না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেবাসুর কল্পনা ও বামনরূপের গল্প আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সকল দেবতার মধ্যে প্রাধান্য লাভের কথা আছে। এইরূপে ঋক্ বেদের সূর্য্য দেবতা বিষ্ণু, ক্রমে সূর্য্য হইতে পৃথক হইয়া হইয়া পৌরাণিক যুগে আসিয়া সর্ব্বপ্রধান দেবতার আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি ব্রহ্মায় এবং রুদ্র শিবে পরিণত হন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান দেবতা হন।

রামায়ণ এই যুগের পূর্ব্বে রচিত। শতপথ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনারও পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। রামায়ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ না থাকিবার প্রধান কারণ এই যে রামায়ণের সমাজ বৈদিক কালেরই পরবর্ত্তী বৈদিক ভাবাপন্ন সমাজ; সুতরাং দেবতা জ্ঞান সম্বন্ধে সেই সমাজ খুব অধিক অগ্রসর হয় নাই। এমন কি মহাভারতের সমাজ দেবতা জ্ঞানে যতদূর অগ্রসর রামায়ণের সমাজ ততদূরও অগ্রসর নহে। এই তুলনা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। এইক্ষণ রামায়ণী সমাজের দেবতা জ্ঞানের পরিচয়ই প্রদত্ত হইল।

কৈকেয়ীকে রাজা দশরথ বর দিতে স্বীকৃত হইলে কৈকেয়ী দেবতাগণকে ডাকিয়া সাক্ষী করিতেছেন—

তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহরাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ব্বা সরাক্ষসা॥ ১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব॥ ১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরংমম দদাত্যেষ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ॥ ১৬। ২। ১১

অর্থ—ইন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা শ্রবণ করুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, নভোমণ্ডল, গ্রহ, দিক, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নিশাচর প্রাণী, গৃহদেবতা, অন্যান্য দেবতা সকলে অবগত হউন; এই সত্যসন্ধ ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কৈকেয়ী তাঁহার সময়ের সমাজে-উপাসিত সকল দেবতাকেই যে আহ্বান করিয়াছিলেন—অন্ততঃ স্ত্রী বুদ্ধিতে তাঁহার যতদূর দেবতার জ্ঞান ছিল তিনি যে সেই জ্ঞান অনুসারেই দেবতাগণকে ডাকিয়া ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়। এই উক্তিতে স্ত্রী জনোচিত অনভিজ্ঞতার পরিচয়ও যথেষ্ট আছে; সেরূপ ত্রুটী খুবই স্বাভাবিক।

কৈকেয়ী সকলকেই সাক্ষী মান্য করিলেন, কিন্তু তিনি তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নাম উচ্চারণ করিলেন না? পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে এই রচনা অংশটী রামায়ণের একেবারে আদি স্তরের রচনা। ইহা প্রক্ষিপ্ত-দোষ কলঙ্কিত হয় নাই।

অন্যত্র—কৌশল্যা রামকে বনে গমনে বিদায় দিতেছেন। মাতা একমাত্র পুত্রের জন্য আকুল প্রাণে দেবতাদিগের নিকট রামের জন্য কুশল ভিক্ষা চাহিতেছেন—

পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥ ৬
সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানিচ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপা হ্রদা॥ ৭
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ॥ ৮
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোহর্য্যমা।
লোক পালশ্চতে সর্ব্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা॥ ৯
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্ব্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।

দিনানি চ মুহূর্ত্তাশ্চ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে সদা ॥ ১০
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্ব্বতঃ।
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চেন্দ্রো বৃহস্পতিঃ ॥১১
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ।
তে চাপি সর্ব্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ॥১২
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ।
শৈলাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ ॥১৩
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ ॥"১৪
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্।
ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসা সংবৎসরাস্তথা ॥১৫
কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম্ম দিশন্তু তে।
স্বস্তিতেঽস্ত্বন্তরীক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ ।২২
সর্ব্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ।
শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ধনদোঽথযমস্তথা ॥২৩
অগ্নি র্বায়ুস্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখাচ্চ্যুতাঃ ॥২৪।২।২৫

ইহার প্রত্যেকটি শব্দের প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই জন্যই এত বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত হইল। এই বিস্তৃত প্রার্থনার অর্থ এই যে—

হে পুত্র তুমি জনক-জননী শুশ্রূষা জনিত যে পুণ্য তাহা দ্বারা ও সত্য ব্যবহার দ্বারা রক্ষিত হও। সমিধ,কুশ, পবিত্রবেদী, দেবায়তন, ব্রাহ্মণগণ, তোমাকে রক্ষা করুন। শৈল, হ্রদ, বৃক্ষ, পতঙ্গ, সর্প হইতে তুমি রক্ষিত হও। সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, মরুৎগণ, মহর্ষিগণ, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা প্রভৃতি লোকপালগণ; ষড়ঋতু, দ্বাদশ মাস, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত—তোমাকে রক্ষা করুন। শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, স্কন্দদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষিগণ নারদ, দিকপালদিগের সহিত দিক সকল তোমাকে রক্ষা করুন। আমি শৈল, সমুদ্র, বরুণ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, চরাচর, নক্ষত্র, গ্রহ সকলকে স্তব করিলাম—ইঁহারা তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।...

পৃথিবীও অন্তরীক্ষের প্রাণীগণ, সমস্ত দেবতা গণ ও শত্রুগণের নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক। শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, যম, অগ্নি, বায়ু ও ধূম ও ঋষিমুখ নির্গত মন্ত্রসকল তোমাকে রক্ষা করুন।...ইত্যাদি।

কৌশল্যার এই সুদীর্ঘ প্রার্থনাতে একটা ভয়ানক নৈরাশ্যের হতাশ ভাব প্রকাশ পাইতেছে—তিনি অশাহত হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আকুল প্রাণে বনের সরীসৃপ হইতে দৃশ্য অদৃশ্য যত কিছু প্রাণী ও দেবতার নাম লইয়াছেন; কিন্তু কৈ তিনিত পৌরাণিক কোন দেব দেবীর নাম লইলেন না!

এই স্থানে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। কৌশল্যার উক্তির পূর্ব্বে কৈকেয়ীর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; উহাকে আমরা আদিম স্তরের রচনা বলিয়াছি; কৌশল্যার এই উক্তিটী কিন্তু সেরূপ নহে। এই রচনার মাঝে মাঝে শব্দ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং এক কথারই পুনরাবৃত্তি আছে—মাঝের পরিত্যক্ত শ্লোকগুলির সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় লক্ষ্যের বিষয়—যে সূর্য্যবংশের কুল বধূ কৌশল্যা, সেই সূর্য্য বংশের বংশ-দেবতা সূর্য্যের নামই তিনি লইতে প্রায় যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রার্থনার একেবারে শেষ অংশে রামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়া যেন হঠাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়—সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ুর কথা তাঁহার মনে পড়িল! তখন তিনি সেই ত্রি দেবতার নামের সহিত একেবারে ব্রহ্মার নামটীও করিয়া ফেলিলেন। যথা—

"সর্ব্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূত কর্ত্তা তথর্ষয়ঃ ॥"২৫।২।২৫

এই উক্তিই কৌশল্যার শেষ উক্তি।

তৃতীয় লক্ষ্যের বিষয়—কৌশল্যার বিষ্ণু উপাসনার উল্লেখটী। রাম বনে গমন করিবেন বলিয়া জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখিলেন জননী কৌশল্যা বিষ্ণু পূজায় রত। যথা—

"কৌশল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিতা সমাহিতা।
প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্র হিতৈষিণী॥১৪।২।২০

কৌশল্যা বিষ্ণুর উপাসক হইয়াও তাঁহার আকুল প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ ও কামনার ভিতর বিষ্ণুর নামটী উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন কেন?

আমরা গ্রন্থের প্রথমাংশের প্রক্ষিপ্ত রচনা অধ্যায়ে এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানেও পুনরায় ২৫ সর্গের ব্রহ্মার উল্লেখ এবং ২০ সর্গের বিষ্ণুর উল্লেখ গুলিকে পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

নবযুগের শিশুশিক্ষা।

(প্রথম ভাগ)

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় 'শিশুশিক্ষা' লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। শিশুদের পাঠ্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুস্তক লিখিবার ধৃষ্টতা ও সাহস আমার নাই, কাজেই সেরূপ প্রয়াস আমি করি নাই। আমার এ শিশুশিক্ষা শিশুদের জন্য লিখিত নয়, ইহা শিশুদের পিতা মাতার জন্য। বস্তুতঃ শিশুদের শিক্ষার জন্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়ত' খুবই কম, পিতা মাতার শিক্ষাদানের ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন যথেষ্ট। এমনকি কেহ কেহ মনে করেন পুস্তক দ্বারা বালকদের শিক্ষার বরং ব্যাঘাতই হইতেছে;—তাই যুগপ্রবর্ত্তক মহামতি রুসো বলিয়াছেন যে শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি পোড়াইয়া না ফেলিলে আর শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না। এইরূপ গুরুতর মতবাদের কারণ কি এবং পুস্তক ব্যতীত কিরূপে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব—তাহাই এই প্রবন্ধে প্রথম আলোচ্য।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ—কাজেই জ্ঞানের প্রতি মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বালকেরা যাহা কিছু দেখে সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য যে প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করে ও অজস্র প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া অভিভাবককে বিব্রত করিয়া তোলে—তাহা হইতেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে যদি তদুপযোগী খাদ্যের পরিবর্ত্তে দুষ্পাচ্য ও অনুপযোগী খাদ্য দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার যেমন পুষ্টির পরিবর্ত্তে অজীর্ণাদি রোগেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ শিশুদেব অনুপযোগী শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিলে তাহাদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগত লোপ হয়ই অধিকন্তু তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি জড়ত্ব ও বিভ্রান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে যে প্রকার জ্ঞান যে ভাবে তাহারা গ্রহণ করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক তাহা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে উত্তরোত্তর বুদ্ধির বিকাশ ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংসারের যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মনের গোচর হইয়া থাকে। আবার পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুই চক্ষুগোচর হইয়া থাকে এবং চক্ষুগোচর বস্তুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে ও স্মরণ থাকে সুতরাং চক্ষুর সাহায্যেই জ্ঞানের পরিপুষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ হেন চক্ষুর উৎকর্ষ সাধন করাই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। আলো-ছায়ার সম্পাতে চক্ষুর কার্য্যকারিতা প্রকাশ পায় সুতরাং বিভিন্ন বর্ণ ও আকার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মান বিশেষ প্রয়োজন। পুস্তকেও একপ্রকার বর্ণজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় বটে কিন্তু সে সকল বর্ণ দেখিয়া শিক্ষার্থী বিবর্ণ হইয়া যায়, আর আমি যে বর্ণের কথা বলিলাম তাহা দেখিলে শিক্ষার্থী উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। কাজেই অপ্রীতিকর অক্ষরজ্ঞান অল্প অল্প করিয়া শর্করাচ্ছাদিত কুইনাইনের ন্যায় প্রয়োগ করাই ব্যবস্থা। অন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুর সাহায্যে জ্ঞান অধিক পরিস্ফুট এবং স্থায়ী ভাবে মনে অঙ্কিত হয় বলিয়া আমরা যাহা কিছু জানিতে চাই তাহা চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলে শিক্ষা সহজ ও কার্য্যকরী হয়। সকল বস্তু ও সকল কার্য্য বালককে দেখান ব্যয়সাধ্য ও সময় সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে চিত্র, প্রতিমূর্ত্তি বা তত্তুল্য পদার্থ উপস্থিত করিলেও বুঝিবার ও ধারণা করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু তাহা না করিলে—সর্ব্বদা ব্যবহৃত শব্দ—সিংহ, গণ্ডার, ফুট, গজ, পাউণ্ড, শিলিং, এমনকি সের, মন ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ধারণা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া তাহারা ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করিবে। পক্ষান্তরে দৃষ্টির সুব্যবহার করিতে থাকিলে সূক্ষ্মদৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিবে ও দেখিয়াই দূরত্ব ওজন প্রভৃতি অনুমান করা সম্ভব হইবে। ব্যবহারিক জীবনে এ সকল ক্ষমতা সমধিক আবশ্যক ও হিতকারী।

চক্ষু সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তাহার নিকট উপস্থিত করিলে ইন্দ্রিয় সাহায্যে সেই সেই বিষয়ের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ত জন্মিবেই, তাহা ছাড়া ইন্দ্রিয় পরিচালন-জনিত একপ্রকার আনন্দ জন্মিয়া শিক্ষার্থীর শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি করিবে। অন্য পক্ষে ইন্দ্রিয়গণকে নিষ্ক্রিয় রাখিয়া পুস্তক ও চিন্তার সাহায্যে বিষয়ের ধারণা করা একপ্রকার কৃচ্ছ্র যোগ সাধন মাত্র—চঞ্চল মতি বালকগণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

মন শ্রেষ্ঠতম ইন্দ্রিয়। ইহাকে শিক্ষা দিতে হয় বিচার, কল্পনা ও সদ্‌প্রবৃত্তি। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটী সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় না তবে বিচার ক্ষমতা লাভ সম্বন্ধে নবযুগে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। সত্য নির্দ্ধারণ ব্যাপারে প্রধানতঃ দুইটী প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে—রাম মরে, শ্যাম মরে, যদু মরে ইত্যাদি দেখিয়া স্থির করা হয় যে 'মানুষ মরে'—এই এক অংশ; আবার মানুষ যখন মরে তখন আমি মরিব, তুমি মরিবে, সে মরিবে—ইহা স্থির করা অন্য অংশ। একবার বিভিন্ন অবস্থা দৃষ্টে একটী সাধারণ সত্যে বা নিয়মে আমরা উপনীত হই, আবার তাহার প্রয়োগ দ্বারা উপস্থিতক্ষেত্রে সত্যনির্দ্ধারণ করি।

ইতঃপূর্ব্বে পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষা প্রণালীতেই ছিল যে শিক্ষক একটী নিয়ম বলিয়া দিবেন, শিক্ষার্থী তাহার প্রয়োগ করিবে, যথা—অকারের পর অকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। প্রথমেই একথা বলার দুইটী দোষ (১) অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সূত্রাকারে যে সত্য প্রকাশ করেন অনভিজ্ঞ বালক তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না; (২) কোন প্রকারে পারিলেও সে জ্ঞান কৃত্রিম ও অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে স্বাভাবিক ও পূর্ণ জ্ঞান দিতে হইলে প্রথমতঃ কতকগুলি উদাহরণ উপস্থিত করিতে হইবে এবং সেগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষার্থীকেই নিয়মটি আবিষ্কার করিতে হইবে ও পুনরায় অন্যস্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে, শিক্ষক সাহায্য করিবেন মাত্র। বালক নিয়মটি বিধিবদ্ধ করিতে না পারিলেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া নূতন ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই যথেষ্ট। নিয়ম হইতেছে সারসংগ্রহ, তাহা কেবল জ্ঞানীদেরই ব্যবহার্য্য। পূর্ব্বকালে লোকের স্বাধীন চিন্তা অপরিস্ফুট থাকাতে তাহারা নিয়ম সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ বা জিজ্ঞাসু হইত না; কিন্তু এক্ষণে নিয়মগুলি কোথা হইতে আসিল তাহার মূলের সন্ধান অনেকেই করে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে ইহাই প্রতীয়মান হয়।

(দ্বিতীয় ভাগ)

অতঃপর আমরা শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। স্বাস্থ্য নির্ভর করে অশন, বসন ও মনের উপর। শিশুদের মন স্বভাবতই পবিত্র, কাজেই পরিবারের লোকের ও সঙ্গিগণের অসদুদাহরণে তাহার স্বভাব কলুষিত না হয় তাহাই দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে সকলেই একমত, কাজেই অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই কিন্তু খাদ্য ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় শিশুগণকে কাঁদাইয়া ও বলপূর্ব্বক খাওয়াইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ঘটনা আর কি হইতে পারে! যে শিশু অখাদ্য কুখাদ্য পাওয়া মাত্র নির্ব্বিচারে মুখে তুলিয়া দেয় সে উপাদেয় দুগ্ধাদি যখন খাইতে চায় না তখনই বুঝিতে হয় খাদ্য বস্তুর মধ্যে কোন ত্রুটি আছে, নয় তাহার ক্ষুধা নাই, নতুবা খাওয়াইবার ব্যবস্থার দোষে তাহার এই কুঅভ্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর খাদ্য বস্তুর প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা। সুস্থ অবস্থায় শিশু যাহা খাইতে চায় অর্থাৎ যাহা তাহার ভাল লাগে তাহাই তাহার পক্ষে উপযোগী, আর যে পরিমাণ সে খাইতে চায় তাহাই তাহার প্রয়োজন। কোন খাদ্য দেহের পক্ষে উপযোগী কিনা তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত জিহ্বা রহিয়াছে, আর কখন কতটুক খাদ্য প্রয়োজন তাহা নির্দ্দেশ করিতে ক্ষুধা রহিয়াছে; কিন্তু অভিভাবকগণ শিশুর জিহ্বা ও ক্ষুধার উপর নির্ভর না করিয়া উপকার করিতে গিয়া অপকারই করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি প্রচলিত সংস্কার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিশুগণ মিষ্ট দ্রব্য ও অম্লঘটিত ফলাদি খুব খাইতে চায়, কারণ ঐগুলি দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাহাতে তাহাদের অপকার হইবে মনে করিয়া অভিভাকগণ খাইতে দেন না। ফলে কোন একদিন সুবিধা পাইলে তাহারা ঐগুলি অতিরিক্ত ভোজন করিয়া যথার্থই অসুস্থ হইয়া পড়ে। যদি ঐসকল বস্তু তাহারা নিয়মিতরূপে ইচ্ছামত খাইতে পাইত তাহা হইলে ঐরূপ রাক্ষসী ক্ষুধার সৃষ্টি হইত না। ইহা ছাড়া অভিভাবকগণ প্রায়ই উপদেশ দেন 'আর খাইয়া কাজ নাই, উঠ' অথবা 'পাতে যে টুকু আছে ফেলিয়া দিও না, খাইয়া ফেল'।—এ সকল জবরদস্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের দেহে শক্তি আছে সেই ভয়ে বালকগণ আমাদের কথা শুনিয়া

থাকে কিন্তু দেহযন্ত্র অন্য ব্যক্তির আদেশ নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য নয় কাজেই বিকল হইয়া পড়ে।

অতঃপর শীতাতপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমর যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহা দেহের ক্ষয় পুরণ, উত্তাপ রক্ষা ও শক্তি সঞ্চার কার্য্যে ব্যয়িত হয়। সুতরাং শীতের সময় যদি উপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করি তবে আমাদের খাদ্যের অপব্যয় নিবারণ হয়। অত্যধিক শীতপ্রধান দেশে লোকে পশমী কাপড় পরে তাহাতে উত্তাপ বহিস্কৃত হয় না। কিন্তু কিছুতেই উপযুক্তরূপ শীত নিবারণ না হওয়াতে ঐ সকল দেশের লোক পুষ্টির অভাবে অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি ও অনুন্নত। এই হিসাবে আমরা শীত নিবারণের যত ব্যবস্থা করিতে পারি ততই দেহের পুষ্টি অধিক হইবার কথা। শিশুদের পুষ্টির প্রয়োজন খুব বেশী, আবার অনুপাতে তাহাদেরই উত্তাপের ক্ষয়ও বেশী। কাজেই তাহাদের উপযুক্তরূপ শীত নিবারণ অত্যাবশ্যক।

কিন্তু এই ব্যাপারের আর এক দিক আছে। আমরা ইচ্ছা করিলেও উল্লিখিত নিয়ম রক্ষা করিতে পারিব না, কারণ কার্য্যানুরোধে ও অবস্থানুসারে আমাদের বাধ্য হইয়া অনেক সময় শীত ভোগ করিতে হয়। যদি আমরা শীত ভোগে আদৌ অভ্যস্ত না থাকি তবে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে আমরা অসুস্থ হইয়া পড়িব। এই বিবেচনায় অনেকে রৌদ্র, বৃষ্টি, শীতভোগে অভ্যস্ত হওয়াই কর্ত্তব্য বোধ করেন এবং উক্ত প্রকার শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন সময় সময় ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে লাভের বহু গুণ ক্ষতি হইতেছে; সাময়িক অসুস্থতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শরীরকে স্থায়ী ভাবে পঙ্গু করা হইতেছে। কেহ কেহ বলিবেন যে কৃষক শ্রমজীবী প্রভৃতি লোকেরা ত বেশ সুস্থ সবল, তাহার উত্তর এই যে শীতাতপ ভোগ করাতে তাহাদের দেহ সুস্থ সবল হয় নাই পরিশ্রমের গুণে হইয়াছে; যদি তাহারা শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করে তাহা হইলে তাহারা আরও সুস্থ সবল হইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে এই উভয় বিরুদ্ধ অবস্থার সামঞ্জস্য করা। যখনই আমরা শীত অথবা গ্রীষ্ম অনুভব করি তখনই তাহার সম্ভব মত প্রতিবিধান করা প্রয়োজন—ইহাই সাধারণ বিধি। তবে মাঝে মাঝে পরিমিত শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করিতেও অভ্যাস করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের যে পরিমাণ শীত বা গ্রীষ্ম জীবনক্ষেত্রে ভোগ করিবার সম্ভাবনা কম সেরূপ শীত গ্রীষ্ম শিশুদিগকে ভোগ করিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। মনে রাখিতে হইবে—শীত গ্রীষ্ম ভোগ করা দেহের পক্ষে ক্ষতিজনক, তবে কার্য্যক্ষেত্রে যে টুকু বাধ্য হইয়া ভোগ করিতে হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে মাত্র।

গ্রীষ্মভোগ করা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয় নাই। বস্তুতঃ শীত যেমন দেহের পক্ষে অপকারী গ্রীষ্মও তেমনই অপকারী। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিয়া ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছি সত্য কিন্তু শীত-প্রধান দেশের লোক অপেক্ষা আমরা হীনবল। সুতরাং গ্রীষ্ম হইতে আত্মরক্ষাও যথেষ্ট প্রয়োজন, এমন কি শীত কালে অতিরিক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া গরম জন্মান অকর্ত্তব্য। যে অবস্থায় দেহে সামান্য শীত বোধ হয় তাহাই দেহের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, এজন্য নাতি-শীতোষ্ণমণ্ডলের লোকগণের দেহ মনই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

(তৃতীয় ভাগ)

এই প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ের বিষয় হইতেছে শাসন-প্রণালী। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। শিশু ২। ৪ বার পরীক্ষা করিয়া এই সত্য উপলব্ধি করে ও সারা জীবন অগ্নির এই শাসন অবনত মস্তকে মানিয়া চলে—কোন আপত্তি করে না। শিশু যদি কোন দিন অগ্নির উষ্ণতা অনুভব না করে তবে অভিভাবকের নিষেধ বাক্য ও শাসন তাহাকে অগ্নিস্পর্শ হইতে অপাততঃ বিরত করিতে পারিলেও, গোপনে অগ্নিস্পর্শ করিবার ঔৎসুক্য তাহার জন্মিবেই। বাইবেলের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের গল্পের মর্ম্মও এইরূপ। এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে যে প্রকৃতির শাসন সকলেই মানে কিন্তু অভিভাবকের শাসন সকল সময় মানে না কেন?—অথচ বালক নানাপ্রকারে অভিভাবকের মুখাপেক্ষী। ইহার কারণ হইতেছে দুইটি:—(১) অভিভাবকের শাসন অবস্থা অনুসারে করা হয় না,

তাহার অসন্তোষের পরিমাণ অনুসারে করা হয়। (২) এক নিয়ম সমভাবে অভিভাবকগণ নিজেরাও পালন করেন না, বালকদিগকেও করিতে বলেন না। মানুষের ভাবপ্রবণতা আছে বলিয়া এই দুই প্রকার ত্রুটি মানুষেই ঘটে, প্রকৃতিতে ঘটে না। ইহার ফলে বালকগণ অভিভাবকদিগকে ন্যায়বান, বুদ্ধিমান ও হিতৈষী মনে না করিয়া স্বার্থপর, প্রভুত্বপ্রিয় ও খামখেয়ালী মনে করে এবং তাঁহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

ইহার প্রতিকার কি? সে বিষয়ে অভিভাবকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) শাসন কালে নিজের রিপুগণ যেন বশে থাকে। (২) বিবেচনা পূর্ব্বক আদেশ করিবেন ভবিষ্যতে সে বিধি সাধারণতঃ পরিবর্ত্তন করিবেন না। (৩) প্রীতিকর কার্য্য ও বস্তু দ্বারা বালকের প্রীতিভাজন হইবেন। (৪) বালক অপেক্ষা যে তিনি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তাহা কার্য্যতঃ তাহার নিকট প্রতিপন্ন করিতে হইবে। (৫) সাধারণ ব্যাপারে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যদি বালক কিছু করিতে চায় তবে সে যে কাজ করিলে অবিলম্বে কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা করিতে দিয়া বুঝাইতে হইবে যে তিনি তাহার হিতৈষী। (৬) সকল অপরাধের শাস্তি প্রহার হইবে না, সেই সেই কার্য্যের স্বাভাবিক কুফল সম্ভবমত ভোগ করাইতে হইবে, যথা—কাপড় ময়লা করিলে নিজে পরিষ্কার করিবে, কাপড় ছিঁড়িলে সেই ছিন্ন বস্ত্রই কিছু দিন পরিতে হইবে, খেলানা হারাইয়া গেলে শীঘ্র কিনিয়া দেওয়া হইবে না—এই মাত্র। এসকল শাস্তি ও স্নেহময় অভিভাবকের অসন্তোষ বালককে কি পরিমাণ পীড়া দেয় তাহা প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবক অনেক সময় বুঝিতে না পারিয়া শাস্তি অপ্রচুর মনে করেন। যে জাতির ও যে পরিবারের সন্তানকে যত গুরুতর শাস্তি না দিলে গ্রাহ্য করে না, সেই জাতি বা পরিবার সেই পরিমাণে অশিক্ষিত বুঝিতে হইবে। অন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াও বালককে নিবারণ করিতে না পারিলে বালককে প্রহার করিতে হইবে সত্য কিন্তু প্রহার যেন ঘন ঘন না হয়। বেত্রাঘাত বেশ নিরাপদ অথচ কষ্টজনক। কীল চড়, কাণমলা প্রভৃতি শাস্তি একটু গুরুতর হইলেই শরীরের স্থায়ী অনিষ্ট সাধন করে।

পূর্ব্বকাল হইতে সর্ব্বদেশে দণ্ডাদির সাহায্যে বালকগণকে বাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া হইত কিন্তু নবযুগে সে ব্যবস্থা চলা অসম্ভব। আজ পৃথিবীময় স্বাধীনতার স্রোত চলিয়াছে—কেহ কাহারও উপর অবিচার করিতে পারিবে না। প্রজা রাজার নিকট, ভৃত্য প্রভুর নিকট, শূদ্র ব্রাহ্মণের নিকট, দরিদ্র ধনীর নিকট, শিষ্য গুরুর নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিতেছে। বালকগণ কি জগৎ ছাড়া! তবে সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের যুগেই বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাই বর্ত্তমান যুগের বালকগণ পুরাতন ও নূতন কোন শ্রেষ্ঠ পন্থাই অবলম্বন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা জীবনে কষ্ট ভোগ করিবে। কিন্তু ইহাদিগকে সময়োপযোগী পরিচালনার জন্য অভিভাবকগণ প্রস্তুত হইলে অতঃপর তাহারা ক্রমশঃ বিচার পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান ও সৎকর্ম্মশীল হইতে পারিবে।

উপসংহারে সামান্য ২।১ টি কথা বলিবার আছে। শিশুরা প্রধানতঃ মাতার নিকটই শিক্ষালাভ করিয়া থাকে; অতএব মাতা যে পর্য্যন্ত সুশিক্ষিতা না হইবেন এবং সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শক্তি লাভ না করিবেন সে পর্য্যন্ত শিশুদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। তাই বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? বর্ত্তমান অবস্থায় পিতাদিগকেই এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া গৃহে গৃহে উপযুক্ত শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য তাঁহাদেরও বুঝাইয়া উঠা সহজ নহে। মানুষ স্বভাবতঃই রক্ষণশীল কাজেই নিজেদের আচার ব্যবহারে কি দোষ ত্রুটি আছে তাহা আমরা দেখিতে চাই না। আমার এ প্রবন্ধে আবার আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থারই স্থানে স্থানে সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, কাজেই উল্লিখিত বিষয়ের যৌক্তিকতা সহসা হৃদয়গ্রাহী না হওয়াই সম্ভব। তবে আমার বক্তব্য—এই সকল মতের অধিকাংশই পাশ্চাত্য মনীষিগণ একবাক্যে সমর্থন করিয়াছেন এবং অনেক দেশে এই মতানুসারেই কাজ হইতেছে। কাজেই এই সকল মত অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহপূর্ব্বক

আপনারা পিতার দায়িত্ব স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিবেন এবং তদনুসারে ব্যবহার করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী।

গৌরিপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

নিন্দার বন্দনা।

নিন্দা, চিরানন্দ দাও! বন্দনীয় বন্ধু!
মিথ্যা যাহা দগ্ধ কর, প্রজ্বলিত কন্দু!
পাদুকা শিরে বহিতে কি রে এসেছি সবে বিশ্বে?
জ্বালাও প্রাণে দহন-জ্বালা, হটাবো তবু ভীষ্মে!

২

খ্যাতির তুমি করো না ক্ষতি, সুহৃৎ অতি সত্য!
তোমারে ছাড়া পায় না কেহ প্রাণের খাঁটি তথ্য!
এসো গো, এসো, নিন্দা, এসো! তুমিই প্রাণানন্দ!
নিন্দা যশে চলার পথ হবে না কভু বন্ধ!

৩

সত্য যাহা উদিবে প্রাণে, পূজিব তারে নিত্য!
শঙ্খ-রবে ঘোষিব তারে, চাহি না ঘুস বিত্ত!
নিন্দা, কভু মন্দ নও! থাকো না কেন পঙ্কে;
ফুটিবে হৃদি-পদ্ম ভবে গোপন তব অঙ্কে!

৪

দুঃখী সুখ-সঙ্গ পায়, সাক্ষী তারা চন্দ্র!
কোকিল কালো গগণে জাগে সৃষ্টি নাশী মন্ত্র!
সুপ্তপ্রাণে স্বর্গ-শোভা পশে না ব্যথা ভিন্ন!
নিধনে-জীবন রাখে জগতে স্মৃতি চিহ্ন!

৫

নিন্দা যশ সকলি চাই, কিছুই নহে তুচ্ছ!
আজিকে যাহা নিন্দনীয়, কালি তা' মহা উচ্চ!
একটি খাঁটি মানুষ মেলে খুঁজিলে শত লক্ষ!
ধর্ম্ম নীতি আচরি' তাই ফুলায়ে চলি বক্ষ!

৬

দেখেছি ঢের লম্বা টিকী, হৃদয়ে নাই ভক্তি!
আঠারো আনা স্বার্থপর, ভোগেতে অনুরক্তি!
ভজাতে লোক চেষ্টা কত! হিংসাভরা চিত্ত!
রাত্‌কে পারে করিতে দিন পাইলে কিছু বিত্ত!

৭

তথাপি এরা বড়াই করে, সমাজ তাই খাপ্পা!
মুখের জোরে চলিতে চায় চলে না আর ধাপ্পা!
আমরা কবি গাহিব সবি দুঃখে সুখে রঙ্গে!
কীর্ত্তি যশ পেতেছি যবে নিন্দা পাবো সঙ্গে!

৮

হরষে তবে বরিষ' সবে নিন্দা বারি বিন্দু!
অন্ধকার কাটিয়া যাবে, ফুটিবে যশঃ-ইন্দু!
আশার আশে রয়েছি বসে', নিন্দা, এস বন্দি!
তোমারে দূরে রাখিতে আজো শিখিনি কোন ফন্দি!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

পাগ্‌লা ঘোড়া।

আস্তাবলের ঘোড়া আস্তাবলে থাকে বেশ খোস্‌ মেজাজে। দানাপানি খায়, দলাই মলাই পায়; গাড়ী টানে, শোয়ার বয়; চাবুক খায়, চাটছোড়ে; লাগাম্‌ চিবায়, চিঁহিঁ করে; অবসর সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমায়।

আজ সে হটাৎ কেন খেপে উঠেছে। শোয়ার ফেলে দিয়েছে লাগাম ছিঁড়ে ফেলেছে, ধর্‌তে গেছ্‌ল-সইস্‌কে লাথি মেরেছে। সে আজ ছুটে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়; কেউ তা'কে রুখতে পারেনি। সে আজ ল্যাজ তুলে বুক্‌ ফুলিয়ে ছুটেছে সারা সহরের বুকের উপর দিয়ে। তা'র পায়ের ঠকরে ফিন্‌কি উঠছে। কেউ এগুতে সাহস পাচ্ছেনা তা'র কাছে। সবাই সরে' দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে তা'কে।

আজ সে বুঝেছে—গাড়ী টেনে চাবুক খেয়ে দুটো দানা চিবিয়ে খাওয়াই জীবন নয়। আজ শরতের আকাশে বাতাসে কা'র ডাক শুন্‌তে পেয়েছে তাই ছুটেছে সে কোন্‌ অজানা দেশের উদ্দেশে।

যে দেখ্‌ছে সেই বল্‌ছে "পাগ্‌লা ঘোড়া"। সে ছুট্‌তে ছুট্‌তেই চিঁহিঁ করে' ঘাড় ফিরিয়ে বলে যাচ্ছে—"তোরাও বেরিয়ে পড়! বেরবো মনে করাই কঠিন, বেরনো শক্ত নয়।"

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত।

হাতীগুলি সমস্তই বাহির হইয়া ডাইনের আম্নির বাহির দিয়া কোঠের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া ডাইনের খলের মধ্যে নামিয়া যাইতে লাগিল। সেখানে গিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া কেবল ধূলি ছিটাইতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় ২ ½টা বাজিয়া গেল, তথাপি "ড্রাইভারদের" কোনও সাড়া পাওয়া গেল না দেখিয়া রামদয়ালকে তাড়া দিয়া লোক পাঠান গেল। এইবার সে জুঙ্গীর সহায়তা লইল। হাতী পুনরায় গুলানের জন্য জুঙ্গী, দুর্গা এবং অপর ২।১ জনকে পাঠাইয়া দিয়া সে তুরীর পুনঃসংস্কার করিল। ৩।৪ বার বন্দুকের শব্দ দূর হইতে হইল কিন্তু আমরা উপর হইতে দেখিলাম, হাতী একই জায়গায় দাঁড়াইয়া কেবল ধূলি ছিটাইতেছে। জুঙ্গী হাতীর খুব নিকটে যাইয়া একবার ছিটা মারিতেই হাতীগুলি চলিতে আরম্ভ করিল। তারপর ক্রমে তুরীর ভিতর দিয়া আসিয়া পড়িল। হাতী তুরীতে প্রবেশ করিতেই বন্দুকের শব্দে তাহা প্রচার হইল। আমরা সোৎসুক নয়নে চাহিয়া আছি, হঠাৎ দেখি হাতী বাঁয়ের আম্নির সম্মুখ দিয়া যাইয়া ছড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এইবার বড় সর্দ্দার দৌড়াইয়া হাতীগুলির সম্মুখে যাইয়া বন্দুকের ৩।৪ টা আওয়াজ করিল এবং ২।১ টা ছিটা গুলি মারিল। সেই সময়ই দুর্গা প্রভৃতি সর্দ্দারগণ ও সাহসী শ্রেষ্ঠ চোগরাম সমবেত ভাবে উচ্চ চীৎকারে যোগদান করিতেই হাতীগুলি ভয়ে একেবারে বাঁয়ের আম্নির বাহির দিয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে পলায়নপর হইল। এইবার মনে হইল বুঝি সমস্তই শেষ হয়! কিন্তু মুহূর্ত্তে পট পরিবর্ত্তিত হইল! সহসা আম্নির বাহিরেস্থিত খেদার বাবুদিগকে দেখিয়া দলস্থিত একটা অল্প বয়স্ক সবল মোক্‌না বাহির দিক হইতে আম্নি ভাঙ্গিয়া একেবারে সদলে কোঠের মধ্যে প্রবেশ করিল! তখন হরিধ্বনি এবং "দশভূজা মায়িকি জয়" রবে প্রচেষ্টার সার্থকতা বিজ্ঞাপিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে হাতীগুলি পূর্ব্ব রাত্রিতে আম্নির যে অংশ ভাঙ্গিয়াছিল আজিও ঠিক সেই অংশ ভাঙ্গিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল! খেদা বিভাগের কর্ম্মচারী মহেন্দ্র গোস্বামী, নগেন্দ্র সিংহ ও পরেশ সিংহ আম্নির বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হস্তীর সহসা এভাবে আগমন তাঁহারা একেবারেই আশঙ্কা করেন নাই; সুতরাং এক্ষেত্রে হস্তী আম্নি ভাঙ্গিয়া গড়ে প্রবেশ না করিয়া তাঁহাদের দিকে আসিলে তাহাদের বিপদ অনিবার্য্য ছিল! কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

হাতী গড় দাখিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাওয়া গেল এক প্রকাণ্ড মোক্‌না তখনও বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেছে, এবং আর একটা হাতী আম্নির সম্মুখস্থিত খালটায় পড়িয়া গিয়াছে এবং সেটা অনবরত চীৎকার করিতেছে। তাহার শিশুটীও খালের ধারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে! এভাবে আরণ্য হস্তী পড়িয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। হস্তীটা ঠিক দুই প্রস্তরের চাপে পড়িয়াছিল এবং মনে হইল তাহার কোমড় অথবা পশ্চাতের পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বহু প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাকে উঠানের চেষ্টা করা হইল—কিন্তু সবই ব্যর্থ হওয়ায় অরণ্যের এই সুবৃহৎ জন্তুটীকে এই ভাবে ফেলাইয়া রাখিতে হইল। বস্তুতঃ তাহার এই দুর্দ্দশা দর্শনে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। এই হস্তীটী ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে থাকিয়া অবশেষে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ দিকে তাহার শিশুটী মাতৃহারা অবস্থায় চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিয়া ঘুরিতে থাকে। এই অসহায় অবস্থায় তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া রেঞ্জার বাবুকে জানাইয়া আমরা ইহাকে আমাদের নিকট লইয়া আসিলাম। বাচ্চাটীকে আনিয়া তাহাকে রীতিমত দুগ্ধ খাওয়াইতে লাগিলাম। এখন সে বেশ বড় হইয়াছে। পালকের প্রতি তাহার আশক্তি উপভোগ্য। শিশু যেমন মাকে না দেখিয়া মুহূর্ত্তেক থাকিতে পারেনা, ইহার [illegible]ও তদ্রূপ। দুঃখের বিষয় পাহাড়েই ইহার একটী সম্মুখের পদে গুরুতর জখম হইয়াছিল এবং ইহা বোধ হয় স্থায়ী ভাবেই থাকিয়া গেল।

যাহা হৌক্ সেই রাত্রিতে আর হস্তী বাঁধা গেলনা, কাজেই সমস্ত রাত্রি চতুর্দ্দিকে অগ্নি জাঠা এবং তীক্ষ্ণাগ্র বংশধারী রক্ষীর ব্যবস্থা রাখিতে হইল।

আজ পাহারার কার্য্য ভাল ভাবে যাহাতে হয় তাহার জন্য উপেন্দ্র বাবুকে রাত্রিতে রাখিয়া যাওয়া হইল। খেদা বিভাগের কর্ম্মচারীদের যখন যাহাকে যে

আদেশ করা হইয়াছে সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহা সম্পাদিত করিতে বিন্দু মাত্রও পশ্চাৎপদ হয় নাই। আজ রাত্রিতে কেম্পে ছোট কাকাকে রাখিয়া দিয়াছিলাম; সুতরাং উৎসাহে এবং গল্প গুজবে একরূপ বিনিদ্র রজনীই কাটান গেল।

হাতীর পরতালা প্রভৃতি যথারীতি বাঁধা হইলে আমি সুসঙ্গ চলিয়া আসি; কারণ সেই দিন শুনিলাম মেজকাকা খেদা দেখিতে আসিবার সময় এক হাতী তাঁহাকে অত্যন্ত ঝারিয়া ফেলাইবার চেষ্টা করে; ফলে তিনি খুবই কাতর হইয়া শয্যাশায়ী হন। তাঁহাকে একটু ভাল দেখিয়া পর দিবসই যথারীতি হাতী নামানর ব্যবস্থার জন্য কেম্পে গিয়াছিলাম। ইহার ২ দিন পর পিলখানা বাদামবাড়ীতে আনিতে বলিয়া আমি বাড়ী চলিয়া আসি।

কেম্প তথায় থাকা কালেই পূর্ব্বোল্লিখিত মোকনাটী পিলখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাকে তখন ২।১ বার পরতালায় ধরার বিফল প্রয়াস করা হইয়াছিল। পিলখানা যেখানেই লওয়া হইতে লাগিল এই মোকনাটী সেই খানেই যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে পিলখানা দুর্গাপুর আনা হইলে তথায়ও ৪।৫ দিবস রাত্রি-দিন আসিয়া থাকিত। এই সময় ইহার পূর্ণ মদস্রাব হইতেছিল। এই হস্তীটী হাটের দিন বাজারের মধ্য দিয়াও চলিয়া গিয়াছে কিন্তু কোন মানুষের কিছুই ক্ষতি করে নাই। হস্তী স্বভাবের ইহাও একটী বিশেষত্ব। লোকের অনিষ্ট না করিলেও অপর একটী ধৃত মোকনাকে সাঙ্ঘাতিকরূপে আক্রমণ করিতে থাকে; ইহার ফলে এই সবল সুস্থ হস্তীটি ৭।৮ দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়! সুতরাং অপর হস্তীগুলির নিরাপত্তার জন্যই ইহাকে গুলি করিয়া তাড়াইয়া দিতে হইল।

কোন আরণ্য হস্তীকে মারিয়া ফেলিতে হইলে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের হুকুম প্রয়োজন। আমরা ইহার জন্য ময়মনসিংহ মাজিষ্ট্রেটের হুকুম আনাইয়াছিলাম। যাহাহৌক এই গজরাজকে হত্যা করার বাসনা মনে উদিত হইলেও তাহা করিতে কষ্ট হইতেছিল, কাজেই তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াই স্থির হইল কিন্তু বহু চেষ্টায়ও যখন গেল না, তখন গুলি করিয়া তাড়ান গেল! এই মোকনার সঙ্গে একটী দাঁতলা হাতীও আসিত; সেটী বোধ হয় অপরিণত বয়স্ক বলিয়াই অনায়াসে ধৃত হইল। এটী অতি সুশ্রী, উচ্চতায় প্রায় ৮½ ফিট। এই হস্তীটী রাত্র ২ ঘটিকার সময় বাজারের নিকট নদীর তটে বাঁধা হয়। মোকনাটা যেদিন চলিয়া যায় সেই রাত্রেই আমাদের পরিবারে এক শোচনীয় ঘটনা সংঘটীত হয়। মেজকাকা পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যারামে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া রোগ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান।

ধৃত হস্তীকে এক কেম্প হইতে অন্য কেম্পে স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

এই ঘটনায় সমুদয় কার্য্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। মধ্যে মনে হইয়াছিল ইহার পর খেদার কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া কিন্তু আরব্ধ কার্য্য এভাবে শেষ করা অনেকেই সঙ্গত বোধ করিলেন না, কাজেই kooly পুনরায় দাপসীর অভিমুখেই রওনা হইল। এবার কার্য্যের ভার সম্পূর্ণই মহেন্দ্র বাবুর উপর প্রথমে ন্যস্ত রহিল। ইতঃপর অবশ্য নগেন্দ্রবাবুও গিয়াছিলেন। অসম্ভব কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং কুলিদের সহিত মিশিয়া তাহাদেক কাজ করানতে ধীর এবং স্থির মহেন্দ্র বাবুর মত এবং দুর্জ্জয় সাহসে নগেন্দ্র বাবুর মত লোক খুবই কম পাওয়া যায়। যাহাই হৌক এবারের ভার সমস্তই ইঁহাদের এবং সর্দ্দারদের উপর ন্যস্ত করা হইল। পৃথিবীতে বিশ্বাসে যতদূর কার্য্য হয় অন্য কোনও প্রকারে তাহার শতাংশের একাংশও সম্ভবেনা।

কিছু দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল নেংথং বস্তীর নিকট হাতী বেড় হইয়াছে। drive হওয়ার দুই দিন পূর্ব্বে রায় সাহেব দেবেন্দ্র লাহিড়ী এবং উপেন্দ্র বাবু রওনা হইয়া গেলেন; বিপদ পাতে এবার আমাদের যাওয়া হয় নাই। খেদার সময় এবার উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোনও ঘটনা হয় নাই কিন্তু বিচিত্র ঘটনা এই হইয়াছিল যে হস্তী গড় দাখিল হইতেই বাহির হইতে দুইটা হাতী একেবারে অন্দির ভিতর প্রবেশ করিয়া গিয়াছিল। আমাদের মাহুৎগণ তন্মধ্যে একটা মেয়ানা হাতীকে ফাঁস দিয়া ধরিল অপরটী চলিয়া গেল। এবার সর্ব্ব সমেত ১০ হাতী ধৃত হইল। কিন্তু একটা অতি সুশ্রী হস্তিনী আনিবার সময় রাস্তায় মরিয়া গেল। সেটা রাগে তৃণ গাছ পর্য্যন্ত আহার করে নাই আমাদের মনে হয় সে রাগেই মরিয়া গিয়াছে।

ইহাই বিশেষ দোষ যে তাহারা অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং বেজায় দলাদলি প্রিয়। গোঁসাই মহাশয় রেওয়াক কেম্প হইতে সংবাদ দিলেন যে কর্ত্তৃকপক্ষের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক তাহা না হইলে সমুদয় কার্য্য পণ্ড হইবে। সংবাদ পাইয়া বড় কাকা উপেন্দ্র বাবুকে লইয়া তথায় উপস্থিত হওয়ায় সে যাত্রা কার্য্য পণ্ড হয় নাই। খেদার কুলীকে শাসনে রাখাই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। বড় সর্দ্দারকে শাসনে রাখাও অত্যন্ত আবশ্যক, নতুবা সাধারণ লোক অধিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যাহা হয় তাহাই হইয়া থাকে; এই ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই। রামদয়াল বড় সর্দ্দার হওয়ায় সে মনে করিত যে সে খেদা কর্ম্মচারীদেরও উপরে সুতরাং তাঁহারা ন্যায্য এবং সমাচীন কথা বলিলেও সে বাঁকিয়া বসিত। যাহা হোক জুঙ্গা এবং বদে এবার পাঞ্জালির কার্য্যে যাইয়া অতি সুন্দর স্থানে হাতী বাহির করিল।
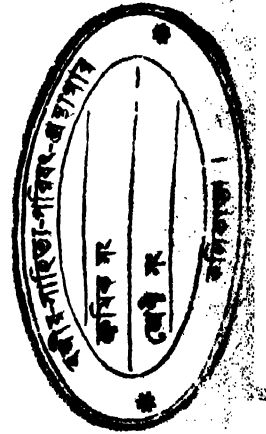
বন্ধনাবদ্ধ হস্তীর অনশন পণ।

পুনরায় হাতীর খোঁজে পাঞ্জালী পাঠান হইল। ইতিমধ্যে একদিন সংবাদ আসিল যে কুলি প্রায়ই পলায়ন করিতেছে। গোঁসাই মহাশয় এবং সিংহ মহাশয় কুলিদের চার্য্যে ছিলেন; তাঁরা সংবাদ দিলেন যে কুলি যে ভাবে পলায়ন করিতেছে তাহাতে আর কয়েক দিন বসিয়া থাকিলে প্রায় সকলেই পলায়ন করিবে।

অবস্থা বুঝিয়া যে অল্প সংখ্যক কুলি ছিল তাহাদেরই লইয়াই বেড় দেওয়ার অভিপ্রায়ে খেদার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ ডাপসি অভিমুখে রওনা দিলেন। কিন্তু সর্দ্দারগণ বিশেষতঃ বড় সর্দ্দার এবং চেগ্‌রাম খেদাবাবুদের অমতেই তথা হইতে চলিয়া আসিল! এই শ্রেণীর কুলির তাহাদের মতে এই দলে ১৫।২০টী হাতী আছে। কিন্তু বড় সর্দ্দার নিজের বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার বজায় রাখিতে যাইয়া বলিল ৮।৯টা হাতী হইবে সুতরাং সে ছয় পাটের কোট করিল। সৌভাগ্যের বিষয় এবার "থল" টী অতি সুন্দর ছিল। এক দিকে একটা ছড়া এবং তাহার অপর পারেই একেবারে দেয়ালের মত সোজা পাহাড়। অপর দিকের পাহাড়ও প্রায় সোজা। মোটে ৫।৬ টা জায়গা দিয়া হাতী উঠিতে পারে। থলটা পাশে বেশী ছিল না, লম্বাভাবে অর্দ্ধ মাইলের অধিক হইতে পারে না। ইহার ফলে ১৫০।১৭৫ কুলিতে "পাত বেড়" বেশ হইয়াছিল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

কোজাগরী রজনী।

(কথিকা।)

১

রজনী কোজাগরী—স্নিগ্ধ ধবল জোৎস্নায় আকাশ প্লাবিত। মঞ্জরিত কানন-বিতানে বিকশিত বল্লী পল্লবে প্রসারিত শ্যামল প্রান্তরে হর্ষের রোমাঞ্চে ধরণী পুলকিতা, শিশিরে শিশিরে আনন্দের দরবিগলিত স্বেদ ধারা, অনিলাহত বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মরে মর্ম্মরে এক নিগূঢ় আবেশের মৃদু-মধুর কম্পন। কিসের স্পর্শে বিশ্ব সচকিত—জাগরিত ও আনন্দিত!

উৎসবের লহরী প্রকৃতির বুকে লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে, অথচ মানুষ তাহার আস্বাদে বঞ্চিত! নির্ব্বাসিত মানব-সন্তান;—ত্রিদিবের নিরাবিল সুখের অনধিকারী—ক্ষুদ্র আমোদে সে তাই আপনা-হারা হইয়া রহিয়াছে।

২

প্রফুল্ল চন্দ্রালোকে পথে বাহিরিয়া পড়িলাম। দুই ধারে সুসজ্জিত বিপণী—বিচিত্র পশরা—ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। সঙ্ সাজিয়া কেহ কেহ হাসির হল্লা তুলিতেছে। অদূরে ধনীভবন আজ প্রমোদ-শালায় পরিণত। প্রশস্ত মণ্ডপ—আলোর গৌরবে সমুজ্জ্বল। তথায় সহস্রের উৎসাহ ধ্বনির মাঝে বেতাল নৃত্য ও বেসুর সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে সুপ্রসিদ্ধ যদু নাট্টের নাট্যাভিনয় জমিয়া উঠিয়াছে!

অন্দর-মহলে মহাধূমধামে মা-লক্ষ্মীর পূজা সমাপ্ত হইল। প্রসাদ-লোলুপ ভক্তের দল সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া দেহি দেহি রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

ক্রমে রাত্রি ঘনীভূত হইল—হাটের হট্টগোল থামিল। নাট্য মণ্ডপ জনশূন্য—প্রমোদশ্রান্ত বাবুগণ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

৩

নিঃশব্দ নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। অনন্ত নীলিমার মাঝে শারদ শুভ্র পূর্ণ শশীর নীরব মহিমা আজ কি কাহারও হৃদয় বিকশিত করিয়া তুলিবে না!

সহসা মনে হইল, সুদূর হইতে একটা অশ্রুত ঝঙ্কারের শেষ রেশ সমীর-হিল্লোলে ভাসিয়া আসিতেছে। কিসের এ সুর? কে ইহার স্রষ্টা? কোথায় সে? অবিহিত চিত্তে অলক্ষ সে সুরের অজ্ঞাত কেন্দ্র অন্বেষণ করিলাম—মনে হইল, সে সুর ঈশান কোণ হইতে আসিতেছে—ধ্বনি বীণা যন্ত্রের—বোধ হয় প্রসাদবাগে কোনও বীণ্‌কার আলাপচারি করিতেছে।

৪

সঙ্গীতের মোহন আকর্ষণে শ্রান্তি ভুলিয়া ছুটিয়া চলিলাম। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখি, অনতিদূরে, একান্তে রজনী গন্ধার গন্ধে আনন্দিত এক নিকুঞ্জকাননে—যেখানে লতায় পাতায় হিমাংশুর ক্ষীরককিরণ গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে সেখানে শুভ্রশ্মশ্রু সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ শষ্পাসনে উপবেশন করিয়া তন্ময় হৃদয়ে বীণাযন্ত্রে বসন্তরাগের আলাপ করিতেছেন

নয়নযুগল তাঁর অর্দ্ধমুদ্রিত—ধ্যানস্তিমিত—যেন অন্তরে অন্তরে তিনি উৎসবময়ী চির-পূর্ণিমার কোন্ সুদূর সুরপুরে চলিয়া গিয়াছেন—সেথাকার অনাহত মধুর ঝঙ্কার বীণার তারে তারে প্রতিহত ও অনুরণিত হইতেছে—যেন আজ নন্দনবনের মধুপগুঞ্জন প্রসাদবাগের কুঞ্জবনে এই বৃদ্ধের বীণায় প্রতিধ্বনিত হইয়া মর্ত্ত্যে অমিয় মাধুরী রচিতেছে।

৫

বিবশ হইয়া তৃণ-শয্যায় লুটাইয়া পড়িলাম—নয়ন মুদিয়া আসিল। একদিকে জ্যোছনার অফুরান্ উচ্ছ্বাস, অপর-দিকে বীণার মনোহর স্বরলহরী—সুরে আলোয় মিশিয়া গেল—জ্যোতির্ম্ময় সুরসায়রে দুলিতে দুলিতে কোন্ অতলে ডুবিয়া গেলাম।

৬

কাহার সস্নেহ স্পর্শে চমক ভাঙ্গিল। বৃক্ষে বৃক্ষে তখন বিহগকুল কলকাকলী তুলিয়াছে—পূর্ব্বগগনে সুবর্ণরাগ দেখা দিয়াছে—নয়ন মেলিয়া দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ বীণ্‌কার। সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলাম। তিনি সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "উৎসব-রজনী কেমন কাটিল?" আমি কি উত্তর করিব তাহা ভাবিবার অবসর না দিয়াই তিনি বলিলেন, "সুধাকর চন্দ্র হইতে যে আলোর স্রোত অবতরণ করে, সঙ্গীত তাহারই গতিধ্বনি। আলোই সুর, আর সুরই আলো। যেখানে সুর নাই—পূর্ণিমা সেখানে অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার।" বীণ্‌কার অদৃশ্য হইলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

গৌরীপুর পূর্ণিমা-সম্মিলনে পঠিত।

নান্যপন্থী।

যে পথ ধরে চল্‌ছি আমি, সেটাই আমার ভালো,
হোক্ না তাহা শতেক বাঁকা,
কাঁকর কাঁটায় রক্ত মাখা,
তোম্‌রা কেন নূতন পথে নূতন আলোক জ্বালো,
তোম্‌রা বলো—"নূতন ধরো,
নূতন ক'রে জীবন গড়ো,
সবার মতন মরার পরে বেঁচে থাকাই মিছে" !
উপল ছেড়ে স্থফল পাওয়া
অতল তলে তলিয়ে যাওয়া;
ফল্‌তে পারে মুক্তা মাণিক, মৃত্যু যে তার পিছে !
আমার খাঁচায় বদ্ধ আমি,
চাইনে হ'তে আকাশগামা,
পক্ষ আমার জড়িয়ে গেছে, রুক্ষ আমার ভাষা,
প্রভুর দেবার সবুর চেয়ে,
বিভোর হয়ে নাচ্‌ব গেয়ে,
বনের ফলের, নিঝর জলের, ঘুচেই গেছে আশা,
গোলাম গিরির বজ্র-লাথি
তাও নিতেছি বক্ষপাতি,
গাল গালাজে সলাজ নহি, চড় চাপড়ে খুসী !
ঘানির গাছের বুষের মত
ঘুর্ণিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
দিনান্তরে মিল্‌ছে তবু আধেক-পেটা ভুসী।
পুরাণটারে ফুরাণ ক'রে,
জুড়ান যাবে নূতন ধ'রে ?
ভবিষ্যতের আড়াল তলে কি ফল কে তা জানে?
হবেই না যে, সে-টাই খাঁটি
সুধার লোভে বিষের বাটি
দিশের ভুলে চুমুক দিয়ে মর্‌বো কেন প্রাণে ?

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত।

বৈদেশিকী।

প্রেম পরীক্ষা যন্ত্র।

পাশ্চাত্য-দেশে বিবাহ-বন্ধন এত বেশী পরিমাণে ছিন্ন হইতেছে যে শুধু এই বিষয়ের বিচারের জন্য ভিন্ন বিচারক ও কোর্টের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হইতেছে। সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ "ডাইভোর্সে'র" সংখ্যা দেখিয়া প্রমাদ গণিতেছেন। বৈজ্ঞানিকগণও যে নিশ্চিন্ত নহেন তাহা "কার্ডোমিটার" যন্ত্রের উদ্‌ভাবনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্যারিসের একজন বৈজ্ঞানিক এই যন্ত্রটা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রেম-পরীক্ষা চলিবে। যুবক যুবতীগণ সাময়িক ভাব প্রবণতায় বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরে অনেকে অনুতাপ করেন; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে যদি ইহারা প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রেমের গাঢ়ত্ব বুঝিতে পারেন তবে পরে অনুশোচনা করিতে হইবে না।

এই "কার্ডোমিটার" যন্ত্র দ্বারা স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজনা যন্ত্রে অঙ্কিত হয়। প্রেম, ক্রোধ, শোক ইত্যাদি স্বতন্ত্র ভাবে যন্ত্রে প্রকাশিত হয়। যন্ত্রের নির্ম্মাতা বলেন—ইহাদ্বারা অনায়াসে লোকে পরস্পরের মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিবে। প্রকৃত প্রেম সূচক চিহ্ন যন্ত্রে অঙ্কিত হইলে লোকে অনায়াসেই এই প্রেম খাঁটী কি না বুঝিতে পারিবে সন্দেহ নাই; ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা কমিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণই হইবে। এই যন্ত্রে প্রেমের আবেগের মাত্রা যত খানি উঠিবে, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত ধরিয়া সেই আবেগের স্থায়িত্বের কাল নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নির্দ্ধারিত কাল ঠিক হয় কি না কালে তাহা অবশ্যই জানা যাইবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, জ্যোতিঃ-সিদ্ধান্ত।

বৃষ্টির ফোটা।

নগণ্য বৃষ্টির ফোটা যাহা গায়ে পড়লে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করি তাহারা যে কি আশ্চর্য্য কার্য্য সমাধা করে মিঃ উইলিয়াম পিক বি, এস, সি, (Mr. Pick B. Sc., F. R. A. S. ect.) গ্লাসগো হেরেল্ডে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

একটী বৃষ্টির ফোটা কেবল মাত্র জল সমষ্টি নহে। উহার অভ্যন্তরে হয় একটী ক্ষুদ্র ধূলি-কণা কিম্বা অন্য কোন-

রূপ আগন্তুক পদার্থ থাকে ভূবায়ুর জলীয় বাষ্প একত্রিত হইয়া জল বিন্দুতে পরিণত হইতে একটু আগন্তুক পদার্থের প্রয়োজন ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। যে কোন পদার্থকে কেন্দ্র করিয়াই যে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইবে তাহা নহে। এই কেন্দ্রস্থ পদার্থটীর জল আকর্ষণের ক্ষমতা (Hygroscopic) বিশেষ আকারের হওয়া প্রয়োজন। ভূবায়ুতে এইরূপ ধূলিকণা প্রচুর পাওয়া যায়।

এই জলবিন্দু যাহা ভূমিতে পতিত হয় তাহার পরিমাণ কখন ⅕ ইঞ্চির অধিক হয় না।

আর একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে যখন এই জলবিন্দু বিভক্ত হইয়া দুইটি কিম্বা ততোধিক হয় তখন উহাতে পজিটিভ্ (positive) বিদ্যুতের উদ্ভব হয় এবং উহার পার্শ্বস্থ ভূবায়ুতে নিগেটিভ্ (negative) উৎপন্ন হইয়া থাকে। নানা কারণে এই জলবিন্দু পুনঃ বিচ্ছিন্ন এবং একত্রিত হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রতিবারেই নূতন বিদ্যুত উৎপন্ন হইতে থাকে। যদিও একটি বিন্দু বিচ্ছিন্ন হইতে অতি সামান্য মাত্র বিদ্যুৎ উদ্ভূত হয় কিন্তু ইহাদের পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন এবং একত্রিত হওয়াতে যে সমবেত বিদ্যুতের সৃষ্টি হয় তাহার ফলেই নভোমণ্ডলে ভীষণ বজ্রনাদ বিজলীর উদ্ভব হয় এবং বজ্রপাত হইয়া থাকে

মেঘের সময়ে যে রামধনু উদ্ভূত হয় তাহার কারণ এই জলবিন্দু, এই ক্ষুদ্র জলবিন্দুর দ্বারাই সূর্য্যরশ্মির বিভিন্ন বর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

ইলেক্‌ট্রোন।

প্রকৃতির রাজ্যে অনু সকল বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে আমরা বিশাল শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারি বলিয়া পুস্তকে পাঠ করিয়া থাকি কিন্তু আমরা অনেকেই অবাক হইয়া থাকি—এই শক্তি কোথা হইতে আসে। একখানা তিন পেনি মুদ্রার ভিতরে এরূপ শক্তি আছে যে যদি আমরা উহা সংগ্রহ করিতে পারি তবে উহা দ্বারা অত্যন্ত ভারী রেলগাড়ী লণ্ডন হইতে এডিন্‌বার্গ পর্য্যন্ত চালনা করিতে পারা যায়। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে ইলেক্‌ট্রন্ আমাদের অপরিজ্ঞাত ছিল এখন দেখিতেছি এই ইলেক্‌ট্রনেতেই আমরা মহাশক্তি পাইয়া থাকি। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ওজন পরিমাপ এবং গণনা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বস্তু সকল যে অনুদ্বারা নির্ম্মিত একমাত্র ইলেক্‌ট্রনই তাহাদের উপাদান। এখন কথা এই—অনু কত বড়? নিম্নে একটী উদাহরণ দ্বারা বিবৃত করিয়া ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এক বালতি জল নিয়া সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়া তিন চারি বৎসর অপেক্ষা করি যাবৎ না উহা স্রোতাদি দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তৎপর সমুদ্রের যে কোন স্থান হইতে এক গ্লাস জল গ্রহণ করি। এখন ঐ জলে পূর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত বালতির জলের ১ লক্ষ অনু প্রাপ্ত হইব, ইহাতে অনুর সূক্ষ্মতা অনুমান করিতে পারিলাম। ইলেক্‌ট্রন এই অনু হইতেও দুই লক্ষ গুণ সূক্ষ্ম। তাহা হইলে এক আউন্স জলে দশলক্ষ কোটিকে ১০০ কোটি দ্বারা পূরণ করিলে যে ফল হয় এ গুণ ফলকে ৫৪০ কোটি দ্বারা গুণ করিলে যাহা হয় তত ইলেক্‌ট্রনেরও অধিক থাকে। অঙ্কে দেখাইতে হইলে ৫৪ এর পিছনে ২৭ টী শূন্য যোগ করিলে যে সংখ্যা হয় তত। অন্য কথায় বলিতে গেলে ২ হাজার ৫ শত কোটি ইলেক্‌ট্রন্ এক লাইনে রাখিলে ১ ইঞ্চি লম্বা হইতে পারে।

অনু একটী ক্ষুদ্র সৌর জগতের মত। ইহার অভ্যন্তর ভাগকে সূর্য্য কল্পনা করা যাইতে পারে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ যেরূপ পরিভ্রমণ করে সেইরূপ এই বিন্দুর অনুপাতে তত দূরে কল্পনাতীত বেগে ইলেক্‌ট্রন্ পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে এই ধারণাতীত বেগে ভ্রাম্যমান ইলেক্‌ট্রন্‌কেই অনু বলা হইয়া থাকে। অনুর আভ্যন্তরিক কাল্পনিক বিন্দুতে পজেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং ইলেক্‌ট্রনে নিগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি থাকে। এই কেন্দ্রস্থ পজিটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি ইলেক্‌ট্রন সমূহকে স্বস্থানে আবদ্ধ রাখে কিন্তু ইলেক্‌ট্রন্ পরস্পরকে অপরিসীম বেগে সর্ব্বদা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। এই অপরিসীম বেগে ইলেক্‌ট্রনের পরস্পরকে দূরে রাখিবার চেষ্টার মধ্যেই অনুর গুপ্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। যদি আমরা অনুর কেন্দ্র হইতে ইলেক্‌ট্রন্ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতাম তাহা হইলে ইহার এক আউন্স ইলেক্‌ট্রন্ অপর এক আউন্স ইলেক্‌ট্রন্‌কে ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

টন্ বেগে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিবে। যদি আমরা এই দুই ভাগ ইলেক্‌ট্রন্‌কে পৃথিবীর দুই কেন্দ্রে স্থাপন করি তাহা হইলে একে অপরের উপরে ৫০০ কোটি টনের শক্তি প্রয়োগ করিবে। এই শক্তিতে পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কেবল তাহা নহে ইহা দ্বারা ৯ কোটি মাইল দূরস্থিত সূর্য্য মণ্ডলের বিমুক্ত ইলেক্‌ট্রন্‌কে এক সেকেণ্ডের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে আলোড়িত করিতে পারে। একখণ্ড পাথরকয়লার মধ্য হইতে যদি আমরা একটী ইলেক্‌ট্রনকে বিচ্যুত করিয়া কার্য্যে লাগাইতে পারি তাহা হইলে আমরা আমাদের সমস্ত কয়লার খনি হইতে এক বৎসরে উত্তোলিত কয়লার দ্বারা যে কাজ না পাই ঐ এক বিন্দু ইলেক্‌ট্রন দ্বারা সেই কার্য্য পাইতে পারি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা একটি অণুকে আমাদের সূর্য্য মণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে সুন্দর সাদৃশ্য আছে। কেন্দ্রস্থিত সূর্য্য পজিটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটিতে পূর্ণ এবং গ্রহাদি নিগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটিতে ভরপুর; সেজন্য পৃথিবীকে ৩০ কোটি ভোল্টের একটী নিগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটির আধার বলা যাইতে পারে। একটী অণুর ইলেক্‌ট্রনের তুলনায় পৃথিবী সৌর জগতের একটী ইলেক্‌ট্রন্ বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র মণ্ডল সহ সমস্ত জগতের তুলনায় এই সৌর জগৎ একটী অণুর সহিত উপমিত হইতে পারে। ইলেক্‌ট্রনের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আমরা অনুমান করিতে পারি এই জগতে কিরূপ কল্পনাতীত শক্তির কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা।

"প্রভাতী" শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

এখানি একখানা ধর্ম্মোপদেশ মূলক গদ্যে পদ্যে লিখিত গীতি কাব্য। গ্রন্থকারের হৃদয়ে ধর্ম্মজগতের ও কর্ম্মজগতের যে সব চিন্তার ধারা উদিত হইয়াছিল তাহাকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি, গ্রন্থকারের প্রভাতের বিমল চিন্তাধারা সরস, প্রাঞ্জল ভাষার ভিতর দিয়া শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, পড়িতে পড়িতে মনে এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাবের উদয় হয়। যাহারা সৎচিন্তা ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে চাহেন তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের বিভীষিকা নাই। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই মনোরম।

বিক্রমপুরের মেয়েলী ব্রত কথা—শ্রীমতী হীরণবালা দেবী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ছয় আনা। প্রকাশক ঢাকা বীণা পাব্লিশিং হাউস। ইহাতে মাঘমণ্ডল, পুণ্যি ব্রত, তুষ তুষাণি ব্রত প্রভৃতি বিক্রমপুর নিবাসী বিভিন্ন লেখক ও লেখিকার লিখিত বিক্রমপুরের ত্রিশটী বার ব্রতের নিয়ম ও কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। বার ব্রতগুলি এক সময় গার্হাস্থ্য জীবনের সুখ ও শান্তি-চিন্তার উপায় ছিল—সমাজের ধর্ম্মহীনতা ক্রমে সে গুলিকে লুপ্ত করিয়া দিতেছে। ফলে প্রাচীন গৃহীণীদিগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ভাবের সহিত ধর্ম্ম কথা এবং রীতিগুলি ও হিন্দু পরিবার হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অনেক ধর্ম্মরক্ষা পরায়ণ পরিবারে ইচ্ছা সত্বেও কেবল ব্রত-পালির রীতি ও কথাজানা লোকের অভাবে ব্রত রক্ষা হইতে পারিতেছে না। এই ব্রত কথা সে অভাব পূরণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কথাগুলি বেশ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"মহিম্নঃ স্তোত্রম্"—শ্রী সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত। মূল্য একটাকা মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ভবনে,—কলিকাতা শ্যামবাজার ব্রিজ রোডে পুস্তক প্রাপ্তব্য।

হিন্দুর নিকট মহিম্নঃস্তোত্র এক পরম উপাদেয় জিনিষ। যেমন গীতা হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র মন্থনোদ্ভূত অমৃত তেমনি এই মহিম্নঃস্তোত্র স্তবের কোহিনূর। আজ যে যুগধর্ম্মের সমন্বয় বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিঘোষিত এবং সর্ব্বত্র যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়া "যত মত তত পথ" এই পরম উদার ভাব প্রকাশ করিতেছে তাহা এই মহিম্নঃ স্তোত্রেরই অংশ বিশেষ।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নাথ পথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ই ॥"

এই অংশটুকুতে হিন্দু ধর্ম্মের যাহা বিশেষত্ব এবং পরম তত্ব তাহা বিবৃত হইয়াছে। এটুকু মহিম্নঃস্তোত্রের অংশ। এই স্তোত্রে দর্শনের গভীর তত্ব আছে। পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। এই স্তোত্রখানি অত্যন্ত কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য এজন্য সংস্কৃতে ইহার ৩২ খানা টীকা আছে।

সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় কঠোর পরিশ্রম করিয়া এতগুলি টীকার সন্ধান করিয়াছেন এবং প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া নিজে অতি সরল ভাষায় প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদসহ এই সংস্কৃত টীকা ও তাৎপর্য্য দিয়াছেন। যেখানে দার্শনিক তত্ব আছে সেখানে সাধারণের উপযোগী করিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে পৌরাণিক উপাখ্যানের আভাস আছে তথায় বিস্তৃত ভাবে পৌরাণিক উপাখ্যান সহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মোটের উপর গ্রন্থকার গ্রন্থখানাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যত্নের কিছু মাত্র ত্রুটী করেন নাই। ভূমিকাতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে প্রায় ২০ বৎসর নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া এতগুলি টীকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় গ্রন্থখানা কিরূপ অধ্যবসায়ের ফল। প্রত্যেক ধার্ম্মিক গৃহস্থের গৃহেই মহিম্নঃস্তোত্র পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হওয়া উচিত। একটী প্রার্থনা স্তোত্রে কত গভীর তত্ত্বের সমাবেশ থাকিতে পারে ও আছে তাহা প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করিয়া দেখা উচিত। আমরা আশা করি এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র আদর হইবে।

সাহিত্য সংবাদ।

হেমনগর হিতৈষী—সচিত্র পারিবারিক পত্রিকা; সপ্তম বর্ষ—শারদীয় সংখ্যা। শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ সম্পাদিত। আকার ডাবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা।

এই সচিত্র পত্রিকাখানা গত সাত বৎসর যাবত প্রতি শারদীয় পূজার পূর্ব্বে একখণ্ড করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কেবল হেমনগর জমিদার পরিবারের পরিজনেরাই লিখিয়া থাকেন। এইরূপ পারিবারিক পত্রিকা বঙ্গদেশে নাই—ইহা এ জেলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। আজ যে ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্য চর্চ্চায় বাঙ্গালার জেলা সমূহের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হেমনগরের সাহিত্য চর্চ্চায় এই সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানও তাহার অন্যতম কারণ। বর্ত্তমান সময় ময়মনসিংহের জমিদার পরিবারগুলি শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার জমিদার পরিবারগুলির চেয়ে উন্নত। তন্মধ্যে ময়মনসিংহের সুসঙ্গের রাজপরিবার ও হেমনগরের জমিদার পরিবার শিক্ষা বিষয়ে আদর্শ স্থানীয়। এই দুই পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। আরো সুখের বিষয় এই যে ইঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্য চর্চ্চায় ব্রতী আছেন। আমরা হেমনগর জমিদার পরিবারের সাহিত্য সেবীগণের এই অনুষ্ঠানটীর অভিনন্দন করিতেছি এবং ইহার জন্য গৌরব অনুভব করিতেছি। সংখ্যাখানা ছাপা, কাগজে ও চিত্রে এবং প্রবন্ধ গৌরবে উপভোগ্য হইয়াছে। একুশটী প্রবন্ধের মধ্যে ৪টী মহিলাদিগের রচিত। আশা করি হেমনগর হিতৈষীকে অচিরে ক্রমে ত্রৈমাসিক ও অতঃপর মাসিকরূপে দেখিতে পাইব।

ময়মনসিংহ ছত্রপুর হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ কবিভূষণ পুনরায় "সমাজবান্ধব" প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে "সমাজ-বান্ধব" পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত চলিয়া বন্ধ হয়। এইবার পুনরায় তাহা নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। ইহা একখানা মাসিক পত্র। আকার ডিমাই ৮ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

গত ১৬ই আশ্বিন শুক্রবার লক্ষ্মী-পূর্ণিমা রজনীতে গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের ২য় বার্ষিক ৬ষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুকবি শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি-এ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বাগছি বি-এ, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বি-এ, প্রভৃতি।

Shourabh—Reg. No.C 745.

ত্রয়োদশ বর্ষ ।　　অগ্রহায়ণ—১৩৩২　　একাদশ সংখ্যা ।

সম্পাদক

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার ।

বিষয় সূচী

বার্ষিক মূল্য—　　ময়মনসিংহ ।　　—দুই টাকা ।

ত্রয়োদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ একাদশ সংখ্যা।

রোগ ও আরগ্য।

(শেষ অংশ)

এই অতিযোগ ঔষধ প্রয়োগ আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। নিত্য মাংস ভোজী সুরাসেবী পশ্চিমের আসুর-প্রকৃতি লোকের তীক্ষ্ণ বীর্য্য সুরা-বহুল ঔষধ, আমাদের পূর্ব্ব দেশের উদ্ভিজ্জ ভোজী শান্তপ্রকৃতি লোকের পক্ষে যে অতিযোগ হইয়া যায় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। যে দেশে এক কালে "কপাট বক্ষ পরিনদ্ধ কন্ধর", "শালপ্রাংশু মহাভুজ" ছিল, সে দেশে ইদানীং অধিকাংশ লোকেরই যৌবনের পূর্ব্বেই চাল্‌শে ধরে, যৌবনারম্ভে কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু, উন্নতপঞ্জর বক্ষ, সন্নত দেহ। এখন যদি কালিদাস জন্মিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে "কপাট বক্ষ পরিনদ্ধ কন্ধর" না লিখিয়া "কপোত বক্ষ কৃকলাস কন্ধর" লিখিতে হইত।

ইহার জন্য কেবল মাত্র বাল্য বিবাহ দায়ী নহে। এদেশে যখন এক সময়ে "দশমে কন্যকা প্রোক্তা তদূর্দ্ধন্তু রজঃস্বলা" বলিয়া অষ্টবর্ষে গৌরীদান করা হইত, তখনত এরূপ ছিল না। তখনকার অকাল মাতা ও অকাল পিতারা দেখিতে পাই এখন দিদিমা ও দাদামহাশয় হইয়া বিনা চশমায় সূঁচে সূতা পরাইতেছেন। পঞ্জিকার অস্পষ্ট লেখায় দিন দেখিতেছেন। এখনকার যুবকদেরও সন্দেশের খোসা ফেলিয়া না খাইলে হজম হয় না, দাদা মহাশয় কিন্তু একাদশীর দিন এক দিস্তা রুটি দ্বারা উপবাস করেন। আর ৵০ আনার পয়সা বাজেখরচের ভয়ে দশক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া জেলায় গিয়া মোকদ্দমা করেন, দিদিমা নিরম্বু একাদশীর পর দিন নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া পারণ করেন। তখনও দেশে মশা ছিল, ইন্দুর ছিল।

ফলতঃ পশ্চিমের আব্‌হাওয়া আমাদের শিক্ষা দীক্ষায় আচার ব্যবহারে একটা বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। তাহাতেই আজ আমাদের এই দুর্গতি। আমরা জানিয়াও জানি না পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যত প্রভেদ, উহাদের সর্ব্ব বিষয়েই তত প্রভেদ। তথাপি আমরা তাহার অন্ধ-অনুকরণ করিয়া রসাতলে যাইতেছি। ইহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। জীব মাত্রেই শক্তির পূজা করে। এই জন্য যখন যে জাতি বিজিত হয় সে বিজয়ী জাতির সমস্তই ভাল দেখে। মুসলমান যখন আমাদের দেশের রাজা ছিলেন তখন দেশবাসী তাঁহাদের আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিতেন। এই জন্য শিবাজী ও রাজসিংহ নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও চিত্রে দেখিতে পাই তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও উপবেশন ভঙ্গী মুসলমানের ন্যায়। বর্ত্তমানে ইংরাজ আমাদের রাজা, আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের অনুকরণ করিতেছি।

যে দেশের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলে—

"অম্ভসঃ প্রসৃতান্যষ্টৌ পিবন্ রবৌ অনুদিতে।
বাত-পিত্ত রোগান্ হিত্বা জীবেৎ বর্ষশতং নরঃ॥"

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আট অঞ্জলি জল প্রতি দিন পান করিলে বায়ু পিত্তজনিত সমস্ত রোগ দূর হইয়া মানব শতবর্ষ জীবিত থাকে।

আজ কিনা সে দেশে প্রাতে উষ্ণ চা পান চলিতেছে। যে দেশে প্রহরাতীত বেলা না হইলে দিবালোক সুস্পষ্ট হয় না, প্রহরাধিক বেলা থাকিতেই সন্ধ্যার সূচনা হয়, সেই

অল্প দিনের দেশের লোকের অনুকরণে এই সুদীর্ঘ দিনের দেশের লোক আমরা বড় দিনের উৎসব করি। ভুক্ত মাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে দৌড়াইয়া যাই। ভাবমিশ্র বলেন—

"মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥"

ভোজনান্তে দৌড়াইলে মৃত্যু তাহ'র পশ্চাতে দৌড়ায়।

নিদাঘের খরতাপে পশ্চিমের সভ্যতার অনুরোধে আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া ঘার্ম্মাক্ত কলেবরে উত্তাপের অতিযোগ করিতেছি। এইরূপে শৈশবে বিদ্যাগারে প্রবেশাবধি অকাল মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আচারে ব্যবহারে শিক্ষায় দীক্ষায় নানা প্রকারে এই অতিযোগের আঘাতে জীবনী শক্তিকে অতিরিক্ত উদ্দীপিত করিয়া হীনবল হইয়া পড়িতেছি। প্রত্যহ নানাপ্রকারে নব নব ব্যধির আক্রমণে জীবনের অবসান হইতেছে!

প্রসঙ্গক্রমে মূল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

কথা হইতেছিল ঔষধের অতিযোগের। অল্প ঔষধে যেমন রোগ আরোগ্য হয় না, অতিরিক্ত ঔষধে তদপেক্ষাও বেশী অনিষ্ট করে। যে পরিমাণ রোগ সেই পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন কোন দ্রব্য দগ্ধ করিতে এক মণ কষ্ঠের প্রয়োজন, সে স্থলে অর্দ্ধ মণ দিলে তাহা দগ্ধ হইবে না; আবার দুই মণ দিলে এক মণ কাষ্ঠে তাহা দগ্ধ হইয়া অবশিষ্ট এক মণ অনর্থক জ্বলিবে। সেইরূপ অতিরিক্ত ঔষধের অনর্থক ক্রিয়ায় যে শরীরের সামান্য অনিষ্ট হইবে তাহা নহে। উহা রোগ অপেক্ষা শরীরের বিশেষ হানি করিবে। পুনরায় তাহার প্রতিকার কল্পে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক অনিষ্ট হইবে।

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট করিতেছি। মনে করুন একটি অতিসার রোগীকে ১ রতি অহিফেন প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হইতে পারিত, সে স্থলে ½ রতি অহিফেন প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইবে না বটে, কিন্তু রোগ ভিন্ন অন্য উপসর্গ আনয়ন করিবে না। এক রতি স্থলে যদি ২ রতি অহিফেন প্রয়োগ করি তবে অতিরিক্তি অহিফেন প্রয়োগ জন্য যে কোষ্ঠবদ্ধ উদারাধ্মানাদি উপসর্গ উপস্থিত হইবে তাহা প্রশমন জন্য পুনরায় সারক ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক হইবে। একবার ধারক ক্রিয়া করিয়া পর মুহুর্ত্তে তদ্বিপরিত সারক ক্রিয়া করণ-জন্য জীবনী-শক্তি এক কালে দুইটি বিপরীত সংঘর্ষে বিষম উদ্দ্রিক্ত হইবে। তাহাতে অতি যোগ অপেক্ষায় অধিক অনিষ্ট হইবে। নিরবচ্ছিন্ন শৈত্য বা উষ্ণতায় যত না অনিষ্ট করে, একবার শৈত্য পরক্ষণেই তদ্বিপরীত উষ্ণতায় তদপেক্ষা সমধিক অপকার করে। এই জন্য হেমন্ত ও বসন্ত কালে লোক যত অধিক পীড়িত হয়, শীত বা গ্রীষ্ম ঋতুতে এত হয় না। তাহার কারণ সেই সময় দিবা ভাগে উত্তাপ ও রাত্রে শীত অনুভূত হয়। সে জন্য শীতারম্ভের শীত অল্প হইলেও যুগবৎ শৈত্য ও উষ্ণতার সংঘর্ষে ঐরূপ অসহ্য হয়।

বরং অল্পযোগ তত অনিষ্টকারী হয় না। এক রতি অহিফেন প্রয়োগ স্থলে অর্দ্ধ রতি অহিফেন প্রয়োগ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে না বটে কিন্তু তাহাতে অতিযোগ জন্য কুফল ফলিবে না। একটি দ্রব্যকে দুই হাত দূরে সরাইয়া দিতে হইলে, যে পরিমাণ বলে ঠেলা দিলে তাহা দুই হাত দূরে যাইবে, তদপেক্ষা যদি অল্পবল প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে তাহা দুই হাত দূরে যাইবার পূর্ব্বেই থামিয়া যায়। তখন তাহাকে পুনরায় ঠেলা দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পেঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দ্রব্যটি যদি অতিরিক্ত বল প্রয়োগে নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা অধিক দূরে সরিয়া যায়, তবে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিতে হইলে বিপরীত গতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

মশা গালে বসিলে চড় মারিলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু মুদ্গরাঘাত করিলে মশা মরিবে বটে, গালটি বোধ হয় নিরাপদ হইবে না।

অতিযোগ জন্য কেবল মাত্র পশ্চিমের চিকিৎসাই দায়ী নয় আমাদের দেশেও অতিযোগী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব নাই। এমন চিকিৎসক যথেষ্ট আছেন, যাঁহারা যে কাসি "চন্দ্রামৃতে" সারে তাহাতে, "শৃঙ্গারাভ্র" বা "সার্ব্বভৌম" ব্যবস্থা করিয়া বসেন। "চন্দনাদি লৌহের" রোগীকে "বিষমজরান্তক' বা "জয় মঙ্গল" ব্যবস্থা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থা মনে করেন। "চতুর্মুখে" যদিও এ রোগ আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু

"বৃহৎ বাতচিন্তামণি" দিলে আরও ভাল হয়। ইহা যে কতদূর অনিষ্টকর তাহা বোধ হয় আমার এতক্ষণ চীৎকারের ফলে সুধীবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছেন।

"অধিকন্তু ন দোষায়" চিকিৎসাক্ষেত্রে খাটে না। এই ঔষধে স্বর্ণ নাই, বা ইহাতে দ্বিগুণ স্বর্ণ আছে বলিয়া যে অতিরিক্ত কার্য্যকরী হইবে এমন কোন কারণ নাই। রক্তহীনতায় স্বর্ণঘটিত ঔষধ অপেক্ষা লৌহ ঘটিত ঔষধে অধিক উপকার হয়। অম্লপিত্ত রোগে যখন বুক জ্বালা করে তখন সহজ-লভ্য ক্ষার প্রয়োগেই উপশমিত হয়; বহু মূল্য স্বর্ণভস্ম প্রয়োগে হয় না।

"তদেব ভৈষজ্য মন্যতে যদারোগ্যায় কল্পতে।"

তাহাই ঔষধ—যে আরোগ্য করে। অর্থ আছে বলিয়া দামী ঔষধ খাইলে চলিবে না। সোণার জাঁতিতে সুপারি কাটা চলে না। সুগন্ধি তৈল মাখিলেই যথেষ্ট হয়, পয়সা আছে বলিয়া বহু মূল্য আতর সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দেখিতে পারেন। আজকাল ঔষধের মূল্য সস্তা হওয়ায় অনেক চিকিৎসক বেশী মূল্য আদায়ের জন্য "চতুর্ম্মুখের" স্থলে "বৃহৎবাতচিন্তামণি" ব্যবস্থা করেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। "আমি যখনই দেখি কোন রোগী মস্তকে "হিমসাগর তৈল", বক্ষে "সারচন্দনাদি তৈল", উদরে "শ্রীবিল্ব তৈল", পদে "গুড়ুচ্যাদিতৈল", সর্ব্বাঙ্গে "মহানারায়ণ তৈল" মাখিতেছেন; দক্ষিণ নাসিকায় "ষড়বিন্দুতৈল" এবং বাম নাসিকায় "দশমূল তৈলের" নস্য লইতেছেন এবং "নারায়ণ তৈলের" অনুবাসন করিতেছেন। প্রাতে "কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ", তাহার এক ঘণ্টা পরে "মাষালাদি পাচন", ভোজনের আদিতে ভাবনার "ধাত্রীলৌহ", মধ্যে "পাকের ধাত্রীলৌহ", ভোজনান্তে "ভাস্কর লবণ", বৈকালে "বৃহৎবাত চিন্তামণি", সন্ধ্যায় "যোগেন্দ্র রস", রাত্রে "রসরাজ" সেবন করিতেছেন, তখন সেই রসরাজকে দেখিয়া আমি যে কেবল হাস্য সংবরণ করিতে পারি না তাহা নহে। চিকিৎসার চূড়ান্ত করিতেছি ভাবিয়া তাহার মুখে যে আত্মপ্রসাদের ছবি ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিয়া বস্তুতই আমার দুঃখ হয়। এইসব কৃপা পাত্রদের উপযাচক হইয়া উপদেশ দিতে গেলে তাঁহারা কর্ণপাত করেন না। বরং অযোগ্য বিবেচনায় অবজ্ঞা করেন। সে স্থলে "না পৃষ্টঃ ব্রূয়াৎ" (জিজ্ঞাসিত না হইলে কথা বলিবে না) মনুর এই নীতি অনুসারে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়। পাদরী সাহেবের অযাচিত করুণা সকল স্থলে খাটে না।

চরক বলেন—

"তিষ্ঠেৎ উপরি যুক্তিজ্ঞো দ্রব্যজ্ঞানবতাং সদা"।

যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসক ঔষধজ্ঞ চিকিৎসকদিগের শিরোভাগে স্থান পাইয়া থাকেন।

যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসক স্বল্প ঔষধ প্রয়োগের পক্ষপাতী। যাহা বিনা ঔষধে আরোগ্য হইবে তাহাতে তিনি ঔষধ প্রয়োগ করেন না। যে রোগ মুষ্টিযোগে সারে তাহাতে পাচন দেন না। পাচন সাধ্য রোগে ধাতু ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করেন না। একবার ঔষধ প্রয়োগে যে রোগ আরোগ্য হয় তাহাতে দুইবার ঔষধ দেন না। দুইটি ঔষধে রোগ সারিতে পরিলে তিনটির ব্যবস্থা করেন না। এক দিনে চারিটির অধিক ঔষধ প্রয়োগ করেন না। তাহাতে অনেক ভূমানন্দ প্রকৃতির লোক—যাঁহাদের "নাল্পে তোষমস্তি" তাঁহারা সে সমস্ত চিকিৎসককে পছন্দ করেন না।

বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যখন যাবতীয় রোগ হয়, তখন তদ্দোষ প্রশমক তিনটি মাত্র ঔষধে সকল রোগ আরোগ্য হয় এমন দিন যদি কখন আসে তখনই চিকিৎসার পূর্ণ পরিণতি হইবে। "বাইওকেমিক্‌" চিকিৎসায় বারটি মাত্র ঔষধে যখন সমস্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে তখন আয়ুর্ব্বেদের সহস্রাধিক ঔষধ না হইলে চিকিৎসা চলিবে না—ইহা গৌরবের কথা নহে।

প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যাইতেছি। চিকিৎসক দুই প্রকার। ঔষধজ্ঞ ও যুক্তিজ্ঞ। ঔষধজ্ঞ চিকিৎসক জ্বরে "জ্বরান্তক", শূলে "শূলগজেন্দ্র", কাসে "কাসকুঠার" ব্যবহার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসক দোষ ও দুষ্যের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন। এজন্য তিনি বহু চিকিৎক পরিত্যক্ত কাস-রোগ হয়ত অজীর্ণ রোগের ঔষধে আরোগ্য করিয়া ফেলেন। ঔষধজ্ঞের ন্যায় অন্ধ চিকিৎসা করেন না।

ঔষধজ্ঞ চিকিৎসক কেবল ঔষধের উৎকর্ষ খুঁজিয়া বেড়ান। জ্বরে "চন্দনাদিলৌহে" আরোগ্য না হইলে

"সর্ব্বজ্বরহরলোহ" দেন। তাহাতে বিফল হইলে "বিষম জ্বরান্তক' ব্যবস্থা করেন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে "জ্বরমঙ্গল" ব্যবস্থা করেন। তাহাতেও যদি ফল না হয় তবে শিবের অসাধ্য বলিয়া নিরাশ হন। কিন্তু যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসক যুক্তি বলে অনুধাবন করিয়া ঔষধান্তর প্রয়োগে আরোগ্য সাধন করেন।

রোগের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম হইতে পারে না।

চরক বলেন—

"বিকার নামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।

ন হি সর্ব্ব বিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবাস্থিতি॥

চিকিৎসক রোগের নাম নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। সমস্ত রোগের কখন নির্দ্দিষ্ট নাম হইতে পারে না।

সুশ্রুতও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—

"নাস্তি রোগঃ বিনা দোষৈর্যস্মাৎ, তস্মাৎ বিচক্ষণঃ।

অনুক্তমপি রোগানাং লিঙ্গৈর্ব্যাধি মুপাচরেৎ॥"

ত্রিদোষ কুপিত না হইলে কোন রোগ হয় না; অতএব বুদ্ধিমান চিকিৎসক অনুক্ত ব্যাধির লক্ষণ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিবে।

সুতরাং আমাদের দেশে "নিমোনিয়া" ছিল না, "প্লেগ" ছিল না বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার চিকিৎসা চলিবে না তাহার কোন হেতু নাই। আমাদের দেশে পশ্চিমের লোকেরা আসিবার পূর্ব্বে "নিমোনিয়া" "ব্রঙ্কাইটিস" ছিল না বটে, কিন্তু ঐরূপ রোগ ছিল। "ওয়াটার" ছিল না, কিন্তু জল যে ছিল না তাহা নহে।

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে—

"রোগমাদৌ পরিক্ষেত ভেষজং তদনন্তরং।"

আগে রোগ পরীক্ষা, পরে ঔষধ প্রয়োগ। তবে রোগ নির্ব্বাচন না হইলে চিকিৎসা হইবে কিরূপে?

রোগ কি? লক্ষণের সমষ্টিই রোগ। রোগ কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় নহে। লক্ষণ দেখিয়াই আমরা রোগ স্থির করি। যখন কোন ব্যক্তির রক্তাক্ত শ্লেষ্মাময় মল কুন্থন সহকারে পুনঃ পুনঃ নির্গত হয় তখনই তাহাকে রক্তপ্রবাহি (রক্তামাশয়) বলি। আর যখন তাহা থাকে না তখনই তাহাকে আরোগ্য বলি। সুতরাং রোগের নাম নির্দ্দেশ হইলেও লক্ষণ দূর করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য।

আমরা কাহার চিকিৎসা করিব? রোগে এই কয়টি দেখিতে পাই নিদান পূর্ব্বলক্ষণ এবং লক্ষণ নিদান অর্থাৎ রোগৎপত্তির কারণ। কারণের চিকিৎসায় কখন রোগের বিনাশ হইতে পারে না। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুতের কারণ; কুম্ভকারকে বিনাশ করিলে ঘটের বিনাশ হইবে না। অতিরিক্ত শৈত্য প্রয়োগে প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) হইয়া ক্রমে সর্দ্দি হইতে কাস হইয়াছে। এখানে কাসের কারণ শৈত্য সেবনের চিকিৎসা করিলে কাস সারিবে না। পূর্ব্বরূপ সর্দ্দির চিকিৎসা করিলেও হইবে না। তবে কি বর্ত্তমান লক্ষণের চিকিৎসা করিব? তাহাতেও হইবে না। লক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল, তাহার চিকিৎসা হইবে কিরূপে? তবে কি করিতে হইবে? আমরা কাহার চিকিৎসা করিব? আমরা রোগের চিকিৎসা করিব না, আমরা চিকিৎসা করিব রোগীর। নদী গর্ভে ঝড় উঠিলে নৌকার প্রতি উপেক্ষা করিয়া মাঝি যদি ঝড় থামাইতে যায় তবে নৌকা রক্ষা হইবে না। মাঝির কর্ত্তব্য নৌকা রক্ষা করা; ঝড় নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনিই থামিয়া যাইবে

রোগ শরীরস্থ উপাদানের কোন হানী না করে আমরা তাহারই প্রতিকার করিব। নৌকা উপেক্ষা করিয়া ঝড় থামাইতে যাওয়া ভারতীয় চিকিৎসা নহে। এজন্য এ দেশের উন্নত যুগের চিকিৎসা গ্রন্থ চরক সুশ্রুতাদিতে রোগের ঔষধ অপেক্ষা রোগের প্রতিষেধক উপায় অধিক বর্ণিত হইয়াছে।

"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্।"

গায়ে পাঁক মাখিয়া ধোয়া অপেক্ষা পাঁক না মাখাই ভাল।

হে আদি বৈদ্য ধন্বন্তরি, এস! এই অতিযোগ প্লাবিত দেশে আবার আসিয়া বল—

"অহংহি ধন্বন্তরিরাদি দেবো

জরা রুজামৃত্যুহরোঽমরানাম্।

শল্যাঙ্গমঙ্গৈরপরৈরুপেতম্

প্রাপ্তোঽস্মি গাংভূয় ইহোপদেষ্টুম্॥"

আমি ধন্বন্তরি, আমিই আদিদেব বিষ্ণু। অমর

দিগের জরা রোগ ও মৃত্যু আমিই হরণ করিয়া থাকি। এক্ষণে শল্যাদি অষ্টাঙ্গ সমন্বিত চিকিৎসার উপদেশ দিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি।

শ্রীসুরজিৎদাস গুপ্ত।

ময়মনসিংহ আয়ুর্ব্বেদ সভার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

প্রবীণের আবেদন।

নবীন! আজিকে প্রবীণ হিয়ার বেদনা,
লহ, নব আতিথ্যে নব কারুণ্যে ঢাকিয়া!
আজি, হৃদয় মথিয়া উঠিছে হরষ বেদনা!
দূর অতীতের স্মৃতি জাগিছে থাকিয়া থাকিয়া!
ছিল, আমারো যে হায়! তোমাদেরি মত,
তরুণ পরাণ আশা কত শত,
কত মনোরথ ভরিয়া সকল ভাবনা!
ছিল, কল্পনা কত স্বপন কুহেলী মাখিয়া!
ছিল, আমারো সোণালী গুল্ রঙ্গীন সবুজে,
চারু, চিত্ত-কানন শোভা সৌরভে ভরিয়া!
মম, পেলব পরশ প্রসারিত কত বনজে,
কত, মুগ্ধ মধুপ রহিত যেন গো মরিয়া!
ছিল, আমারো কুঞ্জে মুখর কোকিল,
মলয় পরশে পুলকিত দিল্,
অফুরাণ শোভা, অফুরাণ মধু সরোজে!
বিধু, অরুণে আলোর নির্ঝর যেত ঝরিয়া!

ওগো, আজিকে জ্যোৎস্না শারদ মাধুরী মিলনে!
কম, হিয়া তোমাদের উছলি উঠিছে যেমতি,
ছিল, আমাদেরো সেই অতীত তরুণ জীবনে,
ভাবে, আবেশিত প্রীতি উচ্ছল হিয়া তেমতি।

ছিল, তোমাদেরি মত আমাদেরো প্রাণ,
কাহার প্রণয়ে সদা ভাসমান,
কাহার হাসিটি—কাহার আনন কিরণে,
কার সরোজ-চরণে টানিত হৃদয় এমতি!

আজি, ভুলিয়াছি সেই মধু কল্পনা পশি বাস্তব ভুবনে!
" হারায়েছি সেই মধুর স্বপন লভি জাগরণ জীবনে!
তবু, চির সুখময় তাহার আবেশ,
সেই উন্মদ মদিরতা রেশ,
হৃদয়ে চমকি উঠে থাকি থাকি, পুলকিয়া মধু স্মরণে!
যেন মনে হয় নাহি তার লয় জীবনে অথবা মরণে!

ওগো সুতরুণ! ওগো সুকুমার! আজি এ মিলন বাসরে!
মিলি; তোমাদের কম হিয়া সাথে সব দুখ চিত পাসরে!
সেই গতাতের স্মৃতি সুধা পানে,
অভয় সুখের চির জয় গানে,
আজি তোমাদের উৎসবময় পূর্ণ প্রীতির পাথারে!
ঢালি দু'বিন্দু আনন্দ নীর বন্দি জগত ধাতারে।

করি বিভুপদে কুশল কামনা আজি এ প্রবীণ জীবনে!
রহ, সুচির পুলকে প্রেমের দ্যুলোকে চির-বাঞ্ছিত সদনে!
যেন তোমাদের আনন্দবাণে,
প্রতিকূল টান কেহ নাহি আনে,
চিরনির্ভয় আনন্দময় হৃদয়-কুঞ্জ-ভবনে!
রহ নিশি দিশি প্রীতিরসে ভাসি চির পূর্ণিমা মিলনে॥

শ্রীহেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী।

সাহিত্যে ভূমিকম্প।

একটি প্রবল ভূমিকম্পে যেরূপ সৌধরাজি ভগ্ন হয়, তদ্রূপ অসৎ সাহিত্যেও সমাজের উন্নত আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। সাহিত্য সমাজ ভিত্তির অন্যতম। সাহিত্যই জাতির পথ প্রদর্শক, উন্নতির লক্ষ্য স্থল, শিক্ষার মেরুদণ্ড; এক কথায় মানব জীবন বিকাশের প্রধানতম সোপান। সাহিত্য সাধনা নিষ্কাম ধর্ম্ম। তাহা অহিংস নির্ম্মল এবং পবিত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যে আবর্জ্জনা-উচ্ছৃঙ্খলতা বা কলুষতা থাকা বিকাশত্বের পরিচায়ক কি না বিবেক বুদ্ধি সহকারে বিচার্য্য। প্রত্যেক জাতিরই সাহিত্য আছে, যে দেশে আর্য্যের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া বেদ দণ্ডায়মান,

পৌরাণিক সাহিত্য "সত্যং শিবং সুন্দরং" বলিয়াই যুগ যুগান্তরের কাল-ঝঞ্ঝার কত প্রবল প্রতিঘাতেও জাতির ললাট হইতে মুছিয়া যায় নাই; এখনও তাহা উজ্জ্বলরূপেই জাতির শিরোপরি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। জাতি, ধর্ম্ম, দেশ এবং সাহিত্য—ইহাদের সমবেত সামঞ্জস্যই "জাতীয়তা"। এই জাতীয়তার সহিত প্রত্যেক জীবেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিজড়িত। মানুষ মাত্রেরই জন্মিবা মাত্র জাতিগত একটা অধিকার বর্ত্তে, তাইত প্রত্যেক মনুষ্যই স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে "আমার জাতি"। এরূপ দেশগত এবং ধর্ম্মগত অধিকারও জীবের স্বাভাবিক। তাই দেশ, ধর্ম্ম এবং জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করাই মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।

আমি সামান্যা অবলা, এ বিদ্বজ্জন সমাজে আমার পক্ষে অধিক বলা ধৃষ্টতা মাত্র; তবু জাতিগত অধিকারের দাবী ধরিয়া, নারী হৃদয়ের বেদনা লইয়া আমি সুধী জন সমক্ষে উপস্থিত হইলাম; আশা করি, সুধীজন আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যের যতটা প্রসার ঘটিয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে কখনও তত ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই সাহিত্যের আবার শাখাভেদ আছে—তন্মধ্যে উপন্যাস সাহিত্য সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য। এই উপন্যাস সাহিত্যের এতটা প্রসারতা বাঙ্গালার পক্ষে নূতন বটে। কেহ কেহ এই গর্ব্বে আজ স্ফীত-বক্ষ, এই আমোদ-আস্ফালনে উন্মত্ত! তাই বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের গৃহে গৃহে আজ নভেলের ছড়াছড়ি। বঙ্গনারীরাও তাই আজ নভেলেই আসক্ত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংহিতাদি আর তাহাদের কাজে লাগে না, কেন না তাহারা যে আজ জাগ্রতা রমণী? উপন্যাসের মধ্যে সকল উপান্যাসই "মন্ত্রশক্তি", "মা", "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে" গোরা কিম্বা সেই "রাজর্ষি" "স্বর্ণলতা" "দেবী চৌধুরাণী" নয়। বাঙ্গালার তরুণ তরুণীরা এখন জীবন-টাকে "নভেলময়" করিতে বসিয়াছেন; তাঁহারা মনে করিয়াছেন ইহাতেই পরম আনন্দ। মানব জীবন চরিতার্থ করিবার এমন পন্থা বুঝি আর নাই। তাঁহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে,—ভোগের সুখ—সুখই নহে, তাহাতে শুধু আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া চলে, তৃপ্তি নাই— সন্তোষ নাই, শুধুই তৃষ্ণা।

যখন সকলেরই উপন্যাসে এতটা ঝোঁক পড়িয়াছে, তখন সেই উপন্যাস সাহিত্য যদি নির্ম্মল, পবিত্র এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে সমাজের কল্যাণের পরিবর্ত্তে, উন্নতির বিনিময়ে, অকল্যাণ এবং অধোগতিরই সম্ভাবনা অধিক। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্রাট, সাহিত্য গুরু ঔপান্যাসিক-গণ সাহিত্যক্ষেত্রে আর্টের নামে সমাজের "হার্টফেলের" যে বীজ বপন করিতেছেন, তাহা কি একবার তলাইয়া দেখিবার নহে? গল্প উপন্যাসের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে যে আর্টের ছড়া ছড়ি দেখা যায়, তাহাতে সত্যই মনের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগিয়া উঠে "এটাকি আর্টেরই সাম্রাজ্য? শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "মানুষের জন্য আর্ট, না আর্টের জন্য মানুষ"? সিংহ মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন, "যোদ্ধা অপেক্ষা তাহার তরবারি বড় হইলে, অনর্থকই রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা।" এই আর্টের সম্বন্ধে সত্য সত্যই এ যুক্তি প্রযোজ্য; ইহা কিছু মাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

শুনিতে পাই এটা নাকি নারী জাতির পরম উন্নতির যুগ; আবার নারী স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতী করিবার, পুরুষদের একটা প্রবল আগ্রহও কাগজে পত্রে সভাসমিতি ও বক্তৃতাদিতে বেশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহাও আবার দেখিতে পাই, নারীর মাহাত্মটাকে—নারীর সর্ব্বস্ব সতীত্ব রত্নকে, নিপুন শিল্পীগণ শিল্প কৌশলে কেমন খর্ব্ব করিয়া, আর্টের সফলতা সাধন করিতেছেন! ইহাই কি নারীপ্রিয়তার লক্ষণ? দেশের—জাতির দুর্ভাগ্য, বিশেষতঃ হিন্দু সাহিত্যিকদের দুর্ভাগ্য তাঁহারা কিনা আজ ত্যাগময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রবল লিপ্সা ফোটাইয়া, নারীর উচ্ছৃঙ্খল নগ্ন ছবির রঙিন আলোয় আত্মহারা। তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন যে, ইহা সীতা সাবিত্রীর দেশ, ইহা ত্যাগশীল আর্য্যের দেশ,—অরুন্ধতী, অনুসূয়া, গার্গী মৈত্রীর দেশ। পদ্মিনী, কর্ম্মদেবীর দেশ, ব্রহ্মচারিণী লীলা এদেশের রমণী কিন্তু "রমা" "মাধবী" এদেশের নিজস্ব নয়, উহা আমদানী করা মাত্র।

জানি না বঙ্গ রমণীর ততটা অবনতি হইয়াছে কিনা যে পাশ্চাত্য ঢঙে, আজই তাহাদের চরিত্র বিকাশ

করিতে হইবে। হইতে পারে পাশ্চাত্য রমণীগণ শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরীমা প্রভৃতি গুণে বরেণ্যা। "সংযম ত্যাগ ও পাতিব্রত্য এদেশের রমণীদেরই একচেটীয়া বলা অন্যায় হইলেও এ সাধনায় আর্য্য রমণীগণ যত সিদ্ধা, অন্য কোন দেশের কোন রমণীগণ তত নহেন। এ সাধনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সাবিত্রী বেহুলা। ইহাই দুঃখ, ইহাই বেদনা যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুনের দেশের, শিবাজী, পৃথ্বী, প্রতাপাদিত্যের জন্মভূমির পুরুষেরা সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতা, খনা, লীলা, পদ্মিনী, কর্ম্মদেবীর অংশীভূতা নারীগণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া, নারী চরিত্রে ভোগের লিপ্সা, উচ্ছৃঙ্খলতার লালসা ফুটাইয়া তুলেন। হায়! তাঁহারা কি তাঁহাদের মা বোনের দিকে, কন্যার দিকে তাকাইয়া তাঁহাদের ত্যাগের —নিঃস্বার্থতার—সংযমের দৃষ্টান্ত দেখিতে পান না? বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি জ্ঞান নহে, কিন্তু নীতি জ্ঞানের যে উদ্দেশ্যে কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যে গৌণ উদ্দেশ্য চিত্তোৎকর্ষ সাধন চিত্তশুদ্ধিঃ জনন কবিরা জগতের শিক্ষা দাতা. কিন্তু নীতি ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধিঃ বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কি প্রকারে কবিরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধি করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে কি সে? সৌন্দর্য্য! অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য যে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারিরীক সৌন্দর্য্য নহে তাহা সকল প্রকারের সৌন্দর্য্যই বুঝিতে হইবে।" সেই বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা, বাণীর বরপুত্র, ঔপন্যাসিকের অগ্রণী, সাহিত্য সম্রাট যাহা বলিয়া গিয়াছেন; আজকালকার নব্য সাহিত্যিকদের নিকট তাঁহাদের সেই অগ্রণী এবং সেই পথ প্রদর্শক সাহিত্যিকের অমোঘ বাণী, কতদূর সমাদৃত হইতেছে তাঁহারাই বলিতে পারেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মুন্সীগঞ্জের অধিবেশনে সভাপতি মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কবি পরদারাপহারী রাবণ বা পরস্বাপহারী দুর্য্যোধনকে অঙ্কিত করিলেন, তাহার পার্শ্বে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রামচন্দ্র ও ধর্ম্মের অবতার যুধিষ্ঠিরের চিত্রও নয়ন সম্মুখে ধরিলেন, মূর্ত্তিমতী পতি দেবতা সীতা ও স্বৈরিণী সূর্পণখার চিত্রদ্বয়ও একত্র দেখিতে পাইলাম, কবি বেত্রপাণি হইয়া গুরু মহাশয়ের ন্যায় বলিলেন না একের অনুকরণ কর, অপরের করিও না। কিন্তু চিত্রগুলি এমন ভাবেই অঙ্কিত হইল, যে আমাদের চিত্ত স্বতঃই রাম যুধিষ্ঠির সীতার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে অবনত হইয়া পড়িল। রাবণ সূর্পণখার কথায় সমস্ত অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল।"

"কুন্দ কপালিনী সুর্য্যমুখী শৈবলিনী শান্তি দেবী রাণী যদি একালের আর্টের শক্তি স্বীকার না করিয়া, চিরসৌন্দর্য্যময়ীরূপে আজিও বর্ত্তমান থাকিতে পারে; তবে কাজ কি একটা বৈদেশিক আদর্শের অপমন্ত্রকে জপ করিয়া?"

শ্রীপূর্ণিমাপ্রভা রায়।

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত।

আকুলতা।

আজি এ মন চল্‌ছে ভেসে,
 কোন্ অচেনা সুদূর দেশে;
কাহার তরে অশ্রু বারি
 কিছুই আমি বুঝ্‌তে নারি,
মন ছুটেছে পথিক বেশে!
যদি কেউ নেয় গো ভুলে,
 আদরে প্রেম নদীর কূলে
পথ শ্রান্ত পান্থ বলে
 সুধায় মোরে ভালবেসে,
(তাই) মন ছুটেছে পথিক বেশে!
কোন্ দেশের যে মলয় হাওয়া,
 আন্‌ছে তাহার "গানটী গাওয়া,"
খুঁজে যারে যায় না পাওয়া
 লুকিয়ে থাকে কোথায় বা সে?
(আজ) তাহার মনে নাই যে চিনা,
 প্রাণটী তাহার আছে কি না,
শ্রাবণ রেতের ঘন মেঘে
 বিজলীতে সে উঠে হেসে!
(আমার) মন ছুটেছে পথিক বেশে!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

রামায়ণের দেবতা। (২)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নাম যে পরবর্ত্তী যুগের প্রক্ষিপ্তকারদিগের দ্বারা রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন জন্য রামায়ণ হইতে এইরূপ শত শত স্থানের রচনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে আপাততঃ আর দুইটী মাত্র স্থানের দুইটী প্রার্থনার উল্লেখ করিতেছি।

হনুমান লঙ্কায় সীতার অন্বেষণ করিতে প্রস্তুত হইয়া দেবতাগণের নাম লইয়া প্রণাম করিতেছেন—

বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপিচ।
নমস্কৃত্বা গমিষ্যামী ... ... ॥৫৭।৫।১৩

অর্থ—বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, মরুদগণ ও অশ্বিনী-কুমার দ্বয়কে প্রণাম করিয়া গমন করিতেছি...ইত্যাদি!

এখানেও সেই বৈদিক তেত্রিশ দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণুর ও শিবের উল্লেখ একেবারেই নাই!

হনুমান বনে প্রবেশ করিয়া কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালে পুনরায় প্রণম্যদিগকে প্রণাম করিলেন—

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈচ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র যমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নি মরুদগণেভ্যঃ॥ ৬০
সতেভ্যস্তু নমস্কৃত্য সুগ্রীবায় চ মারুতিঃ।
দিশঃসর্ব্বাঃ সমালোক্য সোঽ শোকবনিকাংগতঃ॥৬১।৫।১৩

হনুমান, রাম, লক্ষ্মণ সীতা, রুদ্র, ইন্দ্র, যম, অনিল, চন্দ্র, অগ্নি, মরুদগণ এবং সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া অশোক বনে প্রবেশ করিলেন।

এই সকল সাময়িক ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হইবে, বাল্মীকির যুগ বৈদিক ভাবাপন্ন—অতি প্রাচীন যুগ। পৌরাণিক যুগের প্রভাব অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কিম্বা স্ত্রীদেবতাগণের প্রভাব তখন একেবারেই ছিল না।

রামায়ণে স্তব, স্তুতি ও উপাসনার কথা আছে এবং হোম দ্বারা যজ্ঞ করিবার কথা আছে—তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। কিন্তু উপাস্য দেবতার স্থানেই গোলমাল। কোথাও বিষ্ণুর নাম প্রদত্ত হইয়াছে, কোথাওবা নারায়ণের নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সেই নারায়ণকে "মধুসূদন" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। কোথাওব সূর্য্য উপাসনার কথা আছে। কৌশল্যা যে পুত্রের ইষ্ট কামনায় বিষ্ণু পূজা করিয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। রামও নাকি সেইরূপ অভিষেকের পূর্ব্ব দিন সংযম করিয়া স্বীয় উপাস্য নারায়ণ (?) দেবতার ধ্যান করিয়াছিলেন। সে স্থলের বর্ণনাটী এইরূপ—

ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে॥৩
বাক্ চত সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়ত মানসঃ॥
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিষ্যে নরবরাত্মজ॥৪

* * *

তত্র শৃণ্বন্ সুখা বাচঃ সূতমাগধ বন্দিনাম্।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ॥৬
তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্।
বিমল ক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান॥ ৭।২।৬

অর্থাৎ রাম বাক্‌যত হইয়া একাগ্র মনে নারায়ণের ধ্যান করিয়া বিষ্ণু মন্দিরে কুশ আস্তরণে বৈদেহীর সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। ... ভোরে সূত মাগধ ও বন্দিগণের বন্দনাবাক্যে জাগ্রত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা অন্তে মন্ত্র জপ করিলেন। পরে ক্ষৌমবাসে ভূষিত হইয়া নত মস্তকে মধুসূদনকে স্তব করিয়া দ্বিজগণ কর্ত্তৃক স্বস্তি বাচন করাইলেন।

যুগধর্ম্মের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া এবং কৈকেয়ী, কৌশল্যা ও হনুমান প্রভৃতির উক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া বিচার করিলে উপরি উদ্ধৃত বর্ণনার অমূলকতা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। রাজা দশরথের আদেশেও রামকে সীতার সহিত সংযত চিত্তে উপবস্তব্যেরই কথা আছে—বিষ্ণু পূজার কোন উল্লেখ নাই। উপবস্তব্য বা উপবাস অর্থ "গার্হপত্য অগ্নি সমীপে বাস"। (৩০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কোন বিষ্ণুভক্ত প্রক্ষিপ্তকার পূর্ব্বাপর লক্ষ্য না করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবণতায় অন্ধ হইয়া এস্থলে রামকে নারায়ণের পূজা করাইয়া বৈদেহীর সহিত একেবারে বিষ্ণু মন্দিরেই শয়ান করাইয়াছেন।

এই পাঠে নারায়ণকে বিষ্ণু এবং উভয়কে মধুসূদন নামে পরিচিত করা হইয়াছে।

নারায়ণ বৈদিক দেবতা নহেন। ঋক বেদের দুইটী ঋকে জল প্লাবনের কথা আছে। ঐ প্লাবনে দেবতাগণ অণ্ড মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। ঐ অণ্ড একটা জন্ম রহিত কিছুর উপর অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তী কালের শ্রৌত সাহিত্যে তাঁহাকেই 'নার'(জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার—তিনি নারায়ণ—এই নামকরণ করা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী উপনিষদ সমূহে নারায়ণ পরম পুরুষ বাচ্যে অভিহিত হইয়াছেন। ইহার পর আরও আধুনিক কালে তাঁহার নিজ নামেও একখানা উপনিষদ প্রচারিত হইয়াছে; তাহা "নারায়ণ উপনিষদ।" এই উপনিষদে নারায়ণ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। নারায়ণ উপনিষদে তাঁহার ধ্যান এইরূপ—

নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহী তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ১০।১।৬

এই ধ্যান তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দুর্গা গায়ত্রীর অনুকরণে রচিত। দুর্গা গায়ত্রী এইরূপ :—

কাত্যায়ণায় বিদ্মহে কন্যা কুমারী ধীমহীতন্নোদুর্গা প্রচোদয়াৎ।

কথিত আছে যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষদগুলিরই আলোচনা করিয়াছেন এবং নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সে জন্য, তাহার আলোচনায় যে সকল উপনিষদের নাম নাই পণ্ডিতগণ ঐ সকল উপনিষদকে আধুনিক অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। এই যুক্তি খুব নিরাপদ না হইলেও নারায়ণ উপনিষদ যে অনেক পরবর্ত্তী সময়ের রচনা তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেহ কেহ বলেন—ইহা আগম-সম্মত অর্থাৎ তান্ত্রিক প্রভাব যুক্ত উপনিষদ; কেহ বা ইহাকে দক্ষিণা পথের দ্রাবিড় জাতির কল্পিত উপনিষদ বলিয়া মনে করেন।

শতপথ, ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রামায়ণের পরে রচিত। রামায়ণে "ব্রাহ্মণের" নাম আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শাখাব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির নামের উল্লেখ নাই।

বৈদিক যুগের পরে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ পরিচালন জন্য 'ব্রাহ্মণ' রচিত হইয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ মাত্র একখানাই ছিল এবং তাহাই কল্পসূত্র নামে অভিহিত হইত। লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে পরে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শতপথ, ঐতরেয় প্রভৃতি পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার বহু পরে পৃথক পৃথক সমাজের জন্য পৃথক পৃথক কল্প-সূত্রও রচিত হয়।

নারায়ণের "মধুসূদন" নামটী আরও পরবর্ত্তী যুগের কল্পিত—ব্রহ্মা ও মধুদৈত্য সম্পর্কীয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী হইতে উদ্ভূত।

রাবণ বধের পূর্ব্বে রাম সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই উপাসনা বা আরাধনা খুব স্বাভাবিক। কেন না, তিনি তাঁহাদের বংশকে এই সূর্য্য দেবতারই বংশ বলিয়া জানিতেন। সূর্য্য আদি দেবতা—এই জন্যও সভ্য অসভ্য সকল দেশের সকল জাতিরই আদি উপাসনার জিনিস সূর্য্য। সূর্য্যের উপাসনা লইয়া দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যে একটা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কথা কোন কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে যেমন সূর্য্যের উপাসনা আছে, আবেস্তা গ্রন্থেও সেইরূপ সূর্য্যের উপাসনার কথা আছে। আবেস্তার সূর্য্য 'মিথ্র'। 'পারস্য দেশে' মিহর-পূজা প্রচলিত ছিল। মিহর ও সংস্কৃত 'মিহির' এক। পারস্য হইতে সূর্য্য পূজা এসিয়ামাইনরে যায়—ঐ স্থানের প্রাচীন হিটাইট জাতি সূর্য্যোপাসক ছিল। তথা হইতে সূর্য্য পূজা রোমে যায়। ভারতে কুশন-রাজ কনিষ্ক সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। সুতরাং সূর্য্য বংশের কুলবধূ কৌশল্যা যে সূর্য্যেরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যই তখনকার সমাজের উপাস্য দেবতা ছিলেন—ইহা অনুমান করা অসমীচীন নহে। রামও এই উপাস্য দেবতারই স্তব করিয়াছিলেন। রামায়ণের একস্থানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সকলেই যে সূর্য্যস্তব করিতেন তাহার উল্লেখ আছে।

রাম যে রাবণ বধের পূর্ব্বে সূর্য্য উপাসনা করিতে যাইয়া আদিত্য হৃদয় স্তব পাঠ করিয়াছিলেন তাহাও প্রক্ষিপ্ত কারগণের কলুষ হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নাম এই স্তোত্রের শীর্ষেই স্থাপিত হইয়াছে। স্তোত্রটী ঠিক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপর

অত্যাচারী শাসন কর্ত্তাদের নির্ম্মিত মস্‌জিদ চূড়ের মত আদিম, অর্ব্বাচীনের যুক্তচিহ্ন লইয়া দণ্ডায়মান। স্তোত্রটী উদ্ধৃত করা গেল—

"সর্ব্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ।৭
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাংপতিঃ ॥৮
পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনো মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্ত্তা প্রভাকরঃ॥৯
আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ॥১০
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্তষ্টা মর্ত্তণ্ডকোহংশুমান্॥১১
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্কর রবিঃ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ॥১২
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋক্‌যজুঃসামপারগঃ।
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথী প্লবঙ্গমঃ॥১৩
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্ব্বতাপনঃ।
কবির্ব্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্ব্বভবোদ্ভবঃ॥১৪
নক্ষত্রগ্রহতারানামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপিতেজস্বী দ্বাদশাত্মন্নমোঽস্তুতে॥১৫
নমঃ পূর্ব্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ।
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ॥১৬
জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্য্যাশ্বায় নমোনমঃ।
নমোনমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমোনমঃ॥১৭
নমঃউগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমোনমঃ।
নমঃ পদ্ম প্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোঽস্তুতে॥১৮
ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সূরায়াদিত্যবর্চ্চসে।
ভাস্বতে সর্ব্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ॥১৯
তমোঘ্নায় হিমঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে।
কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥২০।৬।১০৬

এই স্তোত্রটী দ্বারা কতকটা একেশ্বরবাদিত্বের ভাব প্রকাশ পায়। সূর্য্যই যেন তখন এমন দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাকে তখন সর্ব্বগুণের, সর্ব্ব শক্তির ও সর্ব্ব ভাবের আধার বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারিত। পৃথিবীর সৌর উপাসকদিগের মধ্যে অবশ্য এ ভাব ছিল, তাই তাঁহারা সূর্য্যকেই পরমপুরুষ জ্ঞান করিতেন। রামায়ণের সমাজে তেমন ভাব ছিল না। সে সমাজ সূর্য্যের উপাসনা করিলেও যজ্ঞে অগ্নিকেই অর্চ্চনা করিত। ইন্দ্রের সম্মানও সে সমাজে ছিল; কিন্তু সূর্য্যও অগ্নির ন্যায় ইন্দ্র তেমন ভাবে পূজিত হইতেন না। ঠিক বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মার ন্যায় ইন্দ্র অবহেলিত ছিলেন। বিষ্ণু ও শিবের ন্যায়, সূর্য্যও অগ্নি পূজা পাইতেন। প্রতি গৃহে গৃহে সাক্ষাৎ যজ্ঞাগ্নি সসম্মানে রক্ষিত ও পূজিত হইত; সুতরাং রামায়ণী যুগেও ত্রিদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল।

রামায়ণের আদিত্য হৃদয় স্তোত্রের ন্যায় মহাভারতেও ইন্দ্র স্তোত্র এবং অগ্নি স্তোত্র আছে। এস্থলে সূর্য্যের উপর যেমন সকল দেবতার সমবেত শক্তি আরুপিত হইয়াছে, মহাভারতেও ইন্দ্রস্তোত্রে ইন্দ্রের এবং অগ্নিস্তোত্রে অগ্নির উপর সেইরূপ হইয়াছে। এই ভাব দ্বারা একেশ্বরত্ব ভাব কল্পনা করা যায় না। আর্য্য সাহিত্যে এ ভাব সনাতন।

বেদে সৃষ্টিকর্ত্তা বিষয়ক চিন্তার আভাস আছে। ঋক্‌বেদের একটী ঋক্ এইরূপ—

"দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারাই শেষ নহেন। ইঁহাদের উপর আরো এক আছেন। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। ... যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

এই ভাব বৈদিক যুগের শেষ ভাগের। এই ভাব তখন কোন কোন ঋষিদিগের মনে জাগিলেও সমাজে তাহা প্রভাব লাভ করিতে পারে নাই। চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতিরও যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, তিনি পরমেশ্বর, পাপ পুণ্যের তিনি বিচার করিবেন—এভাব রামায়ণের কোন স্থানেই নাই। সে ভাব রামায়ণী সমাজের ভাব হইলে রামকে আমরা সূর্য্যের উপাসনা করিতে দেখিতাম না। একেশ্বরবাদের আলোচনা রামায়ণের পরবর্ত্তী দার্শনিক যুগে আরম্ভ হইয়াছিল এবং মহাভারতের সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। তখন গীতা তারস্বরে প্রচার করিলেন—

যে হপ্যন্য দেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তে হপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধি পূর্ব্বকং ॥৯।২৩

অর্থ—ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজন করে সে অবিধি পূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

মহাভারতের অন্যত্র—রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলে ভগ্নহৃদয়া শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন—"পুরাণ মুনি পরমেশ্বর সকলের হৃদয় মন্দিরে সর্ব্বদা জগরুক আছেন। তাঁহার নিকট কোন পাপ থাকে না। পরম পুরুষের কিছুই অবিদিত নাই।"

রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় ভক্তি-যুগের রচনা হইলে এরূপ কথা অনেকের মুখেই শুনা যাইত। কিন্তু রামায়ণের কোন স্থানেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন কথা নাই। রাবণ বধের পর সীতাকে যখন রাম ত্যাগ করিলেন তখন সীতার মুখে এমন কোন কথা বাহির হয় নাই। ইহারও কারণ রামায়ণের যুগ কর্ম্ম-যুগ।

যজ্ঞ, উপাসনা, দান, সত্য পালন, অতিথি-সৎকার প্রভৃতিই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম অনুসরণ দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিত। ইহাই ছিল সেই যুগের ধর্ম্ম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অনুসারেই রামায়ণের সমাজ পরিচালিত হইতেছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে এই সকল কর্ম্মের ফলের প্রতি যখন সন্দেহ আসিয়াছিল—মানুষ দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতেছিল যজ্ঞের ফল, বা কর্ম্মের ফল সকল সময় অভিষ্ট ফল প্রদান করিতেছে না, তখন লোক ক্রমে যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিল।

কর্ম্মের যুগ অন্ধ যুগ; জ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ, বিচারের যুগ। ইহাই দর্শন উপনিষদ প্রভৃতিরও যুগ। যুক্তির পর ভক্তি। রামায়ণে ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা একেবারেই নাই। ভক্তির সম্যক অনুশীলন ব্যতীরেকে ঈশ্বর জ্ঞান অসম্ভব। মহাভারতের যুগ ভক্তি অনুশীলনের যুগ। মহাভারতে প্রচুর ভক্তি-কথা ও ভক্তের কথা আছে। ভক্তের হৃদয়েই বাস করিয়া থাকেন শ্রীভগবান।

রামায়ণের যুগ যে ঈশ্বর-বাদ বা একেশ্বরবাদ বিশ্বাসের যুগ নহে, তাহা প্রদর্শন জন্যই এখানে এত কথা বলা হইল।

রামায়ণের রচনার আদি স্তরে ব্রহ্মারও উল্লেখ নাই। "ব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা রামায়ণে বেদ ও "ব্রহ্মঘোষ" শব্দে বেদ-ধ্বনি বুঝাইয়াছে। প্রজাপতি নির্দ্দেশ স্থলেও ব্রহ্মার নির্দ্দেশ রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্ম শব্দ বা ব্রহ্মা শব্দ বেদে আছে। তাহার অর্থ—ব্রহ্ম—স্তোত্র ও বেদ মন্ত্র এবং ব্রহ্মা অর্থ—স্তোতা, যাজক বা পুরোহিত। সেই বৈদিক অর্থে এখনও ব্রহ্মা শব্দে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদিতে যাজ্ঞিককেই বুঝাইয়া থাকে। ব্রহ্মাকে পুরাণে প্রজাপতি বলা হইয়া থাকে। প্রজাপতি শব্দ বেদে আছে। তাহার অর্থ এক এক স্থানে এক এক রূপ। কোথাও তাহার শক্তি বেশী, কোথাও সামান্য। এক স্থানে তিনি বিবাহের দেবতা। পুরাণে ব্রহ্মাকে এই অর্থেও প্রজাপতি বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্মণ" শব্দ বিভিন্ন বচনে ও বিভক্তিতে ঋক্ বেদে ২৯৩ বার, যজুর্ব্বেদে ৮০ বার, অথর্ব্ব বেদে ৩৬৪ বার উল্লেখিত হইয়াছে। বেদের নিরুক্তকার যাস্ক এই বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রূপের ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা অন্ন, যজ্ঞ, স্তোত্র, হোতৃ, কর্ম্ম, বৃহৎ, বেদ, সত্য, যজ্ঞ প্রভৃতি অর্থ করিয়াছেন। এতৎ ব্যতীত ব্রহ্ম শব্দের আর কোন বিশেষ অর্থ বেদে নাই। থাকিলেও, যাস্ক তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। পরবর্ত্তী কেহ কেহ ব্রহ্মণ শব্দে সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেহ বা উহাকে সূর্য্যের বিশেষণ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া কেহই নির্দ্দেশ করেন নাই। ব্রহ্মণ যে সূর্য্য অথবা সূর্য্যের বিশেষণ তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৈদিক সূর্য্যস্তবটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে,
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।"

রামায়ণী যুগের পর জ্ঞান চর্চ্চার যুগে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সমূহে আমরা ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠ দেবতার স্থানীয় দেখিতে পাই। শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা। এই যুগেই প্রজাপতিত্বে ব্রহ্মার বিকাশ আরম্ভ।
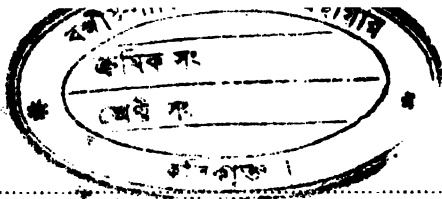
থেরী। *

থেরী একখানি কবিতা পুস্তক। ইহাতে দুইটী গাথা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এই গাথা দুইটী বৌদ্ধ থেরী গাথার ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইলেও কবি নিজ কল্পনার উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন। কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইয়াছে। যিনি এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি পাঠ করিবেন তিনিই কবির শব্দ-যোজনা-শক্তি ও কলা সৌন্দর্য্যের অসামান্য বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। কবির একটী প্রধান গুণ এই যে তিনি অতি অল্প কথায় অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র সমূহ মসীলিপ্ত অক্ষরগুলি হইতে ফুটিয়া মনোহর বেশে আমাদের মানস চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এবং আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

এই কাব্যের প্রথম গাথাটী পূর্ব্বে সৌরভে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় গাথাটী নূতন। এই গাথাটীতে বিমলা নাম্নী একটী নারীর আত্ম বিস্মৃতির কাহিনী (the story of a fallen soul) কবি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বিমলা শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাতুল গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। মাতুল গৃহে বিমলা অতি অনাদরে দিন কাটাইতে থাকে। ধনী মাতুলের একমাত্র গরবিনী কন্যা চিত্রা। মাতুল গৃহে বিমলা "তারি সখীরূপে, না, না তার দাসীরূপে কাটিয়াছে দিন।" একটী পংক্তিতে কবি বিমলার বাল্য জীবনের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। বিমলাকে বিধাতা সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়াও অতুল রূপ লাবণ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। কবি Byron এর ভাষায় বলিতে গেলে এই Fatal gift of beautyই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। চিত্রা ছিল কুরূপা। এক ধনী শ্রেষ্ঠী পুত্রের সহিত চিত্রার বিবাহ স্থির হইল। পাত্র চিত্রাকে দেখিতে আসিল। কিন্তু সহসা বিমলার অসামান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে আত্মহারা হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বিমলাও যুবকের রূপে মুগ্ধ হইয়া গেল। বিমলা মনে করিল তাহার আশা আকাশ কুসুম মাত্র। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বিমলা বুঝিতে পারিল, শ্রেষ্ঠী পুত্রও তাহার সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। একদিন

—"দেখিলাম তাঁর
উৎসুক নয়ন দুটী মুক্ত দ্বার পথে
কাহারে খুঁজিয়া ফিরে! হেরি মোরে যেন
পথ হারা অন্ধকারে হেরিল আলোক!
আঁখি দুটী—দিশা হারা নাবিক যেমন
পাইয়াছে সহসা দেখিতে বনানীর
শ্যাম শোভা,—পাইয়াছে কূল।"

তারপর যুবক একখানি পত্র লিখিয়া বিমলাকে জানাইল "তুমি দিবার ভাবনা মোর, নিশার স্বপন।" দুজনই দুই হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। এ দিকে চিত্রার বিবাহের বিপুল আয়োজন হইতেছে। ভাবী উৎসবের আশায় সকলি উৎসুক। বিবাহের একদিন পূর্ব্বে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্রেষ্ঠী পুত্র একখানি সুসজ্জিত রথ লইয়া পশ্চাৎ দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিল; পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত পাইয়া বিমলা "দ্বিধা হীন অসঙ্কোচে নিতান্ত নির্ভয়ে" সেই যুবকের কণ্ঠ লগ্ন হইয়া মাতুল গৃহ ত্যাগ করিল। আত্মহারা যুবক যুবতী বারাণসী ধামে গিয়া আশ্রয় লইল। এইস্থলে কবি বারাণসীর যে একটী চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। বারাণসী ধামে শ্রেষ্ঠী পুত্র ও বিমলার দিন আনন্দেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু রূপের মোহ কয় দিন স্থায়ী হয়! উদ্দাম যৌবনের ভোগ লালসা চরিতার্থ হইতে কয়দিন লাগে? যুবকের ব্যবহারে তাহার হৃদয়ে বিরাগের ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বিমলার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

—"কোথা হতে ব্যবধান এই অবসাদ?
...... নয়নে নয়নে
হইয়াছে কত কথা, এখন সহসা
আমার নয়নে যদি পড়ে তাঁর আঁখি,
আপনি আনত হয় লজ্জায় সঙ্কোচে!
কেন? কিসের এ লাজ?

একদিন সত্য সত্যই বিমলার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে একদিন রজনী প্রভাতে দেখিতে পাইল—

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত।

——"ভোগে তৃপ্ত বিলাসীর
কণ্ঠাত ছিন্ন মালা সম পড়ে আছে
শূন্য শয্যা পরে!"

হতভাগিনী জ্ঞানহারা উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নৈরাশ্যের তীব্র যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কোথাও তাহার প্রাণ জুড়াবার স্থান মিলিল না। কামুক পুরুষ গুলিতাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র পাছে পাছে ছুটিতে লাগিল। অসহায়া নারী কোথাও লুকাইবার স্থান পাইল না।

—"অনাহারে
অবসাদে শ্রান্তিভরে পথের কিনারে
বিছায়ে অঞ্চলখানি না জানি কেমনে
পরেছিনু ঘুমাইয়া। সহসা জাগিয়া
দেখিলাম শত শত লোলুপ আঁখির
কামনায় ভরা দৃষ্টি একাগ্র আগ্রহে
আছে মোর পানে চাহি। মনে হল যেন
আমার দেহের পাত্রে রূপের মদিরা
নিঃশেষে শুষিয়া লয় ওই দৃষ্টি দিয়া
একি লাজ! ছি ছি যাব কোথা? ত্রস্ত পাদ
ব্যাধভীতা হরিনীর মত ছুটিলাম
যেথা যায় আঁখি।"

বিমলা আত্ম রক্ষার জন্য এক নগরে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু এখানেও সেই উপদ্রব হতভাগিনী ঘৃণা ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল—

—একি জ্বালা!
চারিদিকে সেই শত কৌতুহলী আঁখি
কামনায় জ্বল জ্বল বাসনা লোলুপ।
কে জানিত নগরেও শ্বাপদের বাসা!

বিমলার সরল হৃদয়ে পুরুষ জাতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত হইল। কে তাহাকে আশার সুবর্ণ স্বপ্ন দেখাইয়া তুলাইয়াছে? কাহার স্নেহে ভুলিয়া তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছে! কে তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছে? ভোগ পরায়ণ পুরুষ!

পুরুষ জাতির প্রতি দারুণ ঘৃণায়
তিক্ততায় ভরে গেল মন। কারতরে
এই দশা মোর! অনাহারে ক্লিষ্ট তনু,
স্খলিত চরণ, একান্ত আশ্রয় হীনা,
ঘৃণ্য পথে নাথ বিদ্ধ হয়ে জ্বালাময়
শত শত দৃষ্টির আঘাতে?

নৈরাশ্যের প্রবল তাড়নায় ক্ষুব্ধ বিমলা আহত শার্দ্দুলীর ন্যায় ক্ষিপ্ত ও প্রতি হিংসা পরায়ণ হইয়া উঠিল।

—"ধীরে ধীরে
হৃদে মোর প্রতিহিংসা খুলিয়া কুন্তলী
বিস্তারিল ফণা তার বিক্ষুব্ধ আক্রোশে
পুরুষ জাতির প্রতি লব সব শোধ।
রূপের আগুনে তোরা মরিবি পুড়িয়া?
তাই হোক্।"

অতঃপর বিমলা নগরে রূপের ব্যবসা আরম্ভ করিল। বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় ধনী পুরুষেরা তাহার কৃপা প্রার্থী হইল। অতুল ধনরত্নের অধিকারী হইয়া সে রাজ প্রাসাদ তুল্য মনোহর অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল।

যে জাতির একজন হেলা ভরে মোরে
পিষ্ট করি পদতলে গিয়েছল কেলি;
তাহাদেরি শত শত মোর পদতলে
পড়ে আছে দিবারাতি দলিয়া মথিয়া
বিচূর্ণিয়া গেছি কত তাদেরি হৃদয়।
একটুকু হাসি মোর লভিবার তরে
শূন্য কত কুবের ভাণ্ডার! বহুমূল্য
মাণিক্যে চেয়ে বেশী মূল্যবান্
একটি বিদ্যুৎ গর্ভ কটাক্ষ আমার!

*　　*　　*

দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ সকল মরিতেছে
ছটফটি! কত গৃহে জ্বেলেছি আগুন!

এই পাপের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াও বিমল নারী সুলভ কোমলতা ও সহৃদয়তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় নাই। তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হতভাগ্য পুরুষদিগের শোচনীয় দশা দেখিয়া তাহার মর্ম্মস্থান সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছিল।

"জ্বেলেছি আগুন? কিন্তু কিন্তু ভাবি নাই
আমরি মতন আছে সেই সব গৃহে
ব্যথাময়ী কত নারী।"

বিমলা একদিন শুনিল সারনাথ হইতে জাহ্নবীর তীরে এক ভিক্ষু আসিয়াছেন।

"শত শত নর নারী
প্রত্যুষে সন্ধ্যায় খর রৌদ্র দ্বিপ্রহরে
ঘিরি বসি তাঁর শোনে তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী
অমৃতের বাণী।"

এই কথা শুনিয়া বিমলার গর্ব্বে আঘাত লাগিল।

আমার চরণ ছাড়ি
স্থান লবি আর কোন্ চরণে ছায়ে?
ভিক্ষুরে আনিব মোর চরণের তলে।
পারিব না? এই ভিক্ষু নিতান্ত ভিক্ষুক
ক্লিষ্ট তনু, গুহাবাসী, এই গ্রন্থ কীট,
তারে জয়? বেশী কিছু নয়।

যে ঘাটে ভিক্ষুক থাকেন সেই ঘাটে বিমলা স্নানের ছলে গমন করিল। তাহার রূপের ছটায় জল স্থল আলোকিত হইয়া গেল। বিমলা ভিক্ষুর সাম্নে জাহ্নবীর জলে স্নান করিল—

তারপর সিক্ত বাস
দাঁড়াইনু হেলাভরে সম্মুখে তাঁহার,
বাম পদে করি ভর, লীলা ভরে গ্রীবা
হেলাইয়া, বিচ্ছুরিত রূপের প্রভায়
সম্মোহিয়া শত দৃষ্টি, রবির কিরণ
সিক্ত বসনের তলে সুগৌর কান্তিরে
চুমিয়া লুটিতে ছিল মোর পদতলে!

সদ্যস্নাতা সিক্ত বসনা সুন্দরীর কি অপূর্ব্ব মাধুরী কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ভিক্ষু—"চাহিলেন তুলে দুটী বিশাল নয়ন;
তার মাঝে হেরিলাম কি এক মিনতি
উৎফুল্ল জয়ের গর্ব্বে ফিরিলাম গৃহে।"

ভিক্ষু দুইটী প্রশস্ত চক্ষু হইতে যে করুণ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বিমলার হৃদয় গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিল। তাহার উদ্বেল প্রাণে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—

জয়ী আমি আজ? অথবা এ পরাজয়?
তপঃক্লিষ্ট গৌরতনু শোভিত গৈরিকে,
ওই দুটী পদ্ম নেত্র, প্রশান্ত আনন—
পাষাণে ক্ষোদিত প্রায় হৃদয়ে আমার
কেমনে অঙ্কিত হল নিমেষের মাঝে?
প্রাণ কেন চায়—আমার এ শ্রেষ্ঠ ধন—
এই রূপ রাশি, নিঃশেষে বিলায়ে দিই
ওই ভিক্ষুকেরে? ছিল সাধ আমার এ
চরণের তলে যাহার করিব স্থান,
তারি পদতলে প্রাণ কেন চায় লুটাইতে?

সাধু দর্শনে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিমলার পাপ হৃদয়ে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আসিল। তাহার প্রাণের মর্ম্মস্থলে ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল; বিমলা তখন ও মোহ কাটিয়া উঠিতে পারে নাই। সে—ভিক্ষুকে নিজ কবলে আনিবার জন্য তাঁহাকে আসিবার অনুরোধ করিয়া দাসী দ্বারা তাহার নিকট একখানি পত্র পাঠাইল। এদিকে বিমলা সাজ সজ্জা করিয়া নিজ কক্ষে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভিক্ষু যখন প্রবেশ করিলেন তখন—

ধৈর্য্য আর
নারিনু ধরিতে পড়িলাম ঝাঁপাইয়া
হৃদয়ে তাঁহার। আবেগে বিদ্যুৎ ভরা
একটি চুম্বন আঁকি দিনু ওষ্ঠ তাঁর।

নিষ্কাম নির্ব্বিকার ভিক্ষুক পবিত্র দেহ স্পর্শে বিমলা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সহসা শিহরিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। ভিক্ষু একটী কথা মাত্র উচ্চারণ করিলেন—"হায়! নারি" তাঁহার কোমল কণ্ঠস্বরে যেন দয়ার উৎস উছলিয়া উঠিতেছিল সেই স্পর্শ মনির স্পর্শ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলার জীবনের পরিবর্ত্তন হইল। তাহার পাপ প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া গেল। সে ভিক্ষুর চরণ তলে লুটাইয়া—তাহার উদ্ধারের জন্য কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। দয়ার্দ্র চিত্তে ভিক্ষু কহিলেন—"চল তবে গৃহ ছাড়ি।"

বিমলা তাহার অতুল ধনরত্ন দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিল। আপন ভ্রমর কৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশদাম নিজ হস্তে ছেদন করিল, কঙ্কুম-চন্দন-রাগ কমনীয় দেহ হইতে মুছিয়া গৈরিক বাস পরিধান করিল। তারপর রজনী প্রভাতে "একাকিনী দ্বিধাহীনা ভিক্ষা পাত্র লয়ে" সারনাথের পথে যাত্রা করিল। সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষুর উপদেশে বিমলা ভগবান্ বুদ্ধের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল জ্বালা বিস্মৃত হইল। পতিতা নারী নবজীবন লাভ করিল।

কৃষ্ণদাস বাবুর অপর গাথাটীও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা

"সৌরভে" প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উহারা বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক মনে করিলাম। আমরা এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। কবি আজীবন বাণীর সেবা করিয়া ধন্য হউন ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

মানের কথা।

(কথা-চিত্র)

মান মানে মানকচু নয়। তবে এটা কচুরই মতো একটা কিছু। কচু জলে পেলে পচে, ছাই দিলে বাড়ে, মানও আপ্যায়ন অপেক্ষা অবজ্ঞায় বেশী বেড়ে উঠে।

রাজার দুয়ার দিয়ে যাওয়ার রাস্তা; রোজ দু'বেলা আনাগোনা করি। আমায় চেনে সবাই, তাই কেউ কেয়ার করে না।

এক দিন দেখি—এক দ্বারোয়ান সেলাম কর্‌লে আমাকে দেখে। লোকটা নূতন। আমার চেহারা একটু ভদ্রমস্তর দেখে, রাজ বাড়ী চাকরি করি মনে করেছে।

সেই থেকে লোকটা দেখ্‌লেই সেলাম করে। আমিও আমার চাল্‌চলনে তাকে জান্‌তে দেই না যে আমি সেলাম পাওয়ার হক্‌দার নই। মন্দ কি! ধাপ্পা দিয়ে যদি এমন একটা কিছু আদায় করা যায়।

ক'দিন পরে সে যখন জান্‌তে পার্‌ল আমি রাজার নফর নই, স্কুল মাষ্টার! তখন থেকে সে সেলাম ত করেই না বরং বেশী অবজ্ঞার ভাব দেখায়।

এর মানে কি! মানে হোলো আমা হ'তে এত দিন যে প্রতারণা পেয়ে এসেছে, সে তা সুদ শুদ্ধ শোধে নিতে চায়।

চেয়ে দেখি এই হেনেস্তার ছাই পেয়ে আমার মান বেশ বেড়ে উঠেছে, যখন সে সেলামের পানিতে ডুবে ছিল তা'র চাইতে।

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

—*—

রাস।

ব্রজলীলা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের লীলা; যখন কৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১১ বৎসর ইহা সর্ব্ববাদী সম্মতি ক্রমে সত্য। তিনি যে যুগের লোক ছিলেন সেই যুগে ১১ বৎসরের ছেলের ভিতর কামের উদ্দীপনা অসম্ভব। অথচ এই লীলাকে অনেকে কুৎসিত ভাবে দেখিয়া থাকেন। তিনি গোপ বালক ও গোপীনীদের সহিত যে ক্রীড়া করিয়াছেন তাহা, তাঁহারা বলে চপলতা প্রসূত চিত্তবৃত্তি চরিতার্থের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। সে স্থলে তাহার চরিত্রে দোষারোপ করা যে কত দূর বিগর্হিত কার্য্য তাহা সহজেই অনুমেয়। হরি বংশে রাসলীলা বর্ণনা পাঠে ইহা ভিন্ন আর কিছুই ধারণা করা যায় না। তথায় আছে—

> কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্টা নিশি চান্দ্রোমসোনবম্।
> শারদীযঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি॥
> স করীষাঙ্গ রাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্য্যবান্।
> বৃষাণাং জাত দর্পাণাং যুদ্ধানি সম যোজয়ৎ॥
> গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোজয়া মাস বীর্য্যেবান্।
> বনে স বীরো গাশ্চৈব গ্রাহবৎ বিভুঃ॥
> যুবতী গোপ কন্যাশ্চ রাত্রেই সঙ্কাস্য কালবিৎ।
> কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ॥

কৃষ্ণ শারদীয় নিশাকালে চন্দ্রমার নূতন যৌবন এবং রাত্রির সুন্দর শোভা দর্শন করিয়া ক্রিয়া করিতে মনন করিলেন। বীর্য্যবান কৃষ্ণ শুষ্ক গোময় দ্বারা রঞ্জিত ব্রজের পথে গর্ব্বিত বৃষ সকলকে পরস্পর যুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। বলবান গোপালদিগকে মল্ল যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন, নিজে বনের ভিতর যাইয়া গো দিগকে অবরোধ করিলেন এবং যুবতী গোপবালাদিগকে তথায় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কৈশোরোচিত চপলতা রক্ষা করিয়া আমোদ করিয়াছিলেন। কৈশোরকং মানয়ন টিকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন। কৈশোর বয়স্থোবিতং চাপল্যং অনুকুর্ব্বণ।

এই রাস তিনি যে একাকী করিয়াছিলেন তাহাও নহে তাহার সহিত গোপালকগণ ত ছিলই এমন কি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম ও ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা—

সহ রামেণ মধুরং অতীব বণিতা প্রিয়ং।
জগৌ কলপদং সৌর্বির্ণ না তন্ত্রী কৃত ব্রতম্‌॥

সৌরি অর্থাৎ কৃষ্ণ রামের সহিত নানা ললিত তান সমুত্থান করিয়া রমণী দিগের অতিপ্রিয় কল শব্দ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বংশী বাদন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে আরও বর্ণনা আছে যে কৃষ্ণ স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছিলেন এবং গোপ কন্যাগণ গান করিয়া করিয়া নৃত্য করিতে করিতে একবার দূরে যাইতেছিল এবং একবার সম্মুখে আসিতেছিল। ঐ প্রকার উক্তি যদি রাস সম্বন্ধে পাওয়া যায় তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যের পরিচয় কোথায়? এ প্রকার বিশুদ্ধ বাল্য আমোদ প্রমোদকে যদি অশ্লীল বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইতে গর্হিত কার্য্য আর কি আছে? ব্রজাঙ্গনাদের সহিত যদি কৃষ্ণের অশ্লীল ভাবই থাকিত তাহা হইলে শাণ্ডিল্য সূত্রে, নারদ সূত্রে ভক্তির চরমোৎকর্ষতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে যাইয়া গোপীদের ভাব ভক্তির উল্লেখ করা হইত না এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শেষ জীবনে, এই কুৎসিৎ ব্যবহারের কথা বারংবার উল্লেখ করিয়া লোকজনকে অহেতুকী ভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন না। মহাভারতেও তাঁহার বাল্য জীবনে কলঙ্ক স্থাপন করিয়া কোন শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায় না। তিনি লম্পট বলিয়া তাহার সম সাময়িক কোন লোকের মুখে প্রকাশিত হয় নাই এমন কি তাহার পরম শত্রু কংসও শিশুপাল প্রভৃতি রাজাগণ তাহার নিন্দা এবং অনেকানেক ভর্ৎসনা করিয়াছেন কিন্তু লম্পট বলিয়া বা পরদারাভিমর্ষক বলিয়া কেহই তিরস্কার করেন নাই।

এই কুৎসিৎ ভাব প্রচারের জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার ই সর্ব্বতো ভাবে দায়ী। যদিও তাঁহার এপ্রকার ইচ্ছা আদৌ ছিল না তথাপি তাহার বর্ণনাতিশয্যে এবং ভাব প্রকাশের ভঙ্গীর প্রাবল্যে নানা কুৎসিৎ ব্যবহারিক ভাষার প্রয়োগ করায় এই অশ্লীল ভাব প্রকৃষ্টরূপে তাহার গ্রন্থেই প্রকট হইয়াছে। তৎপর আধুনিক গ্রন্থ জয়দেবের গীত গোবিন্দ ও এই ভাব প্রকাশের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কবিত্ব হিসাবে গীত গোবিন্দ অতি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভের উপযুক্ত হইলেও ইহাতে অশ্লীল ভাষা ও ভাবের প্রয়োগ হেতু শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে অযথা কলঙ্ক অলক্ষ্যে অর্পিত হইয়াছে। এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই আজ বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের এত অধঃপতন ও তাহারা লোক চক্ষে এত ঘৃণ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে একস্থানে আছে শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যপায়ী শৈশবাবস্থায় একদিন নন্দ তাঁহাকে নিয়া গোচারণের মাঠে গিয়াছিলেন হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় তথায় সমুপস্থিতা রাধিকা হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া যশোদার নিকট নিয়া যাওয়ার জন্য তাহাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু রাধিকা অর্দ্ধ রাস্তা অতিক্রম করিলে শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর অবস্থা ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা আসিয়া তথায় তাহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া যান তৎপর তাহারা যথেচ্ছা চারণ করিলে অনেক সময়ান্তে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার নিকট লইয়া উপস্থিত হয়। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল মাত্র দেড় বৎসর। দেড় বৎসর বয়স্ক বালকের উপর একটা দোষারূপ করা কি প্রকার যুক্তি সঙ্গত ইহা সহজ বোধ্য।

এই কথা কেহ বলিতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ছিলেন, অতএব তাঁহার ইচ্ছাক্রমে দেড় বৎসর বয়সেও যুবক বা কিশোর হইতে পারেন। তাহাকে ভগবান বলিয়া মানিয়া নিয়া পুন তাহার চরিত্রে ঐ প্রকার কলঙ্ক আরোপ করাটা কেমন মনে হয়? ভগবান যিনি নিষ্কাম, নির্ব্বিকার, গুণাতীত, তিনি পুন ইন্দ্রিয়বশ হইতে পারেন ইহাই বা কি প্রকার?

হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ এই তিন গ্রন্থ পাঠে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রদোষ বিষয়ক কোন কিছু পাওয়া যায় না। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তি ভাবের প্রাচুর্য্য বেশ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবের বিশ্লেষণ এত বেশী করা হইয়াছে যে তাহার মাধুর্য্য বাড়াইতে যাইয়া হলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে।

ব্রজগোপীদের ভাব ও ভক্তি কি প্রকার পবিত্র এবং উচ্চ ভাবাপন্ন তাহা চৈতন্য, রামানুজ প্রভৃতি ভগবদ্‌-ভক্তদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট অনুমিত হইবে। ব্রজের ভাবে মজিয়া, ব্রজের ভাবে রাধা কৃষ্ণ ভজনা করিয়াই চৈতন্যদেব অবতারে পরিণত হইয়াছেন। রাস লীলা যদি কার্য্যতঃ কুৎসিৎ ব্যাপারই হইবে, তবে তাহার প্রতিমা গড়িয়া বৈষ্ণব-শাক্ত-নির্ব্বিশেষে এত যুগ-যুগান্তর কাল যাবত লোকে পূজা করিয়া আসিত না—তাহা

অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত, কারণ পাপ-কার্য্যের স্থায়ীত্ব কম এবং পরিণাম বিষময়।

শ্রীকৃষ্ণ যে সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময় বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের সন্ধিস্থল ছিল। এই তিন প্রকারের উপাসনা নিয়া ধর্ম্মজগতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এই তিন ধর্ম্মেরই সমান আদর করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছেন। এবং গীতায় লিখিত জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি যোগের প্রকৃত অনুষ্ঠান দ্বারা লোক শিক্ষার জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যে, যে প্রকার যোগের অধিকারী সে সেই প্রকার কার্য্য করিয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে এই শিক্ষা দেওয়াই যেন তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প ছিল। তাই তিনি বাল্যকালে বৃন্দাবনে অশিক্ষিত গোপগোপীদের নিকট ভক্তি যোগের ক্রিয়া, মথুরা ও দ্বারকায় কর্ম্মযোগের ক্রিয়া এবং পাণ্ডবদের সহিত জ্ঞানযোগের ক্রিয়া প্রদর্শন করাইয়া সর্ব্বজীবের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই লিখা আছে "আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়।"

অহেতুকী ভক্তি হইতে প্রেম, এবং স্বার্থ হইতে কামের উৎপত্তি, বৃন্দাবনে কামের বিন্দুবিসর্গও ছিল না তথায় কেবল প্রেমের ক্রিয়া ছিল। আমরা কামের দাস প্রেমের ধারণা করিতে পারি না। সর্ব্বদা কামাচ্ছন্ন তাই প্রেমকে কামে আনিয়া তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। রাসে কামের নিবৃত্তি, প্রেমেরই খেলা। কামের নিবৃত্তিতেই প্রেমের উদয়। তাই বলিয়া থাকে "কাম হইতে প্রেম হয়"।— বাগানে গোলাপ ফুলটী ফুটিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধি বিলাইয়া নিস্বার্থভাবে যেমন অন্যের প্রীতিবর্দ্ধন করে, কিম্বা ধুপ আত্মাহুতি দিয়া নিস্বার্থ ভাবে যেমন অন্যের প্রীতিবর্দ্ধন করে—অন্যের প্রীতিতেই যেমন তাহাদের প্রীতি, অন্যের সুখেই যেমন তাহাদের সুখ, নিজের প্রীতি বা সুখ বলিয়া যেমন একটা পৃথক জিনিস নাই—বৃন্দাবনের গোপীদেরও সে প্রকার কৃষ্ণ প্রীতিতেই তাহাদের প্রীতি—তাঁহার প্রীতিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াই তাহারা সুখী ছিল; অর্থাৎ তাহাদের নিজের কোন পৃথক সত্বা ছিল বলিয়া তাহাদের বোধ ছিল না। ইহাই প্রেম। আর যেথায় পরের তৃপ্তিতে নিজের তৃপ্তিটুকু ষোল আনা রকমের চাই, যথায় স্বার্থের জন্যই ভালবাসার সৃষ্টি—তাহাই কাম। বৃন্দাবনে গোপীদের এই স্বার্থপূর্ণ কামের ছায়া মাত্রও ছিল না এইজন্যই ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় শেষ করিয়া লিখিয়াছে যে যিনি এই লীলা শ্রবণ বা বর্ণন করেন তাহারও কাম প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগে পুরুষের যেমন বেশী অধিকার, ভক্তিযোগেও তেমন মেয়েদের বেশী অধিকার। স্ত্রীলোক ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের সরল ও স্বাভাবিক বিশ্বাস অতি দৃঢ়; তাহাদের ভক্তির টানে ভগবান না টলিয়া পারেন না, অথবা ভগবান তাহাদের অবলা করিয়া সৃজন করিয়াছেন বলিয়াই যেন তাহাদের ভক্তিতে সহজেই তিনি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভারতে যদিও পুরুষ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্বার্থ ধর্ম্মেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে মেয়েমানুষ কিন্তু এখনও তাহাদের স্বভাব সুলভ ভক্তিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহাদের ভক্তির দরুণই বা ভগবান ভারতের প্রতি সম্যক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারেন না।— তাই বুঝি দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য স্ত্রীভাবে তাঁহার ভজনা করিবার ঐকান্তিক বাসনা করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে তাহারাই পরজন্মে বৃন্দাবনে গোপীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন। অতএব দেখা যায় ব্রজের গোপীগণ নিত্য সিদ্ধা বা স্বতঃসিদ্ধা। বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে গোপীগণ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণ শব্দের ধাতুগত অর্থ যিনি সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। পরমাত্মা জীবাত্মাকে তাহার অংশ বলিয়া সর্ব্বদা নিজের দিকে টানিতেছেন অথবা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অচ্ছেদ্য আকর্ষণে আবদ্ধ তাহা হইতেই বোধ হয় সর্ব্বব্যাপী একটা Universal and mutual attraction. অতএব কৃষ্ণ অর্থ পরমাত্মা শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও কৃষ্ণ অর্থে পরমাত্মা জ্ঞাপক একটী শ্লোক আছে, তাহা এই,—

কৃষির্ভূ বাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে॥

এই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী বা হ্লাদিনী শক্তির মিলনই রাস। অন্তর্জগতের রাস বা কুলকুণ্ডলিনীর সহস্রারে পর ব্রহ্মের সহিত মিলনই—বাহ্যজগতে শ্রীকৃষ্ণ বা পরমাত্মা, বৃন্দাবন লীলায় লোক সমক্ষে প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন।

যখন চতুর্দ্দলবাসিনী কুল কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া মূলাধার বা চতুর্দ্দল, স্বাধিষ্ঠান বা ষড়দল পার হইয়া দশদলে মণিপুরে বাস করে তখন মানুষের মন মায়াতীত হইয়া যায়, মণিপুরের নীচে থাকিলেই মানুষ মায়াবদ্ধ থাকে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যা ফলে ব্রজবালাগণের কুল কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ মণিপুরে থাকিত তাই তাহারা মায়াতীত ছিলেন, কোন সাংসারিক মায়া মমতা, সামাজিক আচার নিয়ম, নিন্দা বা প্রশংসা তাহাদের নিকট পৌছিতে পারিত না। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও একমাত্র কার্য্য ছিল কৃষ্ণ প্রেম ও কৃষ্ণ প্রাপ্তি। সে স্থান হইতে বংশীধ্বনি বা অনাহত ধ্বনি শ্রবণ মাত্রই উন্মাদিনী প্রায় একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তুর উদ্দেশ্যে অব্যাহত বেগে ধাবমান হইয়া সহস্রার রূপ রাস মন্দিরে চিন্তামনি ধনে প্রাপ্ত হইয়া বা লীন হইয়া থাকিতেন।

নাভিকমলে দশদলে অর্থাৎ মণিপুরে থাকিতে পারিলে নিরন্তর বংশীধ্বনি বা ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পূজ্যপাদ পরমহংসদেব বলেন—

"অনাহত শব্দ সর্ব্বদা এম্‌নি হচ্ছে। প্রণব ধ্বনি। সে ধ্বনি পরম ব্রহ্ম থেকে আসছে যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানিতে পারে যে সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও অপর দিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে হচ্ছে।"

এই ওঁকার ধ্বনিই কৃষ্ণের বাঁশীর স্বর। যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যশঙ্খ হইতেও এই ওঁকার ধ্বনি উত্থিত হইত।

মণিপুরে আসিয়াই পরা ও অপরা বিদ্যার সংঘর্ষ হয়। একটি মায়া অপরটি ব্রহ্মশক্তি বা কুণ্ডলিনী। মায়াশক্তি কুণ্ডলিনীকে জগতে ব্যাপৃত রাখিতে চায় অর্থাৎ মণিপুরের নীচে রাখিতে চায়, আর ব্রহ্মশক্তি বা কুণ্ডলিনী মায়া ছাড়াইতে চায়। এ প্রকার অবস্থায় আসিয়া পড়িয়া এক পরম সাধক মায়াকে সম্বোধন করিয়া গাইয়াছেন—

যাবনা সজনী আর সে দেশে।
যে দেশে মানুষের সনে মন না মিশে॥

মণিপুরে আসিয়া বাঁশীর গান বা ওঁকার ধ্বনি শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গাহিয়াছেন।

আকাশে পাতিয়া কান শুনিব বাঁশীর গান
সঁপে দিব মন প্রাণ (তাঁর) চরণ উদ্দেশে।

মণিপুরই যে স্বদেশ বা পরমাত্মার খোঁজ পাওয়ার স্থান তাহা জানিয়া গাহিয়াছেন—

স্বদেশে পড়িয়া রব বিদেশে আর নাহি যাব
সারাবিলা কথা কব দুজনে বসে॥

অতঃপর মণিপুর হইতে সহস্রারে যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না, অনায়াসেই যাওয়া যায়। সহস্রারে যাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিতে পারিলেই স্বদেশ হইল, আর মায়ার এই জগৎই বিদেশ। যখন পরমাত্মার সহিত মিলন হয় তখন কোন একটা অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি দৃষ্ট হয় এবং অব্যক্ত মধুর স্বর শ্রুত হয়। তখন আর সে সুখ ছাড়িয়া অন্য সুখ ভোগের ইচ্ছা হয় না, সর্ব্বদা তাহা নিয়াই থাকিতে ইচ্ছা হয়। তাই গোপীনীগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ ভাব, কৃষ্ণ সঙ্গ করিতেই ভাল বাসিতেন; অন্য কিছুই তাহাদের ভাল বোধ হইত না। তখন, তাহা ছাড়া যে আর কিছু নিয়া থাকা যায় না তৎবিষয়ে পরমহংসদেব একটী উক্তি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"উঃ আমার কি অবস্থা গেছে। মন অখণ্ডের লয় হইয়া যেত। এমন কত দিন! সব ভক্তি ভক্ত ত্যাগ করলুম। জড় হলুম দেখলাম মাথাটা নিরাকার। প্রাণ যায় যায় রাম লালের খুড়ীকে ডাকব মনে করলুম? ঘরে ছবিটবি যা ছিল সব সরিয়ে ফেলতে বল্লুম। আবার হুঁস যখন আসে তখন প্রাণ যায়। মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটু পাটু করিতে থাকে। শেষে ভাবতে লাগলুম, তবে কি নিয়ে থাকব।" যেন জগতে আর কিছু নিয়া থাকবার বস্তু নাই।

রাসের চুম্বক আমরা রাধাকৃষ্ণের ওঁকার বেষ্টিত যুগল মূর্ত্তিতে এবং গৌরী পীঠ ও শিব পীঠ একত্রে সন্নিবিষ্ট শিব

নিজে দেখিতে পাই। ইহা পূজ্য, অর্চনীয় ও একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়াই তাহা পূজা হিন্দুর প্রতি ঘরে প্রতি জনের করা উচিত বলিয়া বিধান হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ এবং হর গৌরী যে একই পদার্থের বিভিন্ন অভিব্যক্তি তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার অবতারণা এখানে করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বৃন্দাবনে কালী ই কৃষ্ণরূপে এবং শিব ই রাধা বা প্রধানা গোপীনীরূপে এই অলৌকিক ব্রজলীলা করিয়া ভক্তি রসের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহা আমরা বুঝিতে না পারিলেও সাধকগণ বেশ বুঝিতে পারেন। তাই এক সাধক গাহিয়াছেন—

আমার হৃদয় রাস মন্দিরে
দাড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
নরশির মুণ্ডমালা ছেড়ে পর মা বনমালা
মাথায় পর মা মোহন চূড়া চরণে চরণ থুয়ে।
ইত্যাদি।

শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী বি, এ,।

—*—

হাতী খেদা।

পাতবেড়ের সংবাদ পাইয়াই আমি এবং শ্রীযুক্ত পরমানন্দ লাহিড়ী মহাশয় রেঙ্গরা হ রওনা হইয়া গেলাম। আমরা ৬ই ফাল্গুন সোমবার ১২টার সময় রওনা হইয়া campএ ৫টা ৩০ মিনিটের সময় উপস্থিত হইলাম। এবার camp এর স্থান বড় সুন্দর জায়গায় এইটাকে সোমেশ্বরী valleyর কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। ইহার আশে পাশে শীকারের উৎকৃষ্ট স্থান। নিকটে ডাকবাংলো অবস্থিত এবং দুইটী সমৃদ্ধ গারো বস্তী এই স্থান হইতে অধিক দূর নহে। মোটামুটি camp এর পক্ষে এই স্থানটী উৎকৃষ্ট। এখানের গারোগণ দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ প্রত্যহ আসিত camp সোমেশ্বরী নদীর "চড়ে"। এবার সৌভাগ্যক্রমে শুক্লপক্ষ ছিল। পাহাড়ে এই সময়টা বাস্তবিকই বড়ই উপভোগ্য।

সন্ধ্যার সময় campএ বসিয়া বড় কাকার নিকট জানা গেল—এবং বুঝিলাম তিনি সময় মত উপস্থিত না হইলে এই খেদা কাচ সত্বর পয় হইত না।

৭ই ফাল্গুন—খেদার এখনও ৩। ৪ দিন বাকী আছে, কাজেই এই কয়টা দিনের একটু সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছা হইল। এই স্থান হইতে সিজু অধিক দূর নহে। তথায় মহাশোল মাছ খুবই পাওয়া যায়—সিজুর নিকট "তপাখাল" নামে প্রায় ৩০০। ৪০০ ফিট পাহাড়ের উচ্চে একটা প্রাকৃতিক গহ্বর আছে সেটা বড়ই সুন্দর—কতদূর পর্য্যন্ত গহ্বর গিয়াছে আজিও তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই গহ্বরের দুইদিক এমন সমান ভাবে খোদাই করা যে ইহা দেখিয়া মনে হয় কোনও সুনিপুণ শিল্পি পর্ব্বতগাত্র খোদাই করিয়া ইহা রচনা করিয়াছে। সিজুর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি গম্ভীর অতি সুন্দর। অনেকে বলেন নর্ম্মদার মর্ম্মর পাহাড় ভেদ করিয়া নদী যেমন সুন্দর ভাবে আসিয়াছে ইহার সহিত কেবল মাত্র সেই দৃশ্যই উপমেয়।

সিজুর দৃশ্য আমার নিকট কখনও পুরাতন হয় নাই। আলুঘাট হইতে 'উজানে' যাইতে আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছি। স্বর্গীয় R. C. Dutta এই স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন পৃথিবীর খুব কমস্থানেই এরূপ প্রাকৃতিক সুন্দর মধুর দৃশ্য তিনি দেখিয়াছেন!

আজ সিজুতে মহাশোল মৎস্য শীকারে গেলাম বহু চেষ্টার পর আমার ভাগ্যে কেবল মাত্র একটী "মহাশোল" মিলিল। সেটাও নেহাৎ ছোট—যাহাই হৌক্ মহাশোল শীকার এই প্রথম সুতরাং প্রথম শীকারের রঙ্গিল আনন্দে আমার চিত্ত ভরপুর রহিল।

৮ই ফাল্গুন—আজ কোঠ দেখিতে যাওয়া হইল। "খল" দেখিয়া মনে হইল ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই—কারণ এই খলের পশ্চিম এবং দক্ষিণ অংশ একেবারে দুরারোহ। অতি অল্প লোকেই সম্পূর্ণ পাতবেড় হইয়া যায়—নতুবা সাধ্য ছিলনা এত অল্প লোক লইয়া রীতিমত খেদা এখানে করা। আমাদের স্থান কোঠের সন্নিহিত এক টিলার উচ্চ বুকে করা হইয়াছিল। এখান হইতে কোঠের ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং Drivingএর সম্পূর্ণ দৃশ্যও দেখা যাইতে পারিবে। এখান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম। সম্মুখে ঠিক দেওয়ালের মত সোজা পাহাড়, দূরে ঘন বানানীপূর্ণ উচ্চ পর্ব্বতমালা। অগ্রে পশ্চাতে, দূরে কাছে, দক্ষিণে বামে—কেবল পাহাড়—দূরে ঘন বনানী

পূর্ণ সুনীল অভ্রংলিহ্ উচ্চচূড় পর্ব্বতশ্রেণী একে অপরের মাথার উপর মাথা বাড়াইয়া যেন সমতল ভূমির উপর ক্রিয়া কলাপ সোৎসুক দৃষ্টিতে দেখিতেছে—ঠিক গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখার প্রয়াসী লোকের মত। পশ্চাতে ঠিক পাট খেতের মত নানা বৃক্ষরাজি! গারোহিলের বিশেষত্ব যেন এই স্থানটিতে সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাছ—কেবল গাছ!

থলের দক্ষিণ ভাগে একটু অসমতল বৃক্ষ বহুল স্থান আছে হস্তী দিবা ভাগে সেইখানেই থাকে। কিন্তু কোঠের স্থানের ঠিক সম্মুখেই গারোদের পুরাতন হাদাং থাকায় এজাগায় প্রায় ময়দান—সুতরাং হস্তীর কোঠে পড়ার সময় গতিবিধি তুরীর লোকের গতিবিধি সমস্তই drive এর দিন খুবই ভাল দেখা যাওয়ার কথা।

আজ বিজয় এবং ছোট দাদা সুসঙ্গ হইতে অপর হস্তী গুলিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আজ camp এ বেশ্ গুল্‌জার হইয়া উঠিল।

৯ই ফাল্গুন—আজ কোনও কাজ নাই সুতরাং আহারান্তে একবার শীকারে যাওয়া গেল। নেংখং নদীর তীরে প্রচুর বনানী—সেখানে না পাওয়া যায় এমন জন্তু নাই—তন্মধ্যে মহিষ এবং 'গাউস' হরিণ এবং হস্তীই অধিক। আমাদের camp এর অনতিদূরেই একটা জঙ্গলে কিছুক্ষণ ঘুরিবার পরই একটী হরিণ পাওয়া গেল—ইহার অনুসরণ করিতে করিতে অপর দুইটী পাওয়া গেল। আমরা কোনও আওয়াজ করার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই "থরেং" লস্কর এক আওয়াজ করিতেই হরিণ পলায়ন করিল। ইহাদের অনুসরণ করিতে যাইয়া "জুলুম" নামে এক ফল শরীরে পতিত হওয়ায় এমন যন্ত্রণা পাইলাম যে তখনই campএ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। এই জায়গায় অনেক "বড়কুম" পাওয়া যায়।

১০ই—ফাল্গুন—আজ খেদার দিন—যথা সময়ে আমরা যাইয়া খেদার স্থানে উপস্থিত হইলাম। যথারীতি গুলানেও যাগারা চলিয়া গেলে আমরা তাহাদের সাঙ্কেতিক ধ্বনি শ্রবণের জন্য ভীষণ উৎকণ্ঠার সময় কাটাইতে লাগিলাম। এই সময়কার অবস্থা যে কিরূপ হয় তাহা যাহারা খেদা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। অত্যন্ত প্রিয়জনের গুরুতর অস্ত্র পরীক্ষার সময়, জীবন ধারণের সন্ধিক্ষণে যে উৎকণ্ঠা হয় ইহা তদ্রূপ অথবা ততোধিক। যাহা হৌক্ কিয়ৎক্ষণ পরই driversদের চীৎকার শোনা গেল এবং ইহাতে বুঝাগেল তাহারা হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং দেখা পাইয়াছে। আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম বহুক্ষণ এই ভাবে কাটার পর একটা হাতী দেখা গেল। ইহার পর অপর একটী, তাহার পর এক এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হস্তীই আসিয়া যেখানে ঘন বন শেষ হইয়াছে এবং হাদাং আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ স্থানে দাঁড়াইল। হাতীর পশ্চাতেই জুঙ্গীর চীৎকার শোনা যাইতেছিল, তাহার পরই বন্দুকের আওয়াজ হইল—বন্দুকের শব্দ হওয়া মাত্র হাতীগুলি দাপ্ সীহুড়ার পার ঘেসিয়া বাহির হইল। এই সময় প্রত্যেকটা

মৃত গুণ্ডা হস্তী।

হস্তীকে স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। তখন দূরবীণ লাগাইয়া দেখিলাম এক প্রকাণ্ড দাঁত্‌লা হাতী ঠিক চেগ্‌রাম সর্দ্দারের দিকে চাহিয়া ৫০ হাত দূরে স্থির দাঁড়াইয়া আছে বুঝি এইবার আক্রমণ করে। চেগ্‌রাম সাহসী সেও "যুদ্ধং দেহি" এই ভাবেই অটল দাঁড়াইয়া রহিয়া এক আওয়াজ করিতেই হাতী ফিরিয়া গেল। চেগরাম দক্ষিণের তুরীর মাথায় ছিল।

হাতী যে ভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহাতে আক্রমণ করিলেই হাতী তুরী ঠেলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারিত। সুতরাং আওয়াজটা বেশ সময়মতই হইয়াছিল।

হাতী ফিরিল বটে কিন্তু তথায় ও তাহাদের পশ্চাতেই জুঙ্গী যমের মত গর্জ্জন করিতে ছিল এবং অন্যান্য কুলিগণ তুমুল ধ্বনি করিয়া উঠিল বিপদ বুঝিয়া হাতীগুলি নামিয়া ছড়াটার ভিতরদিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। কিন্তু চগরাম ছাড়িবার পাত্র নহে—সে নিকটে যাইয়াই কয়েক গুলি সঙ্কেত করিতেই হাতী উঠিয়া আসিয়া ঠিক গড়মলম ধরিয়া আসিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন হাতীর আর উপায় ছিল না, কারণ আজ drivers গণ অতি সুন্দরভাবে হাতীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে ছিল হাতী প্রায়গুলিই বেশ আসিতে লাগিল; কিন্তু সেই প্রকাণ্ড দাঁতলাটা এবং আরও ৫। ৬টী হাতী দলের হাতীর আগেই আসিয়া সবেগে গড়ে ঢুকিয়া পড়িতেই দরজা কাটিয়া দিল। পশ্চাতের হাতী সবই ফিরিয়া গেল! তখন দলভ্রষ্ট হইয়া হাতীগুলি ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

যাহাহৌক্ পাতা ও রুখি রাখার কথা বলিয়া বড় কাকাকে লইয়া আমরা কোঠের নিকট যাইয়া দেখিতে যাইব এমন সময় নগেন্দ্র বাবু হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া আসিয়া বলিলেন গুণ্ডাটা ভয়ানক কোঠ আক্রমণ করিতেছে—এখনই না মারিলে কোঠ রাখা অসম্ভব। উপেন্দ্র বাবু চীৎকার করিয়া বলিতে-ছিলেন সকাল গুলি করার হুকুম দিন নতুবা আর এক মুহূর্ত্ত কোঠ রাখা অসম্ভব। আমরা ও দেখিলাম গুণ্ডার প্রত্যেক আক্রমণে 'মড়মড়' শব্দে গাছগুলি ভাঙ্গিতেছে। ঠিক সেই সময়ই Forest guard আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গুণ্ডা মারার লিখিত আদেশ লইয়া তখনই 16 bore rifle এবং 577 bore snider rifle পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অল্প সময় পরেই গুড়ুম শব্দ হইল তাহার পর আর একটী এবং তৎপরে আর একটী গুলির সঙ্গে এক মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া গুণ্ডা ধরাশায়ী হইল। পতনের সময় পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। গারো পলোয়ানই হত্যাকাণ্ড সমাধা করিয়া ছিল কিন্তু ইতি পূর্ব্বেই সে দরজার প্রত্যেক rod এবং পশ্চাতের পাটের তিনটা থাম্বা ২। ৩ টা বাতি একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা কোঠের স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়ার পূর্ব্বেই বড় কুম্‌কী দরজার ভগ্নস্থান দিয়া পলায়ন করিয়াছে ইহাতে মনটা বড়ই দমিয়া গেল! ইতঃপর অরণ্যের এই স্বাধীনচেতা, পরাক্রমশালী, স্বেচ্ছাবিহারী গজরাজকে পতিত দেখিয়া প্রত্যেকের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। বস্তুতঃ এই বনের অধিপতিরূপে অনূন ৭০। ৮০ বৎসর যে গজরাজ অমিত পরাক্রমে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়াছে আমাদেরই জন্য আজ তাহার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আমাদেরই হস্তে হত হইল! একটা শিশু বাচ্চা উক্ত হস্তীর মৃত দেহের উপর মানব শিশুর মতই উঠিতেছিল, পড়িতেছিল—ইহারই মাতা দরজা ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অপর চারিটী হস্তীই ৫ হইতে ৬ ফুট ৬ ইঞ্চির ভিতর উচ্চ—সেগুলি ভয়ে দরজার বিপরীত দিকে মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহারা ইতস্ততঃ আর কোন দিকেই ফিরে নাই, বস্তুতঃ যদি ফিরিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিত তবে আর মুহূর্ত্তেক এ ভাবে না থাকিয়া অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিত। দুই ঘণ্টার ভিতরই হাতী বাঁধিয়া বাহির করা হইল।

যদি দরজা ভাঙ্গিয়া না থাকিত তবে আজই হাতী পুনরায় drive করা হইত—বাধ্য হইয়া স্থির করা হইল মৃত হস্তীটাকে বাহির করিয়া কোঠ সংস্কার করিয়া পুনরায় drive করা হইবে। এই কার্য্য করিতে অন্ততঃ এক দিন সময় যাইবে। এই সময়ের মধ্যে হস্তী পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে এই কোঠে হাতী প্রবেশ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে না। যাহা হৌক্ এই অবস্থা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না কারণ খলে আহার্য্য না থাকায় কোঠের স্থান পরিবর্ত্তন করা পর্য্যন্ত হাতী কোনও মতেই এই খলে থাকিতে পারিত না। এই মত ব্যবস্থা করিয়া আমরা Campএ ফিরিবার আয়োজন করিলাম পথিমধ্যে বাচ্চা হাতীটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সুতরাং এবার সর্ব্বসমেত কেবল মাত্র ৪ হস্তী পাওয়া গেল। হাতী গুলি ছোট হইলেও প্রত্যেকটাই সুন্দর।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

—ooo—

কবে?

১

কবে, ফুটিবে কোমল প্রাণ!
কবে, বুঝিবে সুপ্ত মর্ম্ম-বেদনা,
শুনিবে করুণ তান!
কবে, অশ্রু মুছিয়া দেখিবে চাহিয়া,
অগ্নি জ্বালাবে প্রাণে!
কবে, চেতনা লভিয়া, দৈন্য দলিয়া
ছুটিবে সমুখ পানে!
কবে, দুঃখ-সিন্ধু মন্থন করি'
করিবে অমিয় পান!!

২

কবে, মুক্তির লাগি র'বে সবে জাগি'
সারাটি জগৎ মাঝে!
কবে, ভুলিবে কামনা, সহিবে যাতনা
পুণ্য মহৎ কাজে!
কবে, গর্ব্বে পুলকে মর্ত্তে সকলে
রাখিবে দেশের মান!!

৩

কবে, দাঁড়াবে আবার ভুবন-মাঝার
উন্নতি করি' শির!
কবে, বাঁচার আশায় বীর্য-প্রভায়
মিলিবে লক্ষ বীর!
কবে, কর্ম্ম-অনলে ঝম্প প্রদানি'
করিবে আত্মদান!!

৪

কবে, আপনার বলে চলিবে সকলে
বিরাট জগতী তলে!
কবে, শিখিবে বাঁচিতে, সাধিয়া মরিতে
জীবন-ধর্ম্মবলে!
কবে, ওঙ্কার-রবে হুঙ্কার করি'
ছুটাবে প্রাণের বান!
কবে, জাগিবে জাতির প্রাণ!!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

—**—

সামাজিক সমস্যার সমাধান।

অস্পৃশ্যতার-বিষ হিন্দু সমাজ-দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে এক্ষণে উহা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রতিকার না করিলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর নাম বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

দেশ কাল ভেদে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সমাজের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী ব্যবহার ও পরিবর্ত্তন না করিলে সেই সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। সত্য যুগে যে ব্যবস্থা ছিল, ত্রেতাতে তাহা নাই। আবার ত্রেতা যুগে যে ব্যবস্থা দ্বাপরে তাহা নাই। কলিযুগের প্রাক্কালে যে ব্যবস্থা ছিল এখন তাহা নাই। আর অধিক দূর উ বা যাইতে হইবে কেন? শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সামাজিক যে ব্যবস্থা ছিল এক্ষণে তাহার বহুল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অধীনে চাকুরী করা ত দূরের কথা শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন ও করিতেন না। এক্ষণে ব্রাহ্মণ অবাদে শুঁড়িত গৃহেও দাসত্ব করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছে না। আবার এদিকে তিনি নিষ্ঠাবান্ শূদ্রের স্পৃষ্ট জল পান করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছেন! পাচক ঠাকুর হয় ত রাত্রিতে কুস্থানে অবস্থান করতঃ পরদিন অবগাহন করা ত দূরের কথা, বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন না করিয়া সশরীরে রন্ধন শালায় আবির্ভাব হইতেছেন, সেই পবিত্র (!) হস্তের পক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ অবলীলা ক্রমে গলাধঃকরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের জাতি যায় না। কিন্তু একজন পরিস্কৃত পরিচ্ছদ পরিহিত নিষ্ঠাবান্ তথা কথিত অন্ত্যজ জাতি রন্ধন শালার দ্বারদেশে পা দিলেই সেই গৃহঃস্থিত সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি অপবিত্র হইয়া যায়। মার্জ্জার মহাশয় আস্তাকুড় হইতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া আসিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে কোনও দোষ হইতেছে না, যত দোষ মানুষের বেলায়! মানুষ কে পশুর অপেক্ষা ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করাই কি হিন্দুর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা? তাহা বোধ হয় কখনই নহে। যে হিন্দুর শাস্ত্র এত উদার, তাহার পক্ষে এরূপ অনুদারতা প্রকাশ কখনও সম্ভবপর নহে।

রামায়ণে দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল গুহককে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ করিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন এবং তদীয় গৃহে আতিথ্য করিয়া ছিলেন। মহাভারতে সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনির পাণ্ডবগণের গৃহে অতিথি হইয়া দ্রৌপদীর পক্ক অন্ন ভক্ষণ করার উল্লেখ আছে।

ইদানীং রেলে, ষ্টিমারে অহিন্দুর স্পৃষ্ট বরফ, সোডা লেমনেড্, ইত্যাদি পান করিতে আমরা হিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হই না; অথচ হিন্দু অন্ত্যজ জাতির স্পর্শে হুকার জল পর্য্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায়!! হায়রে নিষ্ঠাচার!

অন্ত্যজ জাতিরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের রজক এবং ক্ষৌরকারের পরিচর্য্যালাভে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই অন্ত্যজ হিন্দুই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া আসিলে তাহার পরিচর্য্যা করিতে তখন ক্ষৌরকার বা রজকের কোনও আপত্য থাকে না। হিন্দু ধর্ম্মে (বা স্বধর্ম্মে) অবস্থানই তাহার এই নিগ্রহ ভোগের কারণ নয় কি?

এরূপ অবস্থায় অন্ত্যজ হিন্দুর পক্ষে পরধর্ম্ম মোটেই "ভয়াবহ" নহে, বরং "স্বধর্ম্মে" (৩) থাকিয়া "নিধনের" প্রতীক্ষাই "ভয়াবহ"।

আমরা সকল জাতিকেই সকল জাতির স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিতে বলিতেছি না; কিন্তু সকলেই সকলের হাতের জল পান করিতে পারেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একজন তথা কথিত অন্ত্যজ জাতির স্পৃষ্ট জল কি অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্থ উচ্চ জাতীয় লোকের স্পৃষ্ট জল অপেক্ষা অধিক অপবিত্র?

ঘরের এককোণে একটি জলপূর্ণ কলস অবস্থান করিতেছে। দৈবাৎ একজন অন্ত্যজ জাতীয় লোক গৃহের দ্বারদেশে পদার্পণ করিল, অমনি কলসস্থ জল অপবিত্র হইয়া গেল। এইরূপ অনুদারতা কি এই সময়ও থাকা উচিত?

উচ্চ বর্ণের বহু সম্মানিত হিন্দু রেষ্টুরেণ্ট হইতে হিন্দুর অখাদ্য খাদ্যে উদর ও রসনার তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক সগৌরবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু তিনি যদি কোন অন্ত্যজ হিন্দুর হাতের এক গ্লাস জল খান অমনই তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। পুরোহিত ঠাকুর তাহার তুষানল বা নিদান পক্ষে চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিবেন।

গোঁড়ামির দিন চলিয়া গিয়াছে। সমাজে এক্ষণে আর গোঁড়ামি চলিতে পারে না। আমাদের সমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্র এখন একটু প্রশস্ত করুন; আর সংকীর্ণতাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সমাজের বলক্ষয় করিয়া নিজ অধঃপতন ঘটাইবেন না।

মাহিষ্য জাতি বা হালুয়া দাসগণ এখানে শিক্ষায় দীক্ষায় আচার ব্যবহারে অনেক জল আচরণীয় জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহারা এ জেলার কতিপয় অঞ্চলে হিন্দু সমাজে অতি হীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে; তাহাদের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ পান করেন না। শ্রীহট্ট জেলায় মাহিষ্য দাস জলচল। শ্রীহট্টের সীমানায় ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের বহু মাহিষ্যের জল আচরণীয়। তাহাদের গুরু এ জেলার সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামীগণ। সেই গোস্বামী মহোদয়গণ তাঁহাদের মাহিষ্য দাস জাতীয় শিষ্যের গৃহে আগমন করতঃ তাহাদের স্পৃষ্ঠ জল, বাটনা এমন কি জাল দেওয়া দুগ্ধ পর্য্যন্ত আহার করিতে বিন্দু মাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না। এই গোস্বামীগণ কি পতিত? সমাজ পতিগণের এ সকলগুলি লক্ষ্য করা উচিত!

বঙ্গদেশে ২০ লক্ষেরও অধিক নমঃশূদ্রের বাস। ইহারা কর্ম্মঠ, শ্রমসহিষ্ণু ও সাহসী। হিন্দু সমাজের নির্ম্মম অত্যাচারে আজ ইহারা ক্রমশঃ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদিগকে জলচল করিয়া ক্ষৌরকার ও রজকের অধিকার পাইবার ব্যবস্থা করিলে ইহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে না। সুতরাং অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণও হিন্দু জাতির উপর অযথা অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে না। হিন্দু সমাজ-দেহে নব বলের সঞ্চার হইয়া হিন্দু সমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিবে। নচেৎ সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িবে।

এই হীন নমশূদ্রই যে মুহূর্ত্তে ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিবে, তখনই যে মুসলমানের যাবতীয় অধিকার লাভে সমর্থ হইবে। এক পংক্তিতে বসিয়া সে অন্যান্য মুসলমানের সহিত একত্র ভোজন করিতে এবং এক মসজিদে একত্র অবস্থান করতে, উপাসনা করিতে তাহার আর বাধা রহিবে না। তখন আমির ও ফকির উভয়েই এক

পর্য্যায়ভুক্ত। বলা বাহুল্য হিন্দুর ক্ষৌরকার ও রজক তখন তাহার পরিচর্য্যা করিতে বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না!

অন্ত্যজ জাতীয়গণ দেবালয়ে প্রবেশ করা ত দূরের কথা, তাহাদের ছায়া স্পর্শে পর্য্যন্ত দেবালয় অপবিত্র হইয়া যায়! অন্ত্যজ জাতীয়গণ গৃহে পদার্পণ করা মাত্র তৎ গৃহস্থিত পাত্রস্থ জল পর্য্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায়। ক্ষৌরকার এবং রজকগণ অম্লান বদনে অহিন্দুর পরিচর্য্যা করিতেছে; কিন্তু নমঃশূদ্রগণ তাহাদের পরিচর্য্যা লাভে বঞ্চিত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয়ে বাস বা "স্বধর্ম্মে" অবস্থান হেতুই তাহাদের এই দুর্গতি!

অকারণ সামাজিক ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া সামাজিক অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া করিয়া কে সেই সমাজের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে? আত্ম-সম্মান জ্ঞানবিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিই সে সমাজে থাকিতে চায় না। তাহার ফলে প্রতিবর্ষে দলে দলে ইহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ একবার অকপট হৃদয়ে অন্ত্যজ জাতীয়গণের দুর্ব্বিসহ সামাজিক লাঞ্ছনার বিষয় অনুধাবন করুন! তাহাদের সামাজিক অভাব অভিযোগের বিষয় স্বার্থান্ধ না হইয়া স্বীয় বিবেকের নির্দ্দেশ মত নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করুন; এবং তাহাদের বিচার ফল নির্ভিক ভাবে সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়া হিন্দু সমাজের সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন।

"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর কে রাখিবে।" বঙ্কিম চন্দ্রের এই অমরবাণী প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে সতত জাগরূক রাখিয়া হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্গদেশে ক্রমশঃ হিন্দুর সংখ্যা শোচনীয় ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ এই ময়মনসিংহ জেলায় শতকরা ৮০ জন হিন্দুর বাস। এমতাবস্থায় সমগ্র হিন্দুগণ পরস্পর সঙ্ঘ-বদ্ধ হইতে অসমর্থ হইলে সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়া এ জেলা হইতে হিন্দুর নাম বিলুপ্ত হইবে। হিন্দু সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরজেন্দ্রকিশোর সেন।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি এ জেলার গৌরব কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় এম, এ মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। গত ১৫ই কার্ত্তিক ৬৮ বৎসর বয়স দেওঘরে পরলোক গমন করিয়াছেন। কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসাবে এবং বাঙ্গালা দেশে ক্রিকেট খেলার প্রবর্ত্তকরূপে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তিনি সংস্কৃত এবং অঙ্ক শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যশোদীপ চিরদিন ময়মনসিংহ আলোকিত করিবে। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার, যিনি সকল শোক হরণ করেন তাঁহার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করুন।

সাহিত্য সংবাদ।

১৩ই অগ্রাহায়ণ গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি,এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছে।

গত ২৭শে অগ্রাহায়ণ রবিবার ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত টাউন হলে স্থানীয় আনন্দোলাল সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৌলবী মহাম্মদ সহিদুল্লাহ এম, এ, বি, এল, মহোদয় সভাপতির সাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐ দিন ধলা স্কুল গৃহে "বীণাপাণি সাহিত্য সম্মিলনের" ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যরাজ শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাস গুপ্ত ভীষক শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

কোন কোন নূতন লেখক লেখিকাগণ একই প্রবন্ধ একই সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার মুদ্রার্থে প্রেরণ করিয়া থাকেন এরূপ প্রচেষ্টায় সম্পাদকগণ বিপন্ন হইয়া থাকেন। এরূপ ইচ্ছাকৃত ত্রুটী অমার্জ্জনীয়।

আমাদের নিবেদন।

স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হেমরঞ্জন দাস তাহার পিতার পরিচয়ের সুযোগে গত ১৩৩১ সনের পৌষ মাসে আসিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে; আমিও পুত্রাধিক স্নেহে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বিশ্বাস করিয়া প্রেস, পত্রিকা ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের ভার তাহার উপর ন্যস্ত রাখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় সে প্রেসের এই কার্য্য বাহুল্যের সময় এবং আমার শারিরীক অসুখের সময় আমাকে নিতান্ত বিপন্ন রাখিয়া হঠাৎ এক দিন পলায়ন করিয়াছে। তাহার এই দুর্ব্ব্যবহারে সৌরভের মুদ্রন বন্ধ রাখিয়াও মরশুমের কতক কাজ অন্য প্রেস হইতে করাইয়া দিতে হইয়াছিল। কার্য্যবাহুল্যে আমিও ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছি। এই সকল দৈব দুর্ব্বিপাক পাকে অগ্রহায়ণের সৌরভ বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইল। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ অবস্থা বিবেচনায় আমাদেরই ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। ইতি

ময়মনসিংহ সৌরভ প্রেসে—সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Shourabh--Reg. No.C 745.

সৌরভ

ত্রয়োদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩৩২ দ্বাদশ সংখ্যা।

বিশ্রাম।

কর্ম্ম ও বিশ্রাম এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বলীলা চলিতেছে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সর্ব্বত্রই দেখি এই যুগলের বিচিত্র-বিলাস—চিরবিশ্রামশায়ী পুরুষের বক্ষে কর্ম্মময়ী প্রকৃতি নৃত্য করিতেছে—আবার সৃষ্টিস্থিতিসংহার ক্রীড়ার অবসানে সেই স্থির পুরুষের হৃদয়ে লীনা হইয়া মহাপ্রলয়ের সান্দ্র অন্ধকারে নিদ্রাভিভূত হইতেছেন। বিশ্বের দৈনন্দিন ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাই, কর্ম্ম ও বিশ্রাম অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—দিবায় কোলাহলাকুল কর্ম্মের বিচিত্র বিকাশ নিশায় বিরামের গাঢ় নীরবতা—শান্তির বিচ্ছেদ বিহীন একতানতা। যেখানে কর্ম্ম সেখানেই অবশ্যম্ভাবী বিশ্রাম যেখানে গতির উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গ—সেইখানেই স্থিতির নিরুচ্ছ্বাস সাম্য। উভয়েই একই সত্যের দ্বিবিধ প্রকাশ—কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। আমি বিশ্রাম যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিব।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে আমরা বিশ্রামের যথার্থ মূল্যদানে অক্ষম। কর্ম্মই আমাদের জীবন-রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ফলে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও আমরা তাহারই শাসন অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কর্ম্ম যখন আপন পরিধি বিস্তৃত করিতে করিতে বিশ্রামের ক্ষেত্র অধিকার করিতে চায় জীব-রাজ্য তখন বিষম রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপন্ন, সন্দেহ নাই।

উন্মত্তকর্ম্মীও এই সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রচেষ্টার অন্তে যখন দারুণ অবসাদে মন অবশ ও ইন্দ্রিয় অচল, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শ্রান্তির দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মাদক আসব পানে মূর্চ্ছিত প্রায় স্নায়ুনিচয়ে অস্থায়ী উত্তেজনা আনায়ন করিলেও বিলুপ্ত বীর্য্যের উদ্ধার অসম্ভব। বিমূঢ় প্রাণবর্গ তমোময়ী প্রকৃতির অন্ধগহ্বরে নিপতিত হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের দশা লাভ করে। রাজসিক বিক্ষেপের পরিণামে এই তামসিক মোহ অনিবার্য্য। স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। বস্তুত এই মোহগর্ভ অবসাদ মৃত্যুরই ক্ষণিক উন্মেষ—অন্তিম মুহূর্ত্তে এই মোহই চরমরূপে আবির্ভূত হইয়া নিস্তেজ আয়ু নিঃশেষে হরণ করে। বাসনাবিক্ষিপ্ত মানব অহরহ এই মৃত্যুকেই আবাহন করিতেছে। শ্রান্তিরূপে মৃত্যুই তাহাকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া যমপুরে লইয়া চলিয়াছে।

তীব্র রাজসিক চেষ্টার শেষে যে বিশ্রাম অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হয়, তাহার স্বরূপ অতি নিকৃষ্ট; তাহা পশুজন সেব্য। কিন্তু বিশ্রামের অপর এক আনন্দময় সাত্ত্বিক স্বরূপ রহিয়াছে। তামসিক বিশ্রামে প্রাণ বিকৃতরূপে স্পন্দিত হয়, তাহা নানা অশুদ্ধ সংস্কারপূর্ণ কল্পনা বা স্বপ্নের সৃষ্টি করে—স্বপ্নভঙ্গে মানবকে আবার প্রমত্ত আসুরিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। এই বিশ্রামে অবসন্ন প্রাণ সাময়িক আশ্বস্ত হইলেও সুস্থ, সংস্কৃত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে না।

সাত্ত্বিক বিশ্রাম প্রাণে নবীনতা আনয়ন করে। বিক্ষেপের পঙ্কিল তরঙ্গভঙ্গ শান্ত হইলে দৈবী প্রকৃতির পাবন প্রবাহ প্রাণের সংকীর্ণতা দূর করিয়া তাহাকে সংশোধিত ও শান্ত করিয়া তোলে। মানুষ তখন অবিক্ষুব্ধ সিন্ধুর মত নিস্পন্দ অথচ বিপুল সামর্থের আকর হইয়া উঠে।

প্রাণের বিশ্রামে সাত্বিক শক্তির অধিকারী হইয়া মানুষ যখন পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তখন কর্ম্মে কোনও গ্লানি কোনও অপটুতা, ও কোনও দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্রামের পরিপূর্ণ শান্তিই জগন্মঙ্গল কর্ম্ম-প্রস্রবণের আদি উৎস। আর প্রাণের নিথর নিস্পন্দতা বা একতানতাই প্রকৃত বিশ্রাম।

এই প্রাণের সাত্বিক বিশ্রাম অভ্যাস-সাধ্য। কর্ম্মে বিক্ষেপ জাগিলে তামসিকতাকে কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। তাই কর্ম্মের মধ্যে সংযমের অভ্যাস করিতে শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিয়াছেন। এভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে জ্ঞান দৃষ্টি তিরোহিত না হয় ও যাহাতে চিত্ত নিরন্তর শান্ত পরমাত্মায় সংযুক্ত থাকে। আর কর্ম্মের অন্তে প্রাণকে স্থির শান্ত ও স্বচ্ছ রাখিবার অভ্যাস করিতে হইবে—তাহা হইলেই মানব জীবন স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

উচ্ছৃঙ্খল

ঝর্ ঝরিয়ে, ঝর্‌ছে বারি, অম্বরেরি মর্ম্মধারে,
শূন্য কুম্ভ, মনটি আমার, পূর্ণ তবু হয়ত নারে।
নিঃসঙ্গ মোর, জীবন স্রোতে, নিত্য ভেসে যাই যে চ'লে !
ভয়-ভাবনা, নাইতো তবু, কেউ যে নাইকো, ভূমণ্ডলে !
শ্মশান ঘাটের, ত্যক্ত কাষ্ঠ অঙ্গারেরি নৃত্য যথা,
গঙ্গাজলে, উর্ম্মিতালে, চল্‌ছে ভেসে নাইকো ব্যাথা !
রঙ্গ-রসে, কার উদ্দেশে, চল্‌ছে ভেসে তাও না জানে,
সিক্ত সদা, গঙ্গোদকে, শুষ্ক তবু ভিতর পানে !
ঠিক্ তেমনি, এই জীবনী, কালের স্রোতে—কর্ম্মহারা !
দিক্ বিদিকে, চলছে বেঁকে, শুষ্ক হৃদয়—ছন্ন ছাড়া !
আত্ম-মগন, বাক্যবপন, কল্পক্ষেতে, দিনও রেতে,
কই ঠিকানা ? নাইকো জানা, অচিন পথ-অন্তে যেতে।

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

অশ্রুকণা।

(কথিকা)

বরিষার বিরহব্যথা বেশই ঘনিয়ে এসেছে। বিরহ বিধুরা বর্ষাদেবীর অক্লান্ত অশ্রুবারি তাই থেকে থেকে ঝরে পড়ছিল তার ভারাক্রান্ত হৃদয় লঘু করিবার জন্যে। আকাশ নিবিড় কালো মেঘে ঢাকা।

বাগানের শেওলাপড়া পুরানো পাঁচীল ঘেসে দুটি লতিকা বসে আছে। বাদলা হাওয়ার কাঁপনে লতিকা দুটি একটুখানি চমকে উঠলো। তারপর একটি চাঁপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন হলো—তারপর লতিকা, তারপর ? আমার বুদ্ধির ভুল লতিকা এটুকু তো বুঝতে পারিনি আগে, যে, এম্নিভাবেই আমার চিরজীবন জোড়া অন্ধকারের মাঝে যে প্রদীপ শিখাটি জ্বলছিল আমার মনের খানিকটা আলো করে দিয়ে, উৎসব শেষে ক্ষীণ প্রদীপ শিখার মত, সেটুকুও এম্নি নির্ম্মমভাবে এক পলকে নিবে যাবে নির্দ্দয় ঝড়ের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায়। তখন তো বুঝতে পারিনি যে এই শুভ্র আলোক ক্ষনিকের। সেই তিমিরান্ধ জীবনই দুদিন পরে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠবে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন ব্যাপে। কিন্তু কেন ? কেন এই দুদিনের জন্য অন্ধকার জীবনের মাঝে ধীরে ধীরে ক্ষীণ আলোর শিক্ষা জ্বলে উঠেছিল, আর কেনইবা তা এমন ভাবে আমার সমস্ত অন্তরকে হাহাকারে ভরিয়ে দিয়ে চির বিদায় নিয়ে গেল ?

তাইতো আজ আমি নিঃস্ব। আলোর পরশ পাবার চিরতৃষাতুর শাশ্বত ভিখারী চাইনিতো আমি কোন দিন আলো এ আলোর পরশ পাবার জন্যে ব্যাকুল তো হইনি ? ক্ষুদ্র জীবন আমার অন্ধকারে বেশ ছিল। তবু আজ কেন এ যন্ত্রণা আমার ?

তারপর সেইদিন লতিকা, যে দিন নাকি আমি আলোর পরশ পেয়ে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিলাম। সে আলো আমার আজন্ম আকাঙ্ক্ষিত স্নেহের আলো। জানি না কেন ! একজন অচেনা লতিকা আমায় তার স্নেহের পরশে আমার এই

দুঃখময় অন্ধকার জীবন একটু একটু করে আলো করে তুলছিল। আঃ সে কি তৃপ্তি! চিরতৃষাতুর দীন অন্তর আমার সেই আলোতে যতটুকু আলোকিত হতে পেরেছিল তাতে কতটুকুই না তৃপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। না পেয়ে পাওয়ার পরে ভগবানকে কতই না কৃতজ্ঞতা কতই না প্রণাম জানিয়েছি।

কিন্তু মুহূর্ত্তে একটা পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। এর জন্যে তো আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। যে সুখের ঢেউ আমার মনের মাঝে বয়ে চলেছিল তাতে তো ভবিষ্যৎ জীবনের এ জমাট অন্ধকারের ছবি কল্পনায় কখনো আঁকতে পারিনি। স্নেহের স্নিগ্ধক্ষীণ আলোর পরশে আমি এতই মেতে উঠেছিলাম যে এর মাঝেও যে ব্যবধান মুহূর্ত্তে ঘটতে পারে কখনো তা আমি ভাবতে পারিনি। সেই তো আমার অপরাধ।

তারপর ঠিক এমনই দিনে, শ্রাবণের বর্ষণধারা অশ্রান্ত ভাবে ঝরে পড়ছিল। আর তারি সাথে ক্রুদ্ধ বাতাস উতল রোলে ফিরছিল; সমস্ত পৃথিবী সেই কল্লোলে মুখরিত। হঠাৎ বিক্ষিপ্ত পাগলা হাওয়া বিকট হাসি হেসে সেই স্নেহময়ী লতিকাকে তারি নির্ম্মম কোলে টেনে নিলে।

উঃ সেকি ভীষণ হাসি! সে আমায় একটি কথাও বলে যাবার অবসর পেলে না। তার স্নেহের আলো আমার অন্তর থেকে নিবিয়ে দিয়ে নির্দ্দয় হাওয়া এখনো তেম্নিই হাসছে! অন্ধকারে গড়ে উঠে অন্ধকারেই মিশে যেতাম তার খোঁজ কে করত কিন্তু দুদিনের তরে কেন এ আলো জ্বললো? আর আজ ব্যর্থতার বেদনায় সমস্ত অন্তর ভরে দিয়ে তা নিবে গেল? আলোর তরে এত আকুলতায় আজ সমস্ত অন্তর ফুঁপিয়ে উঠত না। যদি না নির্দ্দয় ঝঞ্ঝা আলোর অঙ্কে যবনিকা ফেলে ভবিষ্যৎ জীবনকে আমার এমন ভাবে মসীলিপ্ত করে দিত।

তাইতো এখনো শান্ত হতে পারছিনে। সে যে আমায় বড় ভালবাসত। জীবনের পরপারে গিয়েও সে আমারি জন্যে অপেক্ষা করছে। এই আজন্ম ব্যথিতার জীবন জোড়া অন্ধকারের ললাটে আলোর রাজটীকা পরিয়ে দিয়ে সে যে নিশ্চিন্ত হবে। আমারো দিনগুলি তাই সংক্ষিপ্ত করে নেবার জন্যে এম্নি বরষার আকুল ধারার সঙ্গে ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে বলি—

সন্ধ্যা হল

এবার আমায় তুলে ধর।"

সহসা বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে বরিষার চাপা ক্রন্দন পৃথিবীর বুকে আছাড় খেয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।…—

শ্রীমতীজ্যোৎস্না রায়।

নীলকণ্ঠ।

তুমি শুভ্র-জ্যোতি শশাঙ্ক-শেখর
কৈলাস ভূধরে বাসা।
মঙ্গলময় আশুতোষ তুমি,
মৃদু মধুর ভাষা।
উপরে আকাশ নীচে এ বিশ্ব,
কোটী কোটী দেব! তোমার শিষ্য
আবার এসেছ হে নীলকণ্ঠ!
বিশ্ব গরল নাশা!
পূত-পুলকে তোমারি ভক্ত
উন্নত প্রাণ মন,
মোচন করিতে দীনের দুঃখ
করেছে জীবন পণ;
(তারা) কর্ম্মক্ষেত্রে স্থির বীর;
ধর্ম্ম-প্রাণ কর্ম্ম-বীর;
(তুমি) অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো
দীন জনের আশা,
আবার এসেছ হে নীলকণ্ঠ!
বিশ্ব গরল নাশা!
দুঃখ দৈন্য প্রতি ঘরে ঘরে,
দীন দুঃখী যত ডাকিছে কাতরে;
পান করি সেই কালো হলাহল
পুরাও দীনের আশা,
আবার এসেছ হে নীলকণ্ঠ!
বিশ্ব গরল নাশা।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

কালাপাহাড়ের উদ্ভব।

যে কালাপাহাড়ের নামে একদিন সমস্ত বাংলা দেশ, শুধু বাংলাই বা বলি কেন প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার ভ্রূকুটি কুটিল নেত্র দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং জগন্নাথ দেব ও বিশ্বেশ্বরকে ও তাঁহাদের স্বর্গীয় সিংহাসন ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্য চিল্কা হ্রদও জ্ঞান বাপীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল সেই সুরবিদ্বেষী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে কালাপাহাড়ের উৎপত্তি কবে, কোথায় ও কি কারণে হইয়াছিল। সুতরাং এসম্বন্ধে আর বেশী কিছু লিখিবার প্রয়োজন মনে করি না। তবে এই টুকুই জানিয়া রাখুন যে তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল কালাচাঁদ রায়। তিনি রাজসাহী জিলার অন্তর্গত এক-টাকিয়ার কোন এক বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কালের উপযোগী শিক্ষা দীক্ষায় তিনি সমাজে শীর্ষ স্থানীয়দের মধ্যে পরিগণিত হইয়া নবাব সরকারের উচ্চ রাজকার্য্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সেই নিরীহ প্রতিভাবান্ ব্রাহ্মণ কুমার যিনি একদিন পরম ধার্ম্মিক ও সত্বাগুণের আধার বলিয়া হিন্দু সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তিনি বিধির বিড়ম্বনায় বজ্র পতনের মত বিজাতী ও বিধর্ম্মীর হস্তে নিষ্পেষিত হইয়া সমাজচ্যুত ও আশ্রয় শূন্য অবস্থায় যখন হিন্দু ও হিন্দুর দেবতার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও প্রতিকার দূরে থাক স্বজাতীর হস্তে ততোধিক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইলেন তখনই তাঁহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত আত্মশক্তি নিদ্রিত বিষধরের আঘাতজনিত জাগরণের মত বিতৃষ্ণা ও ধিক্কাররূপ বিষ, দন্তে লইয়া কালাপাহাড় হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার ফলে দেশ, জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ যে কতদূর ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের হৃদয়েই একাধারে দেবত্ব ও পশুত্ব পাশাপাশি বিরাজমান।

বিজাতি কর্ত্তৃক অনিচ্ছায় নিগৃহীত যুবক যদি স্বজাতি ও সমাজ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত না হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অনুকম্পা লাভ করিত, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার প্রতিভা ভিন্ন মুখী হইয়া পাশবিক তাণ্ডবলীলার পরিবর্ত্তে দেবত্বের বিকাশ দ্বারা তখনকার সেই সঙ্কটময় যুগে ধর্ম্ম সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারিত।

মহাশক্তি সম্পন্ন কালের শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের ইচ্ছাশক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। স্রোতের তৃণের মত এই পৃথিবীকে সে তাহার আবর্ত্তে ঘুড়াইয়া যদৃচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। যদি কালের অনুবর্ত্তন না করিয়া ধার্ম্মিক ও সুধীজন সমাজ বিচার বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আচারকেই আকড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের যথেচ্ছা-চারিতার পরিচালনা করেন তবে আজ না হইলেও নিঃসন্দেহ অদূর ভবিষ্যতে আবার কোন এক কালাপাহাড়ের উদ্ভব হইয়া প্রবল বিপ্লবে ধর্ম্ম ও সমাজকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালাপাহাড়ের অপেক্ষাও অধিকতর বিপন্ন করিবে।

আগ্নেয়গিরিকন্দরস্থিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহিরে প্রকাশমান না থাকিলেও সর্ব্বদাই ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া থাকে। কিন্তু কোন প্রাকৃতিক বিপ্লব হইবা মাত্রই তাহা ভীষণাকার পরিগ্রহ করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। ঠিক সেইরূপ আমাদের মহান উদার হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে ক্রমে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়া বহু দিন হইতেই বিদ্বেষ বহ্নি স্ফুলিঙ্গ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। এর পর এই সঙ্কীর্ণতা হীনতায় পরিণত হওয়ার ফলে যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইবে তাহা নির্ব্বাণ করিবার শক্তি বর্ত্তমান যুগের তথা কথিত ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষকগণের কতদূর আছে তাহা সাধারণের বিবেচ্য।

কালাপাহাড়ের উদ্ভব সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা করি ততই যেন উহা আমার মানসপটে তাহার সেই স্থূল দেহের বাহিরাবরণ পরিত্যাগ করিয়া আভ্যন্তরীন ভাব সমষ্টি এক স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করতঃ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আমার মনে হয়, কালাপাহাড় কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। মানবের অন্তর্নিহিত পাশব বৃত্তির বিকাশের ফলে তাহার বিকার দ্বারা যে বিপ্লবের

সৃষ্টি হয় তাহাই কালাপাহাড় নামে খ্যাত। কি কি কারণে এই কলুষিত ভাবের উদ্ভব হয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহা বুঝাইতে যাইয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি শ্রোতৃমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

বহুভাবে স্বজাতি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন কালাচাঁদ রায় যে ভীষণ বৈর নির্য্যাতন করিয়া কালাপাহাড় উপাধি-কলঙ্কিত হইয়াছিল তাহার হৃদয় বিদারক স্মৃতি অদ্যপর্য্যন্তও হিন্দু জাতির মানসপটে জাগরূক রহিয়াছে। একদিন যে ভ্রমের ফলে হিন্দু সমাজে এইরূপ একটা পশু ভাব মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছিল যদি তাহার পর বা এখনও সেই পূর্ব্বকৃত ভ্রম স্মরণ করিয়া হিন্দু সমাজ কথঞ্চিৎ উদারতা দেখাইত তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই জাতীয় পশুত্ব বিকাশের সম্ভাবনা কস্মিন কালেও থাকিত না।

যুগে যুগে এই হিন্দু সমাজে যে কত কালাপাহাড় আবির্ভূত হইয়া পাশবিক তাণ্ডবলীলা করিয়া গিয়াছে ও ভবিষ্যতে করিবে তাহা কে জানে? ইহার কারণই প্রধানতঃ এই উদার হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ চেতা রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব। ইহারা নিজের ভ্রান্ত ও কল্পিত যুক্তির আসন হইতে তিল মাত্রও বিচ্যুত হইতে চান না। একবার যাহা আঁকড়াইয়া ধরেন কিছুতেই তাহা স্বেচ্ছায় হস্তচ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু কালের প্রভাব অনতিক্রমনীয়। সে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। সে তাহার অখণ্ড প্রতাপ ও কুটিল গতিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেও অগ্রাহ্য করিয়া অনাদি কাল হইতে ছুটিয়া চলিতেছে। তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া সকলকেই হাবু ডুবু খাইতে হইতেছে।

হিন্দুজাতি যতই রক্ষণশীল হউক না কেন, তাহাকেও সেই মহাকালেরই অনুসরণ করিয়া অবস্থানুসারে ব্যবস্থা দ্বারা সুপ্রাচীন কাল হইতে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইতেছে। একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে প্রাচীনতম আর্য্য সভ্যতার সৃষ্টি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন অবস্থা ও ভাবের মধ্য দিয়া এই হিন্দু সমাজের আকৃতি, প্রকৃতি ও গতি পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া আসিতেছে। ধরা পৃষ্ঠে জল বুদ্‌বুদের মত এপর্য্যন্ত কত জাতি কত সমাজ ও কত ধর্ম্মের সৃষ্টি ও লয় হইয়াছে; কিন্তু এই মহান হিন্দু জাতির ধর্ম্ম ও সমাজ কত প্রলয় ও বিপ্লবের মধ্য দিয়াও পরিবর্ত্তিত কলেবরে স্বীয় গর্ব্বোন্নত মস্তক অব্যাহত রাখিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে হিন্দু সমাজ যখন পার্ব্বত্য নদীর অপ্রতিহত স্রোতের মুখে পতিত তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল তখন সে তাহার স্বভাব সুলভ রক্ষণশীলতা পরিহার পূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, এমন কি ভগবান বুদ্ধদেবকে হিন্দুর দশ অবতারের অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী যুগে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের প্রেমের মদিরায় যখন দেশ উন্মত্ত, তাঁহার সাম্য ও মৈত্রির মহা আকর্ষণে হিন্দু সমাজের একটা প্রধান অংশ যখন বর্ণাশ্রম গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছিল তখনও হিন্দু সমাজ স্থান কাল ও পাত্র ভেদে তাহাদিগকে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছিল! বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সমাজের গোস্বামী ও অধিকারীগণই তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

বাঙ্গালী পুরুষ-সিংহ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যখন দেখিলেন ব্যভিচার বিপ্লবে বিশৃঙ্খল হিন্দু সমাজ ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অসবর্ণ বিবাহের ফলে যৌন সম্বন্ধের ঘোরতর ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, পানাহারে প্রায় কেহই বর্ণাশ্রমের বৈশিষ্ট রক্ষা করিতেছে না; তখনই তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা লইয়া নিমজ্জমান সমাজের সকলকেই তৎকালোচিৎ ব্যবস্থা দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করতঃ হিন্দুর তথা হিন্দু সমাজের গৌরব পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন।

সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিষ্পেষণে একে হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল তৎপর আবার বিজেতাগণ কর্ত্তৃক হিন্দুর বহু ধর্ম্মগ্রন্থ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হওয়ায় শাস্ত্রালোচনার পক্ষে অনেক বাধা, বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানী ও শক্তিশালী সমাজপতির একান্ত অভাব

হইয়াছে। রঘুনন্দনের পর সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী মধ্যে তৎতুল্য কোন লোকের উদ্ভব না হওয়ায় ক্রমে সমাজ মধ্যে নানাপ্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া শাস্ত্রের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বেদ, বেদান্ত প্রতিপাদিত শাস্ত্র বাক্য সমূহের দোহাই দিয়া, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম কাণ্ড সমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে জলাঞ্জলি দিয়া তৎস্থলে সমাজ ধ্বংশকারী আত্মঘাতী নীতি ছুৎমার্গের বিধিব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সমাজের কর্ত্তৃত্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের উপরই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের অধঃপতনের ফলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় দেশের অভিজাত সম্প্রদায় সমাজ দণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহারাও রোগের নিদান ও লক্ষণ স্থির করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে না পারায় বর্ত্তমানে সমাজে এই বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়া ঘরে ঘরে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ ক্রমাগত মানবোচিত ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা করিতেছে। আজ কাল কেহই আর কাহাকেও বড় গ্রাহ্য করে না। ফলে সমাজ তরণীখানা কর্ণধার বিহীন হইয়া বিপ্লব তরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত অবস্থায় মহা সমুদ্র বক্ষে নিমগ্ন প্রায় পোতের ন্যায় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন দিন কুল কিনারা পাইবে কিনা ভাবিতব্যতাই বলিতে পারেন।

এই সকল দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দেশ কাল ও পাত্রানুসারে যাহার তাহার ন্যায্য অধিকারে বাধা দেওয়ার ফলেই যত কিছু অনিষ্টের উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান উচ্চ জাতিগণ ভুলিয়া যান যে শাস্ত্র অথবা আইন দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যুগে যুগেই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া আসিতেছে। সুদীর্ঘ নিদ্রাবসানে চৈতন্য লাভ করিয়া নিম্নজাতিগণ তাহাদের সামাজিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে; বুঝিয়াছে যে তাহারাও সমদর্শী ভগবানের সন্তান। তাহাদের হৃদয়েও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সদা জাগরূক। কাজেই তাহারা আর পদাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা আরও বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহারা কেবল যুগান্তর ব্যাপী দাসত্বের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, তাহাদের জীবনের ও অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। তাহারাও বিরাট হিন্দু সমাজের বিশাল অংশ। সমাজের নির্দ্দিষ্ট আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াও তাহাদের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার লাভের আশায় তাহারা দীর্ঘকাল হইতে নেতাদিগের দ্বারে দ্বারে ধন্না দিয়া কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। কিন্তু "পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ। পক্ষান্তরে সমাজপতিগণ শাস্ত্রাদির দোহাই দিয়া যদৃচ্ছা ব্যাভিচার করিয়াও সমাজে গর্ব্বোন্নত মস্তকে বিরাজ করিতেছে। ইহাই তাহাদের বিদ্রোহের মূল মন্ত্র।

এই সব দুর্নীতির ফলেই নির্য্যাতিতগণ কালাপাহাড়ী নীতি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্যান্যেরা তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতঃ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

বর্ত্তমান এই ঘোর দুর্দ্দিনে সমাজপতিগণের কর্ত্তব্য অন্ততঃ অবস্থানুসারে নিম্ন শ্রেণীগণকে তাহাদের যথাযোগ্য ন্যায্য অধিকার কতক কতক প্রদান করিয়া ভবিষ্যতের জন্য শান্ত ও সংযত রাখা। ক্ষমতা হাতে থাকিতে তাহার সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহাতে মান সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, ধর্ম্ম ও সমাজ সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অন্যথায় সমাজের প্রায় চৌদ্দ আনা জন-সঙ্ঘ যখন আত্মবলে তাহা অধিকার করিয়া লইবে তখন তাহাদের দিকে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া থাকা ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর থাকিবে না। তখন হয়ত ইহাতেও নিস্তার থাকিবে না। ঘরে ঘরে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হইয়া বর্ত্তমান নীতির প্রতিশোধ লইবে ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

হাতী খেদা।

আমরা Rewak camp এ আসার পর দেখিলাম যে হাতী বাঁধার দড়ি মোটেই প্রস্তুত ছিলনা কাজেই সমস্ত রাত্রি দিন ধরিয়া তাড়াহুড়া করিয়া দড়ি পাকান আমাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। আজ যদিও মাহুতগণ পরিশ্রান্ত

তথাপি আজিও তাহাদের বিশ্রাম নাই, পালা করিয়া রসা দড়ি প্রস্তুত করার কথা বিশেষ বলিয়া দেওয়া হইল। কারণ, হাতী ফেলাইয় stockade প্রস্তুত হইলে কালই drive করিতে পারে। আমাদের এবারকার camp এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বেশ ছিল। পশ্চিমে পিলখানা; সর্ব্ব দক্ষিণে মাহুতের পালের শ্রেণী, তৎপর রসদের ডেরা তৎপর আমাদের তাঁবু। পূর্ব্বদিকে camp এর সম্মুখ দিয়া পুণ্যতোয়া সোমেশ্বরী অবিশ্রান্ত কুলু কুলু রবে খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

আজ বড় পরিশ্রান্ত হইয়াই সকাল সকাল শয়ন করিয়া ছিলাম—কিন্তু ১২॥।১টার সময় বোতল জমাদার ধীরে ধীরে ডাকিয়া বলিল camp এর পশ্চাতে প্রকাণ্ড একটা গুণ্ডা আসিয়া নূতন হস্তীর নিকট দাঁড়াইয়া আছে। আমরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বন্দুক ভরিয়া বাহিরে আসিলাম। স্নিগ্ধ চন্দ্র কিরণোদ্ভাসিত রজনী--তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড হস্তীর অবয়ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার একটী দাঁত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

তৎক্ষণাৎ বড়কাকা দাইদার ও জমাদারকে হাতী ধরিবার প্রয়াস করিতে বলিলেন। মাহুতগণ যথারীতি সজ্জিত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট গেল, প্রায় ½ ঘণ্টা কাল ভিড়িয়া হস্তী সরিয়া গেল। মাহুতগণ বলিল হাতীকে আজ বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া ২।১ দিন পরে চেষ্টা করাই ভাল। এইমতে আমরা রাজি হইলাম—কিন্তু এই হস্তী ইতঃপর আর আসিল না। ইহাতে স্পষ্টই মনে হইল "Don't differ till to-morrow to be wise" এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য।

১১ই ফাল্গুন—আজ বিশেষ কিছুই হয় নাই। একবার stockade সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে সংবাদে অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেই সংবাদ পাইলাম খেদা কাল হইবে—সুতরাং তথা হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

১২ই ফাল্গুন আজ পুনরায় drive। যথা সময়ে drive আরম্ভ হইল—হস্তী সমস্তই পূর্ব্ব দিনের মত আসিল; কিন্তু আজ সমস্ত হস্তী একত্রে আম্নির মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ দলের নায়িকা সেই দিনকার পলায়িতা কুমকী। যাহাই হোক্ হস্তী অতি সুন্দরভাবে আম্নির মধ্যে প্রবেশ করিতেই তুরীর মুখে একটা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। ইতঃপর Fix line জ্বালাইল কিন্তু বাঁয়ের দিকে ১০ হস্ত পরিমিত স্থান বাঁকি রহিল। বন্দুকের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ হইতে লাগিল কিন্তু বায়ের দিকে একটা বন্দুকও ফুটিল না। হস্তী অগ্রসর হইয়া একেবারে দরজা পর্য্যন্ত গেল—সিংহ মহাশয় এবং অপরাপর সর্দ্দারগণ আম্নির মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিল কিন্তু দলের নেত্রী ইঙ্গিত করিতেই সমস্ত হস্তী বায়ের আম্নির নিকট দিয়া বাহির হইয়া গেল। Fire line রীতিমত জ্বলিলে এবং বন্দুকের যথারীতি আওয়াজ হইলে এ হাতী কোনও মতেই ফিরিতে পারে না। "লিখিতমপি ললাটে কুঞ্ঝটিকাতুং কোসমর্থঃ ?"

এদিকে শুষ্ক পত্রের মধ্যে আগুণ লাগিয়া হঠাৎ দাও দাও করিয়া আগুণ খলময় পরিব্যাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর দাবানলের সৃষ্টি করিল। সে অগ্নি দর্শনে তখন ত্রাসের উৎপত্তি হইয়াছিল। অগ্নির গগনস্পর্শী লোলজিহ্বা আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ—মনে হইয়াছিল অল্পকাল মধ্যে আমাদিগকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবে। এখন উপায়ন্তর না দেখিয়া সমস্ত কুলিকে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পাঠান গেল। তাহারা প্রায় ২ ঘণ্টাকাল অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই ভীষণ দাবানল নির্ব্বাপিত করিল। কেবল মাত্র দাও এবং কুড়ালের সাহায্যে ইহারা এই অসম সাহসিকতার কার্য্য করিয়াছে।

আমাদের মনে হয় পলায়িত কুমকী কোঠে ঢুকিয়াই এবং মৃতের গন্ধ পাইয়াই সমুদয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ইঙ্গিত করিতেই সমস্ত পলায়ন করিল। এখন আর drive এর সময় ছিলনা। কিন্তু আজ আর হাতী বেড়ের ভিতর কোনও মতেই থাকিতে পারে না, সুতরাং ফাঁদি দিয়া যদি ধরা যায় তাহার শেষ চেষ্টা করার অভিপ্রায়ে একবার হাতী পাঠান গেল। মাহুতগণ খুব সাহস এবং উৎসাহ ভরে গেল বটে কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় সুবিধা করিতে পারিল না।

আজ বড় হতাশ মনে campএ ফিরিলাম—কারণ অতঃপর খেদা হওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। কুলি বিভ্রাটই ইহার প্রধান কারণ—যে কুলি এই খেদা করিয়াছে অতিকষ্টে তাহাদের কেবল মাত্র এই খেদাটা করিবার জন্ম রাখা গিয়াছিল ইহার পরই তাহারা আর থাকিবে না। এখন গারোদের "হাদাং" কাটার সময় সুতরাং এখন তাহারা অর্থের প্রলোভনেও থাকিবে না। সুতরাং আজ খেদা এই

seasonএ হইবে না ইহার জন্য মন আরও খারাপ হইয়া গেল!

Campএ আসিবার সময় দূর হইতে ডাকবাংলোর বাতি দেখা যাইতেছিল, campএ আসিয়া শুনিলাম Garo Hills এর D. C. F. Mr. A. Dass I F. S. আমাদের অনুসন্ধান লইয়া গিয়াছেন। campএ ফিরিতেই তাহার চিঠি পাইলাম বিশেষ প্রয়োজনে তিনি দেখা করিবেন। উত্তর লিখিয়া দিলাম কাল প্রাতে ডাকবাংলোতেই তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আজ বড় হতাশ হইয়া রাত্রি কাটান গেল। খেলায় বিফল মনোরথ হইলে বড় মন ভাঙ্গিয়া যায়। উৎসাহে দিনের পরিশ্রম মনেই হয় না কিন্তু রাত্রিতে বিশেষতঃ বিফল প্রযত্ন হইলে কষ্ট বড় লাগে।

১২ই ফাল্গুন—সকাল বেলায় Mr. Dass এর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তথায় গল্প করার সময়ই ডাকবাংলো সন্নিহিত এক বট বৃক্ষে আগত দুই "বড়কুম্" কে Mr. Dass দুই গুলিতে নিহত করিলেন। তাহার হাতের নিশানা বেশ ভাল। আমি ২।৩ বার তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। Mr. Das. অতিশয় ভদ্রলোক। তিনি Forest Hd. Guard হইতে এই পদে উন্নীত হইয়াছেন। এই পদে বাঙ্গালী খুব কমই আছেন। Mr. Das এত উচ্চ পদস্থ হইয়াও অত্যন্ত অমায়িক তাঁহার ব্যবহারে উচ্চ পদের অহংকার নাই অপর দিকে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁহার সহিত স্থির হইল যে বিকাল বেলায় শিকারে যাওয়া যাইবে। সেই মতে দুইটার সময় ৪।৫ টী হাতী লইয়া আমরা রংজাক্ ছড়ার দিকে শিকার মানসে গেলাম। এত বড় জঙ্গলে ৪।৫ হাতীতে শিকার অসুবিধাজনক। বস্তুতঃ শিকারের কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে একটা বিলের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তথায় বহু হাঁস উড়িতেছে দেখা গেল। সেখানে Mr. Das এর Guard এবং সিংহ মহাশয় হাঁস মারিতে অবতরণ করিলেন, আমরা হাতীতেই রহিলাম। হঠাৎ একজন মাহুত চীৎকার করিয়া উঠিল "গুণ্ডা হাতী আসিতেছে সিংহ মহাশয় সাবধানে চলিয়া আসুন" আমরা কিন্তু কোনও কিছুই লক্ষ করিতে পারিলাম না অধিকন্তু মাহুতকে অত্যন্ত শাসন করিলাম। কিন্তু মাহুত জেদ করিয়া বলিল "হাতী আছেই আমি এখনই দেখাইয়া দিব।" ইহার পর আর তাহার কথায় অপ্রত্যয় হইল না। সিংহ মহাশয় এবং Ferest Guard চলিয়া আসিলেই Mr. Das কে বলিলাম "এখন পালিত কুম্‌কীকে শব্দ করাইলে নিশ্চয় মদস্রাবী Tusker হইলে আসিবে।" তাহাই করা গেল। কিছুক্ষণ পরই একটা প্রকাণ্ড পৃষ্ঠ তরুই বাঁশের উপর দিয়া দেখা গেল। বিলটা থাকায় হাতী সোজা সুজি আমাদের দিকে আসিতে পারে নাই কাজেই হস্তী পাহাড় বাহিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়াছে। এইবার তাহাকে সোজা আসিতে দেখা গেল Mr. Das তাঁহার উৎকৃষ্ট rifle প্রস্তুত রাখিলেন আমিও আমার বন্দুক প্রস্তুত করিলাম।

Mr. Das হস্তীকে মারিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আমি বাধা দিয়া বলিলাম "হাতীটা সস্থি থাকিলে ধরিবার প্রয়াস মন্দ কি এবং ইহার সঙ্গে দল হাতীও থাকিতে পারে।" ইহাতে তিনিও সম্মত হইলেন। আমরা একটু পরিষ্কৃত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম প্রকাণ্ড এক Tusker আসিতেছে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহার দাঁত দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে একটা আকাশের দিকে অপরটা একেবারে মাটীর দিকে। এমন অদ্ভুত দন্ত ইতিপূর্ব্বে আমি কদাচ দেখি নাই। যাহাহোক আমরা শীঘ্র কেম্পে চলিয়া আসিয়া জমাদারকে বলিলাম বড়কুম্‌কী লইয়া ভিড়াইবার চেষ্টা করিতে; সে তখনই হাতী পাঠাইয়া দিল মাহুতগণ এই হাতীর নাম দিয়াছিল "জামাতা বাবাজি" তাহারা জামাতা বাবাজির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু হস্তী আর আসিল না। Mr. Das কেম্পের নিকট ২টা বন্য কুক্কুট বধ করিলেন। সন্ধ্যায় কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত গল্পে গুজবে কাটান গেল।

ইতি মধ্যে একরাত্রিতে আমি ও বিজয় শিকারের মানসে নেংখং ছড়া দিয়া কতদূর গিয়াছিলাম। রজনী যোগে হাতীতে পাহাড়ে এভাবে বিচরণ বড়ই আমোদ-জনক। বিজয় ১৪।১৫ বৎসরের বালক মাত্র কিন্তু তাহার সাহস কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং শিকার দক্ষতা বিশেষ প্রশংসার্হ।

লিখিতে ভুলিয়াছি, যে গুণ্ডাটা আমরা কোঠে বধ করিয়াছি সেটা ১০½ ফিটের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে। উচ্চতা পা হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বমান ভাবে লওয়া হইয়াছিল। Sanderson সাহেব Thirteen years amongst the wild beasts in India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে গুণ্ডাহাতী ১০ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না কিন্তু তাঁহার এই কথা যে খুব ঠিক তাহা আমাদের মনে হয় না।

১৫ই ফাল্গুন আজ কেম্প ভাঙ্গিয়া ফিরিবার দিন। কালই কুলিদিগকে বিদায় করা হইয়াছিল সুতরাং কেম্প ভাঙ্গিয়া ফিরিবার দিন আজ। রসদ officer পরেশ-চন্দ্র সিংহ Rewak এ বাকি রসদ লইয়া থাকিবেন আর সমস্তেই চলিয়া আসিবে। তাহাকে বলা হইয়াছিল পাগ্গালি হস্তী অনুসন্ধান করিতে থাকুক ইতিমধ্যে তিনি স্থানীয় ১০০ পরিমাণ কুলি সংগ্রহ করুন তাহা হইলে পুনরায় একটা খেদার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে।

আমরা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এইবার কিন্তু বিদায়ের ছাপটা মনে বড়ই রহিয়া গেল। এবার মনে হইল খেদা আর হইবে না; সুতরাং এবারকার বিদায়ই শেষ বিদায় হইবে!

কয়েক দিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং পাহাড়ের জীবন বড়ই আমোদপ্রদ বোধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ শান্তির এই লীলা নিকেতন হইতে কোনও আকর্ষণই আমার নিকট অধিকতর হৃদয়গ্রাহী নহে! প্রত্যুষে কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন নিবিড় বনানির ভিতর হইতে নানা বিহগ কাকলি, পর্ব্বত গাত্র বিদারিণী কুয়াসা আঁচল ঘেরা স্রোতস্বিনীর প্রাণস্পর্শী কল্লোলনাদ, দিবাগমের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণ শিকার প্রভৃতি রজোগুণের চঞ্চল আনন্দ, পুনরায় সোণার আঁচল পরা সন্ধ্যা বধুর আগমন প্রতীক্ষায় পক্ষিকুলের আনন্দগীতি আর ঝিল্লির অবিশ্রান্ত উলুধ্বনি, আবার ঝিল্লি মুখরিত সন্ধ্যায় স্নিগ্ধোজ্জল চন্দ্র কিরণোদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যের মোহন ছবি কোন স্বপ্ন রাজ্যের মোহজাল রচনা করিয়া দিত; পুনরায় বনচরগণের গমনাগমন প্রতীক্ষাজনিত আশা উৎকণ্ঠার উপভোগ্য বিনিদ্র রজনী এই সমস্তকেই বিদায় দিতে হইবে এই কারণে মন বড় দমিয়া যাইতেছিল। যদিও খেদার মিয়াদ কাটে নাই তথাপি এই বারই যেন সব শেষ এই কথাই বারম্বার মনের আনাচে কানাচে উঠিতেছিল। আশু বিরহের যন্ত্রণা যেমন মনকে অশান্তির পীড়নে অস্থির করে তদ্রূপ আমার মনেও এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ হইতেছিল। বড় প্রিয়জন এবং মধুর স্মৃতি ঘেরা স্থান হইতে বিদায় লইতে মনে যেমন কষ্ট হয় আজ আমার মন তেমনি বিরহ বেদনায় ক্লিষ্ট। কিন্তু বিদায়ই দুনিয়ার নিয়ম সবই যাইতেছে নদীর স্রোত চলিতেছে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ তারা কেবল বিদায়ের কাহিনী দিনের পর দিন গাহিয়া যাইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্ত চলিয়াছে। বাল্য যায়, যৌবন আসে, যৌবনের অবসানে বার্দ্ধক্যের অসাড়তা। জন্ম যাইয়া মৃত্যু আসে, থাকে না কিছুই—সবই যায় এই গতিই জগৎ। এই পৃথিবীতে বিদায়ের পালাই স্বাভাবিক সুতরাং Rewak হইতে আমাদিগকে বিদায় লইতে হইবে ইহাতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এত প্রিয় পৃথিবী এখান হইতেও যাইতে হইবে। সুতরাং দুঃখের সহিত দুইটার সময় রওনা হইয়া আসিলাম—বাড়ীতে আসিতে ৮টা বাজিয়াছিল।

এবার সর্ব্বসমেত ৩০ হাতী আনা হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

বুড়ী।

(কথা-চিত্র)

"জয় সীতারাম ধনুক্‌ধারী"

মুখ তুলে দেখি একবুড়ী। এক হাতে ঝুলি আর হাতে তা'রই মতো লম্বা একটা লাঠি। দাঁত গুলো সবই পড়ে' গেছে; উপরের পাটির ধবধবে একটা দাঁত নীচের ঠোঁটে চেপে আছে। বয়স ষাটের কম নয়। গালের ও দু'বাহুর কোঁচকানো ঝুলে পড়া চামড়া দেখে বোঝা গেল কালে সে খুব যোয়ান ছিল। পাকা চুল ছোট করে' ছাঁটা; চোখ কড়ির মতো শাদা হয়ে

গেছে। মাথা কাঁপছে। কুঁড়ে আঙুলের মতো মোটা ছেঁদাওয়ালা কাণের লম্বা লতি দুটো দুলছে।

আমি বললাম—"কা?"

"এক মুঠি চাউর মিল যায়, বাবু!"

"ঘর কাঁহা?"

"চিত্রকুটধাম, যাঁহা বিরাজে সীতারাম।"

"তুমি সীতারামকে জানো?"

বুড়ী একটু হেসে বলল "আ—রে বাবু!"

"বলো তো!"

বুড়ী তখন লাঠিটা মাটিতে ফেলে বসে পড়ে' বলতে লাগল,—

"অযোধ্যামে এক রাজা থা। উন্‌কা তিন রাণী থি। কোশল্যা, সুমাত্রা ঔর কেকয়ী। রাজা এক রোজ বাঁশ কাঁটনে গায়া।"

"রাজা বাঁশ কাটতে গেল!"

"হাঁ বাবু বাঁশ কাটনে যাকে উন্‌কা অঙ্গুলী কাট গায়া।"

বই বন্ধ করে' বুড়ীর কথায় মন দিলাম। বুড়ী হিন্দিতে বলতে লাগল,—"কোনো রাণী পারল না, কেকয়ী রাজার আঙুল ভালো করে' দিল। রাজা বহুত খুসী হয়ে বর দিতে চাইল; কৈকেয়ী এক বরে সতীন্ পো রামের বনবাস, অন্যবরে নিজের ছেলে ভরতের রাজা হওয়া বর মাগল।

রামচন্দ্রজী বনে গেলেন; সঙ্গে গেলেন সীতামায়ী আর লছমনজী। দুই ভাই মিলে সেখানে ক্ষেতি উতি করলেন।

"বটে!"

বুড়ী কর গুনে গুনে বলতে লাগল—"এই গম্ করল, যব করল ভুট্টা করল আরো কত কত চিজ করল।

তার পর একরোজ রাবণ রাচ্ছস এসে সীতা মাইকে 'চোরি' করে নিয়ে গেল।"

এই বলে' বুড়ী কপাল থাবুড়ে কাঁদতে লাগল। তা'র শুক্‌নো গাল গড়িয়ে দু'চোখের জল পড়ছিল।

তারপর হনুমানজীর কথা পড়'ল। হনুমানজী এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণের সোণার পুরী পুড়িয়ে ছারখার করে' দিল।

এই বলে বুড়ী হেসেই খুন্। হাঁ করে বুড়ী হাসতে লাগল, শাদা দাঁতটা বেশী করে' বেরিয়ে পড়ল। চোখে জল, অদম্যের হাসি আমার বেশ লাগছিল।

এই টুকু আলাপেই বুড়ীর উপর একটু মায়া বসে গেল; সে কেন দেশ ছেড়ে এল জানতে ইচ্ছা হল।

বুড়ী বললে সে চিরকাল এমন ছিল না। তার শ বিঘা জমিন্ ছিল। এক কুড়ি ভৈষ ছিল, চার বেটা ছিল। বুড় বয়সে বুড়া মারা গেল, বুড়ীর মন হল তীর্থ ঘুরবে। বেটারা বাপ মরে জমিন্ পেয়ে কাজিয়া করতে লাগল, বুড়ীর সঙ্গে কেউ যেতে চাইল না। বাপ মা-মরা এক দেওর-পুৎ ছিল, বুড়ী তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বুড়ী পায়দলে হেঁটে সারা তীরথ্ ঘুরল। হরিদ্বার দ্বারকা জগন্নাথজী সেতুবন্ধ রামেশ্বর দুনিয়ার এই চার দুয়ার বুড়ী দেখেছে।

দু বছর পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখে—ওরা মরে গেছে ভেবে দেওর পুতের জমিনটুকু বেটারা বেঁটে নিয়েছে। বুড়ী গাঁয়ের মাতব্বর ডাকল; ছেলেরা তাদের একরোজ 'নেওতা' খাইয়ে দিল; তারা বিচার করে বলল—"জমিন্ পাবে না।"

তালুকদারের দুয়ারে নালিশ করল, ছেলেরা নায়েবকে এক রূপেয়া নজর দিল, নায়েব বাবু সরজমিন্ তদন্ত করে বললেন—"নেহি মিলেগা।"

ভিখুয়া বললে "দেশে ভিখ্ মাঙতে সরম লাগে আমি বাংলা মুলুকে যাবো।"

বুড়ীও বেরিয়ে পড়লো, "আমা হতে যখন ওর এমন হাল হল, আমিও ওর সঙ্গে যাবো; এমন দুষমন্ লেড়কা চাই না।"

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

যুগাবর্ত্তন।

(মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।)

যাবতীয় সৃষ্টজীব মধ্যে মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে অন্য কোন

জীব এ পর্য্যন্ত পারে নাই, পারিবে কিনা তাহাও অজ্ঞাত।

ডারউইনের কল্পনা মতে, জীব ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা লাভের দিকে তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া মানবত্বে পরিণত হইয়াছে। কে বলিতে পারে, ভবিষ্যতে আরও কোন জীবের আবির্ভাব হইবে, নাকি এখানেই পূর্ণতার শেষ।

পূর্ণতার পথে যাইতে গিয়া তাহারা যে সম্পূর্ণ অপূর্ণতা সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে, তাহাই মহা কষ্টের কথা। বাস্তবিক পূর্ণতাটা কি? যেখানে কোন অভাব নাই, অভিযোগ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পরপীড়ন নাই, নিরানন্দ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, কেবল তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা, ও অভিন্নতা রূপ বিমল আনন্দ লহরী বিরাজমান, তাহাই ত পূর্ণতা, না যেখানে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবের বৃদ্ধি; অভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে মানব তাহা পূর্ণ করিতে যাইয়া, অর্থাৎ পৌছিতে যাইয়া, সম্যক হ্রাস করিতে না পারিয়াও সন্ন্যাসী; পরস্বাপহরণের সন্ধানে ছদ্ম বেশী জ্ঞান প্রবীর; সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষার জন্য চতুর রাজনৈতিক; কিম্বা গৌরবান্বিত উপাধিভূষিত দুষ্টাসরস্বতীর বর পুত্র প্রভৃতি নানা সাজে সাজিয়া ভবরঙ্গমাঝে নানা অভিনয় করিতে থাকাই পূর্ণতা! পূর্ণতার দিকে যাইতে যাইতে যদি অপূর্ণতায় পৌঁছিতে হয়, অভাব দূর করিতে যাইয়া যদি নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ মানব হইতে বরং জ্ঞানহীন পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবের অবস্থাও বাঞ্ছনীয়; তাহাদের জ্ঞানহীনতা যদিও এই সুখের মূল কারণ, তথাপি একপ্রকারে তাহারাই প্রকৃত সুখী। অথবা স্বনাম ধন্য কবি Gray এর কথায় বলা যায় "where ignorance is bliss it is folly to be wise."

আজ মানব বিজ্ঞান জগতে বিচরণ করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া কতই না গৌরব করিতেছে এবং এই বিজ্ঞানই তাহাদিগকে perfection এ নিয়া যাইবে বলিয়া ধারণা করিতেছে; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে একটু অনুধাবনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় নাকি, যে এই বিজ্ঞানই আমাদের অভাব দূর না করিয়া বরং অভাবের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। দিন দিন নূতন আবিষ্কারের পর আমাদের নিজ নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপতিত হইয়া, নিজেদের দৈন্য বা অভাব বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুরই সাহায্য করিতেছে না। যে বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষীকৃত নহে; যে বিজ্ঞান কোন পদার্থের স্বরূপ বলিতে যাইয়া, মাত্র তাহার মোটামুটি অবস্থা দিয়াই সন্তুষ্ট থাকে; যাহা শুধু সঙ্কল্পের উপর সংস্থাপিত এবং যে পুনঃ কল্পনার সময় ক্রমে আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার লাভ কত দূরে অবস্থিত তাহা অতি সহজ বোধগম্য।

এক কালে Ptolemyর মত জগতে বিরাট অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ-মান ছিল। তখন কে জানিত যে Copernicus এর মত আসিয়া তাহাকে বিদুরিত করিয়া তাহার অধিকৃত আসন জুড়িয়া বসিবে। এবং এখনই বা কে বলিতে পারে,—যদিও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান অনেকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়, যে অদূর ভবিষ্যতে আবার কাহার সিদ্ধান্ত আসিয়া Copernicus এর স্থান অধিকার করিয়া বসিবে না?

গ্রহ উপগ্রহ হইতে অণুপরমাণু পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থই এত কাল জড় পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইত এবং প্রত্যেক দ্রব্যেই আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়াই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম! জলযানের পরমাণু হইতে আর ক্ষুদ্র পরমাণু জগতে পরিচিত ছিল না। কিন্তু Dalton এর সেই আণুবিক তত্ত্ব আজ দোদোল্যমান। আজ আবার Hydrozen হইতে শত সহস্রগুণে ক্ষুদ্র electron দেখা গিয়াছে। এবং চলন্ত electron এর জড়ত্ব আছে; স্থির electron এর জড়ত্ব নাই প্রমাণিত হইয়াছে। জড়ত্ব এখন অবস্থাভেদে আরোপিত হয়। অম্লজান বাষ্প ও উদজান বাষ্প প্রভৃতি এযাবৎকাল অবিনশ্বররূপে পরিগৃহীত আজ বিনশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Radium নামক আর এক পদার্থের আবিষ্কারে পুনঃ বিজ্ঞান জগতের অনেক ধারণায় মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত। তদ্দ্বারা পৃথিবীর আয়ু আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়া হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কল্পকল্পান্ত-স্থায়ীরূপে পরিণত হইতে চলিল। Etherই

এখন সমুদয় পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা, এবং লয়ের পূর্ব্ব অবস্থা বলিয়া পরিগৃহীত হইতে চলিল। কি আমূল পরিবর্ত্তন? এইরূপ সদা পরিবর্ত্তনশীল বিজ্ঞান যদি পূর্ণতায় নিয়া যাইতে পারে তবে অভাবের পথে নিবে কে?

আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া যতই আড়ম্বর করি না কেন আমাদের নূতন আবিষ্কার, নূতন অনুশীলন, নূতন বিধান সমুদয়ই সেই প্রাচীন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, পঞ্চগুণান্বিত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পঞ্চভূত অতিক্রম করিয়া আর কোথাও যাওয়ার উপায় নাই। ঘুরাইয়া বলি, ফিরাইয়া বলি, কিম্বা নূতন করিয়া বলি, আমাদের এই পঞ্চভূতের কথাই বলিতে হইবে। বিশেষত্ব মাত্র এই যে ক্ষিতিতে আরও বাকি চারিটি গুণ মিলিবে, অপ্ এ ক্ষিতি ভিন্ন আর তিনটি গুণ মিলিবে। সেইরূপ তেজে আর দুইটি, মরুতে আর একটি, এবং ব্যোমে কেবল মাত্র ব্যোমের গুণই পাওয়া যাইবে। আবার যে, বিপরীত ক্রমে ব্যোমে সর্ব্বগুণ মরুতে সর্ব্বগুণ, তেজ, অপ, ক্ষিতিতেও সর্ব্বগুণের পরিচয় পাইবে সেই বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক। তাহার বিজ্ঞানই বাস্তবিক পূর্ণতায় নিতে পারিবে। তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই নহে।

এই রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ মধ্যে আধুনিক জড়বৈজ্ঞানিকগণ শুধু রূপ (light) স্পর্শ (Heat) এবং শব্দ (sound) আংশিক আলোচনা করিতে পারিয়াছেন মাত্র, গন্ধ বা রসের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা আলোচনা করিবার মত ক্ষমতা এখনও কাহারও জন্মে নাই। এই গেল বহির্জ্জগতের কথা, অন্তর্জ্জগতের কথা এখনও অনেক দূরে।

এ প্রকার যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় প্রত্যেক দিকেই বিজ্ঞানকে অপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের এত অভাব, সেইটা কি প্রকারে পূর্ণতায় নিয়া যাইতে পারে তাহাই চিন্তার বিষয়। তাই বুঝি ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয় গাহিয়াছিলেন— "ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে; দেখব কেমন উপাধি নিলে কয়টা কেনর জবাব শিখে।" ইত্যাদি।

বিজ্ঞান জগতে যতই আবিষ্কার বা অনুশীলন হইতেছে তাহা সমুদয়ই অনুভূতির সাহায্যে। আলোর অধ্যায়ে দেখিব আমাদের চক্ষের স্নায়ুর উপর ether এর কোন নির্দ্দিষ্ট সম্যক ঢেউয়ে আঘাত করাতে আমরা নীল বা লাল রং দেখিতে পাই। ইহাও একটা অনুভূতির ব্যাপার। সে প্রকার Heat বা sound স্পর্শ বা শব্দ আমাদের শারীরিক কোন কোন স্নায়ুর উপর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আঘাত জন্মাইয়া বিভিন্ন রকমের অনুভূতি জন্মায়। তজ্জন্যই আমরা বাহ্য জগতের বিজ্ঞান জানিতে পারি। অতএব বাহ্যজগতের বিজ্ঞান জানা অন্তর্জ্জগতের অনুভূতি ভিন্ন হইতে পারে না।

"বিজ্ঞানের কাজ মনন কর্ম্ম; বাহিরের প্রত্যক্ষ গোচর কতকগুলি percepts মিলাইয়া, তাহা হইতে concept তৈয়ার করিয়া, সেই সকল concept এর সম্পর্ক নির্দ্ধারণই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানবিৎ সমুদয় দৃষ্টজ্ঞান হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া নিজের অনুভূতির সহিত মিলাইয়া যাহা পাইবে তাহাই তাহার একটা কাটছাট করিয়া সাধারণ নিয়ম গঠন করিয়া ব্যষ্টিকে সমষ্টির ভিতর আনিয়া চরিতার্থ হয়। এইখানেই তাহার শান্তি। নিউটনের আপেলের পতন হইতে মাধ্যাকর্ষণের বিধান; পরে তাহা হইতে জাগতিক সমুদয় বস্তুর পরস্পরের আকর্ষণের বিধান হইয়াছে। কোন ঘটনা যখন তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ভিতর আসে না অমনি বিজ্ঞানবিৎ তাহা বিশ্বাস করেন না এবং তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া ফেলেন।

বাস্তবিক পূর্ণতায় পৌছিতে হইলে এই বিজ্ঞান তাহার সাহায্য করিবে না, অন্তর্বিজ্ঞান জানার প্রয়োজন; এবং তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পরিলে, অন্তর্বিজ্ঞান ও বহির্বিজ্ঞান উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বহির্বিজ্ঞান যেমন অনুভূতির ভিতর দিয়া জানিতে হয়, অন্তর্বিজ্ঞানও সেইরূপ অনুভূতির ভিতর দিয়া জানা যায়। সেখানে ধারণাই মুখ্য; দৃষ্ট প্রমাণ সেখানে অতিশয় গৌণ উপায়। বাহিরে যেমন রূপ রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ, ও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আছে, অন্তর্জ্জগতেও সেই সকল

ঠিক ঠিক বর্ত্তমান আছে। সমগ্র বিশ্বমণ্ডলে যাহা আছে এক অন্তর্জ্জগতের ভিতরও সে সমুদয় আছে। বট বীজের ভিতর যেমন সূক্ষ্ম ভাবে বটবৃক্ষের সমুদয় আয়তন লুকাইয়া থাকে, বৃক্ষের কোন অংশই যেমন বীজাভ্যন্তরীন অবস্থা হইতে একটুও বিভিন্ন নহে, সেপ্রকার বহির্জ্জগৎ এই অন্তর্জ্জগতে সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান আছে। তাহা অন্তর্নিবিষ্ট চক্ষু ভিন্ন, বা দিব্য চক্ষু ভিন্ন দেখা যায় না, এবং সেই দিব্য চক্ষু পাইতে কঠোর সাধনার দরকার। শ্রীকৃষ্ণে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত। অবিশ্বাস্য কিছুই নয়। বিজ্ঞানের মূলভিত্তিও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। বিশ্বাস না করিলে বিজ্ঞান মুহূর্ত্তের ভিতর মিথ্যা হইয়া পড়ে।

অন্তর্জ্জগতে রূপ বা তেজ গ্রহণের জন্য আছে নেত্র, এবং রূপ বা তেজ ত্যাগের জন্য আছে পাদ; রস গ্রহণের জন্য আছে জিহ্বা, রস ত্যাগের জন্য আছে উপস্থ; গন্ধ গ্রহণের জন্য আছে নাসিকা, গন্ধ ত্যাগের জন্য আছে পায়ু, স্পর্শের জন্য আছে ত্বক্; ত্যাগের জন্য পাণি; শব্দ গ্রহণের জন্য আছে কর্ণ, শব্দ ত্যাগের জন্য আছে বাক্। আর অন্তর্জ্জগতে, ক্ষিতি গুহে বা পায়ুতে, অপ নিম্নোদরে বা মূত্রস্থলীতে, তেজ উর্দ্ধোদরে বা পাকস্থলীতে মরুৎ বক্ষস্থলে বা ফুসফুসে, ব্যোম মস্তকে বা মগজে। অন্তর্জ্জগৎটা বহির্জ্জগতেরই একটা অত্যাদ্ভুত চুম্বক মাত্র।

জড়বিজ্ঞানবিৎ জড়বিজ্ঞান বা বাহ্য বিজ্ঞান তত্ত্ব অবগত হইয়া সাধারণ লোকের নয়ন ধাঁধাইয়া, সূর্য্য গ্রহণের ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া, কিম্বা রসায়ন শাস্ত্রের বলে অত্যাদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করিয়া, কিংবা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের নক্ষত্ররাজির কোন অনাবিষ্কৃত ঘটনার আবিষ্কার করিয়া যেমন শ্রেষ্ঠ মনিষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন; অন্তর্বিজ্ঞানবিৎ অন্তর্বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া সাধারণ লোকের নিকটে তাহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ত্রিকালজ্ঞ যোগীরূপে পরিচিত হইয়া, ততোধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। দেওভোগের "নাগ মহাশয়" আঙ্গিনা কাটাইয়া গঙ্গা আনিয়াছিলেন, ইহা বিজ্ঞানাতীত। তাহাদের নিকট জড়-বিজ্ঞানবিৎ অতি তুচ্ছ নগণ্য এবং তখন বিজ্ঞানবিদের এই অতুল গৌরব ভূমি চুম্বন করিয়া তৃপ্ত হয়।

শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী বি, এ,

চণ্ডীদাস।

শ্রীচৈতন্য দেবেরও প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলার প্রেমিক কবি-কুল চূড়ামণি চণ্ডীদাস যে অপার্থিব প্রেমতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া কালের অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—সে অমূল্য সম্পদ্ আজ ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীকে জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কত বড় উচ্চাসন দিয়াছে, তাহা জাতির ইতিহাসে চিরাদিনের জন্য অক্ষয় হইয়া রহিবে। চণ্ডীদাস বঙ্গের আদি কবি না হইলেও বঙ্গ ভাষার সেই শৈশব অবস্থায় ইনি যেরূপ রচনা পারিপাট্য রস মধুর্য্য, ও সুললিত ছন্দোবন্দের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই ইনি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে প্রধান আসন পাওয়ার যোগ্য। চণ্ডীদাসের সময় বাঙ্গালা রচনার আদিকাল বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাস অতি সরল-ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা যেমন গুছাইয়া সরল তরল ভাষায় বলিয়াছেন, বাঙ্গালী হৃদয়ের নিখুঁৎ ছবি যেমন শুভ্র স্বচ্ছ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন—এমন ভাবে মরমের কথা, অন্তরের সজীব ছায়া আর কোন কবি আঁকিতে পারিয়াছেন কি? মধুর শব্দ বিন্যাসে অনেকেই সিদ্ধ হস্ত, কিন্তু মানুষের অন্তরের যে গোপন কথা, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, যাহা অন্তদৃষ্টি ব্যতীত বুঝিবার সাধ্য নাই, যোগ সাধক ভিন্ন যাহার সন্ধান পায় না—সেই নিকষিত পরাতীত প্রেম বাঙ্গালীর প্রাণে এক চণ্ডীদাসই জাগাইতে পারিয়াছেন। তাই বলি চণ্ডীদাস কেবল কবি নন—প্রেম-সাধক ঋষি।

চণ্ডীদাসের মত কবি যে জাতিতে জন্মায় তার অতীতকে বাদ দিলে চলে না—বাঙ্গালার শ্যামল বুকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই তাঁদের যশঃ সৌরভ রাখিয়া গিয়াছেন—যার গরিমা নিয়া তরুণ বাংলা আজ বিশ্ব-মানবের মিলন-মঞ্চে তার আসনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যে এক স্বর্গীয় সম্পদ। এ সৌন্দর্য্য যে

বাঙ্গালী উপভোগ করিতে পারেন নাই—এসুরের মূর্চ্ছনায় যার মনের গোপন তলে আঘাত করে নাই, তাঁর চর্ণ্ডাগ্যের মসী রেখাকে সান্ত্বনার জলে মুছিয়া দেওয়া সম্ভব পর কি?

বাস্তবিক—কবি চণ্ডীদাসকে মনে করিলে প্রথমে তার প্রেমের কথাই অন্তর দুয়ারে উঁকি মারে। আপ্‌না হইতেই সেই কবি-হৃদয়ের—সপ্ত-রাগ-রঞ্জিত রামধনুর ন্যায়, অনন্ত ভাব বৈচিত্রের বর্ণ রাগ চখের তলে ফুটিয়া উঠে। প্রেমই ছিল সেই রজকিণী প্রেম-মুগ্ধ কবি-জীবনের দেহ-মন-প্রাণ। চণ্ডীদাসের আত্ম-বিস্মৃত প্রেম আজ শত শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া রাধাকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবন লীলার করুণ গীতি-ছন্দে বাংলার গগন পবন মুখরিত। এমন প্রাণ-মন-মাতানো আপন ভোলা উদাসী ভাব পাঁচশত বৎসর পরেও তেমনি ললিত ঝঙ্কারে আজ ভাবুকের প্রাণের তলে গাহিয়া চলিয়াছে

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।"

এ যেন কতদিনের পরিচিত চেনা সুর। যতবার বলা যায় ততবারই এ যেন নব নব রসের সৃজন করিয়া—

"কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিলা গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"—

চণ্ডীদাসের এ গীতি-ছন্দের দোলায় সমস্ত বাঙ্গালী আজও তেমনি ভাবে দোল্ খাইতেছে। এ দোলা আর থামিবেনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রেমের এ অমিয় ধারা, বিরহীবুকের তোরের করুণ প্রবাহ ধ্বংস লীলার শেষ দিন পর্য্যন্ত মানব-হৃদয়ে—মরমের তলে তলে গলিয়া গলিয়া গোপনে বহিয়া চলিবে। এমন উদাস গাঁথা, প্রেমের এমন তন্ময়তা বাঞ্ছিতের আলাপনে বিলাপের এমন মর্ম্মস্পর্শী উচ্ছ্বাস আর কোথায়ও শুনিয়াছ কি?

"না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।"

এ পাওয়ার মধ্যে কামনার পুতি-গন্ধ নাই, লালসার তীব্র মাদকতা নাই—এ শুধু রসাত্মিকা ভক্তি মিশ্রিত প্রেম। প্রেমই চণ্ডীদাসের জীবনের প্রতিপাদ্য বিষয়।

চণ্ডীদাসের কবিতাবলী মধ্যে দুঃখের বেদনাই তাহার প্রেমের অনুরাগকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে বিশেষ করিয়া। প্রকৃতই চণ্ডীদাস ছিলেন দুঃখের কবি। সুখকে তিনি দুঃখের শীতল ছায়ায় সদাই ঢাকিয়া রাখিতেন দুঃখের ভিতর দিয়াই প্রেমের সেই একনিষ্ঠ সাধক কবি পিরীতির মহান্ বীজ রোপন করিয়াছিলেন—তিনি বলিতেন—

"কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী,
সুখ দুঃখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।"

সুখের প্রয়াসী হওয়াকে কবি যেন মোটেই পছন্দ করিতেন না, সুখ চাহিলেই যে সুখকে পাওয়া যায় না—দুঃখের আঘাতে সে সুখের সকল তার ছিঁড়িয়া বেসুরা বাজিতে থাকে সে কথা সাধক কবি তার প্রেমের অধ্যাত্ম জীবনে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই বড় অভিমানের আবেগে গাহিয়াছেন

"সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর কপালে লিখি"

কবি দুঃখকেই পিরীতির আধার মনে করিয়া, দুঃখ ভিন্ন পিরীতির সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া অপ্রেমিককে সান্ত্বনা সুরে জানাইয়া দিলেন—

"যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি।" পাছে জ্বালা পাইয়া দুঃখের আঘাতে পিরীতির পথে না আসে তাই প্রেমিককে আর এক প্রলোভনে পিরীতির স্বাদ বুঝাইলেন—

"সই পিরীতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ মানয়ে তারা।"

প্রেমের যেখানে সমাধি—মানুষের মন সেখানে ভাষা দিতে পারে না—মানুষ সেখানে অতলের মাঝে নির্ব্বাক হইয়া আপনার ঈপ্সিতের ধ্যানে মগ্ন থাকে। এই নিশ্চল ধারণার ভিতর দিয়াই প্রকৃত পিরীতিকে পাওয়া যায়। আমিত্বকে পিরীতির দুয়ারে বলি দিলে তবে না পিরীতি-সাধন হয়। এই পিরীতি সাধনের জন্য কবি চণ্ডীদাস তাঁর প্রেমের মানুষকে ডাকিয়া বলিলেন—

"চণ্ডীদাস বাণী,
শুন বিনোদিনী
পিরীতি না কহে কথা।
পিরতি লাগিয়া,
পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥"

বাস্তবিক প্রেমের কি মহিমাময় আত্মত্যাগ। ইহ সংসারের কয় জন প্রেমিক এমন নিকসিত হেমস্বরূপ প্রেম লাভ করিতে গিয়া আপনার জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারেন? কয় জন নিষ্কাম প্রেমিক পিরীতির এই অমর বাঞ্ছিত আদর্শকে চণ্ডীদাসের ন্যায় বুকের পরতে পরতে অনুভব করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন? এ যেন প্রাণের উজার করা ভালবাসার মূর্ত্তরূপ!

এ হেন দুঃখ লব্ধ পিরীতির সৃজন ব্যাখ্যা কবি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সরল ও সহজ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পিরীতির এমন স্বর্গীয় ভাবের নির্ম্মল বিকাশ আর কোথাও মিলে কি? এ যেন পূত সলিলা মন্দাকিনীর অমল ধবল প্রপাত ধারা, আপনার ছন্দে আপনি তন্ময়! দুঃখের তপস্যায় বসিয়া সাধকের কি অপূর্ব্ব গৌরবময় অপার্থিব আনন্দ, এর তুলনা নাই, এর দ্বিতীয় উপমা নাই চণ্ডীদাসের উপমা কেবল আমরা চণ্ডীদাসেতেই খুঁজিয়া পাই।

প্রেমরাজ্যের সাধনা সিদ্ধ ঋষি বাস্তব জগতের দিকে ফিরিয়া শুনিলেন তাঁহার জীবনভরা আরাধনা-লব্ধ পিরীতির কথা সাধারণ মানুষ যথা তথা গাহিয়া ফিরে। পিরীতি করিতে গিয়া তারা হিংসা দ্বেষে, নীচ লালসার আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। পিরীতির এই অধঃপতনে রিপুজয়ী চণ্ডীদাস কামান্ধ সমাজকে ডাকিয়া বড় করুণ সুরে গাহিলেন—

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি অন্তরে
পিরীতি সাধি লয়ে,
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস'
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ।"

চণ্ডীদাস পিরীতি সাধন-মার্গে বাংলার তথা ভারতের ভবিষ্য বংশধরগণের জন্য মিলনের যে পথ রচনা করিয়া গিয়াছেন,—তাতে ভেদের দ্বন্দ্বের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া "পরকে আপন করিতে পারিলে" দুর্ব্বল আত্ম-ঘাতী জাতির অহিংসা-প্রেমের যজ্ঞ পূর্ণ হয় নাকি? এই পিরীতির মন্ত্রে স্বার্থের কালকূট হলাহল অমৃতে ভরিয়া উঠে নাকি? দেশের নায়কেরা আজ জাতিকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিতে গিয়া ঐক্যের মহান্ মন্ত্র, অহিংসার প্রেমের বাণী জগৎকে শুনাইতেছেন,—পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে নান্নুরের কোন্ এক নিভৃত পর্ণ কুটীরে বসিয়া বাশুলী-কৃপা প্রাপ্ত, ভবিষ্যৎদর্শী পিরীতির ঋষি এই বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব এবং মহাত্মা গান্ধী সে বীজের অত্যুৎকৃষ্ট অঙ্কুর মাত্র। ক্ষুদ্র অঙ্কুর হইতেই মহামহীরুহের উৎপত্তি। যাহা ক্ষুদ্র তাহাই বিলোপ হয়, যাহা বৃহৎ তাহাই জগতে থাকিয়া যায়। এই দুই অতি-মানবই বাংলার বুকে, চণ্ডীদাসের পিরীতির দুটী ধারা। চণ্ডীদাসের সেই উদার মিলন গীতিই না আজ বিশ্ব-মানবের দুয়ারে আঘাত দিয়া পিরীতির জয় জয়কার ঘোষণা করিতেছে।

চণ্ডীদাসকে মনে রাখিলে এই সুজলা সুফলা বাংলাকে মনের আসনে পূজা করিতে হইবে। দেশকে ভালবাসিলেই জাতিকে ভালবাসিতে হয়। জাতিকে ভালবাসিলেই ভগবানকে ভালবাসা হয়, কারণ হিন্দু দর্শন বলেন জীবই—শিব।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

আগমনী।

১

ওই আসে! ওই আসে!
আলোকের রথে নীহারিকা-পথে অন্ধ জাতির পাশে!
আজিও কে হেথা পাপীরে বাসিছে ভালো
দুঃখ-নিশীথে দেখালো কে কারে আলো!
অমনি দেবতা উজলি' গগন কালো,
রহিয়া রহিয়া বিজলী ঝিলিক্ হাসে!
দুঃখ কোথায়? শঙ্কা কোথায়? সে যে আসে! ওই আসে!

২

সদা অবিচারে কা'রা গুমরিছে মনে!
ক্ষুধাতুর কা'রা মরিছ সঙ্গোপনে!
পদাঘাতে কে গো যুঝিয়া ভাগ্যসনে,
বিফলে মরিয়া ধাইছ মৃত্যু-নাশে!
সম্বর' তবু সম্বর' আজি! সে যে আসে! ওই আসে!

৩

মশালবাহীরা! আপন স্বার্থ ভুলি'
মনের বেদনা একসাথে কহ খুলি'!
বিচারের ভার তারি হাতে দাও তুলি':
মারিবে না কেহ তার অনুগত দাসে!
আত্মার বলে করিতে বিজয়ী সে যে আসে! ওই আসে।

৪

যত মত তত পথে চলে লোক ভবে;
ভূমারে এরূপে সকলে পূজিতে র'বে!
বাঁধা ধরা একপথে যেতে কেন তবে,
কেবল কর্ম্মী জ্ঞানী জনে শুধু শাসে!
বুদ্ধি-অস্ত্র বরষিয়া তাই সে যে আসে! ওই আসে!

৫

অরূপ হইয়া ধরে অনন্ত রূপ!
পূজিতে বিরাটে কে বয়ে অন্ধকূপ?
ফুল বেলপাতা নাহি চাহে ধুনা ধূপ!
সৃষ্টির মাঝে তাহারি মুরতি ভাসে!
আপন স্বরূপ দেখায়ে চেনাতে সে যে আসে! অই আসে!

৬

আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া যে জন ডাকে,
দেখা পাবে সে যে অতি নির্জ্জনে তাকে!
চিনিবে তখনি যদি সুকৃতি থাকে!
বুঝিতে পারিবে কত সে যে ভালবাসে!
কমল-নয়ন মেলিয়া নেহারো। সে যে আসে! ওই আসে!

৭

আত্ম-অবোধ যারা আছ ভয়ে মরি',
অবিশ্বাসের বিষে গেছে মন জরি'!—
ঝড়-ঝঞ্ঝায় মেঘে গর্জ্জন করি',
'সিংহ' জাগাতে ডাকিছে সে কত আশে!
শোন আহ্বান! শোন আহ্বান! সে যে আসে! ওই আসে!

৮

তমের তিমিরে ছেয়ে গেছে সারা দেশ!
হাঁকে তমোগুণী,—"সাত্ত্বিকতাটা বেশ!"
কোন্ ঠাসা হয়ে জীবন করিছে শেষ!
কর্ম্মী জাতিরা তথাপি চরণে ঠাসে!
ঘোর তামসিক জাতিরে জাগাতে সে যে আসে! ওই আসে!

৯

দেশে দেশে আজি রাজসিক জাতি সবে,
পাহাড় উড়ায়, নদী শোষে, ওড়ে নভে!
ভারত-পণ্যে সোণা ফলিতেছে ভবে!
মোরা ভারবাহী, ক্ষুধা নাশি তুষ ঘাসে!
ঘুচাইতে মোহ মহামারীরূপে সে যে আসে! ওই আসে!

১০

এখনো সময় আছে, আছে, ওরে, আছে!
আগে বাঁচা চাই, বেদ বেদান্ত পাছে!
খেতে দাও শুধু যাহারা মৃত্যু যাচে!
জড়ায়ে যেয়ো না নানা গোঁড়ামির ফাঁসে!
হৃদয়হীনতা ধ্বংস করিতে সে যে আসে! ওই আসে!

১১

জয়, জয়, জয়! সত্যের হবে জয়!
মিথ্যার সাথে কখনো আপোস নয়!
শাসনে শোষণে বিবেক পাবে কি লয়?
ভয়-ভীতি কোথা প্রাণের মহোচ্ছ্বাসে?
সব ব্যবধান ঘুচাইতে সে যে ওই আসে! ওই আসে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

দেশ-প্রীতি।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে' ফেরার সময় বজনা নদীর তীরে দেখতে পেলেন বহু যোজন বিস্তৃত বিজন এক বনভূমি। শ্যামল অরণ্যানীর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য উপভোগ মানসে মন্থর গতিতে বাসব বনের দিকে অগ্রসর হ'লেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে সেই দিগন্ত প্রসারী অরণ্যে বৃক্ষলতা গুল্ম কিছুরই অভাব নাই বটে, কিন্তু কোন এক অজানা দেবতার অজানা অভিশাপে বৃক্ষলতাদি সমস্তই যেন সজীবতা হারিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেবারে।

ধ্বংশের তাণ্ডবলীলার প্রলঙ্কর পরিণাম দেখে দেবরাজ মর্ম্মাহত হয়ে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌লেন। তারপর ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে ধীরে ধীরে বনের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। বনের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরেও তিনি কিন্তু একটী জীবিত প্রাণীর সন্ধান পেলেন না। অবশেষে যখন অন্য পথ দিয়ে বেড়িয়ে যাবার উপক্রম কর্চ্ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল প্রকাণ্ড শুক্‌না একটা অশ্বত্থ গাছের দিকে। বিস্মিত হয়ে' তিনি দেখলেন জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল সার একটী পক্ষী গাছের ডালে চক্ষু মুদ্রিত করে' স্থির ভাবে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্চ্ছে। পাখীর তদবস্থা দেখে দেবরাজ দয়ার্দ্র হলেন এবং কাছে গিয়ে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"শুক্‌নো বনের মধ্যে একা মরা গাছে চোখ বুঁজে বসে' আছ কেন? তুমি কি চলৎ শক্তিহীন?" অস্ফুট স্বরে পাখী জবাব দিল—"না—এখনও সে শক্তি সম্পূর্ণ ভাবে হারাই নি। তবে শিগ্‌গিরই হারাব বলে বোধ হচ্ছে।" আবার ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে এখনও তুমি স্থানান্তরে চলে যাও নাই কেন? কি আশায় কার অপেক্ষা এখানে বসে অকারণ কাল কাটাচ্ছ?" শুনে পাখীর চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জল পরতে লাগল। বহুক্ষণ তার বাক্যস্ফুর্ত্তি হ'ল না—অবশেষে কম্পিত কণ্ঠে ক্ষীণ স্বরে সে বলতে লাগল—এই বন আমার জন্মভূমি—আমার পিতৃ পিতামহের আদিম বাসস্থান। এখানকার প্রতি বৃক্ষের প্রতি লতা গুল্মের এমন কি প্রত্যেকটা বালুকা কণার সঙ্গে হাজার হাজার বাঁধনে আমি বাধা। এই যে শুক্‌নো গাছ দেখছেন এরই উত্তরের দিক্‌কার ঐ মোটা ডাল খানাতে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার পিতাও জন্মে ছিলেন এই গাছেরই পূবেরঐ সরু ডালে। প্রথম আমি উড় শিখে গিয়ে বসে ছিলাম আপনার পায়ের নীচে যে জায়গাটার ঘাস শুকিয়ে বালি বেড়িয়ে পরেছে ওখানে। ওঃ কি আনন্দই সেদিন হয়েছিল আমার! সারাটা দিন এগাছ থেকে ও গাছে, এ ডাল থেকে ও ডালে কেবল উড়ে উড়েই বেড়াচ্ছিলাম। পাছে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ মাটিতে পরে যাই অথবা কোন হিংস্রক পাখী এসে ছোঁ মেরে আমায় নিয়ে যায়, এই ভয়ে বাবা আর মা অতি স্নেহপূর্ণ এবং সতর্ক দৃষ্টিতে সর্ব্বদা আমায় পাহারা দিচ্ছিলেন সমস্ত বনটা সেদিন আমার কাছে আনন্দময় বলে বোধ হচ্ছিল।" এই পর্য্যন্ত বলে পাখী হাঁ কাতে লাগল। প্রশংসমান দৃষ্টিতে বজ্রপাণি তার পানে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে পাখী আবার বিষাদপূর্ণ স্বরে বলতে আরম্ভ করল:—"আজ এই জীবন সন্ধ্যায় সব চেয়ে বেশী করে মনে আস্‌ছে আমার জীবন প্রভাতের সেই প্রাণ মন বিমোহনকারী সূর্য্যোদয়ের কথা। দৃষ্টিশক্তি লাভ করার পর সেই আমার প্রথম সূর্য্যোদয় দর্শন। রক্তের মতন রাঙ্গা আলোক লতার মতন সরু একটী আলোক রশ্মি ঐ বট গাছের পাতার ভিতর দিয়ে সেদিন প্রভাতে আমারই গায়ে এসে পরেছিল সর্ব্বাগ্রে। আর তার সঞ্জীবনী পরশে আমিই কোলাহল করে উঠেছিলাম সকলের আগে। আপনার ডান দিকের ঐ বালুকাস্তুপের উপর জীবনে প্রথম আমি আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হই। নরম কচি ঘাসে তখনও জায়গাটা সম্পূর্ণ ঢাকা ছিল। যেখানে আমি বসে আছি ঠিক এইখানে বসে' বাবা আর মা হর্ষোৎফুল্ল গর্ব্বিত দৃষ্টি দ্বারা আমার গতি বিধির অনুসরণ কর্চ্ছিলেন। গলা শুকিয়ে আস্‌ছে বেশী কথা বলতে পার্চ্ছি না এখন ভেবে দেখুন একটী বার যেখানকার জলবায়ুতে বর্দ্ধিত হয়েছি পিতার তত্ত্বাবধানে মাতার স্নেহে আশৈশব যেখানে লালিত পালিত হইয়েছি; আজন্ম পরিচিত, প্রাণপ্রিয়তম পিতৃ পিতামহের সেই

পবিত্র বাসভূমির আসক্তি কাটান আমার মতন দুর্ব্বল পক্ষীর পক্ষে কি সোজা? এই শুক্‌নো বন আমার কাছে ওপারের কাশীর চেয়েও পবিত্র; এখানকার পশুপক্ষী তৃণলতা প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম বালুকা কণাটীকে পর্য্যন্ত যে আমি কত ভালবাসি তা কেমন করে বোঝাব আপনাকে? আজ অনশনে আমি অর্দ্ধমৃত প্রাণ আমার কণ্ঠাগত কিন্তু তবুও একমুহূর্ত্তের তরে এ জাগা ছেড়ে কোথায়ও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। জানি আহার্য্যের অন্যত্র অনাটন নাই তথাপিও প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই গাছের ডাল ছেড়ে কোথায়ও যাব না। আমার প্রাণের জন্মভূমিতে দেহরক্ষা করাই হচ্ছে আমার অন্তিম কামনা।" পাখীর সমস্ত কথা শুনে দেবরাজ বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে বল্লেন—(পাখী,) তোমার ঐকান্তিক দেশপ্রীতি দেখে আমি অত্যন্ত বিমুগ্ধ হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।" ক্ষীণ কণ্ঠে পাখী বলল—"জানি না কে আপনি। আমি বর চাই না। আমার আর বেশী দেরী নাই। এখন যত সত্বর জীবনাবসান হয় সেই ভাল।" তার পরে একটু থেমে আবার ধীরে ধীরে বল্‌ল—"নিজের জন্য কিচ্ছু চাই না আমি। বর দেবার শক্তি যদি আপনার থাকে তবে এই বর দিন যেন এই সৌন্দর্য্যবিহীন বনভূমি পত্রে পুষ্পে, লতা গুল্মে, ফলে জলে, তৃণে সুশোভিত হয়ে আবার পূর্ব্বশ্রী ধারণ করে।" —ইন্দ্রদেব "তথাস্তু" বলে অন্তর্ধ্যান হলেন।

দেখতে দেখতে শুকনো গাছে আবার পাতা গজিয়ে উঠল—হঠাৎ ফুল ভারে আক্রান্ত হয়ে লতা পরতে পরতে পাশের গাছটীকে ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে গেল—ভোম্‌রারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ফুলগুলির আশে পাশে অধীর ভাবে উড়তে লাগ্‌ল। দেশ বিদেশ থেকে পাখীরা এসে গাছে গাছে বসল—বালুকা-কঙ্করসমাচ্ছন্ন বন ভূমি সবুজ ঘাসে ঢেকে গেল। চূতমুকুলের কষায় আস্বাদে বসন্ত সখার আবার কণ্ঠ মুক্ত হল। তার বিরাম বিহীন সঙ্গীতালাপ বনের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে সমগ্র বনভূমিকে আবার নতুনপ্রাণে প্রাণবন্ত করে তুল্‌ল।

পাখী চিত্রার্পিতের মতন বসে সমস্ত দেখতে লাগল। অনাবিল আনন্দের আবেগময়ী উচ্ছ্বাসে পাখীর বুকখানা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আনন্দ বিস্ফারিত চক্ষে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু সে বলল—"হা ভগবন্!"

পর মুহূর্ত্তে তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে পরে গেল।

শ্রীবারেশ্বর বাগচী।

ভুল।

(ক)

আজ দশ বৎসর পর সে অঞ্চলের একমাত্র সরকারী বড় চাকুরিয়া সদরজজ হরমোহন বসু দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের কি সৌভাগ্য! চাবি বন্ধ প্রাসাদ পুরী আজ জনকোলাহলে মুখরিত। চামচিকা, বাদুড় আজ তাহাদের শান্তি রাজ্য, আশ্রয় দাতা প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে।

দেশের লোক গ্রামের একমাত্র জমিদারকে পাইয়া আত্মহারা—যেন হারামণি ফিরিয়া আসিয়াছে। গুরুজনের আশীর্ব্বাদে চাষা ভুষা প্রজাদের দণ্ডবৎ প্রণামে, সমবয়সীদের উল্লাসে হরমোহনের প্রাণ অতি মাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে যে এই গ্রামের একজন অসামান্য জনপতি এই ভাবটা সহসা তাহার আত্মাভিমানে সাড়া দিল। কলিকাতার নগণ্য এক গলিতে থাকিবার প্রবৃত্তি ও আফিসে রায় লিখিবার বাসনা অপেক্ষা গ্রামের একছত্র অধিপতি হইয়া থাকিবার কত বড় গৌরব হরমোহন অনুভব করিতে পারিলেন।

হরমোহনের আগমনে নিরীহ পল্লীজীবনে যেন একটা সজীবতা দেখা গেল। চারিদিকে যেন উৎসাহ উল্লাস আমোদ প্রমোদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। প্রাচীনেরা ভাবিলেন হরমোহন যখন বাড়ী আসিয়াছে তখন অবশ্য গ্রামের শ্রী ফিরিয়া যাইবে, দুঃখ দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে। দলপতিরা দলাদলি কিছু দিনের জন্য বন্ধ করিলেন। অর্থী প্রার্থীরা আশায় উৎসাহে, রঙীন হইয়া উঠিল।

(খ)

"জগমোহন [illegible] মনে করে ?"

"বাবু [illegible]। ৮ দিন হইল বাড়ী আসিয়াছে, [illegible] সঙ্গে ত [illegible] সাক্ষাৎ করতে হয়। আর দাদা [illegible] পারি না। [illegible] বৎসর [illegible] ছেলেটা দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাকে দেখিলে ও যে পুণ্য। আজ বুড়া কর্ত্তা থাকলে"---

"আর সে কথা বলো না ভাই"—বলিয়া গোবিন্দ বসু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর বলিলেন—"আমাদের বংশটা আলো করে আছে, আসিবার পর থেকে আর অবসর নাই। এই একটা কি সভা করবে—স্কুলের শিক্ষকেরা সঙ্গে সঙ্গেই আছে একটু সুয়াস্তি নাই। কিসে দেশের লোক খেতে পায়; রোগ জীর্ণ বাঙ্গালী কি করে বাঁচতে পারে তাই সে বসে বসে লেখে পত্রিকায় পাঠায়, এ সম্বন্ধে কত পুঁথি পত্র যে সঙ্গে আসিয়াছে—তা দেখলে অবাক হইতে হয়।"

"এই দেখ না ভাই, বাড়ীতে পা দিয়াই নূতন রাস্তার ব্যবস্থা হইয়াছে, গাছ কাটিবার হুকুম পড়িয়াছে পুকুরের জলে লোক নামিতে নিষেধ দিয়াছে, পাঁড়ে ঠাকুরকে ঘাটে পাহারায় দেওয়া হইয়াছে।"

জগমোহন বাহির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "এ করিয়া কি দেশটাকে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করিতে পারিবে—না, গ্রামের অজ্ঞ লোকগুলার যন্ত্রণা বাড়িয়া দিবে ঠাকুর দাদা!"

"হাঁ আমিও ঠিক তোমার মতই বলিয়াছিলাম। আর কি লোক আছে যে কেউ প্রতিবাদ করে। কেউ একটু টু শব্দ করিল না। দেখ না এখন জলের জন্য কি বেগই পাইতে হয়।"

"আমি তাকে বলব মনে করিয়াই আসিয়াছিলাম। আমাদের কথা কি সে ফেলিতে পারিবে। বুঝাইয়া বলিতে পারিলে অবশ্য সে শুনিবে।"

"তা এখন ত আর সে বাড়ী নাই। শুনেছি সে বলে যে দেশে কি আর মানুষ থাকতে পারে, জল নাই স্বাস্থ্য নাই। আমরা যেমন আর—মানুষ নাই। সে বলে সহরের পুকুরের জলে লোক নামিতে পারে না, [illegible] আর [illegible] জানে, তাই [illegible] দিয়া মেজাজ গরম করিয়া থাকে।

জগমোহন হাসিয়া বলিল—"কিন্তু এখানে মেজাজ গরম করিলে হয় না। এটা ভালবাসার সংসার। ভালবাসার সংসারের ভাব ভঙ্গী ঠিক উলটা। এখানে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা চাই। আর কথাবার্ত্তা খুব খাদে নরমে, কোমলে হওয়া চাই। গ্রামে তোমার নিকট তার দাবী আছে, তার উপর তোমার দাবী আছে।

"হাঁ জগমোহন এখানে ক্ষমতার অপব্যবহারও আছে আবার একটা অন্যায় করে তার মাপ করিবার দাবীও আছে। চক্ষু লজ্জা ত আছে। সহরে চক্ষুর পর্দ্দা নাই—কেবল আইন। এখানে আইন খাটাইতে গেলে নিন্দার ভাগী হইতে হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে আইন খাটাইলে যশ আছে।"

"হাঁ দাদা সেখানে আইন চলে। এখানে মানুষকে বুঝাইতে হইবে তবে লোকে শিখিবে, কথা মানিবে। নতুবা একটা শত্রুতার সৃষ্টি হবে মাত্র।

এমন সময় পরাণ চাকর তামাক লইয়া আসিল। গোবিন্দ বসু অনেক টানিয়া ধূমের লেশ মাত্র পাইলেন না—মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। হুকা জগমোহনের হাতে দিয়া বিকট চীৎকারে পরাণের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিলেন। অবসর বুঝিয়া হুকাটী রাখিয়া "যাই" বলিয়া জগমোহন উঠিয়া পড়িল।

(গ)

হরমোহন বাবু আসা অবধি বাড়ীর পুকুরে কড়া পাহাড়া পড়িয়াছে। কেহ তাহার জলে নামিতে পারে না। এ হুকুমে সমস্ত গ্রামখানিতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামে যে মাত্র একটী দিঘী—তার জলেই যে পল্লীর প্রাণ। সে জল না হইলে যে গ্রামবাসীর এক বেলাও চলে না।

* * * *

সেদিন সন্ধ্যার সময় হরমোহন বাবু একাকী বাহেরবাড়ীর উঠানে পায়চারী করিতেছিলেন। এমন সময় একটী বৃদ্ধ লোক আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।